# Jagannath University Journal of Arts

Volume 12, No 01, January–June 2022

ISSN 2519-5816

Jagannath University

Jagannath University Journal of Arts
Volume 12, No 01, January–June 2022

Published in : June, 2022

Published by: Dean, Faculty of Arts
Jagannath University
Dhaka-1100, Bangladesh

Printed at : DS Printing and Packaging
234/D New Elephant Road, Dhaka-1205
Cell : 01817078796

Subscription : BDT 300/- (Three Hundred Taka) per issue

ISSN : 2519-5816

Chief Editor

**Professor Dr. Md. Rais Uddin**

Faculty of Arts
Jagannath University, Dhaka-1100
www.jnu.ac.bd

## Advisory Board

1. **Professor Dr. A.K.M Yakub Ali**
   Professor Emeritus
   Department of Islamic History and Culture
   Rajshahi University, Rajshahi
2. **Professor Dr. Fakrul Alam**
   UGC Professor & Director
   Bangabandhu Sheikh Mujib Research Institute
   University of Dhaka, Dhaka-1000
3. **Professor Dr. Sharif Uddin Ahmed**
   Department of History
   University of Dhaka, Dhaka-1000
4. **Professor Dr. Syed Azizul Haque**
   Department of Bangla
   University of Dhaka, Dhaka-1000
5. **Professor Dr. Rashidunnabi**
   Department of Music
   Jatia Kobi Kazi Nazrul Islam University
   Trishal, Mymensingh.
6. **Professor Nisar Hossain**
   Dean, Faculty of Fine Arts
   University of Dhaka, Dhaka-1000
7. **Professor Dr. Lutfor Rahman**
   Department of Drama & Dramatics
   Jahangirnagar University, Savar, Dhaka
8. **Professor Dr. M. Matiur Rahman**
   Department of Philosophy
   University of Dhaka, Dhaka-1000
9. **Professor Dr. Anirudha Kahaly**
   Department of Bangla
   Jahangirnagar University, Savar, Dhaka

10 **Professor Dr. Muhammad Shafiq Ahmad**
   Department of Islamic Studies
   University of Dhaka, Dhaka-1000

# Editorial Board

**Chief Editor** : **Professor Dr. Md. Rais Uddin**
Dean
Faculty of Arts, Jagannath University, Dhaka

**Associate Editor** : **Fazle Elahi Chawdhury**
Associate Professor, Dept. of Bangla
Jagannath University, Dhaka

**Dr. Musarrat Shameem**
Associate Professor, Dept. of English
Jagannath University, Dhaka

**Members** : **Professor Dr. Parveen Akter Jemy**
Chairman
Department of Bangla, Jagannath University, Dhaka

**Professor Dr. Md. Momin Uddin**
Chairman
Department of English, Jagannath University, Dhaka

**Professor Dr. Shamsun Nahar**
Chairman
Department of Hisroty, Jagannath University, Dhaka

**Professor Dr. Md. Atiar Rahman**
Chairman
Department of Islamic History and Culture
Jagannath University, Dhaka

**Professor Dr. Muhammad Abdul Wadud**
Chairman
Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka

**Professor Dr. Md. Towhidul Hassan**
Chairman
Department of Philosophy, Jagannath University, Dhaka

**Dr. Jhumur Ahmed**
Chairman
Department of Music, Jagannath University, Dhaka

**Professor Dr. Bazlur Rashid Khan**
Chairman
Department of Fine Arts, Jagannath University, Dhaka

**Shams Shahriar Kobi**
Chairman
Department of Theatre, Jagannath University, Dhaka

**Editorial Assistant** : **S.M.Enamul Haque**
Assistant Registrar
Faculty of Arts, Jagannath University, Dhaka

# সম্পাদকীয়

'Jagannath University Journal of Arts'-এর চলতি সংখ্যাটি যথাসময়ে বের হল। গবেষকদের অভূতপূর্ব সাড়া জার্নালটির প্রচলিত অবয়বকে সম্প্রসারিত করেছে। প্রবন্ধ-মূল্যায়নকারীদের তালিকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অ্যাকাডেমিক কমিটির কাছে চাওয়া হয়েছিল, যা বিভাগসমূহ যথাসময়ে পাঠিয়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রতিটি রচনা কারা মূল্যায়ন করবেন এ বিষয়ে কঠোর-গোপনীয়তা রক্ষিত হয়েছে। গবেষণা-প্রবন্ধ চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ-মূল্যায়নকারীদের মতামতই 'চূড়ান্ত' বিবেচিত হয়েছে। প্রকাশিত প্রতিটি প্রবন্ধের শেষাংশে প্রবন্ধটির জমা প্রদানের তারিখ এবং গৃহীত হবার তারিখ সংযোজিত হয়েছে– যা 'অভিনব'। যাঁদের লেখা গৃহীত হয়নি, তাঁদেরকে চিঠির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞের মূল্যায়ন-প্রতিবেদনসহ জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা প্রবন্ধটি পুনর্বিবেচনা ও যথাযথ সংশোধনের সুযোগ পান।

বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত ২৯টি প্রবন্ধ ঠাঁই পেল এ সংখ্যায়। ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক-শিক্ষক তাঁদের মূল্যবান প্রকল্পনাকে নিরীক্ষাপূর্বক সংবদ্ধ করেছেন। কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকের 'Queering Cognitive-Sociolinguistics'-শীর্ষক প্রবন্ধটি আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ গুরুত্ববহ, যা জার্নালের মানকে বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশের গবেষকদের গুরুত্বপূর্ণ একাধিক রচনা রয়েছে এ সংখ্যায়। প্রকাশিত প্রতিটি রচনা প্রসঙ্গে আলাদা করে বলতে গেলে তা দীর্ঘায়ত হবে; সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ইতিহাস-ভাষা-চিত্রকলা-সংগীত-সাহিত্য-দর্শন-সমাজবিজ্ঞান-রাষ্ট্রবিজ্ঞান– ইত্যাদি প্রসঙ্গে রচিত গবেষণাসমূহে ভিন্ন-ভিন্ন ডিসিপ্লিন আন্তঃসম্পর্কিত হয়ে উঠেছে, যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

যথাসময়ে জার্নালটি প্রকাশে সহযোগী সম্পাদক ফজলে এলাহি চৌধুরী নিরলস শ্রম দিয়েছেন; তাঁর প্রতি ভালোবাসা জানাই। গবেষণা-প্রবন্ধসমুহ বাছাই থেকে শুরু করে মুদ্রণ ও বাঁধাই অবধি সকল সহায়ককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

(অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদদীন)
প্রধান সম্পাদক
Jagannath University Journal of Arts
Volume 12, No 01, January–June 2022
Jagannath Universtiy
Dhaka

# সূচি

১. **বাংলায় কোম্পানি আমলের মুঘল চিত্রকলা ও ইউরোপীয় চিত্রকলার অভিঘাত: একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন** ৯
অপূর্ব রঞ্জন বিশ্বাস

২. **অবিভক্ত বাংলায় শ্রমিক আন্দোলন (১৯২০-১৯৪৭ খ্রি.): নারী নেতৃত্ব** ২০
আনোয়ারা আক্তার, মোঃ কামাল হোসেন

৩. **চট্টগ্রামে নির্মিত মসজিদ স্থাপত্যের নির্মাণশৈলী: সুলতানি ও মুঘল শাসনামল** ৩৫
আবু তৈয়ব মোঃ নাজমুছছাকিব ভূঁইয়া, আবুল ফারাহ মোঃ মিছবাহুদ্দীন ভূঁইয়া

৪. **রবীন্দ্রসংগীতে 'দেশ' ও 'ইমন' রাগের প্রভাব** ৫৩
ঝুমুর আহমেদ

৫. **মারমা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন** ৭১
ফাতেমা-তুজ-জোহরা

৬. **ভারতীয় সিরিয়ালে নারী উপস্থাপনা এবং বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এর প্রভাব** ৮৭
ফাতেমাতুজ জোহরা, মোশরাত জাহান

৭. **বাংলাদেশের রাজনৈতিক পোস্টার: মুক্তিযুদ্ধের শৈল্পিক হাতিয়ার** ১০৫
মারুফ আদনান

৮. **স্বাস্থ্য-সুরক্ষায় ইসলামি নির্দেশনা: পরিপ্রেক্ষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা** ১১৮
মুহাম্মদ ছালেহ উদ্দীন

৯. **হাদিস লিপিবদ্ধকরণ: রাসুলুল্লাহর (সা.) নির্দেশনা ও বাস্তবতা বিষয়ে একটি অনুসন্ধান** ১৩৬
মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক

১০. **প্রাচীন বাংলার নারী সমাজ** ১৫১
মোছা. রূপালী খাতুন

১১. **নাগরিক সেবায় ইসলামি নির্দেশনার প্রতিফলন: প্রসঙ্গ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন** ১৬২
মোহাম্মদ নুরুল আমিন, মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন

১২. **মধ্যযুগে বাংলার প্রস্তর লিপির অলঙ্করণ শৈলী: একটি পর্যালোচনা।** ১৮১
মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস

১৩. **বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: বাঙালি জাতির মুক্তির অনুপ্রেরণার স্বরূপ সন্ধান** ২০৬
মোঃ শাহ আলম

১৪. **মধ্যযুগের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক সূত্রে বাংলার কর্মজীবী নারীর স্বরূপ সন্ধান** ২২৫
সুফিয়া খাতুন

১৫. **Features of Medieval Muslim Education System Under the Mughals: An Analysis** ২৪৩
Abdul Momen, Mobarak Hossain

১৬. **British educational policy in colonial Bengal: A critical context** ২৫৮
Afsana Ahmed

১৭. **Repatriation or Rehabilitation? Justification of Rohingya Refugee Through the Lens of Lifeboat Ethics** ২৬৮
Farhad Ahmed, Noorana

১৮. **Pronunciation of the English Consonant Diagraphs by Bangladeshi EFL Learners: An Analysis** ২৭৮
Jakir

১৯. **Reflective Teaching: EL Teachers' Perceptions and Practices** ২৮৬
Md. Abdur Rouf

২০. **A Comparative Analysis of Walter Benjamin's Ideology with the Extinct Folk Art of Bangladesh.** ৩০১
Jannatul Royhana

২১. **Poetry for Global Peace: Reading Lalon and Tagore in the 21st Century** ৩১১
Md. Momin Uddin

২২. **Stigma, Exclusion, Discrimination and Access of Dalit Children to Education in Bangladesh** ৩২৪
Mohammad Sajjad Hossain

২৩. **Land Acquisition Legislation of Bangladesh and FIG Recommendations: From "Acquisition only" to "Addressing the Needs of those Affected"** ৩৩৭
Nasrin Akter

২৪. **English Language Teaching Practices in Bangladesh and South Korea: A Comparative Study between Jagannath University and Chung Ang University** ৩৫০
Protiva Rani Karmaker

২৫. **Queering Cognitive-Sociolinguistics** ৩৭২
Sankhadeep Ghosh

২৬. **The Status of English in Language Policy in Bangladesh: Problems and Recommendations** ৩৮৭
Suvash Chandra

২৭. **Examining the Racial-Colonial Entanglements of Bakha: Some Investigations into Mulk Raj Anand's *Untouchable*** ৪০২
Sukanta Biswas

২৮. **Using YouTube Videos as an Influence on the Primary School Teacher Learning Process** ৪১৪
Tanvir Ahsan

২৯. **Analytical Discourse on Inevitability of Arrival of Refugees in Muslim Countries: Economic Policy Context** ৪২৬
Tareq Muhammad Shamsul Arefin, Mohammad Nurullah

**জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস**
**ভলিউম-১২, সংখ্যা-১, জানুয়ারি–জুন ২০২২**

# বাংলায় কোম্পানি আমলের মুঘল চিত্রকলা ও ইউরোপীয় চিত্রকলার অভিঘাত: একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

অপূর্ব রঞ্জন বিশ্বাস*

**Abstract**

The political dominance of the British in India began in the later half of eighteenth century. Before that period under the leadership of Job Charnock, the English introduced Calcutta as the capital of British India, adjacent three villages- Calcutta, Sutanati and Gobindapur. At the same time, after the fall of Nawab*s* of Murshidabad and the establishment of the capital at Calcutta, the British achieved the legitimacy of extensive duty free trade. The fierce English, under the umbrella of the East India Company, expanded its activities commercially and politically. Hence, socio-political and cultural changes took place in India rapidly. With the expulsion of the Mughals and the fall of the Nawabs, the native artists turned to the English for new patronage. A hybrid style of the Mughal paintings and European Renaissance ideology can be seen in the paintings of that period. This was coined as 'Company Style' by the art critics. Here, comparative discussions are presented to understand the impacts of homegrown and European art style at that time.

কোম্পানি আমলের চিত্রকলার সূত্রপাত হয় সাধারণত মুরশিদাবাদকে কেন্দ্র করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই মুরশিদাবাদে নবাবদের ক্ষমতা লোপ পায় এবং সেই জায়গায় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। মুরশিদাবাদের কাশিম বাজারে তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করা হয়। তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষে দলে দলে ইংরেজদের আগমন ঘটতে থাকে। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় নবাবদের আশ্রয়ে যেসব শিল্পীরা কাজ করত তাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে নতুন পৃষ্ঠপোষক ইংরেজদের কাছে দ্বারস্থ হন। মুরশিদাবাদ শৈলী যার মধ্যে মুঘল ঘরানা বিদ্যামান ছিল সেই শৈলীর সাথে ইংরেজদের ভিক্টোরিয়ান শৈলীর এক অভিনব মিশ্রণ ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মুরশিদাবাদের শিল্পীদের মধ্যে দেখা যায় ইউরোপীয় স্টাইলের মিশ্রণ। এখানে দেখা যায়, শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব পূর্বের রীতি ঘন জলরং বা অস্বচ্ছ জলরং (gouache) ছেড়ে ইউরোপীয় স্বচ্ছ জলরং (tint watercolour)-এর দিকে ঝুঁকতে। ফলে একটি মিশ্র রীতির ভাব এখানে পাওয়া যায়। পরিপ্রেক্ষিতের (perspective) ব্যাবহার বাড়তে থাকে এবং ছবিতে ইতালির রেনেসাঁসের আলোছায়া অর্থাৎ চিয়েরোস্কুরো (chiaroscuro) দেখতে পাওয়া যায়।

সেই সময় ছবির বিষয়বস্তু হিসাবে দেখা যায় শ্রমজীবী মানুষ যেমন– নাপিত, ধোপা, মুচি, দরজি, বাবুর্চি, মিস্ত্রি ইত্যাদি নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষজনদের। এখানে উল্লেখ্য যে, মুরশিদাবাদে নসিপুরে নব্য সামন্ত শ্রেণির দ্বারা আশ্রিত মোটা তুলির আঁচড়ের কাজ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে ধর্ম-আশ্রিত ছবি ছাড়াও অন্যান্য বিষয়বস্তুর পরিবর্তন আসে এবং ছবিতে সাধারণ লোকজনের উপস্থিতি ঘটতে থাকে। সেই সময়কার একটি ছবির কথা উল্লেখ করতে হয়– আনুমানিক ১৭৮৫-৯০ খ্রিষ্টাব্দে আঁকা **'ধোবী'** ছবিটিতে দেখা যায়, দুজন ধোবী একজন কাপড় কাচছে অরেকজন রোদে শুকাতে দিচ্ছে। এ ছবিতে পরিপ্রেক্ষিতে ও আলোছায়ার ব্যাবহার স্পষ্ট। যদিও আলোছায়ার ব্যাবহারে ইউরোপীয় ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের মত বিজ্ঞানসম্মত ব্যাবহার দেখা যায় না (দ্র. চিত্র-১)।

*পিএইচ. ডি গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

এখানে একটি ছবির উদাহরণ টানা যেতে পারে যাতে সেই সময়কার দেশীয় শিল্পীদের উপর ইউরোপীয় অভিঘাতের মেজাজটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে পাটনা কলমের **'একজন বেগমের প্রতিকৃতি'** ছবিটিতে দেখা যায় ভারি গয়না পরিহিত মাথায় উড়নি দ্বারা আচ্ছাদিত একজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে। এ ছবির বিশেষত্ব হল মাধ্যম এবং করণকৌশল। জমিনের রঙের উপর উচ্চকিত রং দিয়ে ছবির ত্রিমাত্রিকতা আনা যা ইউরোপীয় ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়, সেই করণকৌশলটি প্রতিফলিত হয়েছে এ ছবিতে। বোর্ড পেপারের উপর পেন্সিল এবং সাদা কন্টি পেন্সিলে অঙ্কিত হয়েছে এ ছবি। সাধারণত এ ধরনের পদ্ধতিতে ছবি আঁকা পূর্বে অবিভক্ত বাংলায় (ভারতে) খুব একটা চোখে পড়ে না। এ ছবি দেখে বোঝা যায় তৎকালীন মিনিয়েচার শিল্পীরা ভালো ভাবেই ইউরোপীয় পদ্ধতি রপ্ত করতে পেরেছিল (দ্র. চিত্র-২)।

মুরশিদাবাদের কলমে মিনিয়েচার ছবির চর্চা তখনও অব্যাহত ছিল। যেমন হাতির দাঁতের উপর অসংখ্য কাজ দেখতে পাওয়া যায়। তেমনি একটি ছবি হচ্ছে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে হাতির দাঁতের উপর অঙ্কিত ছবি **'রাধা'**, ৭.১ সেমি. x ৫.৩ সেমি., যাতে রাজস্থানি শৈলী বিদ্যমান। ছবিটি প্রফাইলে (একপাশ থেকে) অঙ্কিত। প্রতিকৃতির এ প্রফাইল শৈলীটি একান্ত রাজস্থানি যা মুঘল ছবিতে চর্চিত হতে দেখা যায়। মুঘল প্রতিকৃতি ছিল সাধারণত থ্রি-কোয়ার্টার। ছবিতে রাধার মুখের প্রকাশভঙ্গি, গয়না, উড়নির কারুকাজ মুঘল ক্ল্যাসিকাল যুগের কথাই বারবার মনে করিয়ে দেয় (দ্র. চিত্র-৩)। যদিও পরবর্তী সময়ে আমরা কোম্পানির আগ্রাসনে মিনিয়েচার থেকে শিল্পীদের সরে আসতে দেখি। এছাড়া তখন অভ্রের পাতের উপর অঙ্কিত ছবি দেখা যায়। মুরশিদাবাদের শিল্পীরা অভ্রের পাতের উপর কাজ করতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। আগেই বলা হয়েছে যে মুরশিদাবাদে প্রায় শতশত শিল্পী নিয়োগ হতো মহররম ও খাজা খিজির উপলক্ষ্যে অভ্রের পাত দিয়ে তৈরি আলো চিত্রিত করার জন্য। এসব মিনিয়েচার বেশির ভাগ ছিল প্রতিকৃতি নির্ভর। প্রতিকৃতি ছাড়াও দেখা যায় নানা যানবাহনের দৃশ্য, শোভাযাত্রা, উৎসব ইত্যাদি। পণ্ডিত মিলডেড আর্চার মনে করেন অভ্রের পাতের উপর জলরঙের ধারণাটি এবং করণ-কৌশল এই মুরশিদাবাদ থেকেই দক্ষিণের ত্রিচিনাপল্লিতে গিয়েছিল।[১] তবে অভ্রের পাতের উপরেও ব্রিটিশ ঘরানার ছাপ পড়তে দেখা যায়। ইংরেজরা মুরশিদাবাদ থেকে রাজধানী কলকাতায় স্থাপন করার ফলে উনিশ শতকের গোড়া থেকে কলকাতাই হয়ে ওঠে ব্যবসা বানিজ্য শিল্প সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রস্থল। সমৃদ্ধ নগরী মুরশিদাবাদ হয়ে ওঠে অতীত স্মৃতি বৈ আর কিছু নয়।

১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহিত রেগুলেটিং অ্যাক্টের ফলে কলকাতা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে।[২] কলকাতা রাজধানী হওয়ার ফলে ক্রমেই সব বড় বড় দালানকোঠা উঠতে থাকে। অনেকে বলে থাকেন এই দালানকোঠাগুলো ছিল ইউরোপীয় বারোক রোকোকরই ধারার প্রতিফলন স্বরূপ। অলংকারধর্মী 'আর্ট ডেকো' স্টাইলের চেয়ার টেবিল ফায়ারপ্লেস, সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো বড় বড় ছবি ইত্যাদির আমদানি তখন হতে থাকে। অনেকেই একে 'নিও ক্ল্যাসিক্যাল' রীতিও বলে থাকেন। যার মধ্যে মধ্য সপ্তদশ শতাব্দীর ধ্রুপদী শিল্প বিদ্যমান ছিল।

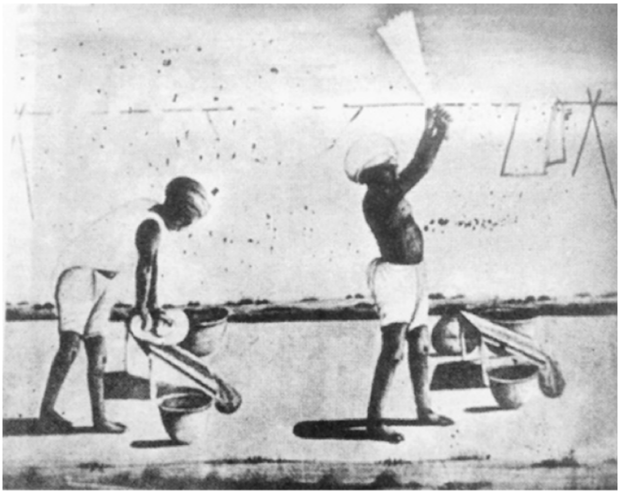

চিত্র- ১, ধোবী, মুরশিদাবাদ, কাগজে জলরং আ.১৭৮৫-৯০ খ্রি. সূত্র: *বাংলার চিত্রকলা* গ্রন্থ

চিত্র- ২, একজন বেগমের প্রতিকৃতি,পাটনা, বোর্ড কাগজের উপর পেন্সিল ও সাদা কন্টি
৮ সি.এম x ৬.৫ সি.এম, উনিশ শতকের মধ্যভাগ, সংগৃহীত- পশ্চিমবঙ্গ আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম
সূত্র: *পশ্চিমবঙ্গ আর্কিওলজিক্যাল পেইন্টিংস* গ্রন্থ ভলিউম ৩

চিত্র-৩, রাধা, মুরশিদাবাদ, হাতির দাতের উপর মিনিয়েচার, ৭.১ সে.মি x৫.৩ সে.মি
উনিশ শতকের প্রথম ভাগ, সংগৃহীত-পশ্চিমবঙ্গ আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম,
সূত্র: *পশ্চিমবঙ্গ আর্কিওলজিক্যাল পেইন্টিংস* গ্রন্থ ভলিউম ৩

সেই সময় ভারতপ্রেমী কিছু ইংরেজদের আগমন ঘটে ফলে তৈরি হয় এশিয়াটিক সোসাইটি, ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজ, হিন্দু কলেজ ইত্যাদি। তেমনি একজনের নাম করা যেতে পারে কলকাতার সদ্য প্রতিষ্ঠিত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপ্রতি স্যার এলিজা ইমপের পত্নীর কথা। লেডি ইমপে যিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির স্ত্রী ছিলেন। তিনি ভারতের ঐতিহ্যবাহী পুঁথি ও চিত্র সংগ্রহে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। ভারতের এমনকি পূর্ব এশিয়ার নানা বর্ণের পশু পাখির সংগ্রহশালা গড়ে তোলে তার চিত্ররূপ দেওয়ার জন্য তিনজন ভারতীয় শিল্পীকে নিয়োগ দেন। এরা হলেন শেখ জৈনুদ্দিন, ভবানী দাস ও রাম দাস। এরা ছিলেন মুলত পাটনা থেকে আগত পাটনা কলমের শিল্পী এই পাটনা কলমের মধ্যে মুঘল ঘরানা বিদ্যমান ছিল, অর্থাৎ এদেরকে মুঘল

উত্তরসূরি বলা যায়। এদের পশুপাখি চিত্র অনেকটা পূর্বযুগের মুঘল ঘরানার শিল্পী ওস্তাদ মানসুরের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ওস্তাদ মনসুরের মধ্যে মুঘল যুগে যেমন পশুপাখি চিত্রণের উৎকর্ষ পাওয়া যায় ঠিক তেমনি ছাপ পাওয়া যায় জৈনুদ্দিন, ভবানি দাস, রাম দাসের কাজের মধ্যেও। এদের মধ্যে জৈনুদ্দিনের কাজ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে আঁকা এসব পশুপাখির চিত্রের মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন হল 'সারস ও টিয়া পাখি'র ছবি।

চিত্র-৪, শেখ জইনুদ্দিন, সারস পাখি, কাগজে গোয়াশ,
উনিশ শতকের শেষভাগ, সংগৃহীত-এসমোলিয়ান মিউজিয়াম অক্সফোর্ড, সূত্রঃ *বাংলার চিত্রকলা গ্রন্থ*

আনুমানিক ১৭৮০-৮২ সালের দিকে অঙ্কিত এসব ছবিতে দেখা যায় অস্বচ্ছ জলরঙে পাখির সুক্ষ পালক ও ডাল, পাতা অঙ্কিত হলেও এর মধ্যে আলোছায়ার ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে শিল্পী সদা সচেষ্ট। আর এ আলোছায়া ফুটিয়ে তুলতে শিল্পী কখনও স্বচ্ছ অস্বচ্ছ রঙের আশ্রয় নিয়েছেন। অনুরূপ **'সারস'** ছবিটিতে দেখা যায় অস্বচ্ছ জল রঙের ব্যাবহারের সাথে স্বচ্ছ জলরঙের ব্যাবহারের ছোঁয়া (দ্র. চিত্র-৪)। ধ্যানমগ্ন সারসটিতে পালকের কাজ অত্যন্ত সুন্দর। পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ড কাজের মধ্যে স্বচ্ছ রঙের আভাস পাওয়া যায়। এই সময়ের প্রাচ্য পাশ্চাত্য কাজের মাধ্যমের টেকনিকগত পরিবর্তনের রূপটি লক্ষ করার মত। পাশ্চাত্য জলরঙের স্বচ্ছ ওয়াশের যে ব্যাবহার তা ভারতীয় শিল্পীদের রপ্ত করতে দেখা যায়। শুধু জলরং নয় ছবির কাঠামোগত দিকও বদলাতে থাকে, মিনিয়েচার থেকে তখন ভারতীয় শিল্পীরা সরে আসতে থাকেন। ছবির সারফেস বা জমিন বড় হতে থাকে। দেশীয় রঙের জায়গায় স্থান পায় বিলিতি রং এবং রং ব্যাবহারের ক্ষেত্রে ভিক্টোরিয়ান যুগের ছাই রঙের ব্যাবহারের তুলনায় উজ্জ্বল রঙের ব্যাবহার দেখতে পাওয়া যায়। ইমপে ছাড়াও অনেক ইংরেজ ভারতীয় শিল্পীদের পশুপাখি উদ্ভিদ অঙ্কনের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন বলে জানা যায় সেই সময়। তবে মুরশিদাবাদ ও পাটনা কলমের শিল্পীদের মধ্যে প্রতিচিত্রণের ও কারিগরির যে দক্ষতা ছিল তা সর্বজন-স্বীকৃত। পশুপাখি ছাড়াও চিকিৎসা শাস্ত্রের ছবিও কিছু ভারতীয় শিল্পীরা করেছিলো বলে শোনা যায়। ১৮০৪ সালের দিকে 'ইনস্টিটিউট অব প্রমোটিং ন্যাচারাল হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া' বারাকপুরে যখন কতিপয় ইরেজদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও পশুপাখির আঁকার কাজে ভারতীয় শিল্পীরা নিযুক্ত হন। সেই সময় ভারতীয় সাধারণ মানুষজন ও তাদের জীবন যাত্রার ওপর ভিত্তি করে নানান ছবির সেট তৈরি হতে থাকে। সেইরকমই কিছু ছবির সেট (চিত্র নথি) যা ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি লন্ডনে সংগৃহীত আছে। তবে ঐতিহাসিকদের মতে এগুলো তৎকালীন সময়কার দলিল বা নথি হিসেবেই অভিহিত। তবে ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে শেষ সার্থক শিল্পী শেখ মোহম্মদ আমির ও ই. সি. দাশ। তবে আমির ইউরোপীয় ধারা রপ্ত করলেও ভারতীয় ছবির ধারাও তাঁর কাজে দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে পশুর চিত্র অঙ্কনে ঘোড়া ও কুকুরের কাজের উৎকর্ষ দেখলে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনের কথাই মনে পড়ে।

উনিশ শতকে কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তরের ফলে রাতারাতি কলকাতার রূপ বদলাতে থাকে। দালানকোঠা তৈরিতে যেমন ইউরোপীয় রীতি পরিলক্ষিত হয় তেমনি সমাজজীবনের রীতিনীতির চিত্রও বদলাতে থাকে ইউরোপীয় কায়দায়– বেশভূষা, আদব-কায়দা, চুলের ছাঁট তৎকালীন বাংলার জনগণের মধ্যে চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে। খেলাধুলা হিসেবে দশ অবতার তাসের জায়গায় স্থান পায় সাহেব বিবি গোলামের টেক্কা। সেরূপ চিত্রকলাতেও তার প্রভাব দেখা দেয়। স্থানীয় চিত্রকররা ইউরোপীয় কায়দায় যে চিত্র অংকন করতে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেতার স্বার্থক রূপ দেখতে পাই কয়রার শিল্পী শেখ মুহম্মদ আমিরের চিত্রকর্মে। পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে শেখ মুহম্মদ আমির ইউরোপীয় ধারায় কলকাতার যে জীবনচিত্র তুলে ধরেন তা যেকোনো ইউরোপীয় শিল্পীর সমকক্ষ বলা যায়। নানামুখী বিষয় আশয় এর মধ্যে ঘোড়ায় টানা গাড়ি, ঘোড়া, কুকুর, সহিস ইত্যাদি দেখা যায়। বাস্তবধর্মী এ ছবিতে পরিপ্রেক্ষিত ও আলোছায়ার ব্যাবহারের মুন্সিয়ানা যথেষ্ট। একটি ছবির কথা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে আর তা হল আমিরের **'ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ি সহ সহিস'**, আনুমানিক ১৮৪০-৫০ সালে কাগজে গোয়াশ দ্বারা অঙ্কিত যা ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। ছবিতে দেখা যায় পুরো পট জুড়ে ঘোড়ার গাড়িসহ সহিস ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। অত্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রতিটি জিনিস অঙ্কিত। ঘোড়ার জিন, শরীরের কোমলতা, গাড়ির খুঁটিনাটি যন্ত্রাংশ যা ফটোগ্রাফি বলে

ভ্রম হয়। ঘোড়া ও গাড়ির নিচে সুন্দর ছায়াপাত ঘটানো হয়েছে। দূরে ভূমি মিলিয়ে দেয়া হয়েছে যা দূর থেকে দূর আকাশের দিগন্তের সাথে মিলে গেছে। ছবিতে ঘোড়া ও গাড়ি মূল ফোকাসে থাকলেও ভূ-দৃশ্যের (landscape) ভাবটি বজায় থাকে (দ্র. চিত্র-৫)। ছবিতে একটি অভিনব জিনিস হচ্ছে এরিয়াল পার্সপেক্টিভের (aerial perspective) ব্যাবহার। ছবিটি গুয়াশে (অস্বচ্ছ জলরং) অঙ্কিত হলেও এতে ওয়াশের (স্বচ্ছ জলরং) ব্যাবহার লক্ষ করা যায়। গুয়াশ হলো ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় রীতি এবং ওয়াশ টেকনিক ইউরোপীয় যা ভারতীয় শিল্পীদের পটে তৎকালীন সময়ে ব্যাবহার হতে দেখা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, ইংরেজদের নানান পছন্দের প্রিয় বিষয় আশয় ছিল যেমন– খেলাধুলা, শিকার করা, ভ্রমণ ইত্যদি। এর মধ্যে একটি প্রিয় বিষয় ছিল কুকুর ও ঘোড়া পোষা। সম্ভ্রান্ত ইংরেজেরা অনেক সময় স্থানীয় শিল্পীদের নিয়োগ দিতেন তাঁদের পছন্দের জিনিস আঁকার জন্য। এদেরকে বলা হত সাংস্থানিক বা টপোগ্রাফিক্যাল আর্টিস্ট।[৩]

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকাতেও তেমনি কিছুর ছবির চর্চা আমরা দেখে থাকি যেখানে জলরং ওয়াশের টেকনিকের ব্যাবহার ফুটে ওঠে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৬৯টি সিরিজ ছবির এলবামে **'মহররমের মিছিলে'** ঢাকার অৎকালীন সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। ছবিগুলো ২৪ ইঞ্চি x ১৮ ইঞ্চি সাইজের কাগজের উপর অঙ্কিত। ছবিগুলোতে লাল, সবুজ, হলুদ, খয়েরি, কালো রঙের ব্যাবহার দেখা যায়। ছবি দেখে মনে হয় ছবিতে বিলেতি রং ব্যাবহার করা হয়েছে। বেশ বড় পরিসরে ছবিতে বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে অঙ্কিত ছবিতে সাপুড়ে, ভিক্ষুক, কুকুর কোনোকিছুই জমিন থেকে এড়িয়ে যায় না। শিল্পী হিসাবে ঐতিহাসিক ড. নাজমা খান মজলীস আলম মুসাব্বির হিসাবে শনাক্ত করেছেন।[৪] যা নামের অর্থ বাংলায় 'বিশ্বশিল্পী' হিসাবে পরিচিতি দেয়। ছবির শৈলী বিশ্লেষণ করলে মুঘল ইউরোপীয় ধারার চমৎকার মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। ছবিগুলো ঢাকার নায়েব নাজিব নুসরাত জং (১৭৯৬-১৮২৩ খ্রি.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় অঙ্কিত হয়।

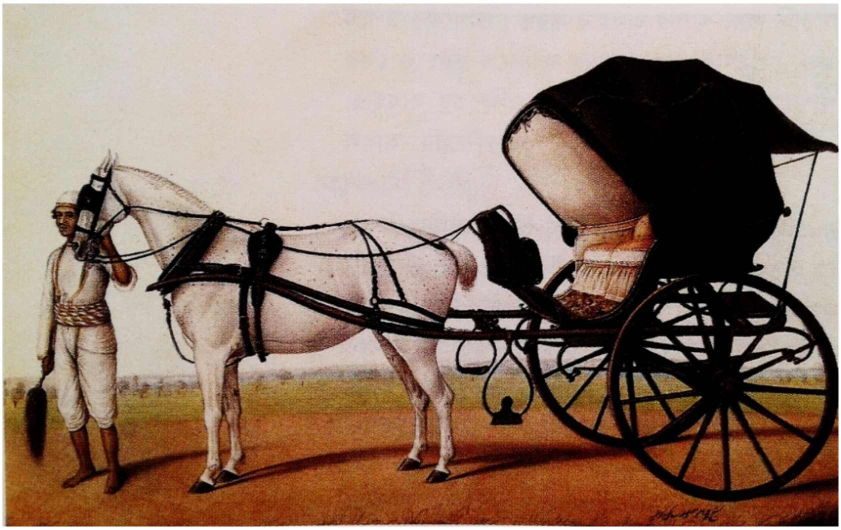

চিত্র- ৫, শেখ মুহম্মদ আমির, ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়িসহ সহিস, কাহজে গোয়াশ, আ. ১৮৪০-৫০খ্রি.
সংগৃহীত– ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়াম, সূত্র: *এশিয়াটিক সোসাইটির চারু ও কারুকলা গ্রন্থ*

**'মহররমের মিছিল'** ছবি খুঁটিয়ে দেখলে বিশেষ করে বাংলার লোকায়ত দো-চালা ঘরের প্যাটার্ন বলে মনে হয়। পাশে দুই তলা বিশিষ্ট ইউরোপীয় ঘরানার বিল্ডিং সূক্ষ রেখার সাহায্যে অত্যন্ত ডিটেইলসে অঙ্কিত হয়েছে। যেমন– খিলান, দরজা, ছাদ প্রাচীর ইত্যাদি। নিচে মহররমের তাজিয়া মিছিলে পাইক বরকন্দাজের চলার গতি যা সাধারণ মানুষ অবলোকন করছেন। উপরে কুণ্ডলীকৃত মেঘ দেখা যায়। এই কুণ্ডলীকৃত মেঘ মানুষ আঁকার ধরন যা মুঘল ঘরানাকে নির্দেশ করে। আবার ওয়াশের ব্যাবহার, ছবির কম্পোজিশন ওয়াইড এঙ্গেলে নিয়ে যাওয়া, ফটোগ্রাফিক ইমেজ ইত্যাদি নানা দিক ইউরোপীয় ঘরানাকে নির্দেশ করে (দ্র. চিত্র-৬)। ছবিকে বাস্তবিক ঘরানার দালিলিক রূপ দেয়া শুরু হয় সাধারণত ইংরেজদের আগমনের ফলে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইংরেজদের সাথে কিছু শিল্পী ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে এসেছিল এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের মধ্যেও কেউ কেউ ছিলেন পুরদস্তুর শিল্পী। সর্বপ্রথম যে শিল্পীর আগমন ঘটে তিনি হচ্ছেন টিলি কেটেল (১৭৭১-৭৬)।[৫] তিনি মাদ্রাজ হয়ে কলকাতায় আসেন। এর পর জন জেফানি (১৭৮৩-৮৯) ও আর্থার ডেবিস (১৭৮৫-৯৫) প্রমুখ শিল্পীদের নাম পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে আরো অনেক শিল্পীর নাম পাওয়া যায় যেমন- জর্জ ফ্যারিংটন, টমাস হিকি, টমাস ও উইলিয়াম ডানিয়েল, রেনাল্ডি, জর্জ চিনেরি, চার্লস ডয়েলি, হোম ইত্যাদি।[৬] এরা যে আদর্শগত দিক ছবিতে তুলে ধরেন তা বাস্তবিক একাডেমিক রীতি যা রেনেসাঁসের ছাপ বহন করে। মূলত বাস্তবিক জিনিসের দালিলিক রূপ দেওয়াই ছিল তখনকার চিত্রকরদের প্রধান কাজ। সেই সময় চিত্রকলায় তিন ধরনের কাজ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন–প্রতিকৃতি (portrait), ঐতিহাসিক (historical) ও মজলিশি (conventional)। এসব ছবির প্রতি বাঙালি অভিজাত শ্রেণিও আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

চিত্র- ৬ ,উনিশ শতকে ঢাকার কোম্পানি শৈলি, মহররমের মিছিল, কাগজে জলরং, ২৪ ইঞ্চি x ১৮ ইঞ্চি, শিল্পী-, আলম মুসাব্বির, সংগৃহীত-ঢাকা জাতীয় জাদুঘর ,সূত্র :ঢাকা জাদুঘর ক্যাটালগ

তবে সেই সময় মিনিয়েচার ঢঙের কাজও দেখতে পাওয়া যায়। এই মিনিয়েচারগুলো হচ্ছে হাতির দাঁতের উপর কাজ করা। হাতির দাঁতের উপর জলরঙের কাজের বিশেষ চর্চা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে দেখতে পাওয়া যায়। বেশ কয়েকজন শিল্পী এ সময়ে খ্যাতি অর্জন করেন তবে সবচেয়ে বেশি যে শিল্পী খ্যাতি অর্জন করেন তিনি হচ্ছেন জর্জ চিনেরি (১৮০২-২৫)। চার্লস ডয়েলি তাঁকে তৎকালীন সময়কালে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী আখ্যা দিয়েছিলেন। বেঙ্গল আর্মির কামান্ডার ইন চিফের পত্নী লেডি নুজেন্ট তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন: "চিনেরির ছবি দেখলাম; সাদৃশ্য ধর্মিতায় অত্যুৎকৃষ্ট"[৭] সেই সময় দুজন মহিলা শিল্পীরও নাম পাওয়া যায় একজন শৌখিন ও অন্যজন পেশাদার ছিলেন। শৌখিন চিত্রকর এমিলি ইডেন ডায়রিতে অনেক ছোট ছোট ছবি এঁকেছেন যা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সংগৃহীত আছে তিনি গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের সিস্টার ছিলেন। এছাড়াও জ্যকুইস বেলন ছিলেন এদেশে জন্মগ্রহণকারী ফরাসী শিল্পী।[৮] কলকাতার নাগরিক জীবনের চিত্র ছাড়াও অন্দরমহলের মহিলাদের আচার বেশভূষা, পূজা-অর্চনার রীতি তাঁর চিত্রপটে সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সংগৃহীত কোয়ার্টার সাইজের এসব চিত্রকর্মে দেখা যায় ওয়াশ এবং পেনের সূক্ষ আঁচড়ের সুন্দর কারুকাজ।

চিনেরি ছাড়াও যেসব শিল্পীর ওপর ভারতীয় শিল্পের ছাপ পাওয়া যায় তার মধ্যে মাদাম বেলনস-এর নামটি উল্লেখযোগ্য। মাদাম বেলনস তাঁর চব্বিশটি ছবি নিয়ে ভিক্টোরিয়া এন্ড মেমোরিয়ার হল থেকে বের হওয়া 'টুয়েন্টি ফোর প্লেটস ইলাস্ট্রেটিভ অব হিন্দু এন্ড ইউরোপিয়ান মেনারস ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে দেখিয়েছেন তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার চালচিত্র। এসব ছবির দালিলিক মূল্যবোধ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি একটি ছবির নাম করতে হয় **'ক্লথ এন্ড সিল্ক মার্চেন্ট'** (দ্র. চিত্র-৭) ছবিটিতে দেখা যায় ভারতীয় বিখ্যাত সিল্ক কাপড়ের ফেরিওয়ালা ইংরেজ অফিসারের সামনে কাপড় মেলে ধরে আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট। ইংরেজ অফিসার আয়েশি ভঙ্গিতে হুকো টানারত অবস্থায় আছেন। পাশে তাঁর স্ত্রী দণ্ডায়মান। মাদাম বেলনসের কাজে ভারতীয় ভাবটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ছবির মেলবন্ধনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ছবির পরিসর মিনিয়েচারের মতই ছোট এবং মাধ্যম হিসেবে ভারতীয় ঘন জলরংকেই বেছে নেয়া হয়েছে। সেই সময় বাংলার মসলিন খুব বিখ্যাত ছিল ইংরেজদের কাছে– বিশেষ করে সেনারগাঁও ও বিক্রমপুরের মসলিন। এক একটি মসলিন বুনতে প্রায় চার মাস সময় লাগত বলে জানা যায়। এক একটি মসলিন চারশ থেকে পাঁচশ টাকা বিক্রি হত বলেও জানা যায়। শুধু মসলিন নয় ইংরেজদের কাছে তৎকালীন ভারতীয় সুতিবস্ত্রের চাহিদাও ছিল বিপুল এবং তা লাভের হারও ছিল উচ্চ।[৯]

চিত্র-৭, মাদাম বেলনস, ক্লথ এন্ড সিল্ক মার্চেন্ট, পেন এন্ড ওয়াশ,উনিশ শতক, সূত্রঃ *টুয়েন্টি ফোর প্লেটস ইলাস্ট্রেটিভ অব হিন্দু এন্ড ইউরোপিয়ান মেনারস ইন বেঙ্গল* গ্রন্থ

নানান টানাপোড়েনের মধ্যে ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শিক ভাবটি সেই সময়ে লোপ পায়। অনেকটা দেয়ানেয়ার মধ্যে শিল্পের গতি অব্যাহত থাকে। রাজনৈতিক উত্থান পতন, কাজের সন্ধানে পৃষ্ঠপোষকদের চাহিদা মেটানো এসব ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও ক্ষীণ আশার আলোটি হচ্ছে চিত্রিত ভারতীয় স্থানিক শিল্পীদের অনেক ঐতিহাসিকরা ইউরোপীয় শিল্পীদের সমকক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন।

## তথ্যসূত্র ও টীকা

১. অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা* (কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, ২০১০), পৃ. ৬৫

২. অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৩. টপোগ্রাফি শব্দটি গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত। টপোস অর্থ স্থান এবং গ্রাফি বলতে সাধারনত লেখা বা অঙ্কন করাকে বেঝায়। অর্থাৎ টপোগ্রাফি শব্দের অর্থ কোনো স্থানের বিবরণ বা অংকন এবং একজন টপোগ্রাফিক্যাল আর্টিস্ট হচ্ছেন তিনি যিনি ড্রইং ও পেইন্টিং এর মাধ্যমে একটি স্থানের বিবরণ দেন। এগনিস এ্যালেন : ভাষান্তর কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইউরোপের চিত্রকলা* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫), পৃ. ৭২

৪. ড. ফয়েজুল আজিম, *চারুকলার ভূমিকা* (চট্টগ্রাম: পূর্বা, ২০২১), পৃ. ৭৬

৫. মাহ্মুদা খানম, *বাংলায় চিত্রকলার বিকাশ: কোম্পানি আমল*, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, (ঢাকা: ছেচল্লিশ বর্ষ, ডিসেম্বর ১০১২), পৃ. ১১২

৬. মাহ্মুদা খানম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৭. সেই সময় বেশ কিছু মিনিয়েচার শিল্পী দেখা যায় তার মধ্যে জর্জ চিনেরি (১৮০২-২৫ খ্রি.) ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। তিনি দীর্ঘদিন  কলকাতায় থেকে হাতির দাঁতের উপর মিনিয়েচারের কাজ করে কেম্পানি কর্মচারীদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ ৭২

৮. অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

৯. সিরাজুল ইসলাম, *এশীয় বাণিজ্য ও বেনেবাদ যুগে ইউরোপীয় সম্প্রসারণ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃ. ৩৭

---

জমা প্রদানের তারিখ : ১৫.০২.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ০৮.০৬.২০২২

---

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-১, জানুয়ারি–জুন ২০২২

# অবিভক্ত বাংলায় শ্রমিক আন্দোলন (১৯২০-১৯৪৭ খ্রি.): নারী নেতৃত্ব

আনোয়ারা আক্তার*
মোঃ কামাল হোসেন**

**Abstract**

The colonized Bengal was the centre of all rebellions and revolutions of India. In the 19th century, under the influence of the European ideologies, the spirit of nationalism and democracy spread gradually in Bengal. AS a result, people in Bengal became aware of their rights. Consequently in the late 9th century and in the early 20th century, people from different classes and castes, occupations and professions came forward to protect their rights in the British ruled undivided Bengal. One of such movements was Labour Movement. In the early part of the last century, Labour Movement started in the undivided Bengal. One of the most noticeable aspects of this movement was the participation of women. Not only in the Labor Movement, women had a great contribution in the war of independence of the undivided Bengal although their contribution was not recognized in the history. Some women played a vital role in raising awareness among the labourers of their rights and in making them united. At a time, when it was very difficult for women to get access to education, some women participated in a very difficult militant movement like the Labour Movement.Santosh Devi. DR. Provabati Dusgupta, Sultana Moazzeda, Sudhe Roy, etc. were those great women. However, very little study has been carried out regarding the contribution of these great women leaders in the academic area. So, the present paper attempts to explore the roles and contributions of women in the Labour Movement of the undivided Bengal.

ব্রিটিশ বাংলাকে বলা হতো ভারতের সকল বিদ্রোহ ও বিপ্লবের উৎসভূমি। উনিশ শতকে ইউরোপীয় ভাবধারা বিস্তারের ফলে বাংলায় ক্রমান্বয়ে আধুনিক জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে অধিকার সচেতনতাবোধ বৃদ্ধি পায়। ফলে উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশ শাসিত অবিভক্ত বাংলায় বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশাজীবীদের মধ্যে অধিকার রক্ষার আন্দোলন শুরু হয়। অধিকার রক্ষার আন্দোলনগুলোর মাঝে অন্যতম একটি আন্দোলন ছিল শ্রমিক আন্দোলন। বাংলার ইতিহাসে শ্রমিক শ্রেণির পরিচালিত এ আন্দোলন যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। অবিভক্ত বাংলায় শ্রমিক আন্দোলন সংঘটনে 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' (All India Trade Union Congress বা AITUC) প্রতিষ্ঠার একটি সংযোগ রয়েছে। ১৯২০ সালের ৩১ অক্টোবর বোম্বে প্রথম উপর্যুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া ও আন্দোলন একটি নির্দিষ্ট গতিপথ লাভ করে। এটিই ছিল ভারতের প্রথম বৃহত্তম শ্রমিক সংগঠন। পরবর্তী কালে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠার পর এ সংগঠনগুলো শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে থাকে। ফলে শ্রমিকরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য যে, ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য এবং ১৯১৯

*সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ
**সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

সালে 'আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা' (International Labour Organisation ILO) প্রতিষ্ঠা ভারতীয়দের মধ্যেও শ্রমিক সংগঠন স্থাপনে উৎসাহ যুগিয়েছে। এ সময় শ্রমিক আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের কারণে শ্রমিক আন্দোলন বেগমান হয় এবং ভিন্নমাত্রা লাভ করে। শুধু শ্রমিক আন্দোলনে নয় অবিভক্ত বাংলায় স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের ছিল অনবদ্য অবদান। তাছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল যা গবেষণার দাবি রাখে। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সচেতন করে তাদের সুসংগঠিত করতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কয়েকজন নারী। যে সময়টা নারীদের শিক্ষা অর্জন করাটাই ছিল কঠিন সে সময়ে বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনের মত কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের সূচনা ঘটান কয়েকজন নারীনেত্রী (১৯২০-৪৭)। এরা হলেন সন্তোষ কুমারী দেবী, ড. প্রভাবতী দাশগুপ্ত, সুলতানা মোয়াজ্জেদা, সুধা রায় প্রমুখ। উনিশ শতক থেকে বাঙালি নারীদের মধ্যে নারী মুক্তি ও নারী জাগরণের সূচনা হয়। বাঙালি নারীরা শিক্ষালাভের মাধ্যমে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সকল বঞ্চনা থেকে মুক্তি ও নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। তাদের সচেতনতা নারী মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পর্যন্ত প্রসারিত হতে থাকে। উনিশ শতক থেকেই নারীরা জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হন। আধুনিক শিক্ষার ফলশ্রুতিতে নারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও জাগ্রত হয়। কৌলিন্য প্রথা, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি প্রথাগুলোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার পাশাপাশি তারা জাতীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।[১] ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলায় শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য মেহনতি শ্রেণির সংগঠিত আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, ইংরেজ শাসনের চরম ব্যর্থতা ও দুর্বলতার সুযোগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম এক নতুন মাত্রা ও ব্যাপ্তি লাভ করে এর সাথে যুক্ত হয় শ্রমিক আন্দোলন। জনগণের আন্দোলন যেমনভাবে তার নেতৃত্বকে তৈরি করে, তেমনিভাবে নেতৃত্বের ভূমিকাই নির্ধারণ করে আন্দোলনের সাফল্য বা ব্যর্থতার সোপান। সমসাময়িক ইতিহাসের কাঠামো যেমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তির ভূমিকাকে তেমনি ব্যক্তি বিশেষের ভূমিকাও বিকশিত করতে পারে জনগণের আন্দোলনকে। দ্রুততর করতে পারে পরিবর্তনের গতিবেগ।[২] আর এভাবে শ্রমিক আন্দোলন ও দ্রুততর হয় নারীদের নেতৃত্বে।

## প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য ও আলোচনার পরিধি

অবিভক্ত বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনে নারীরা নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। শুধু শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ নয় তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন নারী সমাজ যা আলোচনা পর্যালোচনার বিশেষ দাবি রাখলেও এখন পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে তা হয়নি। আর তাই উক্ত শিরোনামে আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা। চল্লিশের দশকের পর শ্রমিক আন্দোলনে নারী নেতৃত্বের যে প্রভাব দেখা যায় পরবর্তী কালে এ হারে তা আর দেখা যায়নি। আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ থেকে চল্লিশের দশকে শ্রমিক আন্দোলনে নারী নেত্রীদের ভূমিকা তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো। যদিও এ বিষয়ে তথ্য উৎসের স্বল্পতা রয়েছে। তবে সুসংহত না হলেও এ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত কিছু তথ্য পাওয়া যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে শ্রমিক আন্দোলনে নারী নেতৃত্বের ভূমিকা তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য। এটি রচনায় স্বল্প পরিমাণে প্রাথমিক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বৈতীয়িক উৎস ব্যাবহার করা হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বভারতীয় সংগঠন জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতীয় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ জাগ্রত হয়। কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুনরুত্থান, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের বিস্তৃতির মাধ্যমে ১৯২০ সালের শেষের দিকে এবং ১৯৩০ এর গোড়ার দিকে বাংলার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার একটি সমৃদ্ধ ও জটিল বর্ণের বিকাশ ঘটেছিল। সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে এ সময় শ্রেণি সচেতনতাবোধ জাগ্রত হয়েছিল। শ্রেণি সচেতন, সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে যেমন একদিকে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যায় তেমনি শিল্প বিকাশেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। আর তাই শিল্প বিকাশে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে জীবন জীবিকা নির্বাহে ট্রেড ইউনিয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যদিও ১৯২০ সালের পূর্ব পর্যন্ত এখানে কোনো শ্রমিক সংগঠন ছিল না। যাবতীয় বিপ্লব ও বিদ্রোহের উৎসভূমি বাংলা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতের সবচেয়ে শিল্পোন্নত প্রদেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হলেও এখানে ছোট বড় কলকারখানা যেমন পাটকল, কয়লাখনি, চা বাগান, বন্দর ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পসহ উল্লেখযোগ্য কলকারখানা গড়ে উঠেছিল। তবে কোনো শ্রমিক সংগঠন না থাকায় শ্রমিকরা তাদের দাবি দাওয়া ও অধিকার নিয়ে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। পরবর্তী কালে ১৯২০ সালে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়।[৩]

বস্তুত এ সময়ের মধ্যে বামপন্থী চিন্তা ভাবনা তৈরি হয় এবং বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব হলে তারা শুরু থেকেই শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে উৎসাহী হয়। কমিউনিস্ট পার্টির প্রচেষ্টায় শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে চেতনাবোধ জাগ্রত হয়েছিল। ১৯২৭-২৯ সালের দিকে ভারতের শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে জাগরণ তৈরি হয়েছিল। এ সময়ে খড়গপুর ও হাওয়ার লিলুয়ার রেল শ্রমিক, কলিকাতা ও আশে পাশের শিল্পাঞ্চলে চটকল শ্রমিক এবং বোম্বেসহ দু'একটি স্থানে শ্রমিকগণ মজুরি বৃদ্ধিসহ আরো কিছু দাবির প্রেক্ষিতে বড় বড় ধর্মঘট ও সংগ্রাম করেছিল।[৪] শ্রমিক আন্দোলনের ভিত যাদের ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে, তাদের সংগ্রামী চেতনার কথা প্রণিধানযোগ্য। ছোট বড় লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে যে সব শ্রমিকরা সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রগতির পক্ষে এগিয়ে চলছে তাদের এগিয়ে নিতে কাজ করেছিল কিছু নারী। অথচ ইতিহাসে এ নারীদের কথা কমই উল্লেখ করা হয়েছে। এ নারীরা শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে শুধু সচেতন করেননি, তা আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অথচ এ নারীদের অধিকাংশ ছিলেন উচ্চশ্রেণির। আলোচ্য প্রবন্ধে শ্রমিক আন্দোলনে এ নারীদের ভূমিকা তুলে ধরার লক্ষ্য থাকবে।

**নারী শ্রমিকদের সংখ্যা ও তাদের অবস্থা**

শ্রমিক শ্রেণি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সমাজ পরিবর্তনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তারাই সমাজ ও রাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। শ্রমিক সংগঠন গঠিত হওয়ার পূর্বে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে তাদের মধ্যে যেমন ছিল না কোনো উদ্যোগ তেমনি ছিল না সচেনতাবোধ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও ভারতের সবচেয়ে শিল্পোন্নত প্রদেশগুলোর মধ্যে বাংলা ছিল অন্যতম। তবে এখানে ছোট বড় কলকারখানা এবং উল্লেখযোগ্য শ্রমিক-শ্রেণি গড়ে উঠলেও শ্রমিকদের অধিকাংশ ছিলো পুরুষ। এদের অধিকাংশই এসেছিল প্রধানত বিহার, ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ, ইউ পি, রাচী, সাঁওতাল পরগণা ও তেলেঙ্গনা থেকে। এদের মধ্যে আবার নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল না বললেই চলে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে বাংলায় কয়েকটি শিল্পে নারী শ্রমিকের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হলো:

| বাংলার শিল্প | নারী শ্রমিক |
|---|---|
| চা (দার্জিলিং, ডুয়ার্স, তেরাই) বাগান | ৮১,৭১১ (মোট মজুর সংখ্যার অর্ধেক) |
| কয়লাখনি | ১৫,৪৯৮ |
| ১০১টি চটকলে | ৩৬,০০৫ (মোট মজুর সংখ্যার শতকরা ১৩ ভাগ) |
| ৩৯২টি ধানকলে | ৮,০০০ (মোট মজুর সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি) |

[সূত্র: ছবি রায়, 'বাঙলার নারী আন্দোলন: সংগ্রামী ভূমিকায় দেড়শ বছর'; উদ্ধৃত, অদিতি ফাল্গুনী, *বাংলার নারী সংগ্রামের ইতিহাস (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১০)*, পৃ. ৬৫]

তাছাড়া ছোটখাটো শিল্পকারখানাগুলোতে (পটারি, বিড়ি তৈরি ইত্যাদি) ছিল দশ হাজারের মত নারী শ্রমিক। এ নারী শ্রমিকরা আর্থ-সামাজিক ও নৈতিকভাবে অত্যাচারিত ও নিষ্পেষিত হত। পরিযায়ী নারী শ্রমিকদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। নাগরিক ও শিল্পায়িত সামাজিক পরিবেশে তারা দু:সহ জীবন-যাপনে বাধ্য ছিল। কর্মস্থলে নারীদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে নিম্নগামী হতে থাকলেও প্রশাসন সে বিষয়ে এড়িয়ে যায়। এছাড়া শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ছুটির ব্যবস্থা ছিল না। তারা একাধারে কাজ করতে গিয়ে নানা রকম দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মিল কারখানাগুলো তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের প্রযুক্তিব্যবস্থা ও দক্ষতাহীন কর্মশক্তি দ্বারা পরিচালিত ছিল। প্রশাসন স্থিতিশীল ও দক্ষ শ্রমিক গঠনে অমনোযোগী ছিল। তাছাড়া শহরে ও শিল্পাঞ্চলে আনুপাতিক হারে নারী শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছিল।[৫] চটকল এলাকায় জীবনযাপনে এদের অনেককে হতে হয় যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত। তাছাড়া অবিবাহিত নারী শ্রমিকদের মুখোমুখি হতে হত নানা সমস্যা। অভিবাসী শ্রমিকরা পরিবারের বাইরে থাকায় এখানে যৌনবৃত্তির প্রবণতা বেড়ে যায়। এছাড়া দীর্ঘ সময়ে দাঁড়িয়ে কাজ করায় অনেককে গ্রহণ করতে হতো বন্ধ্যাত্ব। কাজের পরিবেশ ছিল অমানবিক ও কষ্টকর, বেতন ও অন্যান্য সুবিধা ছিল যৎসামান্য।[৬] এ পরিস্থিতিতে দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠলেও তারা শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া ও অধিকার নিয়ে কথা বলেনি। এহেন পরিস্থিতিতে অবিভক্ত বাংলায় বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন সংঘবদ্ধকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কয়েকজন নারীনেত্রী। যেকোনো রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল প্রাচীন কাল থেকেই। তবে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন খুবই অল্প পরিমাণে তবে শ্রমিক আন্দোলনে নারীদের নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মত। ১৯২০ সালে বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা। সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের (১৯২০) প্রতিষ্ঠা হলে জাতীয় নেতাদের অনেকে শ্রমিকদের সংগঠিত করে জাতীয় আন্দোলনে শামিল করার চিন্তাভাবনা শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হলে তারা শ্রমিকদের সাথে কাজ করে। তাদের সাথে নারীরা কাজ করলেও শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী নারীদের মধ্যে সুধা রায় ছাড়া কেউই কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না।[৭] উল্লেখ্য ১৯২০ সালে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের গঠন করার পর থেকে খুব স্বল্প সংখ্যক কর্মী শ্রমিকদের জন্য কাজ করেন। বাংলায় প্রথম দিকে যারা শ্রমিকদের জন্য কাজ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অশ্বিনী ব্যানার্জী, প্রেমতোষ বোষ পরবর্তী পর্যায়ে মৃণাল কান্তি ঘোষ। তারা কাজ করেছিলেন পাট শ্রমিক, টেক্সটাইল শ্রমিক মুষ্টিমেয় হিন্দি এবং উর্দুভাষী লোকের সাথে। অন্যদিকে শ্রমিকদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া মুষ্টিমেয় এ উচ্চশিক্ষিত নারীরা বাংলার নিম্নবর্ণের শ্রেণির

লোকদের সাথে মিশে তাদের সংগঠিত করার মত অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি করেছিল। তারা শুধু বাঙালি নয় হিন্দি ও উর্দুভাষী শ্রমিকদের সাথে অবাধে মেলামিশা করেন।[৮]

## আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস বিরল। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যেকোনো আন্দোলন সংগ্রামে নারীরা এগিয়ে এসেছে যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইতিহাসের পাতায় অনুয্য। আলোচ্য প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে শুধু অংশগ্রহণ নয় শ্রমিক আন্দোলনের মত শ্রমজীবীদের আন্দোলনে নারীদের নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আন্দোলন পরিচালনা করা। এ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নারীরা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এক. শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণি দুই. শ্রমজীবী শ্রেণি। একমাত্র শ্রমজীবী শ্রেণির মধ্য থেকে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন দুখমৎ বিবি। বাকি যারা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা ছিলেন অভিজাত শ্রেণির। এদের মধ্যে ছিলেন সন্তোষ কুমারী দেবী তিনি কাজ করেছেন প্রথমত চটকল মজুরদের মধ্যে। প্রভাবতী দাশগুপ্ত কলকাতার জমাদার, মেথর ও ধাঙরদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাছাড়া শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা, তাদের সংগঠিত করার কাজে নেমে পড়েন বিমল প্রতিভা দেবী, বীণা দাস, পদ্মিনী সেন ও অভিজাত মুসলিম পরিবারের উচ্চশিক্ষিতা নারী সাকিনা বেগম। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নারীরা। আর এ আন্দোলন থেকে একটা ধারণা আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, শ্রমিকদের সংগঠনে, রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরিতে, তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন ও প্রতিবাদে সক্ষম করে তুলতে নারীনেত্রীদের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য।

বাংলায় বামপন্থী আন্দোলনের বিস্তৃতির সাথে নারীদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হয়। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলায় বামপন্থী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক ও অন্যান্য বামপন্থী দল নারী মুক্তির জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। ১৯৩০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া কর্মসূচিতে বলা হয়:

> The toiling women of India are semi-enslaved condition under a double burden of the survival of feudalism and economic, cultural and legal inequality. The toiling women have no rights whatsoever to determine their fate and in the veil and without the right not only of participating in public affairs, but even of freely and openly meeting their fellow citizen and moving through the streets. .... The Communist Party of India fights for the complete social, economic and legal equality of women.[৯]

কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তারা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছিল। কমিউনিস্টরা শুধু দেশকে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন করা নয় বরং দেশের কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ নিয়ে কাজ করেন, যারা ছিল দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ এবং সমাজ ও দেশের প্রগতির জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ থেকে তাদের মুক্ত করা ছিল জরুরি। তাছাড়া স্বাধীনতা আন্দোলনকেও কমিউনিস্টরা শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করেছিলেন।[১০]

## সন্তোষকুমারী

বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম নারীনেত্রী সন্তোষকুমারী দেবী (১৮৯৭ সালের ১৩ জানুয়ারি মেদিনীপুরের কাঁথি শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা আইনজীবী প্রসন্ন কুমার রায় এবং মাতা নগেন্দ্র দেবী)। মায়ের অনুপ্রেরণায় দেশাত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে তিনি রাজনীতির মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন। মৌলমিনে আমেরিকান মিশনারি স্কুলে পড়াশুনাকালে ইংল্যান্ডে পড়াশোনার জন্য যে বৃত্তি পান তা স্কুল কর্তৃপক্ষের আপত্তিতে বাদ হয়ে যায়। এ সময় থেকেই তিনি রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন।[১১] ১৯১৮ সালে রাজনীতির সাথে যুক্ত হন এবং তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। ১৯১৮ সালের কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন। ১৯২১ সালে গান্ধীজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি দেশাত্ববোধক বক্তৃতা ও সাংগঠনিক কাজকর্মে কর্মীদের আন্দোলনে উজ্জীবিত করে। তাই রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতার অভিযোগ এনে ইংরেজ সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে গৃহে অন্তরীণ রাখার শর্তে মুক্তি দেন। এ সময় তিনি বার্মা থেকে পালিয়ে এসে পশ্চিম বাংলার নৈহাটি তার পৈতৃক বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০-১৯২৫) সঙ্গে রাজনীতিতে যোগদান করেন। মূলত দেশবন্ধুর প্রভাবে ও নিজের মানবিকতাবোধ থেকে তিনি শ্রমিকদের সাথে তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে কাজ করতে থাকেন।

সন্তোষকুমারীর পৈত্রিক বাড়ি নৈহাটির গরিফাতে সেখানেই ছিল গৌরীপুর চটকল। এ সময় চটকলের মালিকদের সাথে বিরোধকে কেন্দ্র করে শ্রমিকরা ধর্মঘটরত ছিল। সন্তোষকুমারী ১৯২১ সালে বার্মা থেকে এসে শ্রমিকদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। শ্রমিকরা মজুরী কম এবং কাজের স্থায়িত্ব না থাকায় বেশি মজুরি ও কাজের স্থায়িত্ব দানের দাবিতে আন্দোলন করে আসছিল। তিনি শ্রমিকদের পক্ষ থেকে তাদের দাবি দাওয়ার বিষয়ে মালিকপক্ষের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে এ আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। চব্বিশ পরগণার গৌরিপুরে শ্রমিকদের সংগঠন 'গৌরিপুর শ্রমিক সমিতি' গড়ে তোলেন যার সভাপতি হন সন্তোষকুমারী। সহ-সভাপতি হন বঙ্কিম মুখার্জি এবং সম্পাদক হন কালিদাস ভট্টাচার্য।[১২]

তিনি শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতে কাজ করেন। ১৯২২ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত কামারহাটি থেকে বজবজ, বাউনিয়া থেকে থেকে গৌরিপুর-চটকল শ্রমিকদের সাথে সভা করা, শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তোলা, শ্রমিকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনসহ শ্রমিক ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এছাড়া তিনি বাংলা ও হিন্দি ভাষায় *'শ্রমিক'* নামে এক পয়সা দামের পত্রিকা প্রকাশ করেন।[১৩] জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলোতে নৈহাটি, হাজিনগর এবং অন্যান্য অঞ্চলে ইউনিয়ন গঠন এবং সন্তোষকুমারীর সভাপতিত্ব করার রিপোর্ট প্রকাশিত হল।[১৪] এ অসীম সাহসী নারী এক দশক শ্রমিক আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন।

তাছাড়া গোর্খা সৈন্যদের অত্যাচারের হাত থেকে আসামের চা বাগানের কুলিদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন এ নারী। এ সময় ১৯২১ সালে মে মাসে চাঁদপুরের জাহাজঘাটায় আসামের চা বাগানের কুলিদের উপর বীভৎস অত্যাচার চালাত গোর্খা সৈন্যরা। তিনি কুলিদের রক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের শুশ্রূষার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। উপরন্তু এ সময় রেল ও বন্দর শ্রমিকরা কুলিদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে ও নিজেদের অর্থনৈতিক দাবিকে কেন্দ্র করে ধর্মঘট চালিয়ে আসছিল। এ ধর্মঘটীদের সমর্থনসহ অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দদের সাথে সন্তোষকুমারীও ছিলেন।[১৫]

মাত্র এক দশক শ্রমিক আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকা সন্তোষকুমারী অত্যন্ত সাহসিকতা, দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে শ্রমিকদের সাথে নিয়ে কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর সাহসিকতা সম্পর্কে বলা হয়–

> একদিন চটকল শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে সন্তোষকুমারী ঘোড়ার গাড়িতে চেপে কামারহাটে গেলে মালিকপক্ষের ভাড়াটে গুন্ডারা তাকে ঘিরে ফেলে। এতটুকু বিচলিত না হয়ে তিনি দুদিকে চাবুক মারতে মারতে পথ করে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বেড়িয়ে গেছেন। শ্রমিকরা বিস্ময়ে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল, গুন্ডার দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।[১৬]

সন্তোষকুমারীর সাহসিকতার আরেকটি বিবরণ পাওয়া যায় মালেকা বেগমের বর্ণনায়। তিনি লিখেছেন যে:

> বন্দর শ্রমিকদের একজন জাহাজে চায়ের বস্তা তুলতে গিয়ে নদীতে পড়ে ডুবে মারা যান। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নির্বিকার থাকলে বন্দর শ্রমিক ও নৌকার মাঝিরা ধর্মঘট করে। শ্রমিকরা বালিগঞ্জ ময়দানে সভা আহ্বান করলে তাতে অন্যান্যদের মধ্যে সন্তোষকুমারী দেবীও বক্তৃতা করেন। তার বক্তৃতার সময় এক মাতাল গোরা গাড়ি নিয়ে সভা ভাঙতে আসে, তার পেছনে আসে পুলিশ কমিশনার টেগার্ট। টেগার্ট লাফ দিয়ে মঞ্চে উঠে সন্তোষকুমারীর দিকে রিভলবার তাক করে চিৎকার করে বলে ,এক্ষণি সভা বন্ধ করে নেমে এসো। সন্তোষকুমারী তখন শ্রমিকদের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়ভাবে বলেন: শ্রমিক ভাইরা আমাকে মেরে ফেলার আগে তোমরা কেউ সভা ছেড়ে যেও না, সভা হবেই। সন্তোষকুমারীর সাহস শ্রমিকদের ভরসা দেয়। টেগার্টের উপস্থিতি সত্ত্বেও সভা চলে। এসব ঘটনা শুধু তাঁর সীমাহীন সাহসের পরিচয়ই দেয় না, শ্রমিকদের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তার বন্ধনে তিনি কীরকম আবদ্ধ হয়েছিলেন তাও জানিয়ে দেয়।[১৭]

এছাড়া বেঙ্গল নাগপুর রেল ধর্মঘটে সন্তোষকুমারী অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি খড়গপুরের প্রায় ২৫,০০০ রেল শ্রমিক ধর্মঘট করে। প্রায় ছয় মাস ধরে চলতে থাকা এ ধর্মঘটে সন্তোষকুমারী যুক্ত ছিলেন। শ্রমিকরা তাকে ভালোবেসে ডাকত মাইরাম।[১৮] সমাজতন্ত্রী বা সাম্যবাদী নীতির সাথে তাঁর কোনো মিল না থাকলেও সমাজতন্ত্রী নেতাদের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার মিল রয়েছে। তিনি জাতীয় আন্দোলনের সাথে মিল রেখে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল শ্রমিক সমিতিগুলো কংগ্রেসে যোগ দিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা ও নিজেদের স্বার্থের জন্য লড়াই করবে। তিনি শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে আন্দোলনের পথে পরিচালনা করার চেষ্টা করতেন। তাঁর আদর্শ সম্পর্কে বলা যায় তিনি একজন দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন, তিনি আদর্শগতভাবে কমিউনিস্ট না হলেও তাদের সাথে কাজ করতে তাঁর কোনো সঙ্কোচ ছিল না। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে শ্রমিকরা তাঁকে 'মা' বলে অভিহিত করেছিল এবং তিনিও ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ও সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করেছিলেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সমর্থক ও শ্রমিক আন্দোলনের পুরোধা এ নারী ১৯৮৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মারা যান।

**প্রভাবতী দাশগুপ্ত**

ধাঙর বা মেথরদের আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ড. প্রভাবতী দাশগুপ্ত এবং বেগম সাকিনা ফারুক সুলতানা মোয়াজ্জেদা। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে আজন্ম অস্পৃশ্য হয়ে বেঁচে আছে ঝাড়ুদার,

মেথর, ধাঙররা। অত্যন্ত শোষিত, নির্যাতিত ও নিরক্ষর এ মানুষগুলো হাজার বছর ধরে সমাজের কঠোর ও অশূচিবৃত্তি পালন করছে অত্যন্ত কম মজুরিতে।

কংগ্রেসকর্মী মোহিনী দেবী এবং প্রখ্যাত দার্শনিক ও আইনজীবী তারকানাথ দাশগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী দাশগুপ্ত ১৮৯২ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন (পৈত্রিক নিবাস ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে এম এ এবং জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে ১৯২৭ সালে দেশে ফিরেন। তিনি রাজনীতিতে যুক্ত না হয়ে সমাজসেবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। জার্মানিতে থাকাকালীন সময়ে তিনি এম. এন রায় এবং ভারতীয় বিপ্লবীদের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন আসে। বিশের দশকের শেষের দিকে তিনি সন্তোষকুমারী গুপ্তের সাথে শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হন। দেশে ফিরে তিনি শ্রমিকদের সংগঠিত করে শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।

প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী নেত্রী প্রভাবতী দাশগুপ্ত ধাঙরদের সাথে কাজ করতে গিয়ে তাদের সংগঠিত করে গড়ে তোলেন 'দি স্ক্যাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অব বেঙ্গল'। সংগঠনের সভানেত্রী হলেন ড. প্রভাবতী দাশগুপ্ত, সহ-সভাপতি মুজাফফর আহমদ ও সম্পাদক ধরণীকান্ত গোস্বামী।[১৭]

কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনে তদানীন্তন সময়ে প্রায় ১০-১২ হাজার ধাঙর নানা বিভাগে কাজ করতো। এদের মাসিক বেতন ছিল ১২ টাকা। ১৯২৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত। তিনি নির্বাচিত হওয়ার পর ধাঙরদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদেরকে দুই টাকা বেতন বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও তা পূর্ণ করা হয়নি। আর তাই প্রভাবতী দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে ধাঙরদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য বেতনাদি, বাড়িঘর ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার আবেদন করা হয় এবং মঞ্জুর না হওয়ায় তারা ধর্মঘট শুরু করে।

৪ মার্চ ১৯২৮ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত ৩০ টাকা বেতন, পরিচ্ছন্ন বাসগৃহ, বিনামূল্যে ঔষধ ও চিকিৎসা, ধাঙর শিশুদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতি দাবি নিয়ে ৯০০০ শ্রমিক মেথর ও ঝাড়ুদার ধর্মঘট শুরু করে।[১৮] ধর্মঘটে পুলিশ ব্যাপক ধড়-পাকড় শুরু করে। এদিকে শ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে কাজ বন্ধ থাকায় শহর মলমূত্র, আবর্জনায় ভরে ওঠে। ফলশ্রুতিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে দুই টাকা বেতন বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রমিকদের কর্মে ফিরতে অনুরোধ করে; যদিও তারা কথা রাখেনি। আর তাই ২৪ জুন ১৯২৮ পুনরায় ধর্মঘটের প্রস্তুতির জন্য প্রভাবতী দাশগুপ্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে শ্রমিকদের একত্রিত করেন। তার সাংগঠনিক দক্ষতা বলে এ আন্দোলন সমগ্র বাংলাব্যাপী শক্তিশালী ধর্মঘটে রূপান্তরিত হয়। এ ধর্মঘটে যুক্ত থাকার অভিযোগে ২৫ জুন প্রভাবতী দাশগুপ্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশের নানা ভয়ভীতি উপেক্ষা করে তিনি এ আন্দোলন চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত এটি সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং ইউনিয়নের সাথে কর্পোরেশনের চুক্তি হয় যেখানে ঝাড়ুদারদের প্রতিনিধি ছিলেন মুজাফফর, ধরণী এবং ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট প্রভাবতী দাশগুপ্ত।[১৯]

তাছাড়া প্রভাবতী দাশগুপ্ত চটকল শ্রমিক আন্দোলনের সাথেও জড়িত ছিলেন। সমগ্র বাংলা চটকল শ্রমিক ইউনিয়নে যোগদানের মধ্য দিয়েই প্রভাবতীর শ্রমিক আন্দোলনে প্রবেশ। সাংগঠনিক প্রতিবাদ ও দক্ষতা বলে তিনি বাংলার চটকল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন।[২০] ১৯২৮ সালে বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা হল চটকলের সাধারণ ধর্মঘট।

১৯২৯ সালের ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সর্বসমেত ২ লাখ ৭২ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করে।[২১] এ ধর্মঘট পরিচালনায় প্রভাবতী দাশ নিজেও যুক্ত ছিলেন এবং তিনি অর্থ, সামর্থ ও শ্রম দিয়ে সাহায্য করেছেন।[২২] প্রভাবতীর নেতৃত্বে শ্রমিক ইউনিয়ন এ ধর্মঘটে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ প্রশাসনের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘটের নিষ্পত্তি হয়। এছাড়াও ১৯৩০-এর গোড়ার দিকে তিনি টিটাগড়ে চটকলে শ্রমিকদের আন্দোলনেও সাহসী নেতৃত্ব দেন। ১৯৭৬ সালের ১ জানুয়ারি প্রভাবতী দাশগুপ্ত মারা যান।

### বেগম সাকিনা ফারুক সুলতানা মোয়াজ্জেদা

শ্রমিক আন্দোলনে জড়িত থাকা আরেকজন সাহসী নারীনেত্রী হলেন বেগম সাকিনা ফারুক সুলতানা মোয়াজ্জেদা। প্রভাবতী দাশগুপ্তের ঠিক দশ বছর পর তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের ধাঙর ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন। বেগম সাকিনা ফারুক ছিলেন একজন সাহসী নারী। যেসময়টাতে মুসলিম নারীদের লেখাপড়া ছিল খুবই স্বল্প পরিমাণে এবং তারা ছিল পর্দা প্রথায় আবদ্ধ। সে সময়টাতে তিনি জমাদার ঝাড়ুদারদের নিয়ে আন্দোলন করেন। তিনি ছিলেন পারস্যের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আগা মুয়াইজাদা ইসলামের দ্বিতীয় কন্যা। ১৯০৫ সালে পারস্যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরাজিত হলে সেখান থেকে আগা মুয়াইজাদা পালিয়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। তিনি কলকাতায় '*Hablul Matin*' নামে একটি উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। আর তাই ব্রিটিশ বিরোধিতা ছিল সাকিনার চরিত্রে সহজাত প্রবৃত্তি। সাংস্কৃতিক পরিবেষ্টিত পারিবারিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠা বেগম সাকিনা ফারুক গৃহশিক্ষকের কাছে ফার্সি, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের মধ্যে প্রথম মুসলিম নারী যিনি এম. এ পাস করেন এবং আইনে প্রথম ডিগ্রি অর্জন করেন।[২৩] উচ্চ শিক্ষিত এ নারী কলকাতা হাইকোর্টে প্রথম নারী এ্যাডভোকেট হিসেবে আইন ব্যবসা করতেন। সাকিনার বাবা ইন্দো-পারসিক সংস্কৃতির ধারক হলেও সাকিনা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে মিশে যান। তিনি বাঙালি এলাকা ছাড়াও অবাঙালি নারীশিক্ষার ওপরও কাজ করতেন। তিনি নারী শিক্ষার উপর *সওগাত* পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। ১৯৩০ সালে, "মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষা" শীর্ষক রচনায় তিনি নারীশিক্ষার পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং তা দূর করার পন্থাসমূহ বিশ্লেষণ করেন।[২৪] তিনি বিয়ে করেন আই. সি. এস অফিসার মি. মজিদকে। ১৯৪০ সালে মার্চ মাসে সুভাষ বসুর ফরোয়ার্ড ব্লক, মুসলিম লীগের সঙ্গে নির্বাচনী মৈত্রী করে কলকাতা কর্পোরেশনে জয়লাভ করেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কমিউনিস্টদের সমর্থনে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। এ সময়ই তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের ধাঙরদের সংস্পর্শে আসেন।[২৫]

১৯২৪ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে কলকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিক, ঝাড়ুদার, মেথর ও গাড়োয়ানদের মাসিক বেতন ও চাকরির অবস্থা ছিল শোচনীয়। তাদের মাসিক বেতন ছিল অনেক কম (১২/১৩ টাকা)। তাদের বাৎসরিক কোনো ছুটি ছিল না। এছাড়া প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, মহার্ঘভাতা থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। এমনকি সাপ্তাহিক কোনো ছুটিও তাদের ছিল না।[২৬] এসব দাবি-দাওয়া নিয়ে শ্রমিকরা ১৯২৪ সাল থেকে আন্দোলন ধর্মঘট করে আসছিল। প্রথমদিকে ধাঙরদের এ ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন প্রভাবতী দাশগুপ্ত। পূর্বেও শ্রমিকরা দু'বার ধর্মঘট করে তাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন করতে পারেনি। তাদের মজুরি বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি

দিয়েও তা রক্ষা করা হয় নি। বরং উঁচু পদের কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে দেয়া হয়। এমন বৈষম্যমূলক আচরণে শ্রমিকরা ক্ষুদ্ধ হয়ে আবার ধর্মঘটের পথে পা বাড়ায়।

এরই মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যুদ্ধের বাজারে জিনিসপত্রের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ দেশের সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এর মধ্যে ধাঙর মেথররাও অবর্ণনীয় দূরবস্থার মধ্যে পড়ে। ১৯৪০ সালে অনুষ্ঠিত কলকাতা কর্পোরোশনের নির্বাচনের আগে ধাঙর ও নিম্ন শ্রেণি বাদে বাকি কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল যাতে তাদের ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘটে অংশ নেয়। এ সময়ই ১৯৪০ এর ২৬ মার্চ সাকিনা বেগমের নেতৃত্বে ধর্মঘট শুরু হয়।[২৭] ২৬ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত মহার্ঘ ভাতা, ছুটি, অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা ও বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতির দাবিতে ধর্মঘট করে। এ ধর্মঘটে প্রায় ১৮ হাজার শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। এ ঐতিহাসিক ধর্মঘট পুলিশি বাঁধার সম্মুখীন হয়। শুরু হয় ব্যাপক ধড়-পাকড়, কাশীপুর ও গোখানাতে গুলি চলে। এর প্রতিবাদে সাকিনা বেগম মেয়র ও অন্যান্য কাউন্সিলরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন:

> কর্পোরেশনের শ্রমিকরা বারবার তাদের অভাব অভিযোগের কথা বলেছে, বেতন বৃদ্ধি ও কাজের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দাবি করছে। বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কর্পোরেশন এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। শ্রমিকদের জীবনযাত্রা ক্রমশঃ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। ... কাউন্সিলার হিসেবে মনে করি কর্পোরেশন শ্রমিকদের স্বার্থ আমাদের দেখা উচিত।[২৮]

কর্পোরেশন শ্রমিক ধর্মঘট তীব্র আকার ধারণ করলে পুলিশি নির্যাতন বেড়ে যায়। বেগম সাকিনা এ নির্যাতনের বিরোধিতা করে বলেন, "আমরা কোনো সুস্থ সরকারের অধীনে বাস করছি না ,আমাদের দেশে নাৎসী রাজত্ব চলছে"।[২৯] পরবর্তী কালে নেতাজি সুভাস চন্দ্র বসুসহ আরো কয়েকজনের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ধাঙর ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয় এবং শ্রমিকদের কল্যাণে ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর প্রায় দশ হাজার সদস্য নিয়ে 'শ্রমিক ইউনিয়ন' গঠিত হয় যার সভাপতি হন সাকিনা বেগম। ইউনিয়ন অফিস ছিল সাকিনার কলকাতার মিডল রোডের বাড়িতে।[৩০] ধাঙর রাণী হিসেবে খ্যাত সাকিনা বেগমের বাড়ি ছিল শ্রমিকদের অবারিত দ্বার। শ্রমিকদের সাথে তিনি মিশতেন নিঃসঙ্কোচে। তাদের সাথে ছিল তাঁর আত্মার সম্পর্ক। তিনি যখন পল্লীতে ও বস্তিতে ঘুরে বেড়াতেন তখন তাঁর সাথে প্রায় দেড়শো থেকে দুশোজন জমাদার থাকত।[৩১] ধর্মঘটের মাঝে মুসলিম লীগ নেতা এ. আর সিদ্দিকী সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বেঙ্গল কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে মেয়র নির্বাচিত হন। প্রথমদিকে সমর্থন না থাকলেও পরবর্তী কালে সুভাষ চন্দ্র বসু এ ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন দেন এবং ধর্মঘটীদের সাথে আলোচনায় বসতে সম্মত হয়ে তাদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সংবেদনশীল হন। এতে ২ এপ্রিল ১৯৪০ তারা সমঝোতায় আসে। তাদের মাসিক বেতন ৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয় এবং তারা ৩ এপ্রিল ১৯৪০ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়।[৩২]

কলকাতা কর্পোরেশন তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় ১৯৪০ সালের ২৬ আগস্ট পুনরায় ধর্মঘট আহবান করা হয়। এ ধর্মঘটে পুলিশের ব্যাপক নির্যাতনে শ্রমিক ও সংগঠক মিলে প্রায় ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ধর্মঘটের পরের দিন সাকিনা বেগমকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অল্পদিনের মধ্যে তাঁকে ছেড়ে দেয়া হলেও তৎকালীন মেয়র এ. আর. সিদ্দিকী তাঁকে কলকাতা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেয় এবং সাকিনা অন্তরীণ অবস্থায় কিছুদিন কার্শিয়াং-এ কাটান। এ ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে প্রায় ১২ হাজার গাড়োয়ান চাকুরিচ্যুত হন।[৩৩]

বেগম সাকিনা কলকাতায় ফিরে এসে পুনরায় কর্পোরেশনের শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে থাকেন এবং রিকশা-শ্রমিকদের সংগঠিত করতে থাকেন। যদিও পূর্বের ধর্মঘটের ব্যর্থতা এবং বিপুল সংখ্যক কর্মী ছাটাই শ্রমিকদের মনোবল ভেঙে দিয়েছিল। তাই শ্রমিক ইউনিয়নেও সদস্যসংখ্যা কমে গিয়েছিল। আর তাই এ আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে শ্রমিকদের আস্থা না হারালেও তিনি নিজেকে এ আন্দোলন থেকে সরিয়ে নেন।

**সুধা রায়**

শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করা নেতৃস্থানীয় আরেকজন হলেন সুধা রায়। যিনি কাজ করেছিলেন বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে যেখানে কোনো নারী শ্রমিক কাজ করার সাহস পেত না। আর তাই বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে নারীর সংখ্যাও ছিল অনেক কম। শ্রমিকদের অধিকাংশ ছিলেন উর্দুভাষী মুসলমান, হিন্দুস্তানী এবং উড়িয়া। বন্দরে নারী শ্রমিকদের কাজ করার পরিবেশ ছিল অনুপযুক্ত। এখানে বেতন যেমন সামান্য ছিল তেমনি থাকার জায়গা ছিল অনুপযুক্ত এবং নানাস্তরের লোককে খুশি করে চাকুরির নিশ্চয়তা বিধান করতে হতো। চাকুরির স্থায়িত্ব যেমন ছিল না তেমনি ছিল না নিরাপত্তা। আর তাই নারীরা বন্দরে কাজ করার উৎসাহ পেত না। অথচ এ বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে এগিয়ে আসেন সুধা রায়। ১৯১১ সালে জন্মগ্রহণকারী সুধা রায় পিতার মৃত্যুর পর ঢাকায় মাতামহ অশ্বিনীকুমার গুহঠাকুরতার কাছে বড় হন। ঢাকার ইডেন স্কুল ও কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন। স্কুল জীবনে তিনি বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত হন। পরবর্তী কালে ১৯৩১ সালে কলকাতা ফিরে যান।

যারা শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে সুধা রায়ের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, অন্যান্যরা ছিলেন শুধু মানবতাবাদী আর তিনি ছিলেন কমিনিউনিস্ট পার্টির সদস্য। প্রথমে তিনি লেবার পার্টির সদস্য ছিলেন পরে তিনি কমিনিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।[৩৪] বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে কোনো নারী না থাকা সত্ত্বেও সুধা রায় পার্টির নির্দেশে খিদিরপুর, মেটেরবুজ, চুনাগলির বস্তিতে বস্তিতে নিরক্ষর শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সাম্যবাদ, লেলিন ও রাশিয়া কমিউনিজম বিষয় বোঝাতেন। এক কথায় শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ তৈরিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন অসীম সাহসী নারী, শিক্ষকতা করতেন কমলা গালর্স স্কুলে। তিনি যেসব জায়গায় কাজ করতেন সেসব জায়গা এতটাই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল যে দিনের বেলায় সেখানে মানুষের সচারাচর চলাচল কম ছিলো; অথচ ওইসব অঞ্চলে সুধা রায় দিনে রাতে ঘুরে ঘুরে শ্রমিকদের মাঝে কাজ করতেন। অনেক সময় রাত হয়ে গেলে সেখানে তাকে থাকতেও হতো।[৩৫] ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ডক ওয়াকার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে ২৭ নভেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত ধর্মঘটে সুধা রায়ের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।[৩৬]

ডকের পর তিনি ব্যারাকপুর চটকল শ্রমিকদের মধ্যেও কাজ করেন। তাঁর প্রধান কর্মস্থল ছিলো হাজিনগর। এখানেও তিনি শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি, সাহস ও মনোবল বৃদ্ধিতে কাজ করেন। এভাবে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে শামিল করতেও তিনি কাজ করেন।[৩৭] তিনি নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সরকারি গোপন রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, 'সুধা রায় লেবার পার্টির একজন উল্লেখযোগ্য কর্মী। তিনি ব্যারাকপুর ও শহরতলি শ্রমিক এলাকায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন। বস্তিতে বস্তিতে ছোট ছোট গ্রুপ মিটিং করতেন এবং স্টাডি গ্রুপ তৈরি করে নিয়মিত পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের

রাজনৈতিক চেতনা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাবোধ জাগ্রতকরণে কাজ করতেন। রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাস নিয়ে সুধা রায় সেই সময় শ্রমিকদের মধ্যে সাম্যবাদী মতবাদ পৌঁছে দিয়েছেন। [৩৭]

## দুখমত বিবি

উল্লেখিত নারী নেত্রীরা ছাড়াও শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী আরেক লড়াকু নারী হলেন দুখমত বিবি। যিনি বাংলার প্রথম শ্রমিক নেত্রী যিনি এসেছেন সাধারণ শ্রমিক শ্রেণি থেকে। ১৯৪২ সালে ঐতিহাসিক চটকল আন্দোলনে সাধারণ শ্রমিকদের সংগঠিত করে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান করে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। পরবর্তী কালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন এবং নারী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত করেন এবং প্রসূতিভাতাসহ অন্যান্য দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি নারী শ্রমিকদের নিয়ে অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে মিলে ম্যানেজারের গাড়ি আটকিয়ে ম্যানেজারকে তাঁদের দাবিপত্র মেনে নিয়ে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। শ্রমিকরা তাকে দুখমত দিদি বলে ডাকত।[৩৮]

## ফুলরেণু দত্ত

ডক শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করা আরেক নারী হলেন লেবার পার্টির সদস্য ড. ফুলরেণু দত্ত (গুহ)। বরিশাল জেলার বাটাজোর গ্রামের দত্ত পরিবারের সন্তান ফুলরেণু দত্ত ১৯১১ সালের ১৩ আগস্ট কলকাতায় মাতুতালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার নানা বসন্ত কুমার বসু কলকাতায় আইন ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাশ করে ফুলরেণু আরবান সোস্যাল সিস্টেম এর উপর ডি লিট ডিগ্রি নিয়ে ১৯৩৮ সালে কলকাতা ফিরে আসেন। এখানে তিনি ডক শ্রমিকদের সাথে কাজ করেন এবং তাদের চিকিৎসার জন্য একটি মেডিক্যাল ইউনিট গঠন করে রাজনীতি সচেতন ও সমাজসেবী এ নারী দীর্ঘ সংগ্রামের জীবনে দুবার তাকে আত্মগোপনে যেতে হয়েছে। তিনি অসংখ্য সংগঠনের জন্মদাতা ও প্রেরণাদাতা।[৩৯]

## মূল্যায়ন

আলোচ্য প্রবন্ধে এটা দেখানো হয়েছে যে, নারী শ্রমিক নেত্রীদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এরা সবাই উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন শুধু দুখমত বিবি ছাড়া। সবাই অভিজাত পরিবারের ছিলেন। একমাত্র সাকিনা বেগম ছিলেন মুসলিম অভিজাত পরিবারের অন্যদিকে বাকি সবাই ছিলেন উঁচু বর্ণের হিন্দু পরিবারের। অথচ তাঁরা কাজ করেছেন অস্পৃশ্য, নিচু শ্রেণির শ্রমিকদের সাথে। তাঁরা তাদের সাথে মিশে তাদের সংগঠিত ও সচেতনতা তৈরি করতে বস্তিতে বস্তিতে কাজ করেছেন। শ্রমিকরা কখনো তাদের মা, কখনো বোন বলে সম্বোধন করতেন যা সত্যি অসাধারণ অর্জন ছিল। কী তাদের শ্রমিকদের কাছে যেতে বাধ্য করেছিল? সুধা রায় ছাড়া কারো কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না। মানবতাবোধই তাঁদের শ্রমিকদের কাছে এনেছিল। তাছাড়া শ্রমিকরা তাদের নেতৃত্ব মেনে নিতে কখনো সংকোচবোধ করেননি। পরবর্তী কালে সুধা রায় ছাড়া অন্যান্য নারীদের রাজনীতিতে আর দেখা যায়নি।

এসকল নারী নেত্রীদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ছিল যার ফলশ্রুতিতে শ্রমিকরা তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করেছিলেন। শ্রমিকদের কাছে তাঁরা শ্রেণি-সচেতন সংগঠক হিসেবে নয় বরং মাতাজি হিসেবে আস্থার জায়গাটি নিয়েছিলেন। তাঁরা শ্রমিকদের মধ্যে

পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর তাই পরবর্তী কালে শ্রমিকরা নিজেরা অধিকার সচেতন হয়ে ধর্মঘট কমিটি গঠন করেছিল। পরিশেষে বলা যায়, এ নারী নেত্রীদের একটি দুর্দান্ত গুণ ছিল তা হল তাঁরা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ। সব কিছুর উর্ধ্বে তাঁরা শ্রমিকদের জন্য কাজ করে শ্রমিকদের উন্নতির পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। আর তাই তাঁরা সত্যিকার অর্থে বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় ও বরণীয় আছেন।

## উপসংহার

বিশ দশক থেকে চল্লিশের দশকে শ্রমিক আন্দোলনে নারী নেত্রীদের ভূমিকা অপরিহার্য। বস্তুত এ সময়ে শ্রমিক আন্দোলনে নারী নেত্রীদের যে ভূমিকায় দেখা যায় পরবর্তী কালে তা শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আর কখনো দেখা যায়নি। বর্তমান সময়ে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কিন্তু আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়ার মত নারী-নেতৃত্বের বিকাশ সে অর্থে হয়নি। বহুদলীয় রাজনীতির বিকাশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হলেও শ্রমিক নেতৃত্বের বিকাশ হয়নি। বিশ থেকে চল্লিশের দশকেও যে সব নারীরা নেতৃত্বে এসেছেন তারা মানবতাবাদী ছিলেন। একমাত্র সুধা রায় মার্ক্সবাদী আদর্শ গ্রহণ করেন। সন্তোষকুমারী দেবী, প্রভাবতী দাশগুপ্ত, বেগম সাকিনা প্রমুখ নারী নেত্রীরা মানবিক মূল্যবোধ ও আদর্শবাদী চিন্তায় উজ্জীবিত হয়ে নির্যাতিত শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রভাবতী দাশগুপ্ত ও বেগম সাকিনার মধ্যে মানবতাবাদ ও ইংরেজ-বিরোধিতা ছাড়া অন্যকোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল না। তারা শ্রমিক আন্দোলন-পরবর্তী কালে নিজেদের সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত রাখেন। অন্যদিকে রাজনৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ সন্তোষকুমারী শ্রমিক আন্দোলন থেকে সরে গেলেও নানা রকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কমিউনিস্ট মতাদর্শে উজ্জীবিত সুধা রায় দলের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্রতী হন। ডক শ্রমিক ধর্মঘটের সময় তাদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলেন। তিনি ধর্মঘটী নেতাদের প্রথম সারিতে না থাকলেও গোপনে শ্রমিকদের সংগঠিত করতে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের তীব্র অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে তিনি শ্রমিকদের সংগঠিত করেন। তিনিই প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী যিনি শ্রমিক শ্রেণিকে তাদের শ্রেণি, অবস্থান বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক মতাদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন। এক কথায় বলা যায় যে, বিশ শতক থেকে চল্লিশের দশকে পুরুষ শ্রমিক নেতাদের পাশাপাশি নারী শ্রমিক নেত্রীরা কোনো রকম স্বার্থ ছাড়া আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে সংগঠিত করে অধিকার আদায়ে সক্ষম হয়েছিলেন। নারীদের এসব গৌরবোজ্জল কর্মকাণ্ড পরবর্তী কালে নারীদের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে দৃঢ় ভূমিকা পালনে একধাপ এগিয়ে নেয়।

## তথ্যসূত্র


১. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী তিনশ বছরের (১৮-২০ শতক) বাঙালি নারীর ইতিহাস* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১), পৃ. ৭০-৭১

২. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, *নারীর ক্ষমতায়ন রাজনীতি ও আন্দোলন* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১২), পৃ. ২৮৫

৩. Subhashini Ali, Indians On Strike Caste and Class in the Indian Trade Union Movement, First Published June, 2011, *https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.4179/NLF.2020000006*

৪. খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ১৪

৫. Tanika Sarker, Politics and women in Bengal- The conditions and meaning of participation, *The Indian Economic and Social History Review, 21, 1* (1984) SAGE, Delhi/London

৬. অদিতি ফাল্গুনী, *বাংলার নারী সংগ্রামের ইতিহাস* (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১০), পৃ. ৬৫

৭. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯

৮. Manju Chattopadhyay, The Pioneering Women Labour Leader Of Bengal (1920-1947), *Indian History Congress, vol.52,* 1991, p. 744

৯. "Emancipation of Women", The Draft Programme for Action of the Communist Party of India, 1930; Kanak Mukherjee, *Women's Emancipation Movement in India (*National Book Centre, New Delhi, 1989), p. 58

১০. খোকা রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

১১. শেখ রফিক (সম্পাদিত), *শত নারী বিপ্লবী, বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা* (ঢাকা, ২০১৪), পৃ. ২৯৫

১২. Manju Chattopadhyay, *op.cit*, p. 745

১৩. শেখ রফিক, (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬

১৪. *আনন্দ বাজার পত্রিকা*, ২০ জানুয়ারি, ১৯২৪

১৫. শেখ রফিক (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬

১৬. অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮

১৭. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১

১৮. অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮

১৯. শেখ রফিক (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৬

২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৭

২১. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২

২২. শেখ রফিক (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৭

২৩. S.M.H, Zaidi, *Position of Women Under Islam* (Calcutta: Book tower, 1935), p. 126

২৪. বেগম মুয়াইজাদা সাকিনা ফারুক সুলতানা, "মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষা", *সওগাত*, কার্তিক, ১৩৩৭, পৃ. ৩-৭

২৫. আনোয়ার হোসেন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী (১৮৭৩-১৯৪৭)* (কলকাতা-৭৩, ২০০৬), পৃ. ২০৬

২৬. বীরেন রায়, "সাকিনা বেগম ও ১৯৪০ সালের কর্পোরেশনের শ্রমিক ধর্মঘট," *অপরাজেয়া*, মহাশ্বেতা দেবী (সম্পাদিত) (কলকাতা : ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৯৫), পৃ. ৮৫

২৭. Manju Chattopadhyay, Begum Sakina & The Calcutta Scavengers Strike (1940), *Indian History Congress, vol.55,* 1994, p. 564

২৮. Minutes of the Proceedings of Calcutta Corporation, 26.3.1940, p. 1993

২৯. *op .cit*

৩০. Anowar Hossain, *Muslim Women's struggle For freedom in Colonial Bengal 1873-1940* (Kolkata, 2008), p. 230

৩১. রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *ভারত ইতিহাসে নারী* (কলকাতা: কে. পি. বাগচী, ১৯৮৯), পৃ. ৯৮

৩২. *The Statemant*, 3&4 april, 1940

৩৩. *আনন্দ বাজার পত্রিকা*, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

৩৪. শেখ রফিক (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫১

৩৫. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪

৩৬. অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১,

৩৭. শেখ রফিক (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫২-৩৫৩

৩৮. অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

৩৯. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে* প্রথম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৮), পৃ. ৪২-৪৪

---

জমা প্রদানের তারিখ : ১৫.০২.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ০৮.০৬.২০২২

---

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-১, জানুয়ারি–জুন ২০২২

# চট্টগ্রামে নির্মিত মসজিদ স্থাপত্যের নির্মাণশৈলী: সুলতানি ও মুঘল শাসনামল

আবু তৈয়ব মোঃ নাজমুছছাকিব ভূঁইয়া*
আবুল ফারাহ মোঃ মিছবাহুদ্দীন ভূঁইয়া**

**Abstract**

Chittagong is a historically significant area of Bengal. Having looked at Bengal's history, it can be seen that Chittagong has been controlled by several regimes at distinct periods. Chittagong was sporadically governed by two Muslim regimes: the Sultanate and the Mughal Empire, starting in 1340 AD and extending for the following five centuries. During this historical period, several mosques and other architectural structures were built in this region. Various architectural designs can be found in the mosques built throughout both regimes, which bear the identity of the history and heritage for that period, as well as testify the preferences and values of the ruling class. Construction on a rectangular plan, usage of an angular archway, rosette design, lotus petal design, marlon design, petal design, pot-shaped finial, chiral dome, and so on are some of the architectural styles employed in mosque architectures. Although some of these mosque architectures have been destroyed, some of them still survive as a mold of civilization. In this article, an attempt has been made to discuss the construction style of mosque architectures built in Chittagong region during the Sultanate and Mughal Empire.

## ভূমিকা

মানবসভ্যতা বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হলো স্থাপত্য। স্থাপত্যশিল্পের বিকাশের সাথে সমাজ ও সংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। কোনো জাতির সামগ্রিক ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে জানার অন্যতম মাধ্যম হলো সে জাতি কর্তৃক নির্মিত স্থাপত্যিক নিদর্শনসমূহ। ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী চট্টগ্রামেও বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নির্মিত হয়েছে এমন বহু স্থাপত্যিক নিদর্শন। এতদাঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, চট্টগ্রাম খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে পরবর্তী প্রায় পাঁচ শতাব্দী যাবৎ দু'টি মুসলিম শাসন তথা সুলতানি ও মুঘল শাসনের অধীনে ছিল। এতে করে শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় এ অঞ্চলে মসজিদ স্থাপত্যের পাশাপাশি নির্মিত হয় নানাবিধ স্থাপত্যকর্ম। চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে সুলতানি ও মুঘল শাসনামলে নির্মিত মসজিদ স্থাপত্যসমূহের কতিপয় কালের বিবর্তনে ও যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও কিছু স্থাপত্য ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আজও টিকে আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে চট্টগ্রাম অঞ্চলে সুলতানি ও মুঘল শাসনামলে নির্মিত মসজিদ স্থাপত্যসমূহের নির্মাণশৈলী ও নান্দনিক বৈশিষ্ট্যাবলি উপস্থাপনের প্রয়াস চালোনো হয়েছে।

*সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ
**স্নাতকোত্তর গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

**গবেষণার উদ্দেশ্য:** এ প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, চট্টগ্রাম অঞ্চলে সুলতানি ও মুঘল শাসনামলে নির্মিত মসজিদ স্থাপত্যসমূহের অবস্থান, নির্মাণ ইতিহাস, নির্মাণশৈলী, আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যাবলি ও এ সকল স্থাপত্যে গ্রামবাংলার স্থাপত্যিক নিদর্শনাবলির ব্যাবহার ইত্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক উভয় শাসনামলে এ অঞ্চলের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে তৎকালীন ইতিহাস-ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করা। এ প্রবন্ধের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো, প্রত্নস্থল ও নিদর্শনাদির পরিচিতি, ইতিহাস, অবস্থান, আকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা; মাঠ জরিপের মাধ্যমে প্রত্নস্থলের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ভূ-প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি প্রত্নস্থলের সার্বিক তথ্য আহরণকল্পে একটি ফলপ্রসূ গবেষণা-কার্য পরিচালনা করা।

**গবেষণা পদ্ধতি:** এ গবেষণাকর্মে দু'টি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে; ঐতিহাসিক ও মাঠজরিপ পদ্ধতি। প্রবন্ধের তথ্য বিন্যাসে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে প্রবন্ধের কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রায় সকল উপকরণ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি মাঠ জরিপ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট স্থাপত্যসমূহ পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপকরণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্থাপত্য-সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহে বর্ণিত তথ্যাদি এবং মাঠ জরিপে প্রাপ্ত তথ্যাদি যাচাই বাছাই করে বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাসের মাধ্যমে এ গবেষণা-কর্ম রচিত হয়েছে।

**গবেষণার সীমাবদ্ধতা:** সুলতানি ও মুঘল শাসনামলে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধর্মীয় স্থাপত্য নির্মাণের পাশাপাশি মুসাফিরখানা, সমাধিভবন, দূর্গ, পাঠাগার, প্রশাসনিক ভবনসহ বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি হয়েছে। এই সকল প্রত্ননিদর্শন নিবিড় মাঠ জরিপ, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাকর্মের দাবি রাখলেও প্রবন্ধের কলেবর সীমিত রাখার জন্য বর্তমান আলোচনায় সুলতানি ও মুঘল শাসনামলে এই অঞ্চলে নির্মিত স্থাপত্যসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র মসজিদ স্থাপত্যসমূহের ইতিহাস, নির্মাণশৈলী ও স্থাপত্যরীতি আলোচনা করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

**চট্টগ্রাম অঞ্চল:** চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। এর আয়তন ৫২৮২.৯৮ বর্গ কি.মি.। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবেও এর রয়েছে সুপরিচিতি। চট্টগ্রাম জেলা ২১°৫৪ থেকে ২২°৫৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°১৭ থেকে ৯২°১৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এর উত্তরে খাগড়াছড়ি জেলা ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে কক্সবাজার জেলা, পূর্বে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা এবং পশ্চিমে নোয়াখালী জেলা ও বঙ্গোপসাগর।[১]

**সুলতানি শাসনামলে চট্টগ্রামে নির্মিত মসজিদ স্থাপত্য:** ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ কর্তৃক এ অঞ্চলে বিজয়াভিযান পরিচলিত হয়। সুলতানি শাসনামলে চট্টগ্রাম মুসলমানদের অধীনে থাকলেও বিভিন্ন সময় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আরাকানি রাজবংশের শাসকদের দখলদারত্বের ফলে এই অঞ্চল আরাকানীদের অধীনে চলে যায়। যার ফলে চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেকটা অনিয়মিতভাবে চট্টগ্রামে সুলতানি শাসন বিরাজমান ছিল।[২] এমন পরিস্থিতিতেও সুলতানি শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত হয়েছে বহু মসজিদ স্থাপত্য। যার অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও কিছু কিছু স্থাপত্য আজও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে।

১. **রাস্তী খাঁ'র মসজিদ:** সুলতান মাহমুদ শাহ প্রায় ২৪ বছর রাজত্ব করে ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমনের পর তাঁর পুত্র সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ সিংহাসনে আসীন হন।[৩] বারবক শাহের শাসনামলে চট্টগ্রামে মসজিদসহ বিভিন্ন ইমারত নির্মিত হয়। রাস্তী খাঁ নামে বারবক শাহের একজন সেনাপতি মীরসরাই থানাধীন জবরা নামক গ্রামে একটি আকর্ষণীয় মসজিদ নির্মাণ করেন। জবরা গ্রামটি চট্টগ্রাম শহর থেকে ২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। মসজিদটি বহু পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এ মসজিদের একটি শিলালিপি প্রত্নতত্ত্ববিদ আর. ডি. ব্যানার্জি উদ্ধার করেন; যা মসজিদের প্রধান মেহরাবের উপরে প্রোথিত ছিল। শিলালিপিটি থেকে জানা যায়, মসজিদটি রাস্তী খাঁ কর্তৃক সুলতান বারবক শাহের শাসনামলে ৮৭৮ হিজরির (১৪৭৩ খ্রি.) ২৫শে রমজান নির্মিত হয়।[৪] বর্তমানে শিলালিপিটি কোথায় সংরক্ষিত আছে বা তার অস্তিত্ব আজও আছে কি না, তা জানা যায় না।

২. **ফকির মসজিদ:** চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়কের পাশে হাটহাজারী বাজার নামক স্থানে প্রাচীন এই মসজিদটি অবস্থিত। এটি হাটহাজারী মসজিদ নামেও পরিচিত। মসজিদ সংলগ্ন ভগ্নপ্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়, মসজিদটি বারবক শাহ এর পুত্র সুলতান শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ এর শাসনামলে (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রি.) নির্মিত।[৫] বহুদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে বন-জঙ্গলে ঢেকে থাকা এ মসজিদ প্রাঙ্গণে পীর-ফকিরদের আস্তানা ছিল। মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে একজন ফকিরের সমাধি রয়েছে। এ কারণে মসজিদটি ফকির মসজিদ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৬]

মসজিদটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। বাহিরের দিকে উত্তর-দক্ষিণে ৪৮ ফুট ও পূর্ব-পশ্চিমে ৩৫ ফুট পরিমাপের মসজিদটির অভ্যন্তরের আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ৩৮ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২৪ ফুট ৯ ইঞ্চি। ইট ও পাথরের সংমিশ্রণে নির্মিত এই মসজিদের দেয়ালের প্রশস্ততা প্রায় ৫ ফুট। মসজিদের পূর্বদেয়ালে আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ তিনটি কৌণিক খিলানপথ রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণদিকে পূর্বদিকের চেয়ে তুলনামূলক ঢালু প্রকৃতির দু'টি করে চারটি খিলানপথ রয়েছে। বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণের পথগুলো লোহার গ্রিল দ্বারা আবদ্ধ। প্রবেশপথের সম্মুখ দেয়ালে খাঁজকাটা কুলুঙ্গি রয়েছে; যা প্রদীপ রাখার জন্য ব্যাবহৃত হতো।

মসজিদের চারকোণে চারটি গোলাকার বুরুজ বা কর্নার টাওয়ার রয়েছে। বুরুজগুলো গোলায়িত হলেও ছাদের উপরের দিকে অষ্টকোণাকৃতির এবং চূড়া ক্ষুদ্রাকৃতির কিউপোলা নকশায় শোভিত। বুরুজগুলোকে পাঁচটি ব্যান্ড নকশা দ্বারা কয়েকটি সমান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এদের নিম্মাংশে মোটাকৃতির পাড় নকশা বিদ্যমান। হাটহাজারীর ফকির মসজিদের অভ্যন্তর দুটি পাথরের স্তম্ভের সাহায্যে দুই আইলে বিভক্ত। স্তম্ভগুলোর নিচের অংশ আয়তাকারাকৃতির, মাঝের অংশ অষ্টভুজাকৃতির এবং উপরের অংশে গম্বুজের ভার বহনকারী কৌণিক খিলানগুলো এসে আয়তাকারে মিলিত হয়েছে।

পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মেহরাব বিদ্যমান। পাথরের তৈরি এবং বহু খাঁজবিশিষ্ট ও কৌণিক আকৃতিতে নির্মিত মধ্যবর্তী মেহরাবটি আয়তন ও অলঙ্করণে তুলনামূলক বড়। বেশ কয়েকটি আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ এই মেহরাব। ফ্রেমগুলোতে কুর'আনের বাণী উৎকীর্ণ ছিল।[৭] সংস্কারের দরুণ দুর্ভাগ্যবশত উৎকীর্ণ আয়াতের লিপিগুলো আস্তরের মাঝে ডুবে গেছে।

মেহরাবের উপরের দেয়ালে কৌণিক খিলান নকশা বিদ্যমান। কৌণিক খিলানের ত্রিকোণাকার অংশের নিচে একটি বড় গোলাপকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক পাশে পাঁচটি করে সর্বমোট বিশটি ক্ষুদ্র গোলাপফুলের নকশা রয়েছে। মেহরাবের দু'পাশে দুটি ফিনিয়াল রয়েছে। মেহরাবের আয়তাকার প্যানেলের উপর ত্রিকোণাকার পাপড়ি নকশা ও মার্লন নকশা একসারিতে বিদ্যমান। অবতলাকৃতির এই মেহরাবে চেইন ও ঘন্টা খোদিত রয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের অন্য দুটি মেহরাবও একই নকশায় নির্মিত। কেন্দ্রীয় মেহরাবের পাশেই মসজিদের মিম্বার বিদ্যমান। তিন ধাপবিশিষ্ট মিম্বারটি সম্পূর্ণ সাদা পাথর দ্বারা নির্মিত।

মসজিদের ছাদ ছয়টি বে'তে বিভক্ত ও ছয়টি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। গম্বুজগুলো স্কুইঞ্জ খিলান দ্বারা দুই সারিতে তিনটি করে নির্মিত। গম্বুজগুলোর উপরিভাগ কলসচূড়া দ্বারা শোভিত এবং ভেতরের অংশ অষ্টভুজাকৃতির ও পাড়ে খোপনকশা বিদ্যামান। গম্বুজগুলোর কেন্দ্রস্থলে গোলাপফুলের নকশাও পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমানে মসজিদটিকে একটি আধুনিক মসজিদে রূপ দেয়া হয়েছে। মসজিদের মূল ভূমি নকশায় পরিবর্তন না এনে পূর্ব দিকে এর সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে মসজিদে একটি রিওয়াক রয়েছে; রিওয়াকের সাথেই লাগানো দু'তলাবিশিষ্ট মসজিদের সম্প্রসারিত ভবন বিদ্যমান। মূল স্থাপত্যের কিছু স্থানে ফাটল দেখা দেয়ায় তাতে সিমেন্টের আস্তর দেয়ার পাশাপাশি সম্পূর্ণ দেয়ালে সবুজ রঙের প্রলেপ দেয়া হয়েছে। ফকির মসজিদ সুলতানি আমলে নির্মিত প্রাচীন স্থাপত্য; যার নির্মাণশৈলী অনুসরণ করে পরবর্তী মুঘল শাসনামলে বহু মসজিদ-স্থাপত্য নির্মিত হয়।

৩. **হাম্মাদিয়া মসজিদ:** বাংলার হোসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রি.) শাসনামলে তৎকালীন চাটিগ্রাম বা চাটগাঁও (বর্তমান চট্টগ্রাম) শহরের প্রায় ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সীতাকুণ্ড থানাধীন ৭নং কুমিরা ইউনিয়নের মসজিদ্দা গ্রামে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মিত হয়। স্থানীয়ভাবে এটি হাম্মাদের বা হাম্মাদিয়া মসজিদ নামে পরিচিত। বাহরাম খান বলেন, প্রাচীনকালে গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হামিদ খান। যিনি বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, সরাইখানা ইত্যাদি নির্মাণ করেন। এ প্রসঙ্গে ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান বলেন, হামিদ খান হোসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কি না জানা যায় না। তবে ধারণা করা হয়, সুলতান তাকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি হোসেন শাহের বংশধর তৃতীয় মাহমুদ শাহের শাসনামলেও প্রশাসনিক কার্যনির্বাহ করেন। কারণ, হাম্মাদিয়া মসজিদের শিলালিপিতে তৃতীয় গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮]

হাম্মাদিয়া মসজিদ বর্গাকৃতির একটি ইমারত। এর বহিরাংশের প্রতিটি বাহুর পরিমাপ ৬.৩৪ মিটার। চার কোণে চারটি সংযুক্ত চোঙ্গাকৃতির গোলাকার বুরুজ বিদ্যমান। মেহরাবের বাইরের দিকে একটি গোলাকৃতির বৃহৎ মিনার এবং এর উপরে স্থাপিত ক্ষুদ্রাকৃতির বুরুজ রয়েছে। চতুর্পাশের মিনারগুলোর ব্যাস সমান হলেও মেহরাবের বাইরের মিনারটির ব্যাস তুলনামূলক বেশি।[৯]

মসজিদটির দেয়াল প্রায় চার হাত পুরু এবং পলেস্তার ও চুনকামকৃত। মসজিদের পূর্বদেয়ালে তিনটি খিলান দরজা এবং উত্তর ও দক্ষিণদেয়ালের প্রত্যেকটিতে একটি করে জানালা বিদ্যমান। জানালাগুলো জালি নকশা দ্বারা আবদ্ধ। প্রতিটি দরজার বাইরে ও ভেতরে রয়েছে দুটি খিলানফ্রেম এবং উভয়ের মাঝে ঢোল সদৃশ খিলান ছাদ বিদ্যমান। মসজিদের অভ্যন্তরে উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে বড় কুলুঙ্গি রয়েছে। এগুলো বাতি জ্বালানোর কাজে ব্যাবহৃত হয়। পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণদেয়ালের জানালাগুলোতে পোড়ামাটির ফলক ছিল। বর্তমানে এগুলোর পরিবর্তে লোহার গ্রিল বসানো হয়েছে।

মসজিদের পশ্চিমদেয়ালে পাথরে নির্মিত তিনটি মেহরাব বিদ্যমান। মধ্যবর্তী প্রধান মেহরাব পার্শ্ববর্তী মেহরাব দুটির চেয়ে আকারে বড়। মধ্যবর্তী এবং ডানপাশের মেহরাব পাথরের কাঠামোতে নির্মিত। বামপাশের মেহরাবটিও পাথর দ্বারা নির্মিত হলেও পরবর্তী কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ইট দ্বারা পুনর্নির্মাণ করা হয়।[১০] প্রধান মেহরাবের ফ্রেমের দুই পাশে পবিত্র কুর'আনের সুরা আ-ল 'ইমরানের ১৮ নং আয়াত উৎকীর্ণ করা আছে।[১১] মেহরাবের বামদিকে উৎকীর্ণ আয়াতের নিচের অংশ পাঠযোগ্য হলেও ডানদিকের অংশ অপাঠযোগ্য ও দুর্বোধ্য। মসজিদের মধ্যবর্তী এবং ডানদিকের খিলানের কুলুঙ্গির ভেতর শৃঙ্খল এবং আয়তাকৃতির ঘণ্টা খোদাই করা হয়েছে। প্রাচীনকালে এ মসজিদের মেহরাবসহ বাহ্যিক অংশের অলংকরণাদিতে প্রকৃতিগত রং দেয়া হলেও বিভিন্ন সময় সংস্কারের ফলে এর মূলগত রঙের পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে মসজিদটির গাত্রে গোলাপি রঙের প্রলেপ দেখা যায়।

হামিদীয়া মসজিদের বুরুজগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক বুরুজ থেকে অন্য বুরুজ পর্যন্ত ছাদের আকৃতি প্রায় ধনুকের মত বাঁকা এবং বাংলার প্রচলিত কুঁড়েঘরের অনুকরণে নির্মিত; যা তাৎক্ষণিকভাবে বৃষ্টির পানি নিচে গড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে। বুরুজগুলো গোলায়িত এবং ছাদ ক্রমানুযায়ী বক্রাকারে তৈরি। বুরুজগুলোর নিম্নাংশের পরিমাপ ৯ ফুট ২ ইঞ্চি। সমান্তরাল বেড়ি দিয়ে তিন ভাগে বিভক্ত এই বুরুজগুলো নিচ থেকে উপরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। ছাদের উপরের অংশে গোলাকার কিউপোলা দ্বারা এ সমস্ত বুরুজ আবৃত। কিউপোলার উপরে কলসচূড়া শোভা পাচ্ছে।

ছাদের উপরে স্থাপন করা হয়েছে কন্দাকৃতির একটি বড় গম্বুজ। এটি চারটি স্কুইঞ্চের সাহায্যে নির্মিত অষ্টভূজের উপর স্থাপিত। গম্বুজের উপর পদ্মপাপড়ি নকশা, কলস মোটিফ নকশা বিদ্যমান। মসজিদের সামনের দেয়ালে দরজার উপর পাথরে খোদাইকৃত তুঘরা রীতিতে আরবি হরফে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি রয়েছে। ২'৪"x১'২" পরিমাপের এই শিলালিপি কষ্টিপাথরে দুই লাইনে উৎকীর্ণ রয়েছে। ভগ্নপ্রাপ্ত হওয়ায় এর পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। ইতিহাসবিদ ও শিলালিপিবিশারদ ড. আবদুল করিম শিলালিপিটির কেবলমাত্র "আদ-দুনিয়া-ওয়াদ-দীন আবুল মুজাফফর মাহমুদ বিন সুলতান" অংশটুকুর পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হন।[১২]

৪. **সুলতান নুসরত শাহ মসজিদ:** ১৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নুসরত শাহ (শাসনকাল ১৫১৯-১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দ) আরাকানিদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানাধীন ফতেহাবাদে প্রশাসনিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।[১৩] হামিদুল্লাহ খান বলেন, চট্টগ্রাম বিজয়ের পর এ অঞ্চলের নাম পরিবর্তন করে ফতেহাবাদ রাখা হয়।

ফতেহাবাদে তিনি একটি প্রাসাদ ও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটিই সুলতান নুসরত শাহ মসজিদ নামে পরিচিত। অবশ্য এ সমস্ত ইমারত বহুপূর্বেই ধংসপ্রাপ্ত হয়েছে।[১৪]

মসজিদটি সম্পূর্ণ পাথর দ্বারা নির্মিত; যা ব্যাপকভাবে পোড়ামাটির ফলকে অলংকৃত ছিল। এর ফাসাদে তিনটি প্রবেশপথ এবং এগুলো বরাবর পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব ছিল। মসজিদের অভ্যন্তর দুটি আইল ও তিনটি বে-তে বিভক্ত ছিল। মসজিদের পাশে অবস্থিত দিঘিটি সুলতানি আমলে খননকৃত চট্টগ্রামের বৃহৎ দিঘিগুলির একটি।[১৫]

বর্তমানে মসজিদটির কিছু ধ্বংসাবশেষ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। জাদুঘরের "মুসলিম স্থাপত্যিক নিদর্শন" নামক গ্যালারির মেঝেতে সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়েছে মসজিদের অভ্যন্তরে ব্যাবহৃত পাথরের স্তম্ভ, দেয়ালে ব্যাবহৃত পাথর খণ্ডসমূহ, শিলালিপির খণ্ড বিশেষ ও মেহরাবের ভগ্নাংশ। মেহরাবটি বহু খাঁজবিশিষ্ট কৌণিক খিলান নকশায় নির্মিত।মেহরাবের উপরাংশে ত্রিকোণাকার স্থানের দু'পাশে দুটি গোলাপফুলের নকশা বিদ্যমান। মসজিদের অন্যান্য নিদর্শন কালের পরিক্রমায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সুলতানি আমলের মুসলিম স্থাপত্যিক নিদর্শন হিসেবে নুসরত শাহ মসজিদটি তৎকালীন সময়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে– চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে সংরক্ষিত স্থাপত্যিক নিদর্শনাদি পর্যবেক্ষণ করলে তা সহজে উপলব্ধি করা যায়।

**মুঘল শাসনামলে চট্টগ্রাম অঞ্চলে নির্মিত মসজিদ স্থাপত্য:** ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সম্রাট বাবর কর্তৃক মুঘল শাসনামলের পদযাত্রা শুরু হয়। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানিদের বিরুদ্ধে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে শায়েস্তা খানের পুত্র উমেদ খান কর্তৃক চট্টগ্রাম অঞ্চল বিজিত হয়। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল শাসনব্যবস্থার পতন অবধি এ অঞ্চল মুঘলশাসনের অধীনে ছিল।[১৬]যার ফলে মুঘল শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এ অঞ্চলে নানাবিধ স্থাপত্যের পাশাপাশি বহু মসজিদ স্থাপত্যও নির্মিত হয়। চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে আজও মুঘল আমলের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বহু মসজিদ স্থাপত্য।

১. **আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ:** চট্টগ্রামে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে সুউচ্চ পাহাড়ের উপর নির্মিত সর্বপ্রাচীন স্থাপত্যিক নিদর্শন হলো আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ। চট্টগ্রাম বিজয়ের স্মৃতি ধরে রাখতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে শায়েস্তা খানের পুত্র উমেদ খানের মাধ্যমে ১৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করেন "আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ"। কিন্তু উমেদ খান চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর নায়েব ও কর্মচারীগণের উদাসীনতার দরুণ মসজিদটির নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়।[১৭] ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই মসজিদকে অস্ত্রাগার হিসেবে ব্যাবহার করতে থাকে। ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে মৌলবি হামিদউল্লাহ খানের উদ্যোগে চট্টগ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের আবেদনের প্রেক্ষিতে দীর্ঘ দুই বছর পর ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে সরকারি অর্থায়নে মসজিদটি সংস্কারের অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদের সম্প্রসারণ করে নতুনভাবে পুনর্নিমিত হয়।[১৮]

সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৩০ ফুট উঁচুতে ছোট্ট পাহাড়ের চূড়ায় এর অবস্থান। মূল নকশা অনুযায়ী এটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে ১৮ গজ (১৬ মিটার) দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৭.৫ গজ (৬.৯ মিটার) চওড়া। মসজিদের প্রতিটি দেয়াল প্রায় ২.৫

গজ (২.২ মিটার) পুরু। পশ্চিম দেয়াল পোড়া মাটি দ্বারা নির্মিত হলেও উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদেয়াল পাথরে নির্মিত। সংস্কারের সময় দেয়ালগুলোতে চুন-সুরকি দ্বারা আস্তর দেয়া হয়েছে।

মসজিদে সর্বমোট ৩টি গম্বুজ বিদ্যমান। মাঝের গম্বুজ দু'পাশের গম্বুজ থেকে আকারে তুলনামূলক বড়। গম্বুজগুলো নির্মাণে স্কুইঞ্চ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এবং নির্মাণ উপাদান হিসেবে পাথর ব্যাবহৃত হয়েছে। গম্বুজগুলো পদ্মপাপড়ি নকশা, ডালিম নকশা, শীর্ষদণ্ড কলস মোটিফ নকশা ও অভ্যন্তরীণ অংশ বিন্দু বিন্দু নকশায় অলংকৃত। মসজিদের চারকোনায় পাথর দ্বারা নির্মিত অষ্টভূজাকৃতির চারটি বুরুজের মধ্যে বর্তমানে পূর্বদেয়ালের দুটি বুরুজ বিদ্যমান। পূর্ব দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে মোট পাঁচটি কৌণিক খিলান বিশিষ্ট প্রবেশদ্বার রয়েছে। পূর্বদেয়ালের দু'পাশের প্রবেশ-পথের তুলনায় মাঝের প্রবেশপথ আকারে বড়। প্রবেশ-পথগুলো আয়তাকার প্যানেল নকশায় আবদ্ধ। পূর্ব দেয়ালের প্রধান প্রবেশ পথের দু'পাশে অষ্টভূজাকৃতির দুটি স্তম্ভ রয়েছে।

মসজিদের পূর্বদেয়ালের ৩টি প্রবেশপথ বরাবর পশ্চিম দেয়ালে অবতলাকৃতির তিনটি মেহরাব বিদ্যমান। মধ্যবর্তী মেহরাবটি প্রধান মেহরাব হিসেবে চিহ্নিত; যা বর্তমানে মোজাইক পাথরে অলংকৃত। এটি বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলান নকশা ও উপরিভাগে একটি আয়তাকার প্যানেল নকশায় নির্মিত। এর উপরাংশে আরবি হরফে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" ও"আয়াতুল কুরসী"[১৯] লেখা উৎকীর্ণ আছে। প্রধান মেহরাবের দু'পাশেই কুলুঙ্গি-সদৃশ জানালা বিদ্যমান। জানালাগুলো আধুনিক সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত। প্রধান মেহরাবের পাশেই বহু ধাপবিশিষ্ট পাথরে নির্মিত একটি উঁচু মিম্বার রয়েছে, যাতে মোজাইক টাইলস দ্বারা আবরণ দেয়া হয়েছে।

আন্দরকিল্লা শাহী মসজিদের নামাজঘর এক আইলবিশিষ্ট। নামাজঘরের অভ্যন্তর দু'টি খিলান দ্বারা তিনটি অংশে বিভক্ত। বর্তমানে মসজিদের মেঝে মোজাইক টাইলস দ্বারা অলংকৃত। প্রধান প্রবেশপথ ও প্রধান মেহরাবের মাঝামাঝি বরাবর ছাদে প্রধান গম্বুজ নির্মিত। গম্বুজের ভিতরের অংশে শিকলদ্বারা বাঁধানো একটি ঝাড়বাতি ঝোলানো হয়েছে, যা আধুনিক কালের সংযোজন। ড. আহমদ হাসান দানী বলেন, ১৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত জামী মসজিদটি তিনটি 'বে' বা লম্বালম্বি সারি এবং একটি আইলবিশিষ্ট চিরাচরিত মুঘলরীতিতে নির্মিত। মধ্যবর্তী স্থলে একটি গম্বুজ এবং দুপাশে ক্রস ভল্টের দ্বারা আবৃত।[২০]

চট্টগ্রামে মুসলিম বিজয়ের স্মারক হিসেবে শিলালিপি ভিত্তিক যেসব স্থাপনা আছে, তার মধ্যে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের শিলালিপি অন্যতম। মসজিদের মূল ইমারতের তিনটি প্রবেশপথে কালো পাথরে খোদাইকৃত সাদা অক্ষরে কাব্যিক ছন্দে ফার্সি লিপিতে উৎকীর্ণ তিনটি শিলালিপি বিদ্যমান।[২১] মসজিদের গঠন কাঠামোতে বহুবার সংস্কারকার্য পরিচালনা করা হয়। মূল কাঠামো ঠিক রেখে প্রয়োজনের তাগিদে মসজিদের রিওয়াক এবং সাহানে সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হয়। যার ফলে বর্তমানে মসজিদের আয়তন ও অন্যান্য অবকাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমানে মসজিদের পূর্ব ও উত্তর দিকে বড় দু'টি গেইট রয়েছে। বহু সিঁড়ি দ্বারা মসজিদ প্রাঙ্গণে ওঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দিক ব্যতীত বাকি তিনদিকে চার আইল

বিশিষ্ট রিওয়াক বিদ্যমান। রিওয়াক নির্মাণে ব্যাবহৃত হয়েছে গোলায়িত ও অষ্টাকোণাকৃতির স্তম্ভসারি। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সর্বমোট ৪৪টি গোলায়িত স্তম্ভ; পূর্ব দিকের তিনটি স্তম্ভ সারির মধ্যে প্রথম সারিতে ১০টি গোলায়িত জোড়া স্তম্ভ এবং বাকি দুই সারিতে ১৪টি করে ২৮টি অষ্টাকোণাকৃতির স্তম্ভ বিদ্যমান। মূল মসজিদের উত্তর প্রবেশপথের কয়েক গজ দূরেই নির্মাণ করা হয় পাঁচটি কৌণিক পথের সমন্বয়ে একটি খিলান পর্দা।

মসজিদের রিওয়াকের গোলায়িত স্তম্ভগুলোর নিম্নাংশ কলসাকৃতির নকশা এবং উপরাংশ আয়তাকারাকৃতির ঠেকনা নকশায় শোভিত। অষ্টাকোণাকৃতির স্তম্ভগুলোর নিম্মাংশ মাটির সাথে সমতল এবং উপরাংশ গোলাকার বৃত্ত সদৃশ বন্ধনী নকশা দ্বারা অলংকৃত। পূর্ব দিকের উন্মুক্ত অঙ্গনের সম্মুখভাগে রিওয়াকের স্তম্ভসারিতে কৌণিক খিলান সম্বলিত জাফ্রি নকশা বিদ্যমান। রিওয়াকের চারকোণে ছত্রীবিশিষ্ট ৪টি মিনার বিদ্যমান। মিনারগুলোর ছত্রীর উপরে পদ্মপাপড়ি নকশা, সর্পফনা নকশা এবং শীর্ষদণ্ড কলসাকৃতির নকশায় নির্মিত। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের রিওয়াকে সর্বমোট ২০টি জানালা রয়েছে। পূর্ব দিকের কার্নিশের উপর রয়েছে সর্বমোট ১৮টি ছোট ছোট গম্বুজ। মসজিদ প্রাঙ্গণের উত্তরে ওযুখানা, দক্ষিণে "বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন" এর চট্টগ্রাম কেন্দ্র এবং উত্তর-পূর্ব কোণে খতিবের বিশ্রামকক্ষ রয়েছে। বর্তমানে এটি দুইতলা বিশিষ্ট একটি মসজিদ।

১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "the Chittagong Shahi Jam-e Masjid Ordinance-1986"-এর অধীন ২.৪২৭৬ একর জায়গাসহ এই ঐতিহাসিক মসজিদ পরিচালনার দায়িত্ব "বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন" এর উপর ন্যস্ত করে।[২২]২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত গেজেটে "সংরক্ষিত পুরাকির্তী"র তালিকায় "চট্টগ্রামস্থ আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ" নামে এই মসজিদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[২৩]

২. **হামজা খানের মসজিদ:** চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন পশ্চিম ষোলশহরে বাগ-ই-হামজা বা হামজারবাগ নামক স্থানে ১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দে হামজা খান একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং তাঁর নামানুসারে এটি হামজা খানের মসজিদ হিসেবে পরিচিত।[২৪] মসজিদটি উত্তর ও দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। উত্তর-দক্ষিণে এর আয়তন ২৫ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৬ ফুট। ইট ও চুন-সুরকি দ্বারা নির্মিত দেয়ালের পুরুত্ব ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি।

মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে সর্বমোট ৫টি আয়তাকার আকৃতির প্রবেশপথ বিদ্যমান। পূর্ব দেয়ালের প্রবেশপথগুলোর মাঝেরটি প্রধান প্রবেশপথ। এর দু'পাশে রয়েছে অষ্টভুজাকৃতির দুটি সরু স্তম্ভ; যেগুলো ছাদের কার্নিশ পর্যন্ত উঠে গেছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মেহরাব বিদ্যমান। মধ্যবর্তী মেহরাবটি প্রধান মেহরাব হিসেবে চিহ্নিত হলেও বর্তমানে তা পুস্তক রাখার তাক হিসেবে ব্যাবহৃত হচ্ছে। মেহরাবগুলো কৌণিক খিলান নকশায় আবদ্ধ। প্রধান মেহরাবের উপরে সারিবদ্ধ পুষ্প নকশা ও তার উপরে সারিবদ্ধ খিলান নকশা রয়েছে। এই মেহরাবের উপরাংশে আয়তাকার পাথরে নির্মিত একটি শিলালিপি স্থাপন করা হয়েছে। মেহরাবের বাইরের দেয়াল প্যারাপেট সংবলিত; যার দুপাশে ডালিম নকশা শোভিত ২টি অষ্টভুজাকৃতির স্তম্ভ বিদ্যমান।

মসজিদের নামাজঘর এক আইলবিশিষ্ট। দক্ষিণ দেয়ালে ২টি কুলুঙ্গি নকশা দেখা যায়। উত্তর দেয়ালেও একই ধরনের ২টি কুলুঙ্গি নকশা ছিল। মসজিদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উত্তর দেয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরীণ অংশে চতুর্দিকে দেয়াল থেকে সামান্য উদ্গত সারিবদ্ধ খিলান নকশা বিদ্যমান।

মসজিদের ছাদ ৩টি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। মধ্যবর্তী গম্বুজটি আকারে বড়। গম্বুজগুলো অষ্টাকৃতির পিপার উপর নির্মিত। মধ্যবর্তী গম্বুজটি স্কুইঞ্চ পদ্ধতিতে নির্মিত। গম্বুজের অভ্যন্তরীণ বৃত্তাকার অংশে খোপ নকশা ও কেন্দ্রস্থলে বৃত্তাকৃতির পুষ্প নকশা বিদ্যমান। গম্বুজের ভার বহনকারী খিলানগুলোর সংযোগস্থলে কলার মোচাকৃতির নকশা বিদ্যমান। গম্বুজগুলোর উপরিভাগে নানান রঙের মর্মর পাথরের ব্যাবহার পরিলক্ষিত হয়। গম্বুজের শীর্ষদেশ পদ্মপাপড়ি নকশায় অলংকৃত এবং শীর্ষদণ্ড কলস মোটিফ ও ডালিম নকশায় নির্মিত। মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এটি বর্তমানে ৫ তলা-বিশিষ্ট একটি মসজিদ। পূর্ব পাশে নির্মাণ করা হয়েছে সুউচ্চ একটি মিনার। বহুবার সংস্কারকার্য পরিচালনার দরুণ এই মসজিদের প্রাচীনত্ব বিশেষ দেখা যায় না।

৩. **বখশী হামিদের মসজিদ:** প্রাচীন মুঘল মুসলিম স্থাপত্যসমূহের অন্যতম বখশী হামিদের মসজিদ চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার অন্তর্ভুক্ত বাহারছড়া ইউনিয়নের ইলিশা নামক গ্রামে একটি দিঘির পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। মসজিদটি তৎকালীন এই অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বখশী হামিদ কর্তৃক ১৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দে (৯৭৫হি.) নির্মিত হয় এবং তাঁর নামানুসারে বখশী হামিদের মসজিদ হিসেবে পরিচিত। মসজিদের পূর্ব দেয়ালের প্রধান প্রবেশপথের উপরে স্থাপিত শিলালিপি থেকে জানা যায়, সুলতান-আল-আযম সুলাইমান কররানীর শাসনামলে (১৫৬৪-১৫৭২ খ্রি.) এই মসজিদটি নির্মিত। মসজিদটি ১৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে পুনর্নির্মিত হয়।[২৫]

মসজিদের শিলালিপিটি আরবি হরফে লেখা; যা সুলতানি আমলে নির্মিত মসজিদের শিলালিপির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে মসজিদের অবকাঠামোগত বৈশিষ্ট্যাবলির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, এটি মুঘল স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত। এ থেকে ধারণা করা হয়, মসজিদটি সুলতানি আমলে নির্মিত হলেও মুঘল শাসনামলে এটি পুনর্নির্মিত হয়। মসজিদটি উত্তর দক্ষিণে প্রশস্তভাবে আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। মসজিদের বহির্দেয়ালের পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ২৯.১৬ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৭.৫০ ফুট। অভ্যন্তরীণ অংশের পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ২২.১৬ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১০.৫০ ফুট। মসজিদের দেয়াল নির্মাণে ইট ও চুন-সুরকি ব্যাবহৃত হয়। দেয়ালের পুরুত্ব হলো ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি।

মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি, উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে সর্বমোট ৫টি খিলানপথ রয়েছে। খিলানপথগুলোর সম্মুখভাগ বহু খাঁজবিশিষ্ট এবং প্রত্যেকটি পথ কয়েকটি আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ। পূর্ব দেয়ালের প্রবেশপথগুলোর উদ্গত অংশ বহু খাঁজবিশিষ্ট এবং অভ্যন্তর কৌণিক খিলান নকশায় নির্মিত। প্রধান প্রবেশপথের উপরে রয়েছে কালো পাথরের উপর আরবি হরফে উৎকীর্ণ শিলালিপি এবং দু'পাশে মিনার সদৃশ দুটি সরু স্তম্ভ বিদ্যমান। স্তম্ভগুলোর নিম্মাংশ কলসাকৃতির নকশা এবং প্যারাপেটের উপরের অংশ ক্ষুদ্র গম্বুজ নকশায় অলংকৃত। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের চতুর্দিকের আয়তাকার প্যানেল নকশার উপর গোলাপফুল ও প্যাঁচানো লতাপাতার নকশা বিদ্যমান। গোলাপ নকশা সংবলিত পূর্বদেয়ালের বাকি প্রবেশপথদুটির

দু'পাশে কলস মোটিফ শোভিত ২টি করে ৪টি ফিনিয়াল রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণদেয়ালের প্রবেশপথদুটি আকারে ছোট, কৌণিক খিলান নকশায় নির্মিত এবং আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ। প্রবেশপথগুলোর উপরের অংশে সারিবদ্ধ খিলান নকশা বিদ্যমান। খিলান নকশার অভ্যন্তরে পত্র-পল্লব শোভিত পদ্ম নকশা এবং খাঁজকাটা খিলান নকশা ব্যাবহৃত হয়েছে।

বখশী হামিদের মসজিদের চারকোণে ৪টি অষ্টকোণাকার বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলোর নিম্মাংশ কলস মোটিফে নির্মিত। কলস মটিফের কিছুটা উপরে ব্যান্ড নকশা বিদ্যমান। বুরুজগুলোর মধ্যভাগ অষ্টকোণাকৃতিতে নির্মিত; ছাদের কার্নিশের অংশে দড়ির ন্যায় অষ্টকোণাকার ব্যান্ড নকশা এবং উপরের অংশে শিরাল গম্বুজ বিদ্যমান। শিরাল গম্বুজগুলোর শীর্ষদণ্ড কলস মোটিফে অলংকৃত। মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ বরাবর পশ্চিম দেয়ালে প্রধান মেহরাব বিদ্যমান। মেহরাবটি অর্ধগোলাকৃতিতে অবতল পদ্ধতিতে নির্মিত। মেহরাবের দু'পাশে গোলায়িত ভিত সমৃদ্ধ ও দাগকাটা নকশা সংবলিত দুটি ফিনিয়াল বিদ্যমান। মেহরাবটি আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ ও বহু খাঁজবিশিষ্ট খিলান নকশায় নির্মিত। উপরিভাগে গোলাপফুলের নকশা ও পত্র-পল্লব শোভিত পুষ্প বৃক্ষের নকশা বিদ্যমান। মেহরাবের অভ্যন্তর আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ তিনটি গোলায়িত প্যানেল নকশায় নির্মিত।

মসজিদের সমতল ছাদের সম্মুখ ও পেছনের অংশ প্যারাপেট সংবলিত। ছাদের কার্নিশ দুই ভাগে বিভক্ত। নিম্নভাগ সমান্তরাল দুটি দড়ি-সদৃশ নকশা দ্বারা মসজিদের চতুর্দিককে ঘেরাও করে রেখেছে এবং উপরিভাগ মার্লন নকশায় শোভিত। পশ্চিম দেয়ালে প্যারাপেটের দু'পাশে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনকল্পে ছাদের সাথে সংযুক্ত দুটি পাথরের নল বিদ্যমান। নলগুলো ৩ফুট সমপরিমাণ বাইরের দিকে সম্প্রসারিত। মসজিদের ছাদ তিনটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। মধ্যবর্তী গম্বুজটি আকারে তুলনামূলক বড়। এটি স্কুইঞ্চ পদ্ধতিতে নির্মিত। গম্বুজের অভ্যন্তরীণ পিপার অংশে মার্লন নকশা এবং শীর্ষে বৃত্তাকার গোলাপ নকশা বিদ্যমান। অভ্যন্তর ভাগের চারপাশে চারটি কৌণিক খিলান দ্বারা গম্বুজটির ভার বহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। খিলানগুলোর সংযোগস্থলে কলার মোচাকৃতির নকশা পরিলক্ষিত হয়। গম্বুজগুলোর পিপা অষ্টাকোণাকৃতিতে নির্মিত; উপরাংশে পদ্মাপাপড়ি নকশা এবং শীর্ষদণ্ডে দুই স্তরের কলসাকৃতি ও কলার মোচাকৃতির নকশা বিদ্যমান। বাকি গম্বুজ দুটি ছাদের উপর অষ্টভুজাকৃতির পিপার উপর স্থাপিত।

মসজিদের নামাজঘর এক আইলবিশিষ্ট। অভ্যন্তরীণ অংশের পূর্ব দেয়ালে প্রধান প্রবেশপথের উপর সারিবদ্ধ আয়তাকার প্যানেল নকশা এবং দেয়ালগাত্র থেকে সম্প্রসারিত সারিবদ্ধ খিলান নকশা বিদ্যমান। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালেও অনুরূপ নকশা বিদ্যমান। মসজিদের পূর্বপাশে সাহন বিদ্যমান। বখশী হামিদের মসজিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এটি সাহনসহ চতুর্দিক ভূমি থেকে ২ ফুট উঁচু সীমানা প্রাচীরে আবদ্ধ। প্রাচীরের চতুর্দিকে ৬টি বুরুজ বিদ্যমান। সাহনের উত্তর সীমানা প্রাচীরে গ্রামীণ বাংলার নিদর্শন দোচালা ঘরের নকশা রয়েছে। পূর্বপাশে রয়েছে কয়েক ধাপ সিঁড়িবিশিষ্ট একটি মঞ্চ। শাসকগণ এখানে মাঝে মাঝে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

মসজিদের পূর্বপাশে দিঘির পাড়ে একটি বট গাছের নিচে বখশী হামিদের সমাধিসৌধ রয়েছে। দীর্ঘদিন মসজিদটি বন-জঙ্গলে ঘেরা ছিল। মসজিদের বর্তমান খতিব মাওলানা আব্দুল মজিদ দুই যুগ পূর্বে এই মসজিদ আঙিনা পরিষ্কার করে ইবাদাতের উপযোগী করে

তুলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মসজিদের উত্তর দিকে নির্মিত হয়েছে মাদ্রাসা ও হেফজখানা কমপ্লেক্স। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জানুয়ারি তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত গেজেটে "সংরক্ষিত পুরাকির্তী"র তালিকায় বখশী হামিদ মসজিদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[২৬]

৪. **কদম মোবারক মসজিদ:** কদম মোবারক মসজিদটি চট্টগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্র চেরাগী পাহাড়ের রহমতগঞ্জের অধীন রসুলনগরের মোমিনরোড অবস্থিত। ১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ইয়াছিন নামক এক ফৌজদার এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।[২৭] ড. আহমদ হাসান দানী বলেন, চট্টগ্রামের রহমতগঞ্জে অবস্থিত কদম মোবারক মসজিদ এ অঞ্চলের সর্বোত্তম সংরক্ষিত ভবন হিসেবে বিবেচিত; যা ১১৩৬ হিজরি মোতাবেক ১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ ইয়াসিন শাহ কর্তৃক নির্মিত।[২৮]

কদম মোবারক মসজিদ সমতল ভূমি থেকে অনুচ্চ পাহাড়ের মাঝখানে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। উত্তর-দক্ষিণে মসজিদের আয়তন ১২ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৫.৮ মিটার। পাথর নির্মিত দেয়ালের পুরুত্ব ২.২ মিটার। তবে বর্তমানে দেয়ালের উপর সিমেন্টের আস্তর এবং সবুজ রঙের প্রলেপ দেয়া হয়েছে। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ২টি করে সর্বমোট ৭টি প্রবেশপথ রয়েছে। পূর্বদেয়ালের মধ্যবর্তী প্রবেশপথটি আকারে বড় এবং এটিই প্রধান প্রবেশপথ। প্রবেশপথগুলো আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ ও বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলান নকশায় শোভিত। খিলানগুলো দুইপাশে অবস্থিত ঢেউকাটা স্তম্ভের উপর নির্মিত হয়েছে।

মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মেহরাব বিদ্যমান। প্রধান দরজা বরাবর প্রধান মেহরাব অবস্থিত; এটি আকারে তুলনামূলক বড়। তিনটি মেহরাবই অবতলাকৃতিতে নির্মিত। মেহরাবগুলোর চারপাশ লতাগুল্ম নকশায় অলংকৃত। সুন্দর হস্তাক্ষরে আরবি ভাষায় উৎকীর্ণ লিপিও মেহরাবের গাত্রে রয়েছে। কেন্দ্রীয় মেহরাবের পাশেই নির্মিত হয় তিন ধাপ-বিশিষ্ট পাথরের মিম্বার।

কদম মোবারক মসজিদের চারকোণে চারটি অষ্টকোণাকার বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলো ছাদের কার্নিশের উপর উঠে গিয়ে শীর্ষদণ্ড বিশিষ্ট ছোট গম্বুজে শোভিত। বুরুজগুলোর গাত্রে ব্যান্ড নকশা, মারলন নকশা, বহুখাঁজযুক্ত আয়তাকৃতির প্যানেল নকশা, সর্পফনা নকশা এবং কলস মোটিফ নকশার অলঙ্করণ বিদ্যমান। চারটি বুরুজ একই প্রকারের অলঙ্করণ দ্বারা নির্মিত। মসজিদের পূর্ব দেয়ালের প্রধান প্রবেশপথের দুপাশে এবং পশ্চিম দেয়ালের প্রধান মেহরাবের দুপাশে ২টি করে ৪টি ছোট ছোট মিনার বিদ্যমান। মিনারগুলোও বুরুজের সমান উচ্চতায় নির্মিত। মিনার গাত্রে অষ্টকোণাকৃতির ব্যান্ড নকশা, মারলন নকশা, ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজের উপরে ডালিম নকশা এবং শীর্ষদণ্ডে মৌচাকৃতির নকশা ব্যাবহৃত হয়েছে।

কদম মোবারক মসজিদের ছাদের কার্নিশ বক্রাকৃতির নয়, বরং সমান্তরাল। ছাদে প্যারাপেট রয়েছে এবং তাতে দড়ি ও মারলোন নকশা বিদ্যমান। মসজিদের ছাদ স্কুইঞ্চ পদ্ধতিতে নির্মিত ৫টি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। গম্বুজগুলো পাথরে নির্মিত ও অষ্টকোণাকার পিপার উপর স্থাপিত। পিপাগুলো মারলোন নকশায় শোভিত। মধ্যবর্তী ৩টি গম্বুজ অর্ধগোলাকৃতির এবং

দুপাশের ২টি গ্রামীণ বাংলার নিদর্শন চৌচালা ঘরের পরিকল্পনায় নির্মিত। মাঝখানের গম্বুজটি আকারে বড়। গম্বুজ অলঙ্করণে মারলোন নকশা, মোজাইক নকশা, পদ্মপাপড়ি নকশা, কলস নকশা এবং শীর্ষদণ্ডে প্রদীপ নকশা ব্যাবহৃত হয়েছে।

মসজিদ অভ্যন্তর ২টি কৌণিক খিলান দ্বারা তিনভাগে বিভক্ত। মূল অংশের উত্তর ও দক্ষিণপাশে দুটি কুঠরি রয়েছে। উত্তরপাশের কুঠরিতে মুহাম্মাদ (স.) ও আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর পদচিহ্ন রয়েছে।[২৯]দক্ষিণপাশের কুঠরি মসজিদের ইমামের বিশ্রামকক্ষ হিসেবে ব্যাবহৃত হয়। মসজিদের নামাজঘর এক আইল বিশিষ্ট। অভ্যন্তরীণ অংশের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে বেশ কয়েকটি কুলুঙ্গি রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সংস্কারের মাধ্যমে মসজিদটির আয়তন বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে এটি ২ তলাবিশিষ্ট একটি মসজিদ। সামনের অংশে একটি ইয়াতিমখানা এবং দক্ষিণদিকে কবরস্থান রয়েছে।

৫. **নবাব ওয়ালীবেগ খাঁ মসজিদঃ** ১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম শহরের চকবাজার গোলচত্বরের বামপাশে নবাব ওয়ালীবেগ খাঁ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং তাঁর নামানুসারে এটি নবাব ওয়ালীবেগ খাঁ মসজিদ নামে পরিচিত। স্থানীয়ভাবে এটি ওয়ালী খাঁ মসজিদ হিসেবেই প্রসিদ্ধ। তিনি এই মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেশ কিছু জমিও দান করেছিলেন।[৩০]

মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। মসজিদের পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ৫৭ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২৪ ফুট। ইট ও চুন-সুরকি দ্বারা নির্মিত দেয়ালের পুরুত্ব ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি। দেয়ালের উপরিভাগে চারিদিকে মার্লন নকশা বিদ্যমান। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ২টি করে সর্বমোট ৭টি গোলায়িত খিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথ রয়েছে। প্রতিটি প্রবেশপথ আয়তাকার প্যানেল নকশায় নির্মিত। বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণদিকের প্রবেশপথগুলো জালি নকশা দ্বারা আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। মসজিদের নামাজঘর মধ্যভাগে উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে নির্মিত ৪টি আয়তাকার কৌণিক খিলান স্তম্ভসারি দ্বারা দুই আইলে বিভক্ত। স্তম্ভগুলোতে কলার মৌচাকৃতির নকশাসহ বেশ কয়েকটি প্যানেল নকশা বিদ্যমান। নামাজঘরের অভ্যন্তর ৬টি বে'তে বিভক্ত।

মসজিদের ছাদের কার্নিশ বক্রভাবে নির্মিত। ছাদে পাথরে নির্মিত সমানাকৃতির ৬টি অর্ধগোলায়িত গম্বুজ বিদ্যমান। গম্বুজ নির্মাণে স্কুইঞ্চ পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। গম্বুজগুলো অষ্টকোণাকৃতির পিপার উপর অবস্থিত। গম্বুজগুলোর অভ্যন্তরীণ অংশে আয়তাকৃতির খোপ নকশা, মার্লন নকশা এবং কেন্দ্রে রোজেট (গোলাপফুল) নকশা বিদ্যমান। গম্বুজগুলোর উপরাংশ পদ্মপাপড়ি নকশা, চার স্তরে সাজানো ডালিম নকশা এবং শীর্ষদণ্ড মৌচাকৃতির নকশায় শোভিত। মসজিদের চারকোণে চারটি অষ্টকোণাকৃতির বুরুজ বিদ্যমান। বুরুজগুলোর নির্মাণ পদ্ধতি সমসাময়িক অন্যান্য মসজিদের বুরুজ নির্মাণ পদ্ধতির চেয়ে ভিন্ন। এই বুরুজগুলো কার্নিশ বরাবর এসে শেষ না হয়ে ২ হাত সমপরিমাণ উপরে উঠে গেছে। বুরুজগুলোর নিম্মাংশ অষ্টকোণাকৃতির কলস মোটিফে অলংকৃত এবং উপরাংশ মার্লন নকশা ও অষ্টভুজি গুচ্ছপ্যানেল নকশায় শোভিত। বুরুজগুলো শীর্ষদণ্ডবিশিষ্ট কিউপোলা নকশায় নির্মিত। উপরের এই অংশে মেহরাব নকশা, শীর্ষদণ্ডে পাপড়ি নকশা, দু'স্তরে সাজানো ডালিম নকশা এবং এর উপরে মৌচাকৃতির নকশা বিদ্যমান।

মসজিদের পশ্চিমদেয়ালে তিনটি মেহরাব বিদ্যমান। প্রধান প্রবেশপথ বরাবর প্রধান মেহরাব নির্মিত। মেহরাবসমূহ অবতলাকৃতিতে নির্মিত। মেহরাবগুলোর উপরে কৌণিক খিলান নকশা বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় মেহরাব আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ এবং দু'পাশে দুটি সরু স্তম্ভ রয়েছে। প্রধান মেহরাবের সাথে লাগোয়া উত্তরপাশে তিন সিঁড়ি বিশিষ্ট মিম্বার বিদ্যমান। মিম্বারটি পাথরে নির্মিত হলেও সংস্কারকালে মোজাইক দ্বারা আস্তর দেয়া হয়েছে। মসজিদ অভ্যন্তরের চারদিকের দেয়ালে ছোট-বড় মিলিয়ে সর্বমোট ২১টি কুলুঙ্গি রয়েছে। দেয়ালজুড়ে রয়েছে আয়তাকার প্যানেল নকশা। প্রধান প্রবেশপথ ও প্রধান মেহরাবের দুপাশে ২টি করে ৪টি অষ্টকোণাকার ক্ষুদ্র মিনার রয়েছে। মিনারগুলো ক্ষুদ্র গম্বুজশোভিত। মসজিদের পূর্ব দিকে এক আইলবিশিষ্ট একটি রিওয়াক বিদ্যমান। রিওয়াকে প্রবেশের জন্য ৩টি দরজা রয়েছে।

২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ০৭ সেপ্টেম্বর তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশ গেজেট"-এ "সংরক্ষিত পুরাকির্তী"-র তালিকায় নবাব ওয়ালীবেগ খাঁ মসজিদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৩১]

৬. **বায়েজিদ বোস্তামী দরগাহ মসজিদ:** বায়েজিদ বোস্তামী ইরানের একজন সুপরিচিত সাধকপুরুষ ছিলেন, যিনি ইসলামের সেবায় নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর নামানুসারে চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে একটি দরগাহ নির্মিত হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, তিনি কখনোই চট্টগ্রামে আসেননি এবং তাঁর জীবনীর সাথেও চট্টগ্রাম জড়িত নয়। এটি মূলত তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত একটি স্মৃতিস্তম্ভ বা অনুকৃতি মাত্র।[৩২] অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) দরগাহ প্রাঙ্গণে পাহাড়ের পাদদেশে তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মিত হয়; যা বায়েজিদ বোস্তামী দরগাহ মসজিদ নামে প্রসিদ্ধ হলেও স্থানীয়ভাবে 'আওরঙ্গজেব মসজিদ' নামে পরিচিত।[৩৩]

মসজিদটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। উত্তর-দক্ষিণে এর আয়তন ৩০.৩৩ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২২.১৬ ফুট। ইট ও পাথরের সংমিশ্রণে নির্মিত এই মসজিদের দেয়ালের পুরুত্ব ৪.৬৬ ফুট। মসজিদের চারকোনায় চারটি অষ্টকোণাকার বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলো ছাদের কার্নিশ থেকে সামান্য উপরে উঠে গিয়ে ছত্রীযুক্ত শিরাল গম্বুজে নির্মিত। বুরুজগুলোর নিম্মাংশের ভিত কলসাকৃতিতে নির্মিত; মধ্যভাগে অষ্টভুজাকৃতির নকশা, ছাদের কার্নিশে অষ্টভুজি খোপ নকশা, মার্লন নকশা, উপরিভাগে ছত্রী নকশা এবং ক্ষুদ্র গম্বুজের উপর প্রস্ফুটিত পুষ্প নকশা বিদ্যমান।

মসজিদের উত্তর-দেয়ালের পশ্চিম ও পূর্বকোণের বুরুজ দুটি আজও টিকে আছে; যদিও দেয়ালগাত্রে ফাটল ধরেছে। তবে দক্ষিণদেয়ালের পশ্চিম ও পূর্বকোণের বুরুজ দুটি ছাদের কার্নিশ বরাবর নিম্নাংশ ঠিক থাকলেও উপরিভাগের ছত্রীযুক্ত ক্ষুদ্র গম্বুজগুলো প্রাচীনত্ব ও সংস্কারের অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। মসজিদের পূর্বদেয়ালে তিনটি খিলানপথ বিদ্যমান। মাঝের পথটিই প্রধান প্রবেশপথ। এই প্রবেশপথটি ঢেউকাটা টারেট এবং ঈষৎ উদ্‌গত প্যারাপেট দ্বারা শোভিত। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের দু'পাশে রয়েছে মিনারসদৃশ দু'টি গোলায়িত স্তম্ভ; এদের নিম্নাংশ কলসাকৃতির নকশায় নির্মিত হয়ে উপরের দিকে ক্রমান্বয়ে সরু হয়েছে। স্তম্ভগুলোর উপরে প্যারাপেটে ও ছাদের কার্নিশে দুই সারি মার্লন নকশা অলংকৃত রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণদিকের প্রবেশপথগুলো একই ধরণের অলঙ্করণে নির্মিত। প্রবেশপথগুলোর দু'পাশে নিচ থেকে উপরে সারি সারি আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ কুলুঙ্গি বিদ্যমান। খিলানের উপর রয়েছে আয়তাকার প্যানেল নকশা।

পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মেহরাব বিদ্যমান। মেহরাবগুলো অবতলাকৃতিতে পাথর দ্বারা নির্মিত। কেন্দ্রীয় মেহরাবের বহির্দেয়াল মূল প্রাচীর থেকে কিছুটা উদ্‌গত। উদ্‌গত অংশে আয়তাকার প্যানেলে কৌণিক খিলান নকশা অলংকৃত। মসজিদের নামাজঘর এক আইলবিশিষ্ট। অভ্যন্তর পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে দুটি খিলান দ্বারা তিনটি অংশে বিভক্ত; প্রতিটি অংশের ছাদের উপর তিনটি গম্বুজ বিদ্যমান। গম্বুজগুলো অনেকটা আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের গম্বুজের মতো স্কুইঞ্চ পদ্ধতির খিলান দ্বারা নির্মিত। মাঝের গম্বুজটি আকারে তুলনামূলক বড়। অষ্টভুজাকৃতির পিপার উপর স্থাপিত গম্বুজগুলোতে পদ্মপাপড়ি নকশা এবং শীর্ষদণ্ডে ডালিম নকশা বিদ্যমান। গম্বুজগুলোতে সবুজ রঙের প্রলেপ পরিলক্ষিত হয়।

৭. **আজগর আলী চৌধুরী জামে মসজিদঃ** আজগর আলী চৌধুরী জামে মসজিদ; চট্টগ্রাম শহরের বড়পোলের পশ্চিমে চৌধুরীপাড়া নামক গ্রামে অবস্থিত একটি মুঘল স্থাপত্য। মসজিদের সম্মুখভাগের একটি ভিত্তিপ্রস্তর থেকে জানা যায়, মসজিদটি ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে এতদঞ্চলের তৎকালীন প্রশাসনিক কর্মকর্তা আজগর আলী চৌধুরী কর্তৃক নির্মিত।[৩৪] মসজিদটি আয়তাকার পরিকল্পনায় উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে নির্মিত। মসজিদের পরিমাপ, বহিরাংশের উত্তর-দক্ষিণে ২৫.৬৬ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৬.৩৩ ফুট; ভেতরাংশের উত্তর-দক্ষিণে ১৮.৬৬ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯.৩৩ ফুট। দেয়ালের পুরুত্ব ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি। দেয়ালের অভ্যন্তর ইট দিয়ে নির্মিত এবং বহিরাংশ পাথর দিয়ে আবৃত।

মসজিদটির পূর্বদেয়ালে প্যারাপেটের ভেতর কৌণিক খিলানবিশিষ্ট একটি প্রবেশপথ বিদ্যমান। প্রবেশপথের সম্মুখভাগও দুটি ফিনিয়াল দ্বারা কৌণিক খিলান নকশায় শোভিত। প্রবেশপথের ফিনিয়ালগুলোর নিম্মাংশ ফুলদানি নকশায় নির্মিত এবং উপরের অংশে কয়েকটি প্যানেল দ্বারা গিল্টি বাঁধানো নকশা বিদ্যমান। কৌণিক খিলানের মাঝামাঝিতে ত্রিকোণাকার পদ্মপাপড়ি নকশা দেখা যায়। প্রবেশপথের দু'পাশে ২টি করে ৪টি কুলুঙ্গি রয়েছে; যেগুলো আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ। কুলুঙ্গিসমুহের মাঝখানে রয়েছে আয়তাকৃতির খোপ নকশা। প্যারাপেটের সম্মুখভাগে রয়েছে দুইসারি করে প্যাঁচানো গোলাপফুলের নকশা। প্রবেশপথের উপরে আয়তাকৃতির প্যানেল নকশা রয়েছে।

প্রবেশপথের উত্তর ও দক্ষিণ পাশে রয়েছে ২টি কৌণিক খিলানসংবলিত বদ্ধ দরজা। এগুলোর দু'পাশে রয়েছে ফুলদানি নকশা শোভিত ফিনিয়াল। বদ্ধ দরজাগুলোর উপরে রয়েছে লম্বা একটি আয়তাকার প্যানেল এবং এর ভেতরে লতাপাতা দ্বারা প্যাঁচানো পত্রশোভিত সারিবদ্ধ গোলাপ নকশা বিদ্যমান। লম্বা আয়তাকার প্যানেল নকশার উপরে রয়েছে সমপরিমাপের ২টি আয়তাকার প্যানেল। প্যানেল নকশাগুলোর উপরে রয়েছে দেয়াল থেকে উদ্‌গত সারিবদ্ধ কৌণিক খিলান নকশা। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ২টি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিদ্যমান। বর্তমানে প্রবেশপথগুলো জালি/জাফ্রি নকশা দ্বারা আবদ্ধ রাখা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালগুলোও প্যারাপেট সংবলিত। প্যারাপেটের দু'পাশে ২টি করে ৪টি সরু স্তম্ভ রয়েছে; এগুলোর ভিত কলসাকৃতির মোটিফে নির্মিত। স্তম্ভগুলোর গাত্রে ঢেউকাটা নকশা ও কার্নিশের উপরদিকে মার্লন নকশা এবং ডালিম নকশার শীর্ষদণ্ডবিশিষ্ট ক্ষুদ্র গম্বুজ বিদ্যমান।

মসজিদের ছাদের কার্নিশ সমতল পদ্ধতিতে নির্মিত। ছাদের সম্মুখ ও পেছনে প্যারাপেট বিদ্যমান। ছাদের কার্নিশ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বহু প্যানেল দ্বারা দড়ির ন্যায়

মসজিদের চতুর্দিক গিল্টি করা এবং দ্বিতীয় ভাগে চতুর্দিকে সারিবদ্ধ মার্লন নকশা রয়েছে। দেয়ালের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে প্যারাপেটের দু'পাশে দুটি করে ৪টি মিনার সদৃশ সরু স্তম্ভ বিদ্যমান। স্তম্ভগুলোর নিম্নভাগ কলস মোটিফে নির্মিত, মধ্যভাগ ঢেউকাটা নকশা, এবং শীর্ষদণ্ড ক্ষুদ্র গম্বুজ শোভিত নকশায় নির্মিত। ক্ষুদ্র গম্বুজগুলোর শীর্ষদণ্ড ডালিম নকশায় নির্মিত।মসজিদের চারকোণে অষ্টকোণাকার পরিকল্পনায় নির্মিত ৪টি বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলোর ভিত অষ্টকোণাকার কলস মোটিফে নির্মিত। বুরুজগুলো ছাদের কার্নিশের উপরে উঠে গিয়ে শীর্ষদণ্ডবিশিষ্ট শিরালগম্বুজে নির্মিত। মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণের প্যারাপেটের প্রতিটি কোণায় ৪টি করে ১৬টি মিনার সদৃশ সরু স্তম্ভ রয়েছে।

মসজিদের মেহরাব পশ্চিম দেয়ালে অবতলাকৃতিতে নির্মিত। এর দু'পাশে কলস মোটিফ শোভিত দুটি ফিনিয়াল রয়েছে। মেহরাবের উপরাংশ কৌণিক খিলানে নির্মিত। মেহরাবের উপরিভাগে ত্রিকোণাকার স্থানে দুটি গোলাপ নকশা এবং দেয়াল থেকে একটু উদ্‌গত সারি সারি খিলান নকশা বিদ্যমান। মেহরাবটি কয়েকটি আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ। মেহরাবের দু'পাশে হুবহু মেহরাবের নকশায় নির্মিত দু'টি কুলুঙ্গি বিদ্যমান। মসজিদের নামাজঘর এক আইলবিশিষ্ট। এর অভ্যন্তরে চারদিকে চারটি বৃহৎ কৌণিক খিলান রয়েছে, যেগুলো গম্বুজের ভার বহন করছে। খিলানগুলোর সংযোগস্থলে আঙুর নকশা বিদ্যমান।

মসজিদটি অষ্টকোণাকার পিপার উপর সংস্থাপিত তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটি স্থাপত্য। মধ্যবর্তী গম্বুজ তুলনামূলক বড় এবং এর পিপা মসজিদের অভ্যন্তরীণ অংশের চারদিকের কৌণিক খিলানের মাধ্যমে ভার বহন করিয়ে নির্মিত। গম্বুজটির উপরিভাগে রয়েছে পদ্মপাপড়ি নকশা এবং শীর্ষদণ্ড তিন স্তরের ডালিম নকশা দ্বারা নির্মিত। দুপাশের গম্বুজ দুটি অর্ধবৃত্তাকৃতিতে নির্মিত। এদের পিপা অষ্টভূজাকৃতির। গম্বুজগুলো সরাসরি ছাদের উপর স্থাপিত। এদের শীর্ষদণ্ড ডালিম নকশায় শোভিত। বর্তমানে মসজিদটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। মসজিদটির পশ্চিমপাশে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে; যা ইবাদতের জন্য ব্যাবহার করা হয়।

আমরা জানি, ব্যাণিজ্যিক নগরী হিসেবে চট্টগ্রামের পরিচিতি প্রাচীনকাল থেকেই। বাণিজ্যিক কারণের পাশাপাশি নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার কারণেও সমুদ্র উপকূলীয় এ নগরীর প্রতি শাসকগোষ্ঠী আকৃষ্ট হতো। চট্টগ্রাম অঞ্চল চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত সুলতানি শাসন এবং পরবর্তী দুই শতাব্দী মুঘল শাসনাধীন ছিল।[৩৫] যার ফলে আবাসস্থল নির্মাণের পাশাপাশি এ অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইবাদতের লক্ষ্যে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করা হয়েছিল বহু মসজিদ স্থাপত্য; যা এ অঞ্চলের সামাজিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব বহন করে। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাবের পাশাপাশি এ সকল স্থাপত্যের নির্মাণ পদ্ধতি ও কলা-কৌশল পরবর্তী সময়ে নির্মিত স্থাপত্যসমূহের উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

সুলতানি ও মুঘল শাসনামলে নির্মিত মসজিদ স্থাপত্যসমূহের অলংকরণে নানাবিধ নির্মাণশৈলীর ব্যাবহার দেখা যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মাণ, বহু খাঁজবিশিষ্ট কৌণিক খিলানপথের ব্যাবহার, খিলানপথের ত্রিকোণাকৃতি স্থানে পদ্মফুল ও আঙুরসহ লতাপাতার নকশা, দেয়ালগাত্রে কুলঙ্গী, প্যারাপেট, গোলাপ নকশা, মার্লন নকশা, পদ্মপাপড়ি নকশা, দেয়ালগাত্রে শিকল-ঘণ্টার নকশা, কলসাকৃতির মোটিফ সম্বলিত ফিনিয়াল,

কিউপোলা কিংবা শিরাল গম্বুজ নির্মাণ, স্কুইঞ্চ পদ্ধতিতে গম্বুজ নির্মাণ, পাথরে নির্মিত নল স্থাপন ইত্যাদি। এসকল নির্মাণশৈলী পরবর্তী কালে বিকশিত মুসলিম স্থাপত্যসমূহ অলঙ্করণে অন্যতম আলঙ্কারিক উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

**উপসংহার:** চতুর্দশ শতকে সুলতানি শাসন ও সপ্তদশ শতকে মুঘল শাসনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম অঞ্চল দীর্ঘদিন মুসলিম শাসনাধীন ছিল। যার ফলে এতদঞ্চলে গড়ে ওঠে বহু মসজিদ স্থাপত্য। এসকল স্থাপত্যে ফুটে ওঠে সুলতানি ও মুঘল শাসনামলের চমৎকার স্থাপত্যরীতি। কালের পরিক্রমায় ও সংস্কারের অভাবে মধ্যযুগে নির্মিত এসকল স্থাপত্যের কিছুসংখ্যক ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে কিছু স্থাপত্য আজও টিকে আছে। প্রাচীন এ স্থাপত্যসমূহের প্রতিটি উপাদান তৎকালীন ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করে। রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কার্যাবলির ক্ষেত্রে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব কেমন ছিল, তা এই স্থাপত্যসমূহের গঠন-কাঠামো ও নির্মাণশৈলী পর্যবেক্ষণ করলে কিছুটা অবগত হওয়া যায়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মধ্যযুগীয় এসকল স্থাপত্যের কিছু অংশ আজ জরাজীর্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান। কিছু স্থাপত্য অতি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় তালাবদ্ধ রাখা হয়েছে। যদি অতিব গুরুত্বপূর্ণ এসকল স্থাপত্যকে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় আনা যেত, তবে বিলুপ্তপ্রায় বহু স্থাপত্যকে চিরতরে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব হতো। চট্টগ্রাম অঞ্চলে নির্মিত প্রাচীন স্থাপত্যসমূহ সংরক্ষণে সরকারি ও বেসরকারিভাবে যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হলে এসকল পুরাকীর্তি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বদেশি ইতিহাস শিক্ষায় অবদান রাখার পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের বিকাশে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে।

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মুসলিম পুরাকীর্তি* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭১) পৃ. ৭২

২ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (ঢাকা: বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ৫৭-৫৮

৩ তদেব, পৃ. ৮৭

৪ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

৫ Perween Hasan, *Sultans and Mosques: The Early Muslim Architecture of Bangladesh*, (London: I.B. Tauris & Co. Ltd, 2007), p. 95; সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মুসলিম পুরাকীর্তি*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭১) পৃ. ৭৬

৬ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

৭ *তদেব।*

৮ *তদেব*, পৃ. ৭৯

৯ "পাঁচশ বছরের পুরোনো সীতাকুণ্ডের হাম্মাদিয়া মসজিদ", *সিটিজি টাইমস*, চট্টগ্রাম, শুক্রবার, ডিসেম্বর ৬, ২০১৯।

১০ *তদেব।*

১১ আল কুর'আন, ০৩:১৮

"شَهِدَاللَّهُأَنَّهُلَا إِلَٰهَإِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُوَأُولُوا الْعِلْمِقَائِمًابِالْقِسْطِلَا إِلَٰهَإِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ"

অর্থ- "আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই, ফিরিশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও (একই সাক্ষ্য দেন); আল্লাহ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"।

১২ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

১৩ M. H. Syed, *History of Delhi Sultanate*, (New Delhi: Anmol Publications Pvt Ltd, 2005), pp. 237-238

১৪ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮-৭৯

১৫ https://bn.banglapedia.org/index.php?title= নুসরত শাহ মসজিদ ও দিঘি, অনুসন্ধান তারিখ ০৬/০৭/২০২০ খ্রি.

১৬ আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০-১৮৩

১৭ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০-৮১

১৮ *তদেব।*

১৯ পবিত্র কুর'আনের ০২ নং সুরা আল-বাকারা'র ২৫৫ নং আয়াত "আয়াতুল কুরসী" নামে পরিচিত।

২০ A.H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, (Dhaka: Asiatic Society of Pakistan, 1961), p. 244

২১ শিলালিপিগুলোর বঙ্গানুবাদ হলো, "হে জ্ঞানী! তুমি জগতবাসীকে বলে দাও, আজ এ দুনিয়ায় দ্বিতীয় কা'বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার প্রতিষ্ঠাকাল ১০৭৮ হিজরি (১৬৬৭ খ্রি.)"।

২২ Government of the People's Republic of Bangladesh, *The Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, 1986* (Ordinance NO. II OF 1986), (Dhaka: Legislative and Parliamentary Affairs Division, January 7, 1986), Section No. 3(b)

২৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *চট্টগ্রাম বিভাগের সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা*, (ঢাকা: প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জুন, ২০২১), পুরাকির্তী/প্রত্নস্থল নং- ৬১, বাংলাদেশ গেজেট- ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮, পৃ. ১৭

২৪ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

২৫ তদেব, পৃ. ৮৫

২৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *চট্টগ্রাম বিভাগের সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা*, প্রাগুক্ত, পুরাকির্তী/প্রত্নস্থল নং- ৫৬, প্রজ্ঞাপন তারিখ- ২২ জানুয়ারি, ১৯৭০, পৃ. ১৬

২৭ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

২৮ A.H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, (Dhaka: Asiatic Society of Pakistan, 1961), p. 244; Nazimuddin, Ahmed, *Mughal Architecture in Bangladesh*, (Dhaka: The University Press Limited), p.112.

২৯ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*।

৩০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *চট্টগ্রাম বিভাগের সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৩১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *চট্টগ্রাম বিভাগের সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা*, প্রাগুক্ত, পুরাকির্তী/প্রত্নস্থল নং- ৬০, বাংলাদেশ গেজেট- ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭, পৃ. ১৭

৩২ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

৩৩ *তদেব*, পৃ. ৮৪

৩৪ "নতুনরূপে ২৫০ বছরের পুরনো মোগল আমলের মসজিদ", *সমকাল*, ঢাকা, বুধবার, ১৩ জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৬।

৩৫ আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*।

---

জমা প্রদানের তারিখ : ১৪.০২.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ০৮.০৬.২০২২

---

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-১, জানুয়ারি–জুন ২০২২

# রবীন্দ্রসংগীতে ‘দেশ’ ও ‘ইমন’ রাগের প্রভাব

ঝুমুর আহমেদ*

**Abstract**

Rabindranath Tagore is a unique name in the history of Bengali music. At the heart of his musical inspiration was Hindustani classical music. The aim and purpose of this study is to verify the type of music that affects the ‘Desh’ and ‘Emon’ Raga and the extent to which it depends. Using comparative methods and textual analysis methods, we will see in the results of this study that Rabindranath used the soul, not the genre of Hindustani music.

## ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১) বাংলা গানের ইতিহাসে প্রাতিস্বিকতায় উজ্জ্বল। তাঁর সাংগীতিক প্রেরণার মর্মমূলে ছিল হিন্দুস্থানি সংগীত। শাস্ত্রীয় সংগীতকে আশ্রয় করে নির্মিত রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে কতটুকু রয়েছে নির্ভরতা; সেই নির্ভরতার ধরন কী; আর কতটুকুই-বা তাঁর স্বকীয় নির্মাণ তা যাচাই করা জরুরি। গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে অতিপরিচিত ‘দেশ’ ও ‘ইমন’ রাগ-নির্ভর কিছু গান বেছে নেয়া হয়েছে। এই গবেষণায় পাঠবিশ্লেষণ পদ্ধতি, তুলনামূলক পদ্ধতি ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি  ব্যাবহার করা হয়েছে।  প্রথমে ইমন ও দেশ রাগের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরবিন্যাসে সেই রাগের স্বরূপ কতটুকু ধরা পড়েছে; এবং, তা বিশ্লেষণ-পূর্বক সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।

ইমন এবং দেশ রাগের সুরে-ঢালা গানগুলোকে যাচাই করতে গিয়ে দেখা যায়, কিছু গান রয়েছে যার স্বরলিপিতে ‘দেশ’ বা ‘ইমন’  নির্দেশিত, অথচ মিশ্রণ রয়েছে অন্য স্বরের। স্বরলিপিতে ইমন বা দেশ রাগটি চিহ্নিত নেই, অথচ সেই গানে ওই রাগ ধরা পড়ছে, এমন বিষয়ও উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরবিন্যাসে ‘দেশ’ ও ‘ইমন’ রাগের সুর নির্মাণের যাথার্থ্য বিবেচনায় দেখতে পাবো, রাগের চলনবিন্যাসের চেয়েও রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ ছিল গানের বাণীর ভাবকে পরিস্ফুট করে তোলার দিকে। কোনো রাগের স্বরূপকে সুচারুরূপে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে ধারণ করেননি। ফলে, ওই রাগসমূহের সুরকে আশ্রয় করে বরীন্দ্রসংগীত স্বকীয় ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারে– এটি দেখানোই এই গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা কাজ করলেও তিনি হিন্দুস্থানি সুর ভুলতে ভুলতে গান রচনা করেছেন। কারণ, তিনি জানতেন, ভালো জিনিসকে ভালোবাসতে হবে মোহমুক্ত হয়ে। শাস্ত্রীয় সংগীতের দানকে যথার্থ আত্মসাৎ করে নিজের মতো রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি মনে করতেন, তর্জমা করে বা ধার করে প্রকৃত রসসৃষ্টি সম্ভব হয় না; সাহিত্যেও না, সংগীতেও না। আমরা ‘দেশ’ ও ‘ইমন’ রাগের প্রভাবযুক্ত রবীন্দ্রসংগীত বিশ্লেষণ করে দেখতে পাব, ‘দেশ’ ও ‘ইমন’ রাগের আশ্রয় করেই তা হয়ে উঠেছে এক হৃদয়গ্রাহী সাংগীতিক অভিক্ষেপ। ‘দেশ’

---

* সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

এবং ‘ইমন’ রাগের মিশ্রণকে ভুলিয়ে দিয়ে তা সুরে ও শব্দে স্বকীয় হয়ে উঠেছে– ‘রবীন্দ্রসংগীত’ই যার যথার্থ সংজ্ঞার্থ। সুধীর চন্দের ‘রবীন্দ্রসংগীত  রাগ-সুর নির্দেশিকা’ গ্রন্থে বেশ কিছু গানের রাগ ও সুরের নির্দেশনা আছে, বিশ্লেষণ নেই। সুভাষ চৌধুরীর ‘গীতবিতানের জগৎ’ গ্রন্থেও রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে কেবল, বিশ্লেষণ নেই। ওই গ্রন্থে রবীন্দ্রসংগীতে রাগের প্রভাব প্রসঙ্গে পর্যালোচনা অনুপস্থিত। গবেষকের জানা মতে, রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক নানান প্রবন্ধে শাস্ত্রীয় সংগীতসহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানান গানের প্রভাব প্রসঙ্গে সামান্য কিছু উল্লেখ থাকলেও বিস্তৃত পরিসরে রাগ-রাগিণীর প্রভাব নিয়ে, বিশেষ করে ‘দেশ’ ও ‘ইমন’ রাগের প্রভাব প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে কোনো গবেষণাকর্ম হয়নি। ফলে, এই প্রস্তাবিত গবেষণাটি ‘অনন্য’ হিসেবে বিবেচনাযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান বাংলা কাব্যসংগীতের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ। এই তাৎপর্য তাঁর গানের বাণীর সঙ্গে সুরের অপূর্ব সম্মিলনের ফল। রবীন্দ্রনাথের শেকড়শুদ্ধ শিক্ষা ছিল হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সংগীত। যদিও তিনি নিয়ম করে বিষ্ণুচক্রবর্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, যদু ভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী– কারো কাছেই গান শেখেননি। তবু দরোজার আড়ালে আবডালে লুকিয়ে ‘কুড়িয়ে-বাড়িয়ে’ তাঁদের কাছে এই শেখা রবীন্দ্রনাথের মর্মমূলে হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি মুগ্ধতা তৈরি করেছিল। এই মুগ্ধতার সঙ্গে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রজ্ঞা তাঁকে প্রথম জীবনে সাহায্য করেছিল ব্রহ্মসংগীত রচনায়। পরবর্তী সময়ে তিনি প্রথম জীবনের গানে ‘ভাব’ বাৎলানো ছেড়ে পরিণত বয়সে যখন গানের মধ্যে ‘রূপ’ দেবার চেষ্টা করলেন, তখনও নিজেরই অজান্তে এইসব শাস্ত্রীয় জানাশোনার প্রভাব তাঁর গানে পড়তে লাগল।  আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের গানে ব্যাপকভাবে ‘বেহাগ’, ‘ভৈরব’. ‘ইমন’, ‘কল্যাণ’, ‘ইমনকল্যাণ’, ‘ছায়ানট’, ‘ভৈরবী’, ‘দেশ’, ‘খাম্বাজ’, ‘কাফি’, ‘সারং’, ‘কানাড়া’, ‘মল্লার’, ‘আড়ানা’, ‘বিলাবল’, ‘নট’– এমন নানান রাগের ব্যাবহার রয়েছে। প্রতিটি রাগের ভিন্ন ভিন্ন রকম প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রসংগীতে। রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপির শুরুতে এই রাগসমূহ এবং তাল সম্পর্কে লিখিত নির্দেশনা আমরা পাই। পরিণত বয়সের গানে এই রাগসমূহের কোনো-কোনোটির প্রয়োগ তাঁর গানে থাকলেও স্বরলিপিতে নির্দেশনা পাওয়া যায় না। আবার কখনো-বা স্বরলিপিতে লিখিত রয়েছে রাগের নাম, কিন্তু গানের মধ্যে সেই রাগের চিহ্নমাত্রও নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপির নানান সংস্করণে, কিংবা ভুলবশত এই রাগসমূহের নাম লিখিত রয়ে গেছে, পুনঃপ্রকাশকালে তা আর পুনর্বিবেচিত হয়নি। রাগের প্রভাব এবং রাগজনিত বিভ্রমের এইসকল চমকপ্রদ বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে ‘দেশ’ ও ‘ইমন’ রাগকে বেছে নেয়া খুবই সংগত। ‘দেশ’ ও ‘ইমন’ রাগের স্বভাব কতটুকু রয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে, এবং কী করে কোন পথে এই রাগাশ্রিত গান সুরগতভাবে ‘রবীন্দ্রসংগীত’ হয়ে উঠেছে, তা যাচাই করবার তাৎপর্য রয়েছে।

**ইমন ও দেশ প্রভাবিত গানের স্বরূপ**

রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় সংগীতের আকর বা কৌলিন্য বজায় রাখেননি। তাঁর গানে মিশ্র সুরের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর গানে রয়েছে  কীর্তনের প্রভাব, বাউলের প্রভাব, ইউরোপীয় স্কচ ও আইরিশ সুরের প্রভাব। শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুশাসন তিনি মানতে চাননি। এ কারণেই তাঁর গানে মিশ্র রাগ-রাগিণীর সমাবেশ রয়েছে। তাঁর গানে মীড়ের বহুল ব্যাবহার লক্ষ করা যায়। কিন্তু গমকের ব্যাবহার খুব সামান্যই পরিলক্ষিত হয়। বাংলা ভাষায়  গমকের ব্যাবহার এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাংলা গানের মেজাজকে উন্নীত করার জন্যে তিনি ধ্রুপদকে আত্মীকৃত করেছিলেন তাঁর গানে। ধ্রুপদের

আভিজাত্যপূর্ণ গাম্ভীর্যকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। আর সঞ্চারীতে অভিনবত্ব এনেছিলেন, যা অপরাপর বাংলা গানে দুর্লভ। রবীন্দ্রসংগীতে রাগরূপের ব্যাবহার রয়েছে প্রায় সকল গানে। আশ্চর্য ব্যাপার যে, পাশ্চাত্য সংগীতের সুর প্রভাবিত গানে খাম্বাজ বা ভূপালি রাগের চলনের ছায়াও লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের ইমন প্রভাবিত গানে হঠাৎ ব্যাবহৃত শুদ্ধ মধ্যম আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে তা ইমনকল্যাণ প্রভাবিত গান কি-না। যদিও, একটি বার শুদ্ধ মধ্যম ব্যাবহৃত হলেই সেই গানকে ইমন কল্যাণের গান হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। তেমনই ইমনকল্যাণ প্রভাবিত গানে বাণীর প্রয়োজনে ইমনকল্যাণের বাইরেও কোনো স্বর এসে লাগলেই তা অন্য কোনো রাগের গান হয়ে যায় না। স্বতন্ত্র কোনো সুর ব্যাবহারের প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের ছিল না।

**ইমন-প্রভাবিত গান:**

ইমন-প্রভাবিত গান আলোচনার শুরুতে শাস্ত্রীয় সংগীতের ইমন রাগ প্রসঙ্গে আলোচনা করা জরুরি–

ঠাট– কল্যাণ। জাতি– সম্পূর্ণ।

বাদী স্বর– গান্ধার।

সমবাদী স্বর– নিষাদ।

সময়– রাত্রি প্রথম প্রহর।[১]

এই রাগে মধ্যম স্বর তীব্র এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ রূপে ব্যাবহৃত হয়ে থাকে।

আরোহ: ন্‌রাগা, ক্ষাধা, নার্সা।

অবরোহ: র্সা নাধা, পা, ক্ষাগা, রাসা

পকড়: ন্‌রাগারা, সা, পা রাগারাসা।

চলন:

ন্‌ রা রা গা, ক্ষা গা পা, ক্ষা ধা পা, ক্ষা গা, রা গা ক্ষা পা রা, গা রা ন্‌ রা সা।

পা ক্ষা গা, ক্ষা ধা না, না -া না র্সা র্সা, র্সা না ধা পা, পা ধা পা র্সা, র্সা না র্রা র্সা, র্সা না ধা পা, পা ক্ষা ধা পা রা, রা গা ক্ষা পা রা, রা গা রা, ন্‌ রা সা।

**গান–১**: 'তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না'[২] ॥ ২৪ বছর বয়সে রচিত[৩]।

গানটি *গীতবিতানের* পূজা পর্যায়ভুক্ত। স্বরলিপির শীর্ষে 'ইমন-ভূপালী' লেখা রয়েছে। স্থায়ী অংশের প্রথমেই ইমন রাগের প্রকট প্রভাব লক্ষ করা যায়। ইমন রাগের আরোহণের যে চলন, তা এই গানের শুরুতেই শুনতে পাওয়া যায়।

গা I I {গক্ষা -পধা ধা | পা ক্ষা পা I গা রা গা | রগরা সা সা I[৪]

তো মা০ ০র্ ক থা হে থা কে হ তো ব০০ লে না

কিন্তু প্রথম চরণের শেষাংশে ‘করে শুধু মিছে কোলাহল’ অংশে ষড়জের পর ধৈবতের ব্যাবহার ভূপালি রাগের চলনের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়–

I সা ধ্া সা | সা সা রে।[৫]

ক রে শু ধু মি ছে

গানটির অন্তরা ও আভোগ অংশেও ইমন প্রভাবিত সুর পাওয়া যায়। সঞ্চারী অংশে প্রথম শব্দ ‘আমি’র সুর ছাড়া বাকি পুরোটাতেই ইমনের সুর রয়েছে। এই গানটিতে ষড়জ ও ধৈবতের সংগতিই রয়েছে কেবল; পুরো গানেই ইমনের ছায়া প্রকট।

**গান–২:** ‘চোখের আলোয় দেখেছিলেম’[৬] ॥ ৫৩ বছর বয়সে রচিত[৭]।

গানের স্বরলিপির শীর্ষে কোনো রাগের নাম চিহ্নিত নেই। রাগ ইমনের আরোহণে পঞ্চমকে বাদ দেবার রীতি রয়েছে, যা এই গানের প্রথম চরণের সুরবিন্যাসেই লক্ষ করা যায়। ইমনের অবরোহণে পঞ্চম স্বরটি ধৈবতের পরে আসে এবং তীব্র মধ্যমের প্রয়োগে রাগটির স্বরূপ প্রকাশিত হয়; এ গানের স্থায়ী অংশসহ বিভিন্ন সুরবিন্যাসে বরাবরই ইমন রাগের এই নিয়মটি রক্ষিত হয়েছে–

I I সা রা -সপা | ক্ষা গা -া I গরা গরা পরা | গা রা -া I[৮]

চো খে ০র্ আ লো য়্ দে০ খে০ ০০ ছি লে ম্

...

I I { পা পা -গা| পক্ষা ধা -া I পা -ধর্সা র্সা | র্সনা র্রসা -া I[৯]

ধ রা য়্ য০ খ ন্ দা ০ও না ধ০ রা০ ০

সঞ্চারী অংশে পুরোটাতেই ইমনের ছাপ বিদ্যমান–

I না না -ধা | ধা -ক্ষা ধা I পা -া -া | -া -া -া I[১০]

প্র ল য়্ ঝ ০ ড়ে তে ০ ০ ০ ০ ০

আভোগের সর্বশেষ “তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়-বীণায় গাহি রে” অংশে তিন-তিন ছন্দে বাণী ও সুরের আশ্চর্য মেলবন্ধনে ইমনের ছাপকে পিছু ফেলে তা রবীন্দ্রসংগীত হিসেবে স্বকীয় হয়ে ওঠে। পঞ্চাশোর্ধ বয়সে রচিত এই গানে রাগকে নির্যাসের মতো করে রবীন্দ্রনাথ ব্যাবহার করেছেন। ফলে, গানটি রাগ-নির্ভর না হয়ে বরং ‘নির্ভার’ হয়েছে ইমনের প্রকট-প্রভাবমুক্ত হয়ে।

**গান–৩:** ‘দই চাই গো দই চাই’[১১] ॥ ৭৬ বছর বয়সে রচিত[১২]।

*নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকায়* ব্যাবহৃত এই গানের স্বরলিপির শীর্ষে কোনো রাগের উল্লেখ নেই। গানটির বাণীর ধরন এমন যে, এই গান শুনে কোনো রাগের কথা তাৎক্ষণিকভাবে অনুভবে আসে না। এই গানে ইমন রাগ-বহির্ভূত শুদ্ধ মধ্যমের ব্যাবহার হলেও পুরো গান জুড়ে ইমনের চলন মাখামাখি হয়ে আছে। বাণীর প্রয়োজনে এই শুদ্ধ মধ্যম স্বরটি ব্যাবহৃত হলেও তা অন্য কোনো রাগের প্রতিনিধি হয়ে থাকে না–

I I {গপা পা -পা -া | পা -া পা -া I গপা -া পা পা | পা -ক্মা ধা -া I

দে হ খা ০ নি ০ তা র্ চি ক্ ক ণ কা ০ লো০

I -া -া -া -া | -া -া -া -পা I[১৩]

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

**গান–৪:** 'এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে'[১৪] ॥ ৭৭ বছর বয়সে রচিত[১৫]।

এই গানের স্বরলিপির শীর্ষে কোনো রাগের উল্লেখ নেই। তবে, এই গানে ইমন রাগের চলন লক্ষ করা যায়। এই গানের বাণীর বিষণ্নতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সান্ধ্যকালীন গেয় রাগ ইমনের যথাযথ চলন–

সা -ন্া I I { সা সা র্সা| না ধা -া I পা পা -া | পক্মা ধপা -ক্মা I[১৬]

এ ই উ দা সী হাও য়া র্ প থে ০ প০ থে ০

I ক্মা গক্মা -গা| গা রগা -রা I গরা সা -া |

মু কু ল্ গু লি ০ ঝ রে ০

সঞ্চারী অংশে প্রথম চরণে হঠাৎ কোমল ঋষভের চার মাত্রাব্যাপী স্থায়িত্ব ইমন রাগাশ্রিত গানের মধ্যে এক অপূর্ব আবেশ তৈরি করে। গানের বাণীর সঙ্গে গানের সুরে ইমনের সম্মিলনের পরও কোমল ঋষভের ক্ষণস্থায়ী প্রয়োগ আমাদের শ্রুতিতে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা হয়ে ধরা দেয়, যা রাগকে প্রকট না করে পরিণত রবীন্দ্রনাথের সরসতা ও স্বকীয়তাকে প্রকাশ করে।

I সা ঋা ঋা | ঋা ঋা -গা I[১৭]

বি ফ ল ব্যা থা য়্

**গান–৫:** 'কে গো অন্তরতর সে'[১৮] ॥ ৫০ বছর বয়সে রচিত[১৯]।

পুরো গানে ইমনের প্রভাব থাকলেও গানের স্বরলিপির শীর্ষে কোনো রাগের নাম চিহ্নিত নেই। ত্রিমাত্রিক একতালে বাঁধা এই গান গাইলে ভাঙা গান ব'লে বিভ্রম হয়। এই গানের বাণীতে ইমনের সুর ঢেলে যে নৈবেদ্য রবীন্দ্রনাথ সাজিয়ে রেখেছেন তা এক অচেনা আবহে আমাদেরকে নিয়ে যায়। রাগ ইমনের চলনের সম্পূর্ণ রীতি মেনে স্থায়ী অংশের ন্যাশ[১] তীব্র মধ্যম হয়ে গান্ধারে যে স্থায়িত্ব পায় তা অদ্ভুত এক অনুভূতির সঞ্চার করে–

I I গা রা সন্া| -রা ন্া রা I রপা ক্মপা গা | -া -া -া I

কে গো অ০ ন্ ত র ত র০ সে ০ ০ ০

...

---

[১] 'ন্যাশ' হলো কোনো একটি স্বরে এসে থামবার সাংগীতিক প্রবণতা।

I সা রা গা | ক্ষা পনা ধা I পা পক্ষা ধপা | -ক্ষা -গা -া I[২০]

তা রি সু গ ভী০ র প র০ শে ০ ০ ০

গানটির সঞ্চারি অংশে ইমনের রাগরূপটি স্পষ্ট ধরা পড়ে–

I { সা সা সা | ন্‌সা রা রা I সন্‌া সা রা | সরা গা গা I

সো না লি রু০ পা লি স বু জে সু০ নী লে

I গরা গা ক্ষা | ক্ষা ক্ষা ক্ষা I গা ক্ষপা ধা | ধপনা ধা পাা I[২১]

সে এ ম ন মা য়া কে ম০ নে গাঁ০ থি লে

**গান–৬:** “দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ও পারে”[২২] ॥ ৫২ বছর বয়সে রচিত[২৩]।

রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশোর্ধ গানে রাগের শক্ত ভিত্তি থেকে নিজেকে ক্রমাগত সরিয়ে আনলেও এই গানে তা ব্যতিক্রম মনে হয়। এর কারণ, এর ত্রিতালের শক্ত-বাঁধুনি। গভীর বাণীবাহী এই গানের সুরও তাই শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্য নিয়ে শ্রোতার কাছে পৌঁছয় এবং অনায়াসে ঈশ্বর-আকাঙ্ক্ষার বাহক হয়ে ওঠে। স্থায়ীর শেষ চরণের ‘তোমারে’ অংশের সুর ধৈবতকে স্পর্শ করে ষড়জ হয়ে আবার পঞ্চমকে স্পর্শ করে তীব্র মধ্যমে এসে সুরের এক অপূর্ব সম্মিলনকে তুলে ধরে–

I{ পা -না -া ধা | ধনা -র্সা ধনা -ধা I পক্ষা -পা ধা -া | -া -া পক্ষা পা I

সু ০ র্ গু লি০ ০ পা য়্ চ ০ র ০ ০ ণ্ আ মি

I{ধনা -র্সর্রা -া -র্রা | র্সনা -র্রা র্সা -না I নধা -না -ধা -া | -ধর্সা -া -পক্ষা -া I I[২৪]

পা০ ০০ ই নে তো ০ মা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

অন্তরার শেষ চরণের শেষাংশ– ‘হৃদয়মাঝারে’তে, বা আভোগের শেষাংশ ‘নিবিড় আঁধারে’তে অনুরূপ ব্যাপার দেখতে পাই–

I র্সনা -র্রা -র্সা -না | নধা -র্সা না -া I পক্ষা -ধা -পা -া | -পর্সা -া -পক্ষা -া I I

হৃ ০ দ য় মা ০ ঝা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

....

I র্সনা -র্রা র্সা -না | নধা -র্সা না -ক্ষা I ক্ষা -ধা -পা -া | -পর্সা -া -পক্ষা -া I I[২৫]

নি ০ বি ড়ু আঁ ০ ধা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সঞ্চারীতে ‘বেদনা’ কথাটির সুরে শুদ্ধ ঋষভের পর কোমল ঋষভের আকস্মিক ব্যাবহার ভিন্ন মাত্রায় গানটিকে নিয়ে যায়, তখন ‘ইমন’-এর প্রভাবের ব্যাপারটি মনে জাগে না গানটি শুনতে গিয়ে– যদিও পুরো গানই ইমনে ঢালা–

I না -র্রা র্রা -র্ঋা | র্রা -র্ঋা র্গর্রা -া I[২৬]

বে ০ দ ০ না ০ তে ০

**গান–৭:** "নয় নয় এ মধুর খেলা"[২৭] ॥ ৫২ বছর বয়সে রচিত[২৮]।

এই গানের স্থায়ী অংশে ইমনকে প্রবলভাবে পাওয়া যায় না। অন্তরাতে শুদ্ধ মধ্যমের ব্যাবহার অন্য কোনো রাগের আবহের দিকে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু এই গানের প্রাণ 'সঞ্চারী'তে তীব্র মধ্যমের ব্যাবহার আমাদেরকে আলোড়িত করে, ইমন রাগকে ভীষণভাবে পাইয়ে দেয়–

I I{ রসা -া রা -া | সা -া সা -পা | পা -া -হ্মা গা | গা -া গা -মা I

বা ০ রে ০ বা ০ রে ০ বাঁ ০ ধ্ ভা ঙি ০ য়া ০

...

I ধনা -া -া ধা | পা -া হ্মা -পহ্মা | গা -া -া -া | -া -া -া -া} I[২৯]

কা ০ ন্ না উ ০ ঠে ০০ ছে ০ ০ ০ ০ ০ গ ০

আভোগের শেষাংশে 'তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাই তো অবহেলা' অংশের সুরও ইমন আশ্রিত–

I পা -া পা -া | পা -া পা -া | হ্মপা -ধা পা -া | হ্মা -া গা -া I

তো ০ মা র্ প্রে ০ মে ০ আ০ ০ ঘা ত্ আ ০ ছে ০

I হ্মা -া -া না | নধা -া পা -া | হ্মা -া গা -র্সা | র্সা -া র্সা -র্রা I I I I

না ০ ই কো অ ০ ব ০ হে ০ লা ০ ন য়্ "ন য়্"

উপরিউক্ত আভোগের অংশটুকু এই গানের অন্তরার শেষাংশের সুরের সঙ্গে কোথাও কোনো মিল রেখে চলেনি– এই ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের গানে বিরল। ফলে, ইমন-প্রভাবিত এই গানটি স্বতন্ত্র ও তাৎপর্যপূর্ণ।

**গান–৮:** "না গো, এই যে ধুলা আমার না এ"[৩০] ॥ ৫৩ বছর বয়সে রচিত[৩১]।

এই গানের স্থায়ী অংশের সুরে পুরোপুরিই ইমন রাগের ছাপ রয়েছে। মন্দ্র সপ্তকের নিষাদ থেকে মধ্য সপ্তকের পঞ্চম পর্যন্ত স্বর বিচরণ করেছে–

I I{ সা -া গা | গো -া -া I ( সা -গা গা | গা গা -া I

না ০ গো ০ ০ এ ই যে ধু লা ০

I রা রা -া | সা -া -পা I পা -া -া | -া -া -া)} I

আ মা র্ না ০ ০ এ ০ ০ ০ ০ ০

I সগা গা -া | গা গা -া I রা রন্া -রা | রা সা -া I

তো০ মা র্ ধু লা র্ ধ রা০ র্ প রে ০

I ন্‌া ন্‌া রা | রা সা -া I ন্‌া -া রা | রা সা -রা I[৩২]

উ ড়ি য়ে যা ব ০ স ন্‌ ধা বা য়ে ০

অন্তরার শেষ দুটি শব্দ ‘তোমার পায়ে’র সুরবিন্যাসে ইমনের প্রতিবিম্ব আমরা লক্ষ করি–

I গা গা -না | ধা -া -ক্ষা I ধপা -া -া | -া -া -া I I[৩৩]

তো মা র্‌ পা ০ ০ য়ে০ ০ ০ ০ ০ ০

আভোগের ‘চরণছায়ে অংশের সুরও একই স্বরবিন্যাসে দেখতে পাওয়া যায়। এবং দুই অংশেই ইমন রাগ প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

সঞ্চারীর পুরো অংশেই ইমনের প্রভাব আমরা লক্ষ করি। তবে, ‘গেছে পড়ে’ অংশের সুরে তীব্র মধ্যমের ব্যাবহার আমাদের ইমনের আবহে প্লাবিত করে–

I পা পা -ক্ষা | ধপা -া -ক্ষা I গা -া -া | -া -া -া) I[৩৪]

গে ছে ০ প০ ০ ০ ড়ে ০ ০ ০ ০ ০

**গান–৯:** ‘এ মোহ-আবরণ’[৩৫] ॥ ২৩ বছর বয়সে রচিত[৩৬]।

এই গানের শীর্ষে রাগ ইমন এবং আড়াঠেকা তাল কথাটি লিপিবদ্ধ রয়েছে। ছন্দোবদ্ধভাবে গানটি স্বরলিপিতে লিখিত থাকলেও এটি তালছাড়া টপ্পাঙ্গের গান হিসেবে গাওয়া হয়ে থাকে। পুরো গানটিতেই ইমন রাগের চলন স্পষ্ট। প্রথম বয়সের রচনা হলেও গানটি খুবই পরিপক্ব ও বাণীর বৈভবে এবং সুরের সুষমায়। এবার, গানটির স্থায়ী অংশের কিছু স্বরবিন্যাসে টপ্পার ধরন ও ইমনের স্বরবিন্যাস লক্ষ করব–

I I [প]র্সাঃ নঃ [ধ]পা -া | -ক্ষপা -ধপধপা -ক্ষপা ক্ষগা | [গ]ক্ষা -া -রগা -ক্ষপা |

এ মো হ ০ ০০ ০০০০ ০০ আব র ০ ০০ ০০

-ধা -পক্ষা [ধ]পা -া I পনা -ধনর্সা নাঃ -ধপঃ | ক্ষপধা -নর্সা -র্রাঃ -র্সনঃ I

০ ০০ ০ ণ্‌ খু০ ০০০ লে ০০ দা০০ ০০ ০ ০ও

নর্সা -র্রর্সর্রর্সা -নধা ধনা | -র্সনর্সনা -ধপক্ষা -পা -া I I[৩৭]

দা০ ০০০০ ০ও হে০ ০০০০ ০০০ ০ ০

**দেশ-প্রভাবিত গান:**

দেশ-প্রভাবিত রবীন্দ্রসংগীত আলোচনার শুরুতে দেশ রাগের বৈশিষ্ট্য জেনে নেয়া যাক–

রাগ– দেশ

ঠাট– খাম্বাজ

জাতি– ঔরব-সম্পূর্ণ

বাদী স্বর– ঋষভ

সমবাদী স্বর– পঞ্চম

সময়– রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর

আরোহের গান্ধার এবং ধৈবত প্রয়োগ প্রায়শই হয় না এবং অবরোহে ঋষভ বক্রভাবে থাকে।

আরোহ– সা, রা মা পা, না র্সা

অবরোহ– র্সা ণা ধা পা, মা গা, রা সা

পকড়– রা, মা পা, ণা ধা পা, পা ধা পা মা, গা রা গা সা

দেশ ও সুরাট– এই দুই রাগের প্রকৃতি প্রায় একরকম হওয়াতে অনেক সময় আলাদা দুটি রাগকে একই রাগ বলে মনে হয়। কারণ, দেশ ও সুরাট সমস্বরা রাগ।

দেশ রাগের চলন– সা -া রা মা গা রা, মা গা রা গা -া, ন্া -া ন্া সা, প্া ন্া সা রা মা গা রা, রা মা পা ণা ধা পা, মা পা ধা পা মা গা রা সা

**গান–১:** 'এসো শ্যামল সুন্দর'[৩৮] ॥ ৭৬ বছর বয়সে রচিত[৩৯]।

এটি সেতারের গৎ-ভাঙা গান। স্বরলিপির শীর্ষে রাগ বা তালের উল্লেখ নেই। কিন্তু গানটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেশ রাগের চলন স্পষ্ট। কেবল স্থায়ী অংশের সুর লক্ষ করলেই আমরা আরোহণ-অবরোহণসহ দেশ রাগের আবহ পেয়ে যাই। গানের সুর পুরোপুরি গৎ-কে মেনে নির্মিত হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত প্রজ্ঞায় এই গানটিকে অনন্য করেছেন বাণী ও সুরের অপূর্ব সম্মিলনে। বর্ষার গান হিসেবে এই গানটির মতো অনন্য গান রবীন্দ্রসংগীতে বিরল। আমরা বর্ষা-মাখা গানের বাণীর বৈভব দিয়ে 'দেশ' রাগ চলতে পারে তা ভাবতেই বিস্ময় জাগে, যা এই গানে ঘটেছে। এবার এ মন্তব্যের সমর্থনে আমরা স্থায়ী অংশের সুরটি লক্ষ করি–

সা সা I I রা -া মা পা | -া র্সা -না র্রা I

এ সো শ্যা ০ ম ল ০ সু ন্ দ

I র্সা -া -া না | র্সা না র্সা -া | না র্সা না র্সা | -া র্রা র্সা র্রা I

র ০ ০ আ নো ত ব ০ তা প হ রা ০ তৃ ষা হ

I র্সা র্সা -ণা ণা | ধা -া পা -া | মা -রা রা মা | -া পা ণা ধা I

রা স ঙ্ গ সু ০ ধা ০ বি ০ র হি ০ ণী চা হি

I পা মা গা গা | -রা গা সা -া I I[৪০]

য়া আ ছে আ ০ কা শে ০

**গান–২:** 'আজি মোর দ্বারে কাহার মুখ হেরেছি'[৪১] ॥ ৩৪ বছর বয়সে রচিত[৪২]।

এই গানটি রবীন্দ্রনাথের 'ভাঙা গান' হিসেবে চিহ্নিত। অর্থাৎ, এই গানের সুরে দেশ রাগ বিচ্যুত হবার সম্ভাবনা নেই। পুরো গানটিই দেশকে মান্য করে চলেছে। স্থায়ী অংশের সুরবিন্যাস লক্ষ করা যাক–

I I $^{ধ}$পা -ধা পমা -গা | -রা -া মা পা | না -া -া -র্সা | র্সা র্সা -া I

মো ০ র০ ০ ০ ০ দ্বা রে কা ০ ০ ০ হা র ০

I র্সর্রা -ণা -া -ধা | $^{ধ}$পা -ধা পমা -গা | $^{গ}$রা -গা $^{র}$সা রা | -$^{র}$ণা -ধা র্সণধা I I[৪৩]

মু০ ০ ০ ০ খ ০ হে০ ০ রে ০ ছি আ ০ ০ জি০০

তবে, গানটির সুর লক্ষ করলে অন্তরা অংশে দেশ রাগে অব্যাবহৃত কোমল গান্ধার স্বরটি কেবল একটি বারের জন্যে অর্ধমাত্রায় ব্যাবহৃত হতে দেখা যায়। এই অর্ধমাত্রার আগত স্বরের প্রয়োগ, যা দেশ রাগে নেই, গানটির আবহকে বদলে দিয়েছে–

I I{ মা মা পা পা | না না র্সা -া | র্সা -া -মা -পা | নর্সা -র্রা র্রজ্ঞা } I[৪৪]

জা গি উ ঠে প্রা ণে গা ন্ ক ০ ০ ০ ত০ ০ যে০

**গান–৩:** "জাগ' জাগ' রে জাগ' সঙ্গীত"[৪৫] ॥ ৪৮ বছর বয়সে রচিত[৪৬]।

এটি রবীন্দ্রনাথের 'ভাঙা গান'। স্বরলিপির শীর্ষে রাগ ও তালের নাম উল্লেখ রয়েছে। রাগের নাম হিসেবে 'দেশ' চিহ্নিত থাকায় ভাঙা গানটিতে সম্পূর্ণরূপে দেশ রাগের চলন অবশ্যম্ভাবী। স্থায়ীর প্রথম চরণে দেশ-এর আরোহ-অবরোহ ক্রম শ্রবণে ধরা পড়ে–

I I{ রা -মা রা | মা -পা | না র্সা I নর্সা -র্রা র্সা | ণা -ধা | পা মগা } I[৪৭]

জা ০ গ জা ০ গ রে জা০ ০ গ স ঙ্ গী ত০

গানটির অন্তরার অংশটির সুর তারসপ্তকের মধ্যম পর্যন্ত বিস্তৃত এবং অবরোহক্রমে মধ্যসপ্তকের ঋষভে এসে ন্যাশ হয়েছে। অন্তরাটিও সর্বাংশে দেশ রাগের আবহকে উপস্থাপন করে। সুরে এটি 'ভাঙা গান' যদিও, বাণীর দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সে নির্মিত দেশ-রাগের সুরের আকর ঠিক রেখে ঈশ্বর-বন্দনার এক অভূতপূর্ব নিদর্শন হয়ে আছে। ফলে, গানটি *গীতবিতান*-এর শুরুতেই স্থান পেয়েছে। এবার অন্তরার সুরের আবহটি লক্ষ করব, যা সুরগতভাবে দেশ রাগেরই প্রতিমূর্তি–

I I{ রা -মা মা | পা -া | র্সা র্সা I র্রর্গা -র্মা র্মা | $^{র্গ}$র্মা -র্গা | র্রা র্সা I

মু ক্ ত ব ন্ ধ ন স০ প্ ত সু র্ ত ব

I ণা ধা পা | $^{প}$ধপা -া | মা গা I রা -া -া | -া -া | -া -া } I[৪৮]

ক রু ক বি০ শ্ শ বি হা ০ ০ ০ ০ ০ র্

**গান–৪:** ‘এমন দিনে তারে বলা যায়’[৪৯]॥ ২৮ বছর বয়সে রচিত[৫০]।

এই গানের স্বরলিপির শীর্ষে কোনো রাগ বা তালের উল্লেখ নেই। এটি তিন-চার ছন্দের গান। প্রথম জীবনের রচনায় এমন বিষণ্ন বাণী-সুরের মেলবন্ধন অবিশ্বাস্য। যদিও গানটি ‘প্রেম’ পর্যায়ভুক্ত, তবুও এটিকে কখনো মনে হয় বর্ষার গান, কখনো সুরের আবহে ঈশ্বরকে পাবার বাসনাই ব্যক্ত করে। গানটির রস-আস্বাদনে মিশ্র অনুভূতির সঞ্চার ঘটে। এই অনুভব কখনোই দেশ রাগকে উপস্থাপন করে না। অথচ, এর চলনে পুরোপুরিই দেশ রাগকে আমরা পাই। স্থায়ী অংশের সুর–

I I মা মা মা | গা রা গা সা I রা রমা মা | -া -া -া -গমা I

এ ম ন দি নে তা রে ব লা০ যা ০ ০ ০ ০য়্

I রা মা মা | পা পা পধা -া I ণা ধা ণা | -া -া -া -া I

এ ম ন ঘ ন ঘো০ র্ ব রি ষা ০ ০ ০ য়্

I ধা পধা মা | গমা রা গা রসা I রা গমপা মপমগা | -মা -া -া -গমগা I[৫১]

এ ম০ ন দি০ নে ম ন০ খো লা০০ যা০০০ ০ ০ ০ ০০য়্

অন্তরায় এসে দীর্ঘ এ গানের অর্ধমাত্রায় কোমল গান্ধারের ছোঁয়া পায়। আমরা জানি, কোমল গান্ধার সচরাচর দেশ রাগের বহির্ভূত একটি স্বর। ফলে, মিশ্র এক রাগের দিকে আমাদের আস্বাদনকে পৌঁছে দিতে চায়–

I [ন]র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা I নর্সা নর্সরা [র্স]র্রা | -া -া -া -জ্ঞর্রা I[৫২]

মি ছে এ জী ব নে র ক০ ল০০ র ০ ০ ০ ০ব্

কোমল গান্ধারকে অন্তরায় ওই অংশে ছুঁয়ে আবার বাকি গানে দেশেরই আবহ পাওয়া যায়। সাধারণত, দেশ রাগে তিন স্বর, চার স্বরের মুড়কি বিরল, যা এই গানে দেখতে পাওয়া যায়। ফলে, ভিন্ন কোনো রাগের আবহে এইধরনের মুড়কির ব্যাবহার আমাদেরকে ধাবিত করতে চায়।

**গান–৫:** ‘কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে’[৫৩] ॥ ৬৮ বছর বয়সে রচিত[৫৪]।

এই গানের স্বরলিপির শীর্ষে কোনো রাগ বা তালের উল্লেখ নেই। তবে, দেশ রাগের আরোহণ গানটির স্থায়ী অংশের সুর জুড়ে বিস্তৃত। গানটি বিশ্লেষণের চিন্তা মাথায় না এনে গানটিকে শুনলে তাৎক্ষণিকভাবে রাগের প্রভাবমুক্ত গান হিসেবেই মনে হয়–

I রা মা | মা পা পমা | পা -ধা | ণা -[ণ]ধা -পা I

নি বি ড় বে দ০ না ০ তে ০ ০

I পা পধা | [ধ]পা মা গা | পমা -গা | রা -গা -সা I[৫৫]

পু ল০ ক লা গে গা০ ০ য়ে ০ ০

স্থায়ীর শেষাংশের সঙ্গে অন্তরার শেষাংশ 'বাজুক ব্যথা পায়ে' এবং আভোগের শেষাংশ 'ফেলিলে একী দায়ে' খুবই কাছাকাছি স্বরবিন্যাসে নির্মিত এবং পুরোপুরি দেশ রাগেরই আবহ তৈরি করে।

গানটির অন্তরায় পুরোপুরিই দেশ রাগের আরোহ-অবরোহক্রমকে বজায় রেখে বিন্যস্ত সুর পাওয়া যায়–

II মা পা | পা পনা না | না -া | না -া -া I

তো মা র অ০ ভি সা ০ রে ০ ০

I পা না | না র্সা র্রা | র্সনা -া | র্সা -া -া I

যা ব অ গ ম পা ০ রে ০ ০

I না র্রা | র্রর্সা ণা ণা | ণা -ধা | র্সণা -ধা -পা I[৫৬]

চ লি তে প থে প ০ থে০ ০ ০

**গান–৬:** 'এই শ্রাবণবেলা বাদলঝরা'[৫৭] ॥ ৬২ বছর বয়সে রচিত[৫৮]।

এই গানের স্বরলিপির শীর্ষে কোনো রাগ বা তালের উল্লেখ নেই। অথচ, অশ্চর্যরকমভাবে গানটির প্রথম চরণেই দেশ রাগের চলনের আরেহ-অবরোহ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়–

সা -া II রা মা মা | পা -র্সা -নর্সা I র্সর্রা -ণা -া | -া -ধা -পা I

এ ই শ্রা ব ণ বে ০ ০০ লা০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা ধা পা | মগা রা -া I[৫৯]

বা দ ল ঝ০ রা ০

গানের অন্তরা অংশের প্রথম চরণের অর্ধেকাংশে এবং আভোগের প্রথম চরণের অর্ধেকাংশে কোমল গান্ধার স্বরটি দীর্ঘ স্থায়িত্বে চার মাত্রা জুড়ে বিরাজ করতে দেখা যায়। যা দেশ রাগের বাইরে শ্রোতাদের নিয়ে যেতে চায়। আবার, অন্তরার দ্বিতীয় চরণটির সুরে দেশের চলন এতই প্রকট যে, পূর্ববর্তী কোমল গান্ধারের ব্যাবহারটির কথা আমাদেরকে ভুলিয়ে দেয়–

না র্সা I র্সর্রা -া -ণা | ণা -া -া I ণর্সা র্সণা -া | ণর্সা র্সণা -া I

যে ন তা০ ০ ০ রে ০ ০ চি০ নি ০ চি০ নি ০

I ণর্সা ণা -া | ধা ণা -া I ধর্সা র্সণা -া | ধা পা -া I

ঘ ন ০ ব নে র্ কো০ নে ০ কো নে ০

I পধা পা -া | মা মা -গা I রা -পা মা | [ম]গা রসা -া I I[৬০]

ফে০ লে ০ ছা য়া র্ ঘো ম্ টা প রা০ ০

গীতবিতানের বর্ষাপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত গান হওয়া সত্ত্বেও এটিকে প্রেমের গান হিসেবে আমাদেরকে কখনো-বা চকিত করে। সুরের মধ্যে দেশ রাগের বেদনা আর বাণীর বৈভবে আকুতি এই প্রেমবোধের সঞ্চার করতে সাহায্য করে।

**গান–৭:** ‘তুমি ছেড়ে ছিলে, ভুলে ছিলে ব’লে’[৬১] ॥ ২৩ বছর বয়সে রচিত[৬২]।

গানের স্বরলিপির শীর্ষে রাগ দেশ এবং একতালের নির্দেশনা রয়েছে। প্রথম বয়সের গান হিসেবে বাণী ততটা পরিণতি পায়নি, সুর যতটা সমৃদ্ধি লাভ করেছে। ঈশ্বর বন্দনার গান হিসেবে বাণীর ওজস্বিতা লক্ষ করা যায়নি, তবে সুরের গাম্ভীর্য রয়েছে এই গানে। স্থায়ী অংশের পুরোটাতেই দেশ রাগের চলন আমরা লক্ষ করি–

I I [র]মা রা মা | পা না র্সা | নর্সা নর্সর্রা র্সর্রা | [র্স]ণধা [প]ধা পা I

তু মি ছে ড়ে ছি লে ভুলে ০০০ ছি০ লে০ ব লে

I [র]মা রা মা | পধা ধণর্সা ণধা | পধপা -মপা মগা | রগরসা -রা -া I[৬৩]

হে রো গো কী০ দ০০ শা০ হ০০ ০০ য়ে০ ছে০০০ ০ ০

কিন্তু অন্তরা অংশের প্রথম চরণের শেষের ‘বেদনা’র ‘না’ ধ্বনিতে কোমল গান্ধারকে ছুঁয়ে যাওয়া সুরকে মহিমান্বিত করেছে–

I I [প]না না না | { -া না নর্সা | র্সা নর্সর্রা র্সা | [র্স]না র্সা -া I

বি র হী র্ বে শে০ এ সে০০ ছি হে থা য়

I নর্সর্রা র্সা ণা | ধণা পধা মপা | মপা - নর্সা -র্রর্রা | ( র্রা -র্সর্রর্জ্ঞা -র্রর্জ্ঞর্মা I

জা০০ না তে বি০ র০ হ০ বে০ ০০ ০দ না ০০০ ০০০

I র্রা র্সা [র্স]র্রনা)} |[৬৪]

বি র হী০

**গান–৮:** ‘আজ তালের বনের করতালি’[৬৫] ॥ ৬১ বছর বয়সে রচিত[৬৬]।

দেশ রাগে আচ্ছাদিত এই গানের স্বরলিপির শীর্ষে কোনো রাগ বা তালের নাম দেখা যায় না। দেশ রাগের চলনের যে ভারী ব্যাপারটি অন্যান্য গানে লক্ষ করা যায়, তা এই গানে অনুপস্থিত। তালের বনের যে চেতনতার স্বরূপ এই গানে উন্মোচিত রয়েছে তা সুরে-স্বরে চেনা ‘দেশ’-এর ভিন্নতর রূপে আমাদেরকে পৌঁছে দেয়। এবার, গানের স্থায়ী অংশের সুর লক্ষ করা যাক–

সা -া I I{ রা -মরা মা মা | পা -া না র্সা I না র্রা [র্]র্সা -ণধা | পা -ধা পা -া I

আ জ্ তা ০০ লে র ব ০ নে র ক ০ র ০০ তা ০ লি ০

I( পা -ধা [ধ]পা মগা | [গ]রা -গা [গ]রা -া I রা -পা [প]মা -গা | রগা -া রসা -া)}I[৬৭]

কি ০ সে র০ তা ০ লে ০ তা ০ লে ০ তা০ ০ লে০ ০

অন্তরা ও আভোগ অংশের পুরোটাতেই দেশ রাগের চলন বিছিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ, নৃত্যপর এই গানের পুরো অংশই দেশ রাগে আবিষ্ট, অথচ গানের স্বরলিপির শীর্ষে তার কোনো নিশানা নেই। অন্তরা অংশটি লক্ষ করব–

সা I I{রা -া রা -া | রা -া রা -গা I মা -া -গধা ধপা | [প]মা -া মা -গা I

ওর্ খু ০ শি র্ সা ০ থে ০ কো ০ ০ন্ খু০ শি র্ আ জ্

I [গ]রা -া রা গা | রা -া রপা -া I -া -া -া -া | -া -া পা -া I [৬৮]

মে ০ লা ০ মে ০ শা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কো ন্

**গান–৯:** ‘কাঁপিছে দেহলতা থরথর’[৬৯] ॥ ৫৬ বছর বয়সে রচিত[৭০]।

গানের স্বরলিপি অংশে রাগ-তালের কোনোরকম উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেবল দুই মাত্রা জুড়ে কোমল গান্ধারের ব্যাবহার দেখতে পাওয়া যায়, যা দেশ রাগে বিরল। এ ছাড়া পুরো গানেই দেশ রাগের চলন মেনে চলেছে। ছন্দকে প্রাধান্য দিয়ে গানটিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবু, গানের বাণী ও ছন্দের বিশেষত্বকে ছাপিয়ে দেশ রাগের সুরটিই প্রধান হয়ে উঠেছে যা অন্তরার সুরে সবচে স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়–

I I মা পা পা | [প]না না না [র্স]না I ধনা ধর্সা [র্স]না র্সা I

দো দু ল ত মা লে রি ব০ ন০ ছা য়ে

I [র্স]র্রা র্সা ণা | [ণ]ধা পা মগা মা I পা [প]র্রা র্রা র্রা I

তো মা রি নী ল বা০ সে নি ল কা য়া

I [র্র]র্মা র্জ্ঞা র্রা | র্সা না র্সা র্সা I [র্স]র্রা র্সা [র্স]র্রা ণা I

বা দ ল নি শী থে রি ঝ র ঝ র

I [ণ]র্সা ণা ধা | পা পা [প]ধপা মা I [ম]ধা পা মগা রা I I[৭১]

তো মা রি আঁ খি প০ রে ভ র ভ০ র

এই গানের বাণীর ছন্দোবিন্যাস তাঁর সুরের ছন্দোবিন্যাসকে প্রভাবিত করেছে। ফলে, রাগরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে স্বরের যে স্বাধীন চলন তাতে এক নান্দনিক শাসন[২] তৈরি করেছে রবীন্দ্রনাথের এই গান। এই অনুশাসনের মধ্য দিয়েই বেরিয়ে এসেছে দেশ রাগের অপূর্ব স্বরূপ।

**উপসংহার**

রবীন্দ্রনাথের গানের সুর-বিবেচনার মধ্য দিয়ে এই ফল পাওয়া গেল যে, ইমন ও দেশ রাগের ব্যাবহার রবীন্দ্রসংগীতকে বিশিষ্ট করেছে। স্বাধীন ব্যাবহারের বাইরেও শাস্ত্রীয় সংগীতের কিছু বন্দিশ ভেঙে তিনি ইমন-প্রবাবিত গান রচনা করেছেন। ইমন রাগ কল্যাণ ঠাটের আশ্রয়-রাগ হওয়ায় অনেক সময় ইমনের অবরোহণের চলন শুনলে ভূপালি বলে বিভ্রম হয়, যেমনটি দেশ রাগ ও সুরাট রাগ সমস্বরা হওয়ায় একই রাগ বলে বিভ্রম তৈরি করে। অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ করলে দেখা যায়, এদের ব্যাবহৃত স্বর এক হলেও চলন-ভিন্নতা লক্ষ করলে, বাদী ও সমবাদী স্বরের পার্থক্যে রাগসমূহকে অনায়াসে আলাদা করা যায়। ইমন রাগ বহুল গীত ও প্রচলিত। দেশ রাগটিও তাই। অন্যদিকে, ভূপালি বা সুরাট অপেক্ষাকৃত লঘু প্রকৃতির রাগ। রবীন্দ্রনাথের গানে লক্ষ করা যায়– অনেক সময় ইমনের সঙ্গে 'ইমন কল্যাণ' কখনো-বা 'ভূপালি' কখনো-বা 'শ্রী' মাখামাখি হয়ে আছে। একইরকমভাবে, রবীন্দ্রসংগীতের দেশ-রাগ প্রভাবিত গানে 'সুরাট' ও 'তিলক-কামোদ' রাগ মিশ্রিত হয়ে আছে।

রবীন্দ্রসংগীতের সুর-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এই অনুসন্ধানে দেখা গেল– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইমন ও দেশ রাগের ব্যাবহার তাঁর অনেক গানে সফলভাবে করেছেন। রাগের চলন ঠিক রেখে কখনো কখনো বিবাদী স্বর বা বর্জিত স্বর ব্যাবহার করেও ইমন বা দেশ রাগের ঢংকে তিনি পরিত্যাগ করেননি। শাস্ত্রীয় সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা তাঁর সাংগীতিক বোধকে উস্‌কে দিয়েছে অভিনব স্বকীয় সৃজনের দিকে। 'দেশ' ও 'ইমন' রাগে তাঁর নির্ভরতাকে কখনো-বা ছাপিয়ে গেছে তাঁর গানের বাণীর সামর্থ্য, এবং সেইসব রাগের এক অনন্য নির্যাস তাঁর গানকে স্বমহিমায় উজ্জ্বল করেছে। গানগুলোর রচনাকাল বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তেও আসা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম জীবনের গানের স্বরলিপির শীর্ষে বিভিন্ন রাগের নাম লিখে রেখে গেলেও পরিণত বয়সে রচিত গানের স্বরলিপিতে কোনো রাগের উল্লেখ করেননি– অথচ সেই সরস গানগুলিতে রাগের স্পষ্ট প্রভাব আমরা লক্ষ করেছি। আর, এভাবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে শাস্ত্রীয় সংগীতের 'জাত'কে নয়, 'প্রাণ'কে ব্যাবহার করে রবীন্দ্রসংগীতকে স্বকীয় করে তুলেছেন।

[২] যেহেতু, বাণীর ছন্দোকাঠামোকে 'বাধা' বা 'প্রতিবন্ধকতা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি, তাই একে সদর্থক 'নান্দনিক শাসন' বলা হয়েছে। যা এই গানকে শিল্পিত করেছে।

## তথ্যনির্দেশ


১. বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতি প্রথম খণ্ড (কলকাতাঃ দীপায়ন, ২০১৪), পৃ. ৫২

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৮০), পৃ. ১৬৩

৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *গীতবিতান কালানুক্রমিক সুচী* (কলকাতাঃ টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৪১০), পৃ. ৪২

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান চতুর্থ খণ্ড* (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৮), পৃ. ৫৬

৫. তদেব, পৃ. ৫৬

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ফাল্গুনী* (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৯), পৃ. ৮৪

৯. তদেব, পৃ. ৮৫

১০. তদেব, পৃ. ৮৫

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১০

১২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা* (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৪৫), পৃ. ৪৩

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬০

১৫. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান ঊনষষ্টিতম খণ্ড* (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭১), পৃ. ২৬

১৭. তদেব, পৃ. ২৭

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭

১৯. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান চত্বারিংশ খণ্ড* (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৯), পৃ. ৩১

২১. তদেব, পৃ. ৩২

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

২৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান চত্বারিংশ খণ্ড* (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৯), পৃ. ৫৬

২৫. তদেব, পৃ. ৫৭

২৬. তদেব, পৃ. ৫৭

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

২৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান চত্বারিংশ খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯
৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৩
৩১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯
৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান ত্রয়শ্চত্বারিংশ খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৭), পৃ. ৪৭
৩৩. তদেব, পৃ. ৪৮
৩৪. তদেব, পৃ. ৪৮
৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২
৩৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান অষ্টম খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৮০), পৃ. ১১
৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৭
৩৯. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮
৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান চতুঃপঞ্চাশত্তম খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৭), পৃ. ১৬
৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯৩
৪২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান পঞ্চত্রিংশ খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৮০), পৃ. ৫
৪৪. তদেব, পৃ. ৫
৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪
৪৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪
৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান ষট্‌ত্রিংশ খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৭), পৃ. ৪৩
৪৮. তদেব, পৃ. ৪৩
৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭০
৫০. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩
৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কেতকী* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৯), পৃ. ৩৪
৫২. তদেব, পৃ. ৩৫
৫৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩২
৫৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪
৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান দ্বিতীয় খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৭), পৃ. ১৪৬
৫৬. তদেব, পৃ. ১৪৭
৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৫
৫৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২

৫৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতমালিক প্রথম খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৬), পৃ. ৪২

৬০. তদেব, পৃ. ৪২

৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩

৬২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান অষ্টম খণ্ড*, পূর্বোক্ত পৃ. ৩৯

৬৪. তদেব, পৃ. ৩৯

৬৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯

৬৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯

৬৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নবগীতিকা প্রথম খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৬), পৃ. ১২

৬৮. তদেব, পৃ. ১৩

৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪২

৭০. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২

৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতপঞ্চাশিকা* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৭), পৃ. ৬৩

---

জমা প্রদানের তারিখ : ২৭.০২.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ২২.০৫.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-১, জানুয়ারি–জুন ২০২২

# মারমা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন

ফাতেমা-তুজ-জোহরা*

**Abstract**

This paper tries to illustrates the cultural varieties of Marma ethnic group of Chittagong Hill Tract (CHT) and also analyzes the cultural change of them. Like other ethnic group of CHT Marma's have had various cultural aspects which is also an important part of their unique identity. Most of their cultural custom and ritual are being unchanged, but in some cases, it is changing day by day. It is needed to discover the reason and impact of this cultural change to understand the future of the Marma's distinctive culture. This research tries to understand the nature and reason of this cultural change. To complete this research, we collect data from questionnaire and focus group discussion (FGD) as primary source. We also collect information from various books, journals and weblink as secondary sources. After analyzed the collected data this research is completed by the qualitative research method.

## ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি জনবৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। বাঙালি ছাড়াও এদেশে রয়েছে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। এসব নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর রয়েছে বৈচিত্র্যময় জীবনধারা ও সংস্কৃতি। বাংলাদেশে যেসব নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী রয়েছে তার মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে মারমা হলো দ্বিতীয়। নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে এই জনগোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে আসছে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায়। তবে তাদের আদি নিবাস ছিল মিয়ানমারের হাইসাওয়াদী রাজ্যের অন্তর্গত পেগু নগরীতে।[১] বাংলাদেশে এরা আগমন করে সপ্তদশ শতাব্দিতে। ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান ও হাইসাওয়াদির মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হাইসাওয়াদি পরাজিত হয়। ফলে পেগুর অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজকুমার মং চ প্যাই ৩৩,০০০ সৈন্য ও অনুসারীসহ আরাকান সম্রাটের অধীনতা মেনে নেন এবং পরবর্তী সময়ে স্বীয় দক্ষতা দেখিয়ে আরাকান সম্রাট মাং খ মং-কে সন্তুষ্ট করেন। এ কারণে আরাকান সম্রাট মং চ প্যাইকে ১৬১৪ সালে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং ১৬২০ সালে 'বোমাং' উপাধিতে ভূষিত করেন– যার অর্থ হচ্ছে প্রধান সেনাপতি। মং চ প্যাই এর অনুসারীরাই মারমাদের পূর্বপুরুষ।[২] এরপর বিভিন্ন সময়ে মারমাদের বিভিন্ন গোত্র চট্টগ্রাম অঞ্চলের তিনটি জেলায় বসতি স্থাপন করে। এদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন-যাপনের প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে তাদের রয়েছে বৈচিত্র্যময় উৎসব ও আনুষ্ঠানিকতা– যা তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির অংশ। মারমাসহ অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সম্পর্কে সঞ্জীব দ্রং বলেন, তারা "তাদের ভিন্ন ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক। তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ভূমি ও প্রকৃতির সঙ্গে তাদের বিশেষ সম্পর্ক।"[৩] আসাদুজ্জামান আসাদ তাঁর ২০১১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে বলেছেন, "বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চেতনা ও জীবনবোধগত বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। শত শত বছর ধরে পাশাপাশি অবস্থান করেও তাদের নিজেদের সংস্কৃতি ও জীবনচেতনার

*সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

উল্লেখযোগ্য কোনো সমন্বয় ঘটেনি। কারণ, এই পার্বত্য ও আরণ্য জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কিছুটা উগ্রধরনের স্বাতন্ত্র্যবাদী।"[৪] গবেষকের এই বক্তব্য অনুযায়ী মারমাসহ বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের ফলে কিংবা নতুন প্রযুক্তি ও প্রতিবেশ সৃষ্টি হওয়ার কারণে মারমা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতেও এসেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। পূর্ববর্তী গবেষণাগুলোতে মারমা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও সময়ের সঙ্গে সংস্কৃতির পরিবর্তনকে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাই মারমা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে বিশ্লেষণের সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকেও উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

## গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা মারমাদের সংস্কৃতি অনেক সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাঙালির যেসব রীতি-নীতি, বিশ্বাস, সংস্কার, অভ্যাস, উৎসব, আনুষ্ঠানিকতা দেখা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি ও বিচিত্র সাংস্কৃতিক পরিসর রয়েছে মারমাদের। এই বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি তাদের স্বতন্ত্র জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় গড়ার অন্যতম উপাদান। কিন্তু কালের পরিক্রমায় তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতিতে এসেছে কিছু পরিবর্তন। মারমা জাতিসত্তার বর্তমান সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করে আমরা তাদের সংস্কৃতিতেও কিছুটা পরিবর্তন দেখতে পেয়েছি। মানুষের জীবন-যাপন পদ্ধতিতে যখন পরিবর্তন আসে, তখন সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসা অস্বাভাবিক নয়। তবে সংস্কৃতির এই পরিবর্তন কখনো স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্যভাবে ঘটে, কখনো-বা পরিবর্তিত হয় বাহ্যিক শক্তির চাপে। বাহ্যিক প্রভাবে সংস্কৃতির যে পরিবর্তন তা অনিবার্য নয়, বরং বাহ্যিক প্রভাব পরিহার করলে তা নিবারণযোগ্য। মারমাদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন কতটুকু পরিসর জুড়ে হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে, পরিবর্তনগুলো স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে নাকি বাহ্যিক প্রভাব কিংবা চাপে হচ্ছে– তা অনুধাবন করা আমাদের কাছে জরুরি বলে মনে হয়। এই উদ্দেশকে সামনে রেখে আমাদের প্রবন্ধে মারমাদের প্রাতিস্বিক সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তনের স্বরূপ, কারণ ও প্রভাবকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বিষয়গুলো বোঝা সম্ভব হলে মারমাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও জানা যাবে। ফলে মারমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি ও পরিসরকে চিহ্নিত করে তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রক্ষায় করণীয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। কিন্তু পূর্বে এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা হয়নি। তাই মারমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করা আমাদের কাছে যৌক্তিক বলে মনে হয়।

## গবেষণা-পদ্ধতি

এই গবেষণাটি সম্পন্ন করতে আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ২৮ জন মারমা শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে প্রশ্নপত্র পদ্ধতি (Questionnaire Method)। এখানে কাঠামোগত প্রশ্নপত্র (Structured Questionnaire) ব্যবহার করা হয়েছে। মুক্ত (Open-ended) ও আবদ্ধ (Closed-ended)– এই দুই ধরনের প্রশ্নের সাহায্যেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ১৪ জন মারমা শিক্ষার্থীদেরকে ৭ জন করে দুটি দলে ভাগ করে দুটি ফোকাস দলীয় আলোচনা (FGD) করা হয়েছে। ফোকাস দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ও উত্তরদাতা শিক্ষার্থীদের বাড়ি পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার বিভিন্ন গ্রামে। ফলে তাদের কাছে পাওয়া তথ্যগুলোকে আমরা প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার

করেছি। এছাড়া দেশে-বিদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পত্রিকা ও ওয়েবসাইটে পাওয়া তথ্যকে আমরা মাধ্যমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছি। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে গুণগত পদ্ধতিতে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে।

**প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা**

মারমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের স্বরূপকে অনুধাবন করার জন্য এবং তাকে একটি তাত্ত্বিক ভিত্তিতে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে আমরা প্রাসঙ্গিক কিছু সাহিত্য পর্যালোচনা করেছি। উল্লেখ্য যে, শুধু মারমাদের সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতিকে উপজীব্য করে রচিত গ্রন্থ খুবই অপ্রতুল। তবে মারমাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতিকে উপজীব্য করে বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব বিষয়ে গবেষণাগ্রন্থ রচনা শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক কালে। এই গবেষণা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের পরও চলমান রয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রথম প্রশাসক ক্যাপ্টেন টি.এইচ.লুইন-এর *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein* এসব গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম।[৫] পার্বত্য অঞ্চলের প্রশাসক ছিলেন বলেই তিনি এই অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনকে পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছেন। মূলত ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, সাংস্কৃতিক জীবন, প্রাকৃতিক সম্পদ প্রভৃতির বিবরণ বইটিতে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। তবে লুইন ঔপনিবেশিক প্রশাসক ছিলেন বলেই হয়তো তার চিন্তায় "জ্ঞানের রাজনীতি ও পশ্চিমা কলোনি বিস্তারে এথনোগ্রাফিক-বিবরণের যে আধিপত্যবাদি সম্পর্ক তার নমুণা পাওয়া যায়"[৬]। গ্রন্থটিতে মারমাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির পরিবর্তনকে আলাদা করে দেখানো হয়নি। Mizanur Rahman Shelley Zuvi *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: The Untold Story* গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাসমূহের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক জীবনকে বিবৃত করেছেন।[৭] ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক রেগুলেশনসহ বিভিন্ন সময়ে সরকারের গৃহীত নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই গ্রন্থে। মাধ্যমিক উৎসনির্ভর ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে সম্পন্ন এই গবেষণাগ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের প্রান্তিকরণের নানা মাত্রা উঠে আসলেও তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের চিত্র বিশদভাবে বর্ণিত হয়নি। Amena Mohsin Zuvi *The Politics of Nationalism: The Case of the Chittagong Hill Tracts Bangladesh* গ্রন্থে ঔপনিবেশিক শাসনকাল থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতির সঙ্গে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির যোগসূত্রকে বিশ্লেষণ করেছেন।[৮] বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রেক্ষাপটে পাহাড়ি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্থানকে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও, মারমাদের সাংস্কৃতিক পরিসর ও পরিবর্তনকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। Schendal, Mey I Dewan তাঁদের *The Chittagong Hill Tracts: Living in a Borderland* গ্রন্থে ব্রিটিশ আমল থেকে বাংলাদেশের শাসনামল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উন্নয়নের আড়ালে পাহাড় ও প্রকৃতির বিনষ্টিকে বিশ্লেষণ করেছেন।[৯] তারা দেখিয়েছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে সেসব স্থানের জল বিদ্যুৎ, কাঠ, বাঁশ, রাবার, তেল ইত্যাদি সম্পদের সম্পর্ক রয়েছে। ফলে পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী নৃগোষ্ঠীদের জন্য উপকারী হিসেবে প্রচারিত

এসব উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় তাদেরকে সরাসরি যুক্ত করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীদের নানান ধরনের ছবি সংযোজন গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণীয় দিক। বিভিন্ন ফটোগ্রাফারের তোলা প্রায় চারশটিরও বেশি অপ্রকাশিত ছবি প্রকাশের ফলে নিঃসন্দেহে গ্রন্থটি একটি ভিন্নমাত্রা পেয়েছে।

রাহমান নাসির উদ্দিন তাঁর *জ্ঞানকাণ্ডের কাণ্ডজ্ঞান: আদিবাসী, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপস্থাপনার রাজনীতি* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ঔপনিবেশিক চিন্তনপ্রক্রিয়া ও উপস্থাপনের রাজনীতির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিসত্তা বাঙালিদের কাছে ভুলভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে।[১০] প্রথাগত জ্ঞানকাণ্ডে ও পুঁজিবাদী মিডিয়ায় 'জ্ঞানের রাজনীতি', 'জাতীয়তাবাদের রাজনীতি', 'উপস্থাপনার বাঙালি মনস্তত্ত্ব'– এরকম বহুমাত্রিক কারণে তাদের পরিচয়, সংস্কৃতি, ভাষা, জুমচাষ, নারী, রাজনীতির পক্ষপাতদুষ্ট ব্যাখ্যা তৈরি হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। তাত্ত্বিক আলোচনা ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখক এই গ্রন্থে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের 'আদিবাসী'দের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করলেও তাদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিষয়টি প্রাধান্য পায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম চাষের স্বরূপ, সরকারের বিভিন্ন জুমচাষবিরোধী নীতির কারণে জুমচাষীদের প্রান্তিকীকরণ, জুমচাষ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন দাতা সংস্থার ভূমিকা, জুমচাষ সম্পর্কে বাঙালি ও পাহাড়িদেরর দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে প্রশান্ত ত্রিপুরা ও অবন্তী হারুনের লেখা *পার্বত্য চট্টগ্রামে জুমচাষ* গ্রন্থে।[১১] গ্রন্থটিতে জুমচাষের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রত্যয়ের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও গ্রন্থটিতে সংযুক্ত হয়েছে। সাক্ষাৎকার, ফোকাস দলীয় আলোচনা, তুলনামূলক পদ্ধতি, বিশ্লেষণ– প্রভৃতি পদ্ধতির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে গবেষণাগ্রন্থটি। মংসানু চৌধুরী ও উ ক্য জেনের লেখা *মারমা: ইতিহাস ও সংস্কৃতি* গ্রন্থটিতে মারমাদের নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে; একই সঙ্গে তাদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়েছে। পরিমাণে কম হলেও গ্রন্থটিতে মারমাদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।[১২] তবে মারমা সংস্কৃতির পরিবর্তন সম্পর্কে এই গ্রন্থ থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া গেলেও সামগ্রিক পরিবর্তন সম্পর্কে জানা যায় না।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে আমরা লক্ষ করি, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রান্তিকীকরণ, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতি, নৃতাত্ত্বিক জাতিসমূহের ওপর সরকারের বিভিন্ন নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হলেও মারমা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনকে এসব গ্রন্থ ধারণ করতে পারেনি। *মারমা: ইতিহাস ও সংস্কৃতি*র মতো কোনো কোনো গ্রন্থে মারমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তবে মারমা জাতিসত্তার সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের স্বরূপ ও প্রভাব এসব গ্রন্থে উঠে আসেনি। তাই তাদের সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিবর্তনের স্বরূপ ও প্রভাবকে আমাদের গবেষণায় বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

## তাত্ত্বিক কাঠামো

কোনো গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ তার তাত্ত্বিক কাঠামো। এই গবেষণাটিকে সম্পন্ন করতে আমরা একাধিক তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তা নিয়েছি। কোনো একটি দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা মারমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের সামগ্রিকতাকে বুঝা সম্ভব না হলেও সবগুলো তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুধাবন করা সহজ হবে। বাংলাদেশে বসবাসকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মতো মারমারাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের কাছে পাহাড়ি, উপজাতি, আদিবাসী, ক্ষুদ্র

নৃগোষ্ঠী ইত্যাদি পরিচয়ে পরিচিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় তাদের জাতিগত পরিচয় নিয়ে নানা বিতর্ক হলেও ইংরেজিতে তাদেরকে Ethnic Group হিসেবে অভিহিত করা হয়। *SAGE dictionary of cultural studies* অনুযায়ী Ethnicity হলঃ "A term that suggests cultural boundary formation between groups of people who have been discursively constructed as sharing values, norms, practices, symbols and artefacts and are seen as such by themselves and others."[১৩] সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারের চিন্তায় এথনিসিটি হলো, "as the belief of social actors in common descent based on racial and cultural differences, among other factors."[১৪] তিনি এথনিক গ্রুপকে রাজনৈতিক গোষ্ঠী, জ্ঞাতিগোষ্ঠী ইত্যাদির মতোই একটি বিশ্বজনীন গোষ্ঠী হিসেবে দেখেছেন। 'এথনিক বাউন্ডারি'র ধারণাকে বিবৃত ও ব্যাখ্যা করে সমাজবিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন ফ্রেডরিক বার্থ (১৯৬৯)।[১৫] তিনি দেখিয়েছেন যে, শুধু সাংস্কৃতিক ভিন্নতার ওপর এথনিক গোষ্ঠীর স্বকীয়তা নির্ভর করে না, বরং এথনিক গ্রুপগুলোর মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের স্বাতন্ত্র্যকে উদ্ঘাটন করা যায়। তাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সীমানাকে চিহ্নিত করা সম্ভব এই মিথস্ক্রিয়ার ফলেই। এথনিক গোষ্ঠীগুলো কট্টরভাবে তাদের প্রতিবেশি জাতিগোষ্ঠীকে এড়িয়ে গিয়ে কিংবা না মিশে তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করে– এথনিক বাউন্ডারি সম্পর্কে এরকম একটি সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে। অর্থাৎ অন্য জাতি থেকে ভৌগোলিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখার কারণে তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও স্বকীয়তা বজায় থাকে। বার্থ এথনিক বাউন্ডারি সম্পর্কে এই প্রচলিত ও জনপ্রিয় ধারণাটিকে খণ্ডন করেছেন। যদিও তিনি স্বীকার করেছেন যে, এথনিক গ্রুপ তাদের সীমানায় অন্য লোকের আনাগোনাকে অপছন্দ করে; কিন্তু এই অপছন্দের কারণে অন্য জাতিসত্তার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বিঘ্নিত হয় না বলেই তিনি মনে করেন। বার্থ দেখিয়েছেন যে, এথনিক গোষ্ঠীর জাতিগত স্বাতন্ত্র্য তাদের সঙ্গে অন্য জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে না; বরং অন্যান্য জাতিসত্তার সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়ার সময় যে 'আমাদের' ও 'তাদের' দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়, তাই জাতিসত্তার সীমানাকে নির্ধারিত করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু তাদের ভৌগোলিক সীমানার ওপর নির্ভর করে না। এটি নির্ভর করে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের ওপর। বার্থের ধারণা মারমাদের এথনিক বাউন্ডারিকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশে মারমারা বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা– বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে। এই তিনটি জেলায় অন্যান্য জাতিসত্তাও বাস করে। বান্দরবান জেলার মারমারা বান্দরবানের অন্যান্য জাতিসত্তার সঙ্গে নয়, বরং রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে বসবাসরত মারমা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে একাত্ম বোধ করে বলে, ভৌগোলিক দূরত্ব তাদের এথনিক বাউন্ডারিতে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। এজন্যই বার্থ বলেছেন : "the boundaries to which we must give our attention are of course social boundaries, though they may have territorial counterparts"[১৬]

মারমাদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে আমরা আত্মীকরণ তত্ত্ব (Assimilation Theory) দ্বারাও বুঝে নিতে পারি। আত্মীকরণ সম্পর্কে Robert E Park এবং Earnest W Burgess বলেনঃ

Assimilation is a process of interpenetration and fusion in which persons and group acquire the memories, sentiments, and attitudes of other persons or

groups, and, by sharing their experience and history, are incorporated with them in a common cultural life.[১৭]

১৯৬৪ সালে প্রকাশিত *Assimilation in American Life* সালে গ্রন্থে গর্ডন আমেরিকার সামাজিক প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতির আত্মীকরণের তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করেন।[১৮] তিনি আত্মীকরণ কেন হয়, কীভাবে হয়, আত্মীকরণের বিভিন্ন ডাইমেনশন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি Cultural Pluralism এবং Melting Pot তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। মারমাদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে বোঝার জন্য আমরা আত্তীকরণ তত্ত্বের সহায়তা নিতে পারি। বাঙালি সেটেলারদের সংস্পর্শে আসার কারণে, কিংবা শিক্ষাগ্রহণ ও অন্যান্য কারণে বাঙালির সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার কারণে দুই সংস্কৃতির মিশ্রণে কোনো কমন সংস্কৃতি সৃষ্টি হচ্ছে কিনা, কিংবা ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেও তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকছে কি না– এই তত্ত্বের সাহায্যে আমরা তা যাচাই করে দেখতে পারি।

সমাজতত্ত্বের তিনটি প্রধান তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েও মারমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনকে বোঝা সম্ভব। এগুলো হলঃ ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (Functionalism), দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি (Conflict Theory) ও প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (Symbolic Interactionism)। ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয়, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন মানবদেহের ভারসাম্য রক্ষা করে, তেমনি সমাজের বিভিন্ন অংশ এর স্থিতিশীলতা রক্ষায় ভূমিকা পালন করে। সংস্কৃতিও সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে কোনো সমাজকে টিকিয়ে রাখে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বলা যায়, সংস্কৃতির মতো সামাজিক উপাদানের ক্রিয়ার (Function) সঙ্গে কিছু অপক্রিয়াও (Dysfunction) আছে। পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালি সেটেলারদের বসতি স্থাপন, অবকাঠামো ও পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, ইন্টারনেট ও প্রিন্টমিডিয়ার প্রভাব, আকাশসংস্কৃতির প্রসার– ইত্যাদি কারণে মারমাদের সংস্কৃতির যেসব উপাদান বাঙালি সংস্কৃতির মতো হয়ে যাচ্ছে, তা সংখ্যাগুরু বাঙালির জন্য ফাংশন হিসেবে কাজ করলেও, সংখ্যালঘু মারমাদের জন্য ডিসফাংশন হিসেবে কাজ করে। যেমনঃ সংখ্যাগুরু বাঙালিদের সুবিধার্থে মারমা ভাষায় পরিচিত হওয়া অনেক স্থানের নাম বদলে গিয়ে বাংলা ভাষায় নামকরণ হচ্ছে। পর্যটন কেন্দ্রের প্রসারের ফলে কোনো-কোনো স্থানে তাদের বসবাসের জায়গা থেকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে– যা তাদের জন্য ডিসফাংশনাল কিন্তু পর্যটক বাঙালিদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে ফাংশনাল।

মানুষের সুযোগ-সুবিধার অসমতার ভিত্তি করে সমাজে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তাকেই ব্যাখ্যা করে। সেটেলার বাঙালিদের বসতি স্থাপনের ফলে পাহাড়ের চাষযোগ্য ভূমি কমে যাওয়ায় কিংবা বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার কারণে বাসস্থান ও পাহাড়ি ভূমি হতে অধিকার হারানোর ফলে তাদের মাঝে সৃষ্টি হওয়া ক্ষোভকে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বলা যায়, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী তাদের জাতিগত ভিন্নতার কারণে নিজেদেরকেই একটি শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করে। সংখ্যালঘু মারমাদের সঙ্গে সংখ্যাগুরু বাঙালির মিথস্ক্রিয়ার ফলে, আধিপত্যশীল সংস্কৃতির বাহক হিসেবে বাঙালিদের মধ্যে মারমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু সংস্কার সৃষ্টি হয়। দৈহিক গঠন ও জাতিগত ভিন্নতার কারণে সংখ্যাগুরু বাঙালিরা সংখ্যালঘু মারমাদেরকে আলাদা শ্রেণি হিসেবে দেখে। ফলে মারমাদের চেহারা, খ্যাদ্যাভ্যাস, ভাষা, পোশাক কিছু ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু বাঙালির কাছে হাসি-ঠাট্টা-তামাসার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার সময় তারা এই সমস্যায় সংকুচিত হয়, বিদীর্ণ হয়।

এই প্রবন্ধে Ethnic Boundary Theory, Assimilation Theory এবং সমাজতত্ত্বের তিনটি প্রধান তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি– Functionalism, Conflict Theory ও Symbolic Interactionism –এর মাধ্যমে আমরা মারমা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনকে বোঝার চেষ্টা করেছি।

## মারমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের সার্বিক জীবনাচরণ। এ বিষয়ে C. N. Shankar Rao বলেন: Culture is a very broad term that includes in itself all our walks of life, our modes of behaviour, our philosophies and ethics, our morals and manners, our customs and traditions, our religious, political, economic and other types of activities.[১৯] সংস্কৃতির এই ব্যাপকতা ও বহুবিস্তৃত সমৃদ্ধি মারমা জাতিসত্তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ কারণে সৌরভ সিকদার বলেন: "সংস্কৃতি, বিশেষ করে আদিবাসী সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনার সময় আমাদের মনে রাখা দরকার এর পরিমণ্ডল মঞ্চে নাচ-গান ও অভিনয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর থেকে অনেক ব্যাপক। মানুষের ভাষা, জ্ঞান, চিন্তা, বিশ্বাস, প্রথা, কর্মকৌশল, আচার-ব্যবহার, অধিকার, নৈতিকতা, উৎসব সবই সংস্কৃতির অঙ্গ।"[২০] বস্তুত মারমাদের জীবনযাপন পদ্ধতির প্রত্যেক স্তরে রয়েছে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির চিহ্ন। তাদের ঘর-বাড়ি, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি, শিক্ষা ও চিকিৎসাব্যবস্থা, উৎসব ও আনুষ্ঠানিকতা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, সঙ্গীত ও সাহিত্য, বিনোদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। তাদের এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের উল্লেখযোগ্য অংশ আমরা এখানে তুলে ধরব।

### *আবাসস্থল ও ঘর-বাড়িকেন্দ্রিক সংস্কৃতি*

মারমারা পূর্বমুখী ঘর তৈরি করে। এতে তাদের মঙ্গল বলে লোকবিশ্বাস আছে। এ কারণে বাড়িঘর তৈরির সময় সামনে নদী, ঝরনা, পাহাড়, খাল, গর্ত ইত্যাদির যাই থাকুক না কেন, তারা পূর্বমুখী করেই ঘর নির্মাণ করে।[২১] সাধারণত তারা বাঁশের তৈরি ঘরে থাকে। কয়েকটি খুঁটি দিয়ে ঘরচিকে উঁচু করে বানানো হয়, যাতে বন্যপ্রাণির আক্রমণ ও বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি থেকে তারা মুক্ত থাকে। ঘরের সাথে একটি মাচাং যুক্ত থাকে। বাড়ির প্রথম যে খুঁটিটি বসানো হয় তাকে তারা বলে 'আখা-তইং'। এটি বসানোর জন্য শুভদিন খুঁজে বের করতে হয়। আর রাশি-নক্ষত্র বিচার করে এই শুভ দিন খুঁজতে সহায়তা করেন গ্রামের বৈদ্য, গণক প্রমুখ। খুঁটি বসানো সময় তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ধরিত্রী-প্রহরী 'নাগে'র অবস্থান নির্ণয় করে নিতে হয়। তাদের ধারণা, ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ মাসে ঐ নাগ পূর্ব-পশ্চিম দিকে লম্বালম্বি অবস্থান নেয়। এই সময় নাগের মাথা পশ্চিমে, লেজ পূর্বে, পেট উত্তর দিকে থাকে বলে মনে করা হয়। তাই এই সময় বাড়ি-নির্মাণ করা হয়। বাড়ির প্রথম খুঁটি বসানোর আগে খুঁটির সাথে মাথা সমান উঁচুতে ছোট্ট একটা ধনুকসহ তির, পানি, সাত টুকরো কাঁচা হলুদ ভরা মঙ্গলসূচক একটা মুলি বাঁশের চোঙা বেঁধে দেয়া হয়। বাঁশের চোঙার মুখে তিন পাতা বিশিষ্ট তিনটি মুলি বাঁশের ডগা, কিছু আম ও জাম পাতা এবং কিছু দুর্বাঘাস ঢুকিয়ে দেয়া হয়। "প্রথম খুঁটিতে তীর-ধনুক আর মঙ্গলসূচক বাঁশের চুঙ্গ বেঁধে দেওয়ার অর্থ হলো– তীর ধনুক পরিবারের সদস্যদের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করতে ক্রিয়াশীল থাকবে এবং বাঁশের চুঙ্গায় রক্ষিত দ্রব্যাদি পরিবারের সুখ, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল বয়ে আনবে।"[২২] এ রকম বিভিন্ন আচার পালন করার পর 'আখা-তইং' গর্তে বসানো হয়। প্রথম খুঁটি বসানোর পরই গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা

হয়। সম্পূর্ণ ঘর শেষ করার আগেই গৃহপ্রবেশ সম্পন্ন করতে হয়, কারণ গৃহপ্রবেশের আগে নির্মাণাধীন ঘরে কোনো আগুন জ্বালানো যায় না। কিন্তু অধিকাংশ মারমাই ধূমপায়ী হওয়ায়, নির্মাণ কাজের সময় তাদেরকে ধূমপান করতে হয়। এজন্য, নির্মাণ কাজের বিঘ্ন না ঘটানোর জন্য আগেই গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান করতে হয়। গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের আগে পানিপূর্ণ কলস এনে এটি পাথর ও একখণ্ড লোহাসহ খুঁটির কাছে বসানো হয়। তারপর প্রতিবেশীদের ডেকে গুড় বা চিনি-সমেত বিন্নি চালের ভাত খাওয়ানো হয়। এরপর গৃহে প্রবেশ করা হয়। মারমাদের মূল ঘরের সাথে পেছনের বর্ধিত অংশে সমান উচ্চতার মাচাং তৈরি করতে হয়। তবে ঘরের সামনের মাচাং মূল ঘরের চেয়ে সামান্য নিচু হয়ে থাকে। মাচাঙের উপরিভাগ ধান, মরিচ, সরিষা, তামাক ইত্যাদি শুকানোর কাজে ব্যবহৃত হয়, আর নিচের জায়গা জ্বালানি কাঠ রাখা, শূকর রাখা কিংবা তাঁত বোনার স্থান হিসেবে ব্যাবহৃত হয়।[২৩]

**উৎসব-অনুষ্ঠান**

মারমারা মূলত বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। সাদামাটা ও সহজ-সরল জীবনের মধ্যেও তারা বিভিন্ন উৎসব ও পালাপার্বণ উদ্‌যাপন করে। এর মধ্যে ধর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানও তারা পালন করে, যেগুলো তাদের সংস্কৃতিরও অবিচ্ছেদ্য অংশ। বৌদ্ধ পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা বা প্রবারণা (ওয়াগ্যোই), মাঘী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা (ওয়াছো লাব্রো),কঠিন চীবর দান উৎসব ইত্যাদি তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এছাড়াও আছে তাদের বিভিন্ন লোকজ উৎসব ও সামাজিক আনুষ্ঠানিকতা যেগুলোকে মারমারা উদযাপন করে পার্বণ হিসেবে। পার্বণকে মারমা ভাষায় বলে 'পোয়ে'। তাই তাদের বেশির ভাগ উৎসব-অনুষ্ঠানের শেষে 'পোয়ে' শব্দটি যুক্ত। যেমন: ছোয়াইদগ্রী লং পোয়ে, এঞংরে রং পোয়ে, রাথা Ovs পোয়ে (রথ টানা উৎসব), মোও-হ্মরং পোয়ে (ফানুস উড়ানো উৎসব), শ্যাংপ্রুহ্ পোয়ে (Sramanization), বিবাহ অনুষ্ঠান (মাঙ্গলা-ছং পোয়ে বা অম্রাহ পোয়ে বা লাক্‌ছং পোয়ে), শিশুর জন্মোৎসব (মেদেতং পোয়ে). আসুহ পাহ্ (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া), ইং আসইক্ তাক্ পোয়ে (নবগৃহ প্রবেশ), কক্আইক্ চাহ্ পোয়ে (নবান্ন অনুষ্ঠান), পইংজারা পোয়ে (রাজপুণ্যাহ অনুষ্ঠান) ইত্যাদি।[২৪] এসব অনুষ্ঠান পালনের রয়েছে আলাদা আলাদা রীতি যা তাদের সংস্কৃতিকে করেছে বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ। জন্ম-মৃত্যুকে উপজীব্য করে যেমন মারমাদের অনুষ্ঠান আছে, তেমনি ছেলে-মেয়ের বয়ঃপ্রাপ্তিতে যুবক-যুবতী হিসেবে স্বীকৃতির অনুষ্ঠানও আছে অনেক গোত্রে। মেয়েদের যুবতী হিসেবে স্বীকৃতির অনুষ্ঠানের নাম 'রাঙতাংপোই' ও ছেলেদের যুবক হিসেবে স্বীকৃতির অনুষ্ঠানের নাম 'লাকপাই ছোয়ে'।[২৫] সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও পরিচিত অনুষ্ঠান হচ্ছে সাংগ্রাই। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ পানি-খেলা। এই খেলা বিষয়ে সঞ্জীব দ্রং বলেন:

মারমা যুবক-যুবতীরা ঐতিহ্যবাহী 'পানি' খেলার আয়োজন করে। সাংগ্রাই উৎসবে জেগে ওঠে মারমা পাড়া। যুবক-যুবতীরা দু'টি দলে ভাগ হয়ে নৌকায় পাত্র রেখে একে অপরের দিকে রঙিন পানি ছিটিয়ে আনন্দ-উল্লাস করে, নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করে। তারা বিশ্বাস করে, রঙিন পানি পুরোনো বছরের দুঃখ, বেদনা, হতাশা, গ্লানি, ধুয়ে-মুছে দেয় এবং নতুন বছরে প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনে। রাতেও উৎসবের মাধ্যমে মারমারা 'নতুন বছর শুভ হোক, সবার জন্য মঙ্গল বয়ে আনুক'– এই মিনতি সহকারে সাংগ্রাই আঁকা নৃত্যের আয়োজন করে থাকে।[২৬]

এভাবে নানা ধরনের উৎসব ও পার্বণ সমৃদ্ধ করেছে মারমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল।

## পোশাক ও অলংকার

নরনারীর বিশেষ পোশাক ও মেয়েদের অলংকারের ব্যবহারের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায় মারমাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। পোশাককে মারমারা বলে 'খ্যংসা'। পুরুষরা কোমর থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঘরে বোনা এক ধরনের নরম সুতি কাপড় পরে, যার নাম 'দেয়াহ' এবং মাথায় পরে এক ধরনের পাগড়ি যার নাম 'গংবং'। তাদেরকে 'আঞ্জি' নামের হাতাওয়ালা গলায় বোতাম দেওয়া আরেক প্রকার পোশাক পরতে দেখা যায়। মহিলার পাগড়ি না পরলেও কোনো অনুষ্ঠানে বা উৎসবে যোগ দেওয়ার সময় মাথা ঢাকার জন্য রুমাল বা স্কার্ফ ব্যবহার করে। বুকের উপর জড়ায় এক বিঘত কাপড়। সুতা বা রেশমি কাপড়ে তৈরি পেটিকোটের মতে দেখতে এক ধরনের বস্ত্র ব্যবহার করে যার নাম 'থ্মইন'। এতে দড়ি বা বাঁধার কিছু না থাকায় কোমরের উপর গুঁজে পরতে হয়।[২৭] বয়স্ক মহিলা ছাড়া সব বয়সের মেয়েরাই বর্ণময় নকশা করা পোশাক পরতে পছন্দ করে।

মারমা মেয়েরা হাতের, পায়ের, গলার, কানের, নাকের, চুলের বিশেষ গঠনের নানা রকম অলংকার পরে, যা সাধারণত স্বর্ণ ও রূপা দিয়ে তৈরি। মারমা ভাষায় অলংকারকে বলা হয় 'আছাং আয়াং'। তাদের উল্লেখযোগ্য কানে পরার গয়না হল নৃদং, ন্বোয়ং, নৃসেইং ইত্যাদি। গলার অলংকারের মধ্যে আছে হ্রাইফ্রুসি, অঃজাসী, 'হইনদ্রসী', 'পদী', 'ফেয়া' ইত্যাদি। হাতে ও বাহুতে পরা অলংকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'খালসী', 'দাইং', 'লাক্কক্', 'লাকচোয়ে' ইত্যাদি। খোঁপায় পরা অলংকারের মধ্যে রয়েছে 'ছেইং গ্যাং', 'ছেইং বোয়ং', 'ওফ্রি' ইত্যাদি। পায়ের অলংকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'চোলে' ও 'ক্খ্যাং'।[২৮]

## লোকবিশ্বাস

লোকবিশ্বাস মারমা-সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাদের বিশ্বাসে শান্তির প্রতীক ও পবিত্র বৃক্ষ হল বটগাছ ও অশ্বত্থ গাছ। লাজুক বানর গ্রামে প্রবেশ করলে অশুভ লক্ষণ। গ্রামে বন্য হরিণের প্রবেশ গ্রামবাসীর অনেক ক্ষতি হওয়ার লক্ষণ। কারো মৃত্যুর অশুভ লক্ষণ হচ্ছে ঘরে প্যাঁচা প্রবেশ করা। গ্রামের আশেপাশে খ্যাঁক শিয়ালের বিকট ডাক গ্রামবাসীর ক্ষতির ইঙ্গিত। কাকা দক্ষিণ কোণ থেকে ডাক দিলে নিমন্ত্রণ পাবার ইঙ্গিত। উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে কাকের ডাক শত্রুর আগমনের চিহ্ন। উত্তরপূর্ব দিক থেকে টিকটিকির ডাক অর্থপ্রাপ্তির ও দক্ষিণপূর্ব কোণ থেকে টিকটিকির ডাক গৃহস্থের রোগাক্রান্ত হওয়ার ইঙ্গিত। দুপুর রৌদ্রে ঘুঘু ডালে বসে কাতরভাবে ডাক দিলে কারো মৃত্যুসংবাদ আসার ইঙ্গিত। গৃহপালিত মুরগির ডিম অস্বাভাবিকভাবে ছোট-বড় হলে অমঙ্গলের লক্ষণ। স্বপ্নে চুল ঝরে পড়া দেখলে আয়ু কমে যাওয়ার ইঙ্গিত। বৃষ্টিপাতের স্বপ্ন দেখলে ভাল ফলনের লক্ষণ। আগুন স্বপ্নে দেখলে অশুভ লক্ষণ। স্বপ্নে মৃত ব্যক্তির সাথে দেখা হতে দেখলে বৃষ্টিপাতের লক্ষণ। যাত্রাকালে কোনো নারীর চুল খোলা অবস্থায় দেখলে যাত্রা অশুভ হবে মনে করা হয়। যাত্রাপথে শবযাত্রা দেখলে যাত্রা অশুভ হবে মনে করা হয়। পথে ভরা কলস দেখলে মঙ্গল ও কালি কলস দেখলে অমঙ্গলের ইঙ্গিত। কোনো স্থানে যাওয়ার সময় হোঁচট খেলে অশুভ সংকেত মনে করা হয়। ডান চোখের উপরের পাতা এবং বাম চোখের নিচের পাতা নাচলে শুভ লক্ষণ। আবার ডান চোখের নিচের পাতা ও বাম চোখের উপরের পাতা নাচলে অশুভ লক্ষণ মনে করা হয়। ডান বাহু নাচলে কারো মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার ইঙ্গিত মনে করা হয়। ঠোঁটের ডান দিক নাচলে কারোর সাথ ঝগড়া বিবাদ বাঁধার ইঙ্গিত। ঠোঁটের বাম দিক কাঁপলে শুভ লক্ষণ।[২৯] এরকম অনেক লোকবিশ্বাস মারমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এছাড়া তারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হলেও বিভিন্ন লৌকিক দেবতায় প্রবলভাবে বিশ্বাসী।

## জীবিকা ও খাদ্যসংস্কৃতি

সমতলকৃষি, পশুপালন, কাপড়বুনন, বাগান করা, ব্যবসা, দিনমজুরি, দোকান করা ইত্যাদির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে দেখা গেলেও পাহাড়ে জুমচাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা তাদের প্রধান পেশা ছিল। এই জুমচাষকে কেন্দ্র করে তাদের জীবন চলে বলে, একে কেন্দ্র করে মারমাদের কিছু বিশ্বাস ও কৃত্য গড়ে উঠেছে। এগুলোও তাদের সংস্কৃতির অংশ। জুমচাষের জন্য জমি বাছাইয়ের পর তারা দেবতার পুজো করে, স্বপ্ন দেখলে স্বপ্নের দৃশ্য থেকে জায়গার শুভ-অশুভ সম্ভাবনা নির্ণয় করে, জমিতে বিশেষ ধরনের দা দিয়ে গর্ত করে বীজ রোপণ করে। আবার জুমের ফসল উত্তোলনের সময়ও কিছু উৎসব ও প্রথা পালন করে। এসব ঘিরে গড়ে উঠেছে তাদের জুমচাষকেন্দ্রিক সংস্কৃতি।

মারমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। বাঁশের কচি ডগা ও বিশেষ প্রজাতির ব্যাঙ তাদের প্রিয় খাদ্য। তারা সাধারণত কম মসলাযুক্ত খাবার খায়। সবজি রাঁধার সময় কম সেদ্ধ করে খায়। "মারমারা মাছ ও মাংস ব্যতীত অন্যান্য শাকসবজি জাতীয় খাবারে শুঁটকি ব্যবহার করে। তরকারিতে ঙাপ্পি (মাছের পেস্ট) নামে এক প্রকার খাদ্য দ্রব্য ব্যবহার করে।"[৩০] বিভিন্ন প্রাণির মাংসও তারা খেয়ে থাকে।

## ভাষা, সাহিত্য, প্রবাদ ও খেলাধুলা

মারমা ভাষার সঙ্গে বর্মী ও আরাকানি ভাষার মিল রয়েছে। তবে উচ্চারণে বর্মীদের সঙ্গে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়, মিল পাওয়া যায় আরাকানিদের সঙ্গে। তালপাতা জাতীয় "পী" পাতায় কিংবা বিশেষ ধরনের তৈরি করা হলুদ রঙের কাগজে, বনজ গাছ-গাছড়া দিয়ে তৈরি অমোচনীয় কালির সাহায্যে মারমা ভাষায় লেখা অনেক পুঁথি-পুস্তক রয়েছে। ঋতু পরিবর্তনের কাব্যিক বর্ণনা, রূপকথা, লোকনীতি, লোকাচার, ভেষজ ঔষধ সম্পর্কিত বিষয়, ধর্মীয় বিষয়, সমাজনিষিদ্ধ বিয়ের বিষয়, উত্তরাধিকারী আইন ইত্যাদি এসব পুস্তকে লেখা রয়েছে।[৩১] তাদের ভাষায় ১২টিস্বরবর্ণ রয়েছে যাকে বলা হয় 'আঃ আক্খ্রা'। ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে ৩৩টি যার নাম 'ব্যয়এঃ আক্খ্যা'।

মারমা ভাষার লোকসাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ। তাদের রয়েছে মুখে মুখে বানানো ব্যঙ্গাত্মক ক্প্যা গানের প্রতিযোগিতার ঐতিহ্য। 'ত্ছেহ্লা' নামের বারোমাসি গীতিকাব্যসহ আরও অনেক লোকছড়া ও সাহিত্য ছড়িয়ে আছে মারমা ভাষায়। এছাড়া মারমা ভাষায় আছে বিভিন্ন প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধা (আফ্রি)– যা তাদের লোকপ্রজ্ঞার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

মারমাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা বিদ্যমান আছে। এগুলো হল দোঃ কজাঃ বোওয়েঃ (ঘিলা খেলা), তাছিঃ (দাঁড়িয়াবান্ধা), গ্যাং (লাটিম), ক্যাং লুঙঃ বোওয়েঃ (কুস্তি), হ্রোঅক্ তাইঃ (লুকোচুরি), ব্রিঃদাইঃ (দৌড়) ইত্যাদি।

## সংগীত, নৃত্য, গীতিনাট্য ও বাদ্যযন্ত্র

মারমা সমাজে শিশুর জন্মের কয়েকদিন পর দোলনায় উঠানোর সময় থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে সঙ্গীত শোনা শুরু হয়। শিশুর দোলনায় দোলানো সংগীতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'য়সথারা', 'মনহ্রী', 'ওয়েসেইন্দ্রা' ইত্যাদি।[৩২] বিভিন্ন উপলক্ষে তাদের সমাজে নানা ধরনের সংগীত প্রচলিত আছে। এগুলোর মধ্যে,সাখ্রাঙ, 'ক্প্যা', 'চাগায়াঙ', 'সাইঙগ্যাই', 'রদুক্', লাঙ্গা, 'লুঙদি' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মারমা সমাজে সাত রকমের নৃত্য প্রচলিত আছে।[৩৩] এগুলো হলোঃ 'ক্যাঙমুই

আকাহ্', 'ঙ-চোয়ে আকাহ্' 'রইং আকাহ্', 'ছিঃমুইং', 'লঙবাইঙ আকাহ্', 'খয়্ক্-সয়্ক্ আকাহ', ও 'সইঙ আকাহ্'।

তাদের বিভিন্ন রীতির গীতিনাট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'পাঙখুং', 'জাইত্', 'ওয়েসেইন্দ্রা'।

বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে আছে 'বুঙপাইত', 'হ্নে', 'চেঃ', 'চিং-চোওয়ক', 'খ্রে-খ্রুং' উল্লেখযোগ্য।

**মারমাদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন: প্রকৃতি ও প্রভাব**

**স্থানের নাম পরিবর্তন**

বাঙালিদের প্রভাবে বিভিন্ন স্থানের নাম– যা মারমা ভাষায় প্রচলিত ছিল তা পরিবর্তিত হয়ে বাংলা হয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন কখনো হয়েছে সেটেলার বাঙালিদের বাংলা নামকরণ করার কারণে। মারমা ভাষায় প্রচলিত নাম বাঙালি পর্যটকদের জন্য উচ্চারণ করা কঠিন হওয়ার কারণে পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্যও বিভিন্ন স্থানের নাম পাল্টে বাংলা করা হয়েছে। জেলাপ্রশাসনের অধীনে সার্ভে করার সময় কিংবা অন্য কোনো সরকারি জরিপের সময়ও বাঙালি সার্ভেয়ারগণ মারমা ভাষায় চালু কোনো স্থানের নামকরণ বাংলায় করেছে। ফলে স্থানের নামের সঙ্গে মারমা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর যে সংস্কৃতি জড়িয়ে ছিল, তার অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। নিম্নের ছক থেকে এই পরিবর্তনের বিষয়টি লক্ষ করা যেতে পারে:

| **যে-জেলায় অবস্থিত** | **যে-উপজেলায় অবস্থিত** | **স্থানটির পূর্ব নাম/ মারমা ভাষায় নাম** | **স্থানটির বর্তমান নাম** |
|---|---|---|---|
| খাগড়াছড়ি | মানিকছড়ি | ছাং খং দং | হাতির টিলা |
| খাগড়াছড়ি | মানিকছড়ি | সোদোলি | ছদুর খীল |
| খাগড়াছড়ি | খাগড়াছড়ি সদর | উরু গইং | সাতভাইয়া পাড়া |
| খাগড়াছড়ি | রামগড় | প্লাওয়া | লাচারী পাড়া |
| খাগড়াছড়ি | মানিকছড়ি | মাংদ্রাপচু | মানিকছড়ি |
| খাগড়াছড়ি | খাগড়াছড়ি সদর | মাসোওয়া | মাইসছড়ি |
| খাগড়াছড়ি | পানছড়ি | জসরেঃ | কুড়াদিয়াছেড়া |
| খাগড়াছড়ি | খাগড়াছড়ি সদর | বয়ংস্রা | ভাইবোনছড়া |
| খাগড়াছড়ি | গুইমারা | লাংগি | কুকিমারা |
| বান্দরবান | রোয়াংছড়ি | নাই অইং | দেবতাখুম |
| বান্দরবান | আলীকদম ও থানচী | ক্রাউডং | ডিমপাহাড় |

**তথ্যসূত্র: ফোকাস দলীয় আলোচনা**

**খাদ্য সংস্কৃতিতে পরিবর্তন**

পার্বত্য এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা যত উন্নত হয়েছে, এই অঞ্চলের মারমা জনগোষ্ঠীকে তত বেশি বাঙালি জনগণের সঙ্গে মিশতে হয়েছে। ফলে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসকে তাদের অনেকে কাছ থেকে দেখেছেন। মারমাদের মধ্যে অনেকেই লেখাপড়ার জন্য তাদের গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়েছেন কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির সঙ্গে একই প্রতিষ্ঠানে পড়েছেন। সেখানে মেসে থাকার সময়, হোস্টেলে

থাকার সময় বাঙালির খাবার তাদের খেতে হয়েছে। ফলে এই শ্রেণি ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়েছে বাঙালির খাবারে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মারমা শিক্ষার্থীদের কাছে জানা যায়, তারা বাঙালির রান্না করা বিরিয়ানি, তেহারি ইত্যাদি খাবারের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে তারা এসব খাবারের স্বাদ গ্রহণ করেছে এবং এসব খাবার এখন তাদের কাছে পছন্দনীয় খাবার। শিক্ষিত মারমারা এখন জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন করছে এবং কেক কাটার রেওয়াজে অভ্যস্ত হয়েছে। এই শ্রেণির বিয়ের অনুষ্ঠানে এখন বাঙালি খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। কেননা, তাদের অনুষ্ঠানে প্রভাবশালী ও সামাজিকভাবে সম্মানিত বাঙালিদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়। এই বাঙালিদের সন্তুষ্ট করতে বাঙালি খাবারের আয়োজন করা হয়। ফলে তাদের খাদ্য সংস্কৃতিতে আসছে পরিবর্তন। এছাড়া কর্মব্যস্ত জীবনে মারমাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার প্রস্তুতিতে সময়স্বল্পতা এবং বাঙালি খাবারের সহজলভ্যতার কারণেও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তিত হচ্ছে।

### পোশাক ও অলংকারের পরিবর্তন

মারমাদের প্রথাগথত পোশাক এখন খুব কম পরা হচ্ছে। মিয়ানমারের আদলে সৃষ্ট কিছু পোশাক এখনও থাকলেও বাঙালিদের মতো পোশাক পরার রীতি দেখা যাচ্ছে এখন। শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে পোশাকের এই পরিবর্তন লক্ষ করা যায় বেশি। অন্যদের দেখে পাশ্চাত্যপ্রভাবিত পোশাকে তারা অভ্যস্ত হচ্ছে। নিজেদের পোশাক পরতে তারা স্বচ্ছন্দ বোধ করে না, কারণ তারা সবসময় ভীত থাকে এই ভেবে যে, নিজেদের সংস্কৃতির পোশাক পরলে বাঙালিরা তাদের পোশাক নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করতে পারে কিংবা তাদের আলাদা ভাবতে পারে। বর্তমানে শুধু মারমাদের নিজস্ব উৎসবে ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরা হচ্ছে। এক সময় মারমা মেয়েদেরকে নিজের পোশাক নিজে বুনতে জানতে হত। পোশাক তৈরি করতে পারে না, এমন মেয়েদের সহজে বিয়ে হত না। বর্তমানে, পোশাক বোনা শেখার স্পৃহা মারমা মেয়েদের কমেছে লক্ষণীয়ভাবে। আমাদের ফোকাস দলীয় আলোচনায় অংশগহণকারী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৮ জন ছাত্রীর মায়েরা পোশাক বুনতে পারলেও, তারা কেউ বুনতে পারে না। কয়েক দশক আগে যে অলংকারের ঐতিহ্য ছিল বর্তমানে তা বিলুপ্তপ্রায়। আমাদের সঙ্গে ফোকাস দলীয় আলোচনায় অংশ নেওয়া মারমা ছাত্রীরা জনিয়েছে তারা এসব ঐতিহ্যিক অলংকারের নাম শুনলেও চোখে দেখেনি এবং এগুলো কোথায় পাওয়া যায়, তাও তারা জানে না। তাদের এই অজ্ঞতার কারণ, তাদের মায়েদেরকেও এই অলংকারগুলো তারা পরতে দেখেনি। ফলে মারমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত অলংকারগুলো দুর্লভ হয়ে উঠেছে। বর্তমানে বাঙালিদের মতোই অলংকার তারা ব্যবহার করে। কারণ এসব অলংকার তাদের কাছে সহজলভ্য।

### উৎসব-আনুষ্ঠানিকতায় পরিবর্তন

আগে বিভিন্ন উৎসবে মারমা সঙ্গীত পরিবেশন করা হত। বর্তমানে গ্রামের মানুষ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে হিন্দি গান, ইংরেজি গান কিংবা বাংলা গান বাজায়। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীরা তাদের ছোটবেলা থেকেই হিন্দি গান শুনে অভ্যস্ত। এখন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিরতিতে সমসাময়িক বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি গান বাজানো হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তব্য প্রদানের রীতিও বর্তমানে চালু হয়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠানে এখন বাঙালিদের মতো করে মণ্ডপসজ্জা ও অন্যান্য সজ্জা করা হয়। প্রত্যন্ত মারমা গ্রামে এখন অনেক বাঙালি ব্যবসায়ী প্যাকেজ অনুষ্ঠানের নাম করে ভাড়া করা দল নিয়ে যায়। তারপর মেলার মতো

লোক জমিয়ে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আড়ালে চলে অশ্লীল নৃত্য ও জুয়া খেলা। এই জুয়া খেলার ফাঁদে পড়ে অনেকেই নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার কারণে অনলাইন জুয়া খেলাতেও অনেকে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে।

মেয়েদের যুবতী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অনুষ্ঠান রাং তাং পোঃয়ে এখন বিলুপ্তির পথে। অনেক মেয়েই এখন এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে সংকোচ ও লজ্জা বোধ করে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এটা থাকলেও সব জায়গায় নেই। ছেলেদের যুবক হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অনুষ্ঠানের কথা (লাকপাই ছোয়ে) এখন অনেকেই জানে না। বিভিন্ন সরকারি উন্নয়ন নীতিতে জুমচাষকে নিরুৎসাহিত করায় এবং জুমচাষের জমি সংকোচিত হওয়ায় জুমচাষ যেমন কমে গেছে, তেমনি জুমচাষকেন্দ্রিক সংস্কৃতিও ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

## শিক্ষা ও চিকিৎসাকেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন

এক সময় মারমাদের মধ্যে কিয়ংভিত্তিক শিক্ষা বেশি প্রচলিত ছিল। তখন বিহারে থাকা বিহারাধ্যক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা দিতেন। তিনি শিশুদের ধর্মীয়শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষাও দিতেন। বৈদ্যও ছিল তাদের এক প্রকার শিক্ষাগুরু। তিনি ভেষজ চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষাও প্রদান করতেন। বর্তমানে পার্বত্য এলাকায় সরকারি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার ফলে, রাস্তাঘাটের মতো অবকাঠামো নির্মিত হওয়ায়, ধর্মমন্দিরভিত্তিক শিক্ষার প্রতি মারমাদের ঝোঁক কমে গিয়ে সরকারি স্কুলের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ফলে, ধর্মমন্দিরভিত্তিক সাংস্কৃতিক আচারঅনুষ্ঠানগুলো সীমিত হয়ে যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দির চল্লিশের দশক পর্যন্ত মারমারা নিজস্ব ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারত বলে গবেষক মত প্রকাশ করেছেন।[৩৪] এর কারণ, ওইসময় বিহারভিত্তিক পড়াশোনা চালু ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিহারের অধ্যক্ষ কিশোর-কিশোরিদের মারমা হরফে লেখা-পড়া শেখাতেন। জুম চাষ ছেড়ে লাঙল চাষে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তাদের ভাষায় পাঠদানে ভাটা পড়েছে বলে গবেষক মনে করেন।[৩৫]

অতীতে মারমারা বৈদ্য ভিন্ন কারো কাছে চিকিৎসা নিত না। অর্থাৎ, মেডিকেল সায়েন্সে ডিগ্রি লাভ করা ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে তাদের ছিল অনীহা। তাদের ধারণা ছিল, ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার চিকিৎসা করার বদলে ইঞ্জেকশন দিয়ে ক্ষতি করে ফেলবে। তাই তারা চিকিৎসা নেওয়ার জন্য যেতো বৈদ্যের কাছে। বনের ঔষধি গাছ দ্বারাই তাদের উত্তম চিকিৎসা হতো। বর্তমানেও এই ধারণা অনেকটাই প্রচলিত আছে, কিন্তু সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার প্রতি আগ্রহ বোধ করছে। বিশেষ করে শিক্ষিত ও অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছলদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি। ফলে চিকিৎসাকেন্দ্রিক কিছু রীতি– যা তাদের সংস্কৃতিরও উল্লেখযোগ্য অংশ তা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। যেমন: সন্তান জন্মদানে সহায়তাকারী ধাত্রীকে উপহার দেওয়ার রীতি তাদের মাঝে বহু আগে থেকেই প্রচলিত আছে। যতক্ষণ ধাত্রীকে উপহার না দেওয়া হয়, ততক্ষণ সন্তানের প্রতি ধাত্রীর দাবি থেকে যায় বলে মনে করা হয়। এখন হাসপাতালে অনেক শিশুর জন্ম হচ্ছে বলে ধাত্রীকে উপহার দেওয়ার রীতিও কমে যাচ্ছে।

## গান, সাহিত্য ও বাদ্যযন্ত্রের পরিবর্তন

বর্তমানে মারমা ভাষার লোকগানের চর্চা কমে যাচ্ছে। মারমাদের নিজস্ব কিছু বাদ্যযন্ত্র আছে, কিন্তু সেগুলো বাজানোর ও বাজাতে শেখানোর লোকের সংখ্যাও কম। ফলে তরুণ প্রজন্ম এসব বাদ্যযন্ত্র

বাজাতে শিখতে পারছে না। আবার এসব বাদ্যযন্ত্র বানানোতে দক্ষ লোক যেমন কম, তেমনি সেগুলো সংরক্ষণেরও অভাব দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া বিশ্বায়নের প্রভাবে এসব যন্ত্রের প্রতি আগ্রহ কমে গিয়ে, তরুণ প্রজন্মের মারমাদের আগ্রহ জন্মাচ্ছে বিভিন্ন আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের প্রতি। মারমাদের লোকসাহিত্যগুলোও সংগ্রহের অভাবে নতুন প্রজন্ম সেগুলো প্রায় ভুলতে বসেছে।

## উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা লক্ষ করছি, মারমাদের প্রাতিস্বিক সংস্কৃতির সিংহভাগ টিকে থাকলেও, তাতে পরিবর্তনের চিহ্নও লক্ষণীয়ভাবে পড়েছে। বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে আত্মীকৃত হয়ে কোনো নতুন সংস্কৃতি তৈরি না হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই মারমাদের সংস্কৃতি বাঙালির সাংস্কৃতিক আধিপত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তন দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে একসময় মারমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। "ক্রমবর্ধমান সভ্যতার নগ্ন আগ্রাসনে"[৩৬] ক্ষতিগ্রস্ত মারমাদের স্বতন্ত্র বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য যেমন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ দরকার, তেমনি প্রয়োজন শিক্ষিত মারমা জনগোষ্ঠীর সচেতনতা। রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে পারে, মারমাদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান। এতে তাদের ভাষাগত সংস্কৃতি, যেমন মারমা ভাষার সাহিত্য, লোককথা, ছড়া, ইত্যাদি রক্ষা করা সহজ হবে। অন্যদিকে মারমা শিক্ষিত শ্রেণি সচেতন হলে, তাদের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য উদ্যোগ নিতে পারবে। বিশেষ করে তাদের বাদ্যযন্ত্র, পোশাক, লোকঐতিহ্য রক্ষায় এবং সর্বস্তরের মারমাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারবে। এসব উদ্যোগই মারমা সংস্কৃতির স্বকীয়তা টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. মং ক্য শোয়ে নু নেভী, "মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ", *মারমা জাতিসত্তা* (মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা, মুস্তাফা মজিদ সম্পাদিত, ২০০৪), পৃ. ৪৭।

২. ক্য শৈ প্রু, 'আলোচনা, মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ', *মারমা জাতিসত্তা* (মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা, মুস্তাফা মজিদ সম্পাদিত, ২০০৪), পৃ, ৬৯; নাজিমুদ্দীন শ্যামল, *বাংলাদেশে উপজাতিদের শিক্ষা সংকট ও উত্তরণের প্রস্তাবনা: পরিপ্রেক্ষিত– পার্বত্য চট্টগ্রাম* (চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম ফোরাম, ২০০২), পৃ. ২৪; উ চ নু, "বান্দরবান পার্বত্য জেলা : উপজাতীয় নৃগোষ্ঠী মারমা" (মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা, মুস্তাফা মজিদ সম্পাদিত, ২০০৪), পৃ. ৩১-৩২।

৩. সঞ্জীব দ্রং, *বাংলাদেশে বিপন্ন আদিবাসী* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০১০) পৃ. ৯৬।

৪. আসাদুজ্জামান আসাদ, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস* (ঢাকা: ব্রিজ মিডিয়া কমিউনিকেশন, ২০১১), পৃ. ১৮।

৫. T. H. Lewin, *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein* (Calcutta: Bengal Publishing Company,1869), pp. 1-151.

৬. রাহমান নাসির উদ্দিন, *জ্ঞানকাণ্ডের কাণ্ডজ্ঞান: আদিবাসী, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপস্থাপনার রাজনীতি* (ঢাকা: Institute of Culture and Development Research, ২০১৬), পৃ. ৩২।

৭. Mizanur Rahman Shelley, *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: The Untold Story.* (Dhaka: Centre For Development Research, 1992), pp. 9-199.

৮. Amena Mohsin, *The Politics of Nationalism: The Case of the Chittagong Hill Tracts Bangladesh* (Dhaka: The University Press, 1997), pp. 1-272.

৯. Willem van Schendel, Wolfgang Mey and Aditya Kumar Dewan, *The Chittagong Hill Tracts: Living in a Borderland* (Dhaka:The University Press Limited, 2001), pp. 1-327.

১০. রাহমান নাসির উদ্দিন, *জ্ঞানকাণ্ডের কাণ্ডজ্ঞান: আদিবাসী, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপস্থাপনার রাজনীতি* (ঢাকা: Institute of Culture and Development Research, ২০১৬), পৃ. ১৫-১৪৪।

১১. প্রশান্ত ত্রিপুরা ও অবন্তী হারুন, *পার্বত্য চট্টগ্রামে জুমচাষ* (ঢাকা: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, ২০০৩), পৃ. ১-১১৭।

১২. মংসানু চৌধুরী ও উ ক্য জেন, *মারমা: ইতিহাস ও সংস্কৃতি* (খাগড়াছড়ি: মারমা উন্নয়ন সংসদ, ২০১৮), পৃ. ১-৩৯২।

১৩. Chris Barker, *SAGE dictionary of cultural studies* (London: SAGE Publications Ltd:, 2004), p. 62.

১৪. Maurice Jackson, 'An Analysis of Max Weber's Theory of Ethnicity'. *Humboldt Journal of Social Relations. 10*(1). Winter 1982/83, p. 5.

১৫. Fredrik Barth, *Ethnic Groups and Boundaries,* (Boston: Little, Brown and Company), 1969. pp. 11-37.

১৬. *Ibid,* p. 15

১৭. Robert E Park and Earnest W Burgess, *Introduction To The Science Of Sociology* (Chicago: The University of Chicago Press, 1921), p. 735

১৮. Milton M Gordon, *Assimilation in American Life,* (New York: Oxford University Press, 1964), pp. 1-276.

১৯. C. N. Shankar Rao, *Sociology: Principles of Sociology with an Introduction to Social Thought* (New Delhi: S. Chand and Company Limited, Seventh Revised Edition, 2012), p. 189.

২০. সৌরভ সিকদার, *বাংলাদেশে আদিবাসী: ভাষা-সংস্কৃতি ও অধিকার* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪), পৃ. ১৬।

২১. মংসানু চৌধুরী ও উ ক্য জেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫।

২২. তদেব, পৃ. ১৯৭।

২৩. মংসিংঞো মারমা, "মারমা", *বাংলাদেশের আদিবাসী: এথনোগ্রাফিয় গবেষণা* (ঢাকা: উৎস প্রকাশন, প্রথম খণ্ড, মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য সম্পাদিত, ২০১০), পৃ. ৪৪৪।

২৪. মং ক্য শোয়ে নু নেভী, পূর্বোক্ত, ৫২-৫৩।

২৫. মংসিংঞো মারমা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৭-৪২৮।

২৬. সঞ্জীব দ্রং, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১।

২৭. মংসানু চৌধুরী ও উ ক্য জেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০-১৯১।

২৮. তদেব, পৃ. ১৯২-১৯৪।

২৯. তদেব, পৃ. ২৮৬-২৮৮।

৩০. মংসিংঞো মারমা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৭।

৩১. মংসানু চৌধুরী ও উ ক্য জেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪।

৩২. তদেব, পৃ. ৩৩৫।

৩৩. তদেব, পৃ. ৩৪০।

৩৪. তদেব, পৃ. ১৯৫।

৩৫. তদেব, পৃ. ১৯৫।

৩৬. সঞ্জীব দ্রং, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪।

---

জমা প্রদানের তারিখ : ১৭.০২.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ২২.০৫.২০২২

---

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-১, জানুয়ারি–জুন ২০২২

# ভারতীয় সিরিয়ালে নারী উপস্থাপনা এবং বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এর প্রভাব

ফাতেমাতুজ জোহরা*
মোশরাত জাহান**

**Abstract**

At present, Indian Television drama series are considered the most popular and powerful entertainment platforms. Yet, the impact of these series showed a negative aspect in most of the cases which are creating an alarming situation, especially in the society and culture of Bangladesh. Considering this issue, this study aims at how Indian TV serials represent women in different forms and how these types of representation have a great influence on social and cultural life in the context of Bangladesh. The qualitative research was conducted on 50 respondents who were selected through a purposive sampling method. Alongside, formal and informal interviews were applied to collect data from the respondents. Furthermore, the observation method played a vital role to understand the representation of women in Indian TV serials and its impact on Bangladeshi society and culture. Findings showed that these serials represent women like the characters more glamorous, disregarded, powerless, helpless, and unfit to protest. The ultra burnishes and insubstantial reality of these TV serials are making a hyperreality world in the women`s minds which has a significant effect everywhere in the society and culture of Bangladesh.

চাবি-শব্দ: মিডিয়া উপস্থাপনা, অতিবাস্তবতা, আধিপত্যবাদী বা কর্তৃত্ববাদী, পিতৃতন্ত্র, পুঁজিবাদ, এবং ভোগবাদ।

## ভূমিকা

অত্যাধুনিক যুগে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ‘বিনোদন’। আগে বিনোদনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল খেলার মাঠ। কিন্তু বর্তমানে তা টিভি সিরিয়াল, কম্পিউটার গেমস, সোশাল মিডিয়া, স্মার্টফোন-নির্ভর হয়ে উঠেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষার হার কম, যেখানে নারী শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য হারে কম, কর্মসংস্থানের স্বল্পতার দরুণ উল্লেখসংখ্যক নারী বিশেষত, যারা গৃহিণী তারা তাদের অবসর সময় কাটায় টিভি সিরিয়াল দেখার মাধ্যমে। এছাড়া অল্প বয়স্ক কিশোর, কিশোরীরাও এ ধরনের সিরিয়ালের প্রতি বেশ আগ্রহী এবং নাটক বা ধারাবাহিক বা বিজ্ঞাপনের মডেলকে নিজেদের ফ্যাশন আইকন হিসাবে বেছে নেয়। এসব মডেলের ব্যবহৃত পোশাক, গয়না এধরনের বিশেষ দর্শক শ্রেণীর কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়ে থাকে। এভাবে মানুষকে হেজিমোনাইজড করা হয় এসব দৃশ্যগত ধারণায়নের মধ্য দিয়ে। যার মধ্য দিয়ে সমাজে বা বিশেষত নারীর উপর কতটা নেতিবাচক বা ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে তা দেখবার বিষয়। বিশেষত নারীদের ‘আধিপত্যবাদী’ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ভিজুয়্যাল বা দৃশ্যগত

* স্নাতকোত্তর গবেষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ
**সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

মাধ্যম। যার প্রধান হাতিয়ার হলো নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞাপন চিত্র ইত্যাদি এবং হেজিমনি চর্চার ক্ষেত্রে কিছু ডিসকোর্স ব্যবহার করা হয়। যেমন: উপনিবেশিক শাসকরা স্বাধীন দেশগুলোতে তাদের পরোক্ষ শাসন চালিয়ে যাবার জন্য উন্নয়ন ডিসকোর্স ব্যবহার করে থাকেন। আর এসব ডিসকোর্সগুলো এখন তৈরি হচ্ছে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সোশাল মিডিয়া ইত্যাদিতে। উদাহরণ হিসেবে নারী উপস্থাপনা একটি ডিসকোর্স হতে পারে পুরুষতান্ত্রিক উপস্থাপনের ক্ষেত্রে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দৃশ্যগত এসব নাটক, ধারাবাহিকে নারীরা উপস্থাপিত হচ্ছে পুরুষের মাধ্যমে। সে ব্যাপারে লরা মালভি তার বক্তব্যে পরিষ্কার ধারণা দিয়েছেন এভাবে যে ক্যামেরার চোখে নারীকে দেখা হচ্ছে বা নারীকে তুলে আনা হচ্ছে তার পেছনে রয়েছে পুরুষালি দৃষ্টিভঙ্গী। যা হয়তো সাধারণ মানুষের চোখে অনুপস্থিত থেকে যায় কিন্তু সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কে একটা কল্পনার জগৎ তৈরি করে দেয়, যা বাস্তব না হলেও বাস্তবতার থেকে বেশি মনে হয়[১]। আমাদের দেশের সর্বত্র ভারতীয় টিভি সিরিয়ালগুলো ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। ফলে এর একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে, যার মধ্য দিয়ে সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং নারীর অবমাননা হলেও তা খুব বেশি দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণার মধ্য দিয়ে বাস্তব চিত্র তুলে ধরা অনেক বেশি প্রয়োজনীয়।

## গবেষণার উদ্দেশ্য

আমাদের সমাজ কাঠামো পুরুষ পক্ষপাত-দুষ্ট হওয়ার দরুণ নারীর ওপর পুরুষ কর্তৃক বিবিধ অন্যায় আচরণ সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। ভারতীয় দৃশ্যগত মিডিয়াগুলো এসব অন্যায় আচরণের বৈধতা প্রদানের বড় মাধ্যম। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হলো: সিরিয়ালগুলোতে নারী উপস্থাপনার বিভিন্ন ধরন এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় সিরিয়ালের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিশ্লেষণ।

প্রধান লক্ষ্যকে সামনে রেখে কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে যা নিম্নরূপ:

১. ভারতীয় সিরিয়ালগুলোতে নারী কীভাবে পুরুষালি ভাষায় উপস্থাপিত হচ্ছে তা দেখানোর চেষ্টা করা ।
২. নারীকে কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের গণ্ডিতে বেঁধে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা তা তুলে ধরা।
৩. নারী উপস্থাপনার সাথে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর কোনো যোগ্যসূত্র রয়েছে কি না তা স্পষ্ট করা।

## গবেষণার যৌক্তিকতা

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সিরিয়াল একটি আসক্তিতে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় এসব সিরিয়াল আসক্তি এদেশের নারীদের পুরোপুরি দেশীয় টিভি চ্যানেল বিমুখ করে তুলছে। যার ফলে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির উপর এসব সিরিয়ালের মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। আর এসব সিরিয়াল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। ফলে সিরিয়ালে নারী উপস্থাপনার ধরন নারীদের প্রাত্যহিক জীবনে ও মনোজাগতিক পর্যায়ে অনেক বেশি প্রভাব ফেলে। যা নারীর ভিতর পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের জন্ম দেয়। এছাড়া সিরিয়ালের সেট থেকে শুরু করে সংলাপ, পোশাক-পরিচ্ছদ, সব কিছু নারীদের সামনে এমন একটি অতিবাস্তব জগৎ সৃষ্টি করে যাকে নারীরা একমাত্র বাস্তব হিসাবে ধরে নেয়। যার ফলে তারা ওই ধরনের বিষয়গুলো তাদের বাস্তব জীবনে খুঁজে পেতে চায়।

তাই উক্ত গবেষণায়, সিরিয়ালে নারী উপস্থাপনার ধরন ও সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভাবের আন্তর-সম্পর্ককে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যা গবেষণাকর্মটিকে অন্যান্য গবেষণা থেকে আলাদা করেছে।

## প্রত্যয়গত ধারণা

### ধারাবাহিক বা সিরিয়াল

বিভিন্ন প্রকার নাটকের মধ্যে ধারাবাহিক বা সিরিয়াল বর্তমান সময়ে বেশ জনপ্রিয়। সাধারণত একটি লিখিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে অভিনয় করে সিরিয়ালে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই সিরিয়ালগুলো বেশকিছু পর্বে বিভক্ত থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিন প্রচার হয়ে থাকে। বর্তমানে এসব সিরিয়ালগুলো প্রেম, সামাজিক ও পারিবারিক জীবন, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়কেন্দ্রিক হয়ে থাকে।

### রিপ্রেজেন্টেশন/উপস্থাপনা

রিপ্রেজেন্টেশন বা উপস্থাপনা কে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে ভাষার মাধ্যমে শব্দ উৎপাদন। এর অর্থ হল কোনো কিছুর বর্ণনা করা অথবা পেশ করা। বর্ণনা অথবা কল্পনার মাধ্যমে মনের মধ্যে বিষয়টি গেঁথে ফেলা[২]।

### হেজিমনি/আধিপত্যবাদ

হেজিমনি শব্দটির প্রণেতা গ্রামসি। এর অর্থ হল কোনো একটি বিষয়কে মানুষের মস্তিষ্কে এমন ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া, যাতে মনে হয় ধারণাটি ঠিক এবং তাদের জীবনের মধ্যে অপরিহার্য। গবেষণায় ভারতীয় সিরিয়ালে নারীর বিভিন্ন রূপে উপস্থাপনার ধরন কীভাবে নারীর মনোজগৎকে প্রভাবিত করছে এবং এর মধ্য দিয়ে নারী কীভাবে অতিবাস্তব জগতে ঢুকে পড়ছে যার প্রভাব পারিবারিক, সামাজিক সকল ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, তার প্রভাব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

## সাহিত্য-পর্যালোচনা

ভারতীয় সিরিয়ালের জনপ্রিয়তা এবং এর প্রভাব নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। এই গবেষণাকর্মটির সাথে সম্পর্কিত কিছু গবেষণাকাজ নিচে তুলে ধরা হলো:

Razu et, al "IMPACT OF INDIAN DRAMA SERIALS ON BANGLADESHI CULTURE" শিরোনামে গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করেছেন, কীভাবে ভারতীয় টিভি সিরিয়ালগুলো জীবনধারা, পারিবারিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিবর্তন এবং শিল্প ও সাহিত্যের রূপের মাধ্যমে বাংলাদেশি সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছে। ভারতীয় টিভি সিরিয়ালগুলো বাংলাদেশে বসবাসরত মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনধারাকে প্রভাবিত করার কারণে তারা এই টিভি সিরিয়ালগুলো দেখতে যথেষ্ট সময় ব্যয় করে। পাশাপাশি, ভারতীয় টিভি সিরিয়ালের উপর নির্ভরতার কারণে দেশীয় শিল্প, সাহিত্য, ভাষা, রীতিনীতি এবং আচার-অনুষ্ঠানগুলো যে নিজস্বতা ক্রমাগত হারাচ্ছে, তা দেখিয়েছেন[৩] ।

Kabir 'UNDER/REPRESENTATION OF GENDER IN TV SERIES: IMPLICATIONS ON REAL-LIFE RELATIONSHIP' এই শিরোনামে তাঁর প্রকাশিত গবেষণাকর্মের মাধ্যমে দেখিয়েছেন, টিভি সিরিজগুলো বাস্তব জীবনের সম্পর্কগুলোর ওপর কত বেশি প্রভাব ফেলে । এই ধরনের টিভি সিরিজগুলোতে, চমকপদ উপস্থাপনা নারী এবং পুরুষের জন্য সমাজ দ্বারা নির্ধারিত ভূমিকাকে আরো প্রতিষ্ঠিত করে তোলে। পুরুষের কর্তৃত্ব এবং নারীর অক্ষমতা এই বিষয় ছাড়াও গবেষণাপত্রটির উদ্দেশ্য হল এই ধারাবাহিকগুলো আসলে কীভাবে আমাদের বাস্তবতার পথ থেকে বিচ্যুত করে তা তুলে ধরা[৪]।

Roy ''REALITY OR MYTH: REPRESENTATION OF WOMEN IN INDIAN TV SERIALS'' গবেষণায় প্রাথমিকভাবে আলোকপাত করেছেন, ভারতীয় টেলিভিশন সিরিয়াল কীভাবে নারীদের উপস্থাপন করে এবং তাদের উপস্থাপনায় কতটা "বাস্তবতা" আছে? নাকি এই বাস্তবতাটি গতানুগতিক? এখানে নারীরা চিত্রিত হয় পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার এবং জারদৌসি শাড়ির মোড়কে বেষ্টিত পুতুল গোছের বস্তু হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় সিরিয়ালগুলিতে এখনো নারী মানে বিশ্বস্ত স্ত্রী বা ষড়যন্ত্রকারী মহিলা– এই দুই মাত্রার বাইরে বিকশিত হয়নি[৫]।

উপর্যুক্ত গবেষণাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মিডিয়া তথা টিভি চরিত্র নির্মাণ নিয়ে বেশকিছু গবেষণা হয়েছে। তবে এই গবেষণাগুলোর থেকে উক্ত গবেষণার প্রেক্ষাপটের ভিন্নতা রয়েছে। গবেষণায় ভারতীয় সিরিয়ালে নারীর বিভিন্নরূপে উপস্থাপনার ধরন কীভাবে নারীর মনোজগৎকে প্রভাবিত করছে এবং এর মধ্যদিয়ে নারী কীভাবে অতিবাস্তব জগতে ঢুকে পড়ছে, যার প্রভাব পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রে লক্ষণীয় তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

## তাত্ত্বিক কাঠামো

নারীকে বস্তু হিসাবে নিরূপণ এবং সে জায়গা থেকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু প্রাসঙ্গিক তত্ত্বীয় ধারণা ও তাত্ত্বিক কাঠামোকে বোঝা জরুরি–

### পুরুষতান্ত্রিক ভাষা:

ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের অন্যতম বাহন। মানুষ মাত্রই আমরা কোনো-না-কোনো ভাষাতে কথা বলি। কিন্তু এই ভাষার ভেতর দিয়েই টিকে আছে পুরুষাধিপত্য। পুরুষতান্ত্রিক ভাষা হলো, যে ভাষা পুরুষের প্রতিনিধিত্ব করে। পুরুষের হয়ে অর্থ প্রকাশ করে। গায়ত্রি স্পিভাকের মতে, ভাষা অনুপস্থিতির নির্মাণ করে। এই ভাষা দিয়ে যখন নারীকে বর্ণনা করা হয় তখন তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এক ধরনের হীনমানসিকতা। আর ভারতীয় সিরিয়ালগুলোতে এ ধরণের ভাষার প্রয়োগ হরহামেশাই হয়ে থাকে। যেমন- "তার অনুমতি ছাড়া এ বাড়ির মেয়েরা বাড়ির চৌকাঠ পেরোয় না"। এখানে তার বলতে পরিবারের পুরুষ কর্তার কথা বলা হয়েছে। এমন আরো অনেক কথা বা শব্দ আছে যা পুরুষের ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। আর এসব শব্দ অবলীলায় ব্যবহৃত হচ্ছে ভারতীয় সিরিয়ালের সংলাপ তৈরিতে।

**হাইপার রিয়াল/অতিবাস্তব জগৎ:**

Jean Baudrillarb 'হাইপার রিয়াল/অতিবাস্তব জগৎ' প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, আমরা চোখের সামনে যে-সব জিনিস দেখতে পাই তার সব কিছুই কপির কপি। এই বিষয়টিকে তিনি নাম দেন 'সিমুলেশন'। বর্তমান সমাজ তার সকল বাস্তবতা ও অর্থগুলো প্রতীক এর মাধ্যমে প্রস্থাপন করেছে। সুতরাং মানুষ যে বাস্তবতা দেখে তা মূলত 'সিমুলেশন' এর বাস্তবতা[৬]। এটি এমন একটি কপি যা থেকে আমরা কোনোভাবেই বাস্তবতাকে আলাদা করতে পারি না। আর এই জগৎটার নাম দিয়েছেন হাইপার রিয়াল জগৎ। যার প্রধান শিকার হয়ে থাকে নারী। আর এই জগতে প্রবেশ করতে নারীদের অনেক বেশি সহায়তা করছে দৃশ্যগত মিডিয়াগুলো যেমন– ফর্সা হবার জন্য দামি কসমেটিক্স ও মেকাপ ব্যবহার করতে হবে। এই চাহিদাগুলো তৈরি করে দিয়েছে তথাকথিত সৌন্দর্য। আর এই সৌন্দর্যের মডেল হিসাবে ধরে নেওয়া হয় মিডিয়া জগতের অভিনয়শিল্পীদের। ভারতীয় সিরিয়ালে অভিনীত নারী চরিত্রগুলো এ বিষয়ে বেশ এগিয়ে।

**মিডিয়ার উপস্থাপনা:**

নারী উপস্থাপনা বোঝার জন্য মিডিয়ার উপস্থাপনা কী, সে বিষয়টি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। উপস্থাপনা হলো কোনো-কিছু বর্ণনার মাধ্যমে পেশ করা। আর মিডিয়া বলতে আমরা সাধারণত বুঝি দৃশ্যগত মাধ্যম ও প্রিন্ট মিডিয়াগুলো। যেমন: নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞাপন অর্থাৎ টেলিভিশন ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ ইত্যাদি। এসব উপস্থাপিত বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হল নারী[৭] ।

মিডিয়াগুলো যা উপস্থাপন করছে তা নারীবাদীদের মতে, অর্থের মানচিত্র। তারা বলেন, যদি নারী উপস্থাপনা প্রতিচ্ছবি না হয়, বাস্তব অবাস্তবের মানদণ্ডে সেটিকে বিচার করতে গেলে, মিডিয়াতে নারীর ইমেজ অবাস্তব কারণ সেটি পুরুষালি ভাবনার প্রতিচ্ছবি। আমাদের এই তথাকথিত আধুনিক যুগটি হলো পুরুষতান্ত্রিক মিডিয়া প্রণোদিত কনজিউমার সোসাইটির নিদর্শন। মিডিয়াতে সেটাই প্রদর্শিত হয় যেটা মানুষ অনায়াসে গ্রহণ করবে।

**গবেষণার এলাকা**

গবেষণাকর্মটিকে ফলপ্রসূ করার জন্য গবেষণার এলাকা নির্বাচন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই মাঠ নির্বাচনে সতর্ক থাকতে হয়। উক্ত গবেষণা কাজে গবেষেণার মাঠ হিসেবে পুরাতন ঢাকার লক্ষ্মীবাজার এবং কলতাবাজারকে নির্বাচন করা হয়েছে। লক্ষ্মীবাজার (অক্ষাংশ:২৩.৭০৮৪° উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ: ৯০.৪১৫৫° পূর্ব) এবং কলতাবাজার (অক্ষাংশ: ২৩.৭০৯৯° উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ: ৯০.৪১২৬° পূর্ব) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের যথাক্রমে ৪২ এবং ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত পুরাতন ঢাকায় অবস্থিত। গবেষণা এলাকায় দেশের অন্যতম একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত হওয়ায় দেশের নানা প্রান্তের মানুষের বিভিন্ন সংস্কৃতির উপস্থিতি বিদ্যমান, যা গবেষণায় জন্য তুলনামূলক তথ্য বিশ্লেষণে সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে, বিশেষ করে ভারতীয় সিরিয়ালের নারী উপস্থাপনার বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গিও তুলনামূলক বিশ্লেষণে তুলে আনা সম্ভব হয়েছে।

**মানচিত্র ১: গবেষণা এলাকা।**

তথ্যসূত্র: গুগল ম্যাপ

## গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণাটি মূলত গুণগত-পদ্ধতি-নির্ভর। এক্ষেত্রে নারী উপস্থাপনার বিষয়টি তে পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এসব সিরিয়ালগুলো নারী-কেন্দ্রিক হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে ৪৫ জন শিক্ষার্থী, গৃহিণী এবং কর্মজীবী নারীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যারা নিয়মিত ভারতীয় সিরিয়াল দেখেন। পাশাপাশি ৫ জন পুরুষ তথ্য দাতার কাছ থেকে তাদের মতামত ও অভিজ্ঞতা তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া সিরিয়ালের বিষয়টিও অনুধাবনের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়টি অনুধাবন করে সকল বয়সের তথ্যদাতার সাথে কথা বলা সম্ভব নয় বিধায় গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্যদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এখানে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দুই ধরনের সাক্ষাৎকার পদ্ধতির অবলম্বন করা হয়েছে । এগুলোর পাশাপাশি এখানে মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন প্রবন্ধ, দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

**ফলাফল এবং আলোচনা**

তথ্যদাতাদের আর্থ-সামাজিক পরিচিতি

**তথ্যদাতাদের বয়স**

উক্ত গবেষণা কাজে বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষকে অন্তভূক্ত করা হয়েছে, যাদের বয়স ২০ বছর থেকে শুরু করে ৫২ বছর পর্যন্ত। নিচে একটি সারণির মাধ্যমে বয়স কাঠামো তুলে ধরা হলো:

**সারণি ১: তথ্যদাতাদের বয়স**

| বয়সের সীমা (বছর) | তথ্যদাতার সংখ্যা | শতকরা হারে (%) |
|---|---|---|
| ২০-৩০ | ২০ জন | ৪০ |
| ৩১-৪০ | ২০ জন | ৪০ |
| ৪১-৫০ | ০৮ জন | ১৬ |
| ৫১-৬০ | ০২ জন | ৪ |
| মোট | ৫০ জন | ১০০% |

তথ্যসূত্র: মাঠকর্ম ২০২০

সারণিতে মোট ৫০ জন তথ্যতদাতার বয়স-সীমার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক তথ্যদাতা রয়েছে ২০-৩০ এবং ৩১-৪০ বছরের মধ্যে, যেখানে মোট ৪০ শতাংশ হারে তথ্যদাতার উপস্থিতি দেখা গেছে। বিভিন্ন বয়সের তথ্যদাতাদের ভিন্ন-ভিন্ন অভিজ্ঞতার ও বৈচিত্র্যময় তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণাকর্মটি করা হয়েছে।

**তথ্যদাতাদের লিঙ্গ**

গবেষণাটিতে নারী ও পুরুষ উভয়কে তথ্যদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। নিচে তথ্যদাতার লিঙ্গভিত্তিক অংশগ্রহণ তুলে ধরা হলো–

**লেখচিত্র ১: তথ্যদাতার লিঙ্গভিত্তিক অংশগ্রহণ।**

তথ্যসূত্র: মাঠকর্ম ২০২০

উক্ত লেখচিত্র ১ এর মাধ্যমে লিঙ্গভিত্তিক তথ্যদাতার অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, বেশিরভাগ তথ্যদাতাই নারী, যার হার ৯০ শতাংশ। যেহেতু, গবেষণার উদ্দেশ্য নারীকেন্দ্রিক, সেক্ষেত্রে তথ্যদাতা নির্বাচনে নারীকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, লিঙ্গভিত্তিক অভিজ্ঞতার ভিন্নতা থাকার দরুণ কিছুসংখ্যক পুরুষ তথ্যদাতাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে লিঙ্গভিত্তিক অভিজ্ঞতার তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায়।

### তথ্যদাতাদের পেশা

গবেষণাটির তথ্যদাতাদের পেশাতেও ভিন্নতা রয়েছে। তথ্যদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেতে নিচে তথ্যদাতাদের পেশার একটি বিবরণী তুলে ধরা হলো–

**লেখচিত্র ২: তথ্যদাতার পেশার ধরন**

তথ্যসূত্র: মাঠকর্ম ২০২০

উপরের লেখচিত্র ২ হতে দেখা যায় যে, মোট তথ্যদাতার মধ্যে শতকরা ৬০ শতাংশ তথ্যদাতার পেশা গৃহিণী, ২২ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী এবং চাকরিজীবী ১৮ শতাংশ।

### তথ্যদাতার বৈবাহিক অবস্থা

গবেষণাটিতে তথ্যদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিবাহিত এবং অবিবাহিত দুই ধরনেরই রয়েছে, যাতে করে বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে কোন ধরনের মতাদর্শের পার্থক্য আছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা যায়।

**লেখচিত্র ৩: তথ্যদাতার বৈবাহিক অবস্থা**

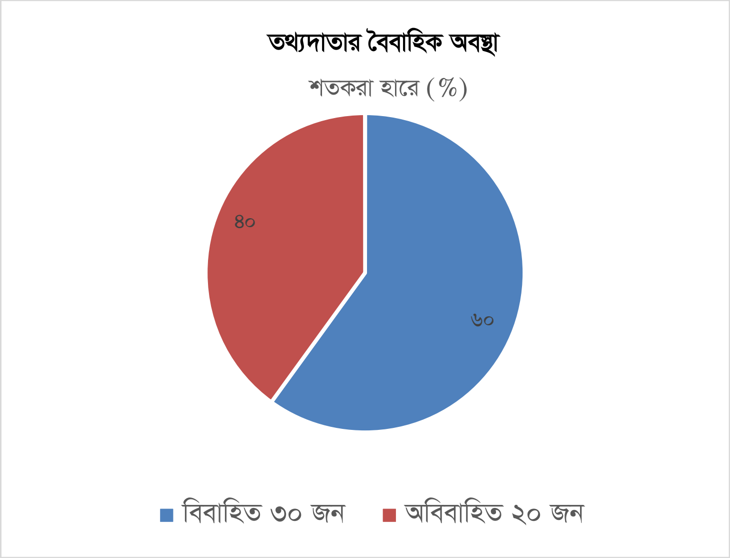


তথ্যসূত্র: মাঠকর্ম ২০২০

তবে যেহেতু গবেষণাটি নারীকেন্দ্রিক, তাই বিবাহিত নারী তথ্যদাতার আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু কিছুসংখ্যক পুরুষ তথ্যদাতার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে, তুলনামূক বিশ্লেষণের জন্য। এক্ষেত্রে, লেখচিত্র ৩ থেকে দেখা যায় যে, মোট তথ্যদাতার ৬০ শতাংশই বিবাহিত।

**নারী উপস্থাপনার মাধ্যম ও ধরন**

বর্তমান বিশ্বে মিডিয়া একটি অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী মাধ্যম, যা জনমত গঠনে জোর ভূমিকা রাখছে। কিন্তু মিডিয়া কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্ত নেতিবাচক অর্থেও ব্যবহৃত হচ্ছে। আজ বিশ্বে মিডিয়া পরিচালিত হচ্ছে পুঁজিপতি, ক্ষমতাধর ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে, যেখানে অনেক ক্ষেত্রেই নারীদের পণ্যে রূপান্তর করা হচ্ছে মিডিয়ার মাধ্যমে।

নারী চরিত্র উপস্থাপনের ধরনগুলো সিরিয়ালে পর্যবেক্ষণ করলে যা পাওয়া যায় তা হলো:

১। **নারী মমতাময়ী মা:** সিরিয়ালে নারীকে প্রায়সময়ই মমতাময়ী মা-রূপে উপস্থাপন করার প্রবণতা দেখা যায়, যেখানে তাকে শত অপমানেও সবকিছু নীরবে মেনে নিতে দেখা যায়। যেমন: স্টার জলসার নাটক 'শ্রীময়ী'।

২। **স্মৃতিকাতর নারী:** সিরিয়ালে নারী চরিত্রকে বেশ স্মৃতিকাতর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যেখানে স্বামী মৃত্যুবরণ অথবা স্বামীর দ্বারা প্রতারিত হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায় নারী তার স্বামীর স্মৃতিকে নিয়ে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। যেমন: সনি টিভির সিরিয়াল 'পাটিয়ালি বেবস'-এ 'ববিতা' চরিত্রটি।

**৩। গৃহকর্মী নারী:** নারী মানেই ঘর কন্যা। সে ঘরের কাজেই অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এর ব্যতিক্রম হলেই তাকে অলক্ষ্মী বলে পরিগণিত করা হয়ে থাকে।

**৪। নারীর বোধশক্তি সীমিত:** পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ভারতীয় সিরিয়ালের নারীকে সীমিত শক্তির অধিকারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে, যেখানে এরূপ দৃশ্যমান হয় যে স্বামী অন্য নারীর সাথে পরকীয়ায় যুক্ত হলেও স্ত্রী সেটা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় অথবা বুঝতে চায় না। যেমন, 'সিলসিলা' নাটকে মলির স্বামী ও তার সব থেকে প্রিয় বন্ধু দিনের পর দিন পরকীয়ায় যুক্ত হলেও তার চোখে পড়ে না।

**৫। নারীর মানসিক দৃঢ়তা:** ভারতীয় সিরিয়ালগুলোতে মানসিকভাবে নারীকে অনেক বেশি শক্তিশালী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। যেমন, অনেকসময়ই এমনও দেখা যায় যে, নায়িকা তার নিজের স্বামীর সুখের জন্য অন্য মেয়ের সাথে তার বিবাহ দিতেও প্রস্তুত থাকে, উদাহরণ হিসেবে স্টার জলসার 'শ্রীময়ী' সিরিয়ালের কথা উল্লেখ করা যায়।

**৬। নারী দুর্বল:** নারী মানসিকভাবে শক্ত হলেও শারীরিকভাবে দুর্বল। এমনটাই ভাবা হয় যে, শ্রমনির্ভর কাজে তারা অদক্ষ। তাই তাদের ঘরের কাজে সীমাবদ্ধ থাকাই ভালো। এমন অনেক সিরিয়াল আছে যাতে এ ধরনের বার্তা প্রদান করা হয়।

মূলত এভাবেই নারীকে উপস্থাপন করা হয় সিরিয়ালগুলোতে। এছাড়া আরো যেসব ধরন খুব বেশি নারী অবমাননাকর সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

### নারীকে পুরুষালি ভাষায় উপস্থাপন

আমরা যা ভাবি সেটা ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। কথোপকথনের মাধ্যমে যা ব্যক্ত হয় সেটাকেই ভাষা বললে ভাষার ব্যাপকতাকে সংকীর্ণ করা হয়। কোনো আঁকা ছবি, অঙ্গভঙ্গি, কোনো প্রতীকী ছবি, বস্তু, শব্দ উচ্চারণ না করলেও নির্দ্বিধায় বলা যায় এর নিজস্ব ভাষা আছে, ঠিক সে জায়গা থেকে দৃশ্যগত মিডিয়া গুলো আচরণের মধ্য দিয়ে পাশাপাশি কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নারীকে যেভাবে উপস্থাপন করে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক ধরনের পুরুষালি দৃষ্টিভঙ্গি। যেমন অন্দর মহল নাটকের একটি দৃশ্যের সংলাপ– "তুমি তো তখন তোমার চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারতে।" যেখানে ডিভোর্স-প্রাপ্ত বউ তার মেয়ের সাথে দেখা করতে পূর্বের শ্বশুর বাড়িতে আসে। ডিভোর্সের কারণ, সে ঘর-কন্যা মেয়ে নয় বরং ক্যারিয়ার-সচেতন। তাই সে যখন মেয়ের সাথে দেখা করতে আসে তখন তাকে বাড়ির সদস্যরা বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেয় না এবং তাকে উপদেশ দেয়, "মেয়ের প্রতি যদি এতো দরদ তবে তখন তো তুমি চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে সংসার আর সন্তান নিয়ে থাকতে পারতে।" এভাবে নারীকে দেখানো হয়ে থাকে । দেখে মনে হয় যেন যে নারী ক্যারিয়ার সচেতন হয় তারা সংসার সামলাতে বা সন্তান লালন পালন করতে পারে না।

"শুধু ঘর কন্যা দিয়ে কী সংসার চলে?"– একই নাটকে আরেকটি দৃশ্যে এমন কথা বলতে শোনা যায় নাটকের প্রধান চরিত্র 'পরমেশ্বরী' সম্পর্কে। যে শিক্ষিত এবং গৃহের সকল কাজে দক্ষ, তা সত্ত্বেও তাকে নানানভাবে কটূক্তি করা হয়ে থাকে।

এমন আরো অনেক বক্তব্য ভারতীয় সিরিয়ালগুলোতে উপস্থাপিত হয়, যা কোনো নারীর মুখ থেকে কথিত হলেও এর পেছনে রয়েছে মূলত পুরুষালি দৃষ্টিভঙ্গি। আর এভাবে উপস্থাপন হবার জন্য দায়ী হলো আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা।

**গঁৎ বাধা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীর উপস্থাপনা**

বেশির ভাগ নাটকগুলোতে দেখানো হয় অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত বা অশিক্ষিত গ্রামের মেয়েরা খুব সংসারী হয় অর্থাৎ রান্না করা, ঘর গোছানো, সবার খেয়াল রাখা, সবার জন্য চিন্তা করা, মিলেমিশে থাকা এসব বিষয়ে আগ্রহী হয়। আর শিক্ষিত বা চাকুরীজীবী মেয়েরা হয় বিপরীত চরিত্রের-রান্না করা তাদের কাছে পাহাড় সমান, তারা স্বার্থপর, পরিবারের সদস্যদের সাথে মানিয়ে গুছিয়ে চলতে পারে না। এভাবে নারীকে উপস্থানের মাধ্যমে তারা পরোক্ষভাবে নারীশিক্ষার বিরোধিতা করছে কি না সেটা ভাবনার বিষয়।

**নারীকে যৌন বস্তু হিসাবে উপস্থাপন**

নারী রহস্যময়ী, যুগ যুগ ধরে নারীর রহস্যের প্রাচীরকে ভেদ করার অনেক কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে, যার মধ্যে নারীর শরীর উন্মোচন করা অধিক দৃষ্টিগোচর হয়। এ কারণে নারীর শরীর নিয়ে পুরুষের কল্পনার অন্ত নেই। নারীর শরীর বন্দনায় রচিত হয়েছে অনেক সাহিত্য। সেই সব সাহিত্যের পাঠকপ্রিয়তাও কম নয়। জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে, লেখকও ধন মান দুইই অর্জন করেছেন। নারীকে নির্মাণ করা হয়েছে দেখার বস্তু হিসাবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে অশ্লীলতার মাপকাঠি যেন শুধু নারীর শরীর। পুরুষের শরীর নিয়ে তেমন অশ্লীলতা শোনা দুর্লভ। আর নারীকে খাদ্যবস্তুর মত লোভনীয় ভাবার প্রচলন প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে।

সিরিয়ালগুলোতে নায়িকার প্রথম দৃশ্যে অবতরণ, প্রথমে তার উড়ন্ত চুল, তারপর চোখ, গাড়ো রঙে সাজানো ঠোঁট এভাবে ক্যামেরায় ধারণ করা হয়। যার মাধ্যমে ওই নারীটির নয় বরং তার শরীরের প্রতি আকৃষ্ট করা হয় দর্শককে। তথ্যদাতা শাওন চৌধুরী (ছদ্মনাম) বলেন, "হিন্দি সিরিয়ালে বর্তমান নায়িকাগুলো সেই, তাকায় থাকার মতো, আমার তো সিলসিলা সিরিয়ালের নন্দীনিরে সেই লাগে। নাটক না হোক ওরে দেখার জন্য হলেও একবার ইউটিউবে সার্চ দেই। তার কোমর, পিঠ, পেট, নাভী পুরোই টানে।" তথ্যদাতার কথাগুলো লরা মালভির ভাষায় বিশ্লেষণ করতে পারি এভাবে– লরা মালভি তার বিখ্যাত "ভিজুয়্যাল প্লেজার ও ন্যারেটিভ সিনামা" প্রবন্ধে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষা তত্ত্বের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, চলচ্চিত্রে নারী হলো দেখার বস্তু এবং পুরুষের দৃষ্টি যাকে দেখে তুষ্টি লাভ করে[৮]।

**নারী উপস্থাপনা ও হাইপার রিয়াল/অতিবাস্তব জগৎ**

ভারতীয় সিরিয়ালগুলোতে উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে নারীকে হাইপার রিয়াল জগতে প্রবেশ করানো হয়। তাত্ত্বিক জ্যাঁ বর্দ্রিয়ার অভিমত হচ্ছে– বাস্তবতা একটি সেকেলে ধারণা। বর্দ্রিয়ার সিমুল্যাক্রাসের ধারণা প্রতিনিধিত্ব এবং পুনরুৎপাদন ধারণাকে অতিক্রম করে। এটি প্রস্তাব করে কৃত্রিম অতিবাস্তবতার ধারণা। এটি প্রস্তাব করে এমন বাস্তবের ধারণা যেটির কোনো উৎস নেই কোনো বাস্তবতা নেই। বদ্রিয়ার মতে প্রতিনিধিত্ব কোন প্রাক-বাস্তবতাকে পুনরুপস্থাপন করে না কারণ এটি ছাড়া কিছু নাই[৯]। আর নারীদের এই অতিবাস্তব জগতে প্রবেশ করনোর সব থেকে বড় মাধ্যম হলো এই ভারতীয় সিরিয়ালগুলো। সিরিয়ালগুলোকে দেখা যায় মেয়েরা সারাদিন সাজগোজ

করে ভারী শাড়ি গয়না পরে ঘুরে বেড়ায়, যা বাস্তবে সম্ভব নয়। তবুও নারীরা এই অবাস্তব দৃশ্যগুলোকে বাস্তব হিসেবে ধরে নিচ্ছে।

আবার সিরিয়ালগুলো মেকাপকে অনেক বেশি উৎসাহিত করে। যার প্রমাণ মেলে বর্তমানে পার্লারগুলোর লাইভ শো দেখে। নিতু আক্তার যিনি একজন তথ্যদাতা, বিউটিশিয়ানও বটে, তার মতে, "যদি এই ২১ শতকের যুগে এসে কোন স্বামী বা বয়ফ্রেন্ড মেকাপকে আটা ময়দা বলে তবে সেই মেয়ের উচিত তাকে ছেড়ে দেওয়া।" অর্থাৎ মেকাপ জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও মডেলদের অনুকরণ করে নিজ শরীরের গঠন তৈরি করার প্রতিযোগিতা এখন বেশ লক্ষণীয়। এক সময় যে মোহ ছিল, 'বারবি'* সাজের প্রতি। যা খুব বেশি অকল্পনীয়। যেমন বারবির শরীরের গড়ন ছিল আনুপাতিক হারে মানব শরীরের ছয় ভাগের এক ভাগ। ফলে উচ্চতা ও প্রশস্ততার দিক থেকে বারবিকে ছয় গুণ বড় করলে মানব শরীরের আকারে একে পাওয়া যাবে। বর্তমানে এই 'বারবি'র জাগাটা নিয়েছে সিরিয়ালের মডেলরা। তারা যে লাইফ স্টাইলের মধ্য দিয়ে শরীরী সৌন্দর্য ধরে রাখে তা বাস্তবিক জীবনে সম্ভব নয়। কিন্তু সিরিয়ালগুলো রিপ্রেজেন্টেশনের বা উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে এই অতি কল্পনীয় বিষয়টিকে বাস্তবকে ছাড়িয়ে যাবার ক্ষমতা প্রদান করে। তাই নারীরা এসব মডেলের মত শাড়ি, গয়না পরে তাদের মত সাজার চেষ্টা করে।

## উপস্থাপনা ও হেজিমনি বা আধিপত্যবাদ

সিরিয়ালের সাথে সব থেকে সম্পর্কিত বিষয় এটি। উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে বর্তমানে সব থেকে বেশি হেজিমনি বা আধিপত্যবাদ কার্যকর। বর্তমানে সিরিয়ালগুলো সব থেকে বড় প্লাটফর্ম হেজিমনির বা আধিপত্যবাদের। তারা তাদের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে প্রথমে মানুষকে আকর্ষিত করছে। যার ফলে মানুষ ঐ পণ্যটি কেনার জন্য মরিয়া হয়ে উঠছে। যার ফলে এক শ্রেণির মুনাফা লোভী গোষ্ঠী প্রতিনিয়ত লাভবান হচ্ছে। আর এর প্রধান টার্গেট হলো নারী গোষ্ঠী। তারা এসব সিরিয়াল দেখে এবং সিরিয়ালে নায়িকাদের নামধারী পোশাক কেনার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। আর এই সিরিয়ালগুলো এতটাই কর্তৃত্ববাদ সৃষ্টি করছে নারীদের যে সিরিয়ালের নামধারি 'পাখি ড্রেস' না পেয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে কিশোরী[১০]। এ বিষয়টি সম্পর্কে আর একটু পরিষ্কার ধারণা পেতে Adorno এর Cultural Industry তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করা যায়। Adorno এর মতে, উৎপাদিত সাংস্কৃতিক পণ্যগুলো শুধুমাত্র লাভ অর্জন করে না বরং এগুলো এমন কিছু ভোক্তা তৈরি করে দেয় যারা উৎপাদিত ঐ পণ্যগুলো ছাড়া নিজেদের জীবন ব্যবস্থাকে আর কল্পনা করতে পারে না[১১]। উদাহরণস্বরূপ টিভি বা সিরিয়ালে প্রদর্শিত যে জীবনধারা দেখানো হয়, সেখানে বেশির ভাগ সময়ে বিলাসবহুল ঘর, জামাকাপড়, আসবাবপত্র ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয়। এটি কোনো কাকতলীয় ঘটনা নয়। এর মাধ্যমে দর্শকদের বোঝানো হয় ভালো জীবন-যাপন বলতে আসলে কী বোঝায়।

## সাংস্কৃতিক কারখানার উৎপাদন ও ভারতীয় সিরিয়াল

ভারতীয় সিরিয়াল বর্তমানে আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনকে পুরোদস্তুর প্রভাবিত করেই চলেছে, যেমন সিরিয়াল 'বোঝে না সে বোঝে না'-এর নায়িকার পরিধেয় পোশাক পাখি জামা

---

* 'হাইপার রিয়েলিটি বা অতি বাস্তবতা' এর একটি উদাহরণ হিসেবে 'বারবি' পুতুলকে ধরা যায়। যার উপস্থিতি বাস্তবে সম্ভবতর না হলেও অনেক নারীর কাছে এটা সৌন্দর্যের আইকন হিসেব পরিগণিত হয়ে থাকে, যেখানে 'বারবি' পুতুলকে অতিবাস্তব হিসেবে তারা মনে করেন।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, এ পোশাক কিনতে না পারায় এ পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদ এবং আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে[১২]। এখানে আমাদের ভাববার বিষয় হচ্ছে, একটা পোশাক মানুষের জীবনের চাহিদার কোন পর্যায়ে পৌঁছতে পারলে সে আত্মহত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। বিষয়টি কি শুধুই পোশাকের চাহিদা, নাকি 'মগজ ধোলাই' এবং এই মগজ ধোলাইয়ের মাত্রা কতটা তীব্র হলে মানুষ আত্মহত্যার মতোও পথ বেছে নিতে পারে। এবার আসি টেলিভিশনে প্রদর্শিত জীবনধারার দিকে। একেবারে কোনো হতদরিদ্র চরিত্র ছাড়া দেখা যায় সিরিয়ালের চরিত্রগুলো প্রায় সকল সময়ই বেশ সাজসজ্জিত করে উপস্থাপন করা হয়, এমন কি তারা ঘুম থেকে ওঠলেও তাদের সাজসজ্জার মাত্রা বাড়ে বৈ কমে না। যার প্রভাব পড়ছে আমাদের উপর, বাড়ছে প্রসাধনী পণ্যের চাহিদা, মুনাফা লুটে নিচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা। আরও একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় খুব ব্যতিক্রম কিছু চরিত্র ছাড়া সিরিয়ালের নায়িকাদের কখনোই কালো, স্থূলকায় রূপে উপস্থাপন করা হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের শরীরের গঠন থাকে পশ্চিমা সংস্কৃতির আদলে গড়া আদর্শ শরীরের মাপ অনুযায়ী। যথাসম্ভব এ আদলেই নায়িকাদের বেশি চাহিদা এবং জনপ্রিয়তাও বেশি। উল্লেখ্য, বিষয় হলো বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যেখানে পরিবেশগত কারণেই মানুষের রং হবে শ্যামলা, শরীরের গঠন হবে পশ্চিমাদের চেয়ে মোটা। কারণ, বাংলাদেশ গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশ এবং আমাদের খাদ্যাভ্যাসও তাদের চেয়ে আলাদা। কিন্তু তাদের দেওয়া ছাঁচে নিজেদের ফেলতে গিয়ে আমরা বাধ্য হচ্ছি তাদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন পণ্য ও সেবা ব্যবহার করতে। অথচ এ বাধ্যবাধকতা প্রত্যক্ষ নয়। এটা একটা কর্তৃত্ববাদী হেজেমনিক প্রক্রিয়া। শুধু তাই নয়, আমরা পরিবর্তন করে ফেলছি আমাদের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়। এভাবে আমরা সকল দৃশ্যগত মাধ্যমের আলোকেই সংস্কৃতি কারখানাকে ব্যাখ্যা করতে পারি। তথ্যদাতা ইউশা ইবনাত বলেন, "যে কোন ডিজাইনার শাড়ি গয়নার খোঁজ তো দোকানে গিয়ে করা সম্ভব নয় বরং দোকানিরাও সিরিয়ালের নায়িকাদের ডিজাইনের শাড়ি গয়না তৈরি করে। তাই সিরিয়াল থেকে ডিজাইন পছন্দ করে দোকানে গিয়ে নাম বললে সহজেই পাওয়া যায়"। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি সিরিয়ালগুলো বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাক ও গয়নার ডিজাইনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করছে, যা কেউ জোর করে আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে তা কিন্তু নয় বরং তারা বিষয়গুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করছে যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আর আমাদের মনোজগতে এমন ভাবনার উদয় করছে, যাতে করে আমাদের মনে হচ্ছে ওই বিশেষ জিনিসটি ছাড়া আমাদের জীবন বৃথা। যাকে আমরা গ্রামসির হেজিমনি ধারণার সাথে পুরোপুরি মেলাতে পারি।

### উপস্থাপনার সাথে পুঁজিবাদ বা ভোগবাদের সম্পর্ক

উপস্থাপনার সাথে বারবারই পুঁজিবাদের কথা উঠে আসছে। অর্থাৎ পুঁজিবাদের সাথে এই উপস্থাপনার একটি জটিল সম্পর্ক রয়েছে। পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র বলতে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বোঝায় যেখানে বাণিজ্য কারখানা এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার নিয়ন্ত্রণ থাকে। পুঁজিবাদ বিশ্লেষণে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন:

### পুঁজিবাদ ও নারী

কর্পোরেট মিডিয়ার বাজার দিন দিন বেশ প্রভাবশালী রূপ ধারণ করছে। স্যাটেলাইট টেলিভিশনের বাজার বাড়ছে, আর যার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অনুষ্ঠান আয়োজন। এই অগ্রগতি বার্তা দেয় সমাজ-প্রগতির। যে সমাজে প্রগতির সঙ্গে অনিবার্যভাবে নিশ্চিত হবার কথা নারীর অগ্রগতি আর

দূর হবার কথা জেন্ডার-বৈষম্য। দৃশ্যমান এবং মুদ্রণ মিডিয়া দুটোতেই নারী পুরুষের সমতা নিয়ে বিশাল আয়োজন। বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ আয়োজনে নারীর অধিকার, নারী-স্বাধীনতা বুলি আউড়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির মহাযজ্ঞ সাধনের চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন মিডিয়া পরিচালকেরা। কিন্তু সে সব মিডিয়াই প্রতি সেকেন্ডে নারীকে পণ্যরূপে উপস্থাপনে ছাড়িয়ে যায় প্রতিপক্ষকে। তারাই নারী শক্তির প্রদর্শনবাদের নতুন মোড়কে হাজির করছে প্রতিদিন। মিডিয়ায় নারীকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা আর পুরুষকে আধিপত্যের সমাজে বিনোদনের ভোগ্য অনুষঙ্গ হিসেবে তুলে ধরার এই প্রবণতাকে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা স্বীকার করে নিয়েছে।

### বদলে যাচ্ছে বর্ষবরণ উৎসব

বৈশাখের আচার অনুষ্ঠান, হালখাতা, বৈশাখী মেলা, খাবার বাঙালির বর্ষবরণ উৎসবের অন্যতম অনুষঙ্গ। সময়ের বিবর্তনে এসব অনুষঙ্গের পরিবর্তন খুব কম নয়। নববর্ষ উদ্‌যাপনের এসব ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে সময়ের সাথে সাথে।

### খাবার আর পোশাকের বৈশাখ

নববর্ষে খাবার ও পোশাক অন্যতম। এক দুই দশক আগে পর্যন্ত ও সন্দেশ, গুড়, পিঠা, পুলি, খই, দই ইত্যাদি নববর্ষের প্রধান খাবার ছিল। তবে এ প্রজন্মের কাছে পান্তা-ইলিশটাই যেন বৈশাখের খাবার হয়ে উঠেছে। বর্ষবরণের পোশাক হিসাবে ধুতি পাঞ্জাবির কথা বলেন অনেকে। তবে এখন পোশাক হিসেবে সাদা-লাল রঙের পাঞ্জাবি, শাড়ি এবং সালোয়ার কামিজের সংখ্যাই বেশি। প্রতিবছর বৈশাখী উৎসবকে কেন্দ্র করে পোশাক ব্যবসায়ীরা শত কোটি টাকার বাণিজ্য করছেন। আর এখানে, সিরিয়ালের প্রভাব নেহাতি কম নয়। এসব সিরিয়ালের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজ আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে বৈশাখ মানে লাল সাদা পোশাক পরতেই হবে। উত্তরদাতা রুবা তালুকদার বলেন, "নতুন শাড়ি না কিনতে পারলে মনেই হয় না নতুন বছর এসেছে"। তার এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় বৈশাখ এখন আর মেলায় গিয়ে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে নেই। বরং সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে পোশাক গয়না কেনার মধ্যে। যার জন্য পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার দায় এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

### উপস্থাপনা ও ক্ষমতার সম্পর্ক

নারীরা যে নেতিবাচকভাবে মিডিয়াতে উপস্থাপিত হচ্ছে তার পিছনের কারণটা উদ্‌ঘাটন করলে দেখা যাবে, পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে ক্ষমতার অধিপতি পুরুষ সেখানে ক্ষমতা বলেই তারা নারীদের ব্যবহার করছে। এছাড়া দৃশ্যমান মিডিয়াগুলোতে নারী যেভাবে উপস্থাপিত হয়, তাতে কতটা নিজের স্বাধীনতা প্রকাশ করতে পারে আর কতটা তাকে বাধ্য করা হয়– সে প্রশ্ন থেকেই যায়। পরিচালকরা যেভাবে নারীদের সামনে তুলে ধরতে চরিত্রের প্রয়োজনে যতটা নয় তার থেকে অনেক বেশি দর্শক বা ভোক্তা শ্রেণিকে ভিজুয়্যাল প্লেজার দেবার জন্য। যা নারীকে যৌন বস্তুতে পরিণত করে। তবে কেন পর্দায় এমনভাবে নিজেদের তারা উপস্থাপন করছে তার কারণ হিসাবে যে বিষয়টি উঠে আসে তা হলো দর্শক-চাহিদা। তবে এই দর্শক কি শুধু দর্শক নাকি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারী-বিদ্বেষী ও নারী-উপভোগ্য চোখ, সে বিষয়টি বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এটিই ক্ষমতায়নের সাথে উপস্থাপনার সম্পর্ক।

## ভারতীয় ধারাবাহিকের সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভাবঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট পারিবারিক জীবনে প্রভাব

ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে ভারতীয় সিরিয়ালের প্রভাব কতটা তা কিছু পারিবারিক অনুষ্ঠানের ধরন খেয়াল করলে বোঝা যাবে। যেমন:

### বার্থ ডে পার্টি

জন্মদিন হলো মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। এক সময় দেখা যেত জন্মদিনে সকালে মা পায়েস বানিয়ে ছেলে-মেয়েদের খাওয়াত। তারপর দুপুরে ভালো খাবার খাওয়া। এসব আমাদের মত দরিদ্র দেশের মানুষের বাস্তবতার সাথে ঠিক খাপ খায় না। তবে অনেকক্ষেত্রে সমাজে এখন জম্মদিনের পার্টির আয়োজন, মিডিয়া বা পর্দাকেও হার মানায়। বাস্তবিক জীবনে মানুষ কল্পনার জগতে এতোটা নিমজ্জিত হয়ে গেছে যে, অনেক সময় দেখা যায় জীবনের জন্য অপরিহার্য জিনিসের থেকে লোক দেখানো বিষয়কে আমরা বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। এর পেছনে রয়েছে ভিজুয়্যাল মিডয়াগুলোর উপস্থাপন, বার্থ ডে পার্টি তার মধ্যে একটি। এখন জন্মদিন পালন মানেই হলো কেক কাটা, পার্টি করা, বন্ধুদের রেস্টুরেন্টে খাওয়ানো, তা তার সাধ্যের মধ্যে থাকুক আর না-থাকুক। এসব অনুষ্ঠানের খরচ মিটানো বা আয়োজনের জন্য অনেক সময় সন্তানরা বাবা মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার পর্যন্ত করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এসব নিয়ে পারিবারিক কলহও সৃষ্টি হয়। যেমন: স্বামী যদি স্ত্রীর জন্মদিন মনে রাখতে না পারে বা তাকে সারপ্রাইজ না দেয় সেক্ষেত্রে অনেক সময় ঝগড়া-বিবাদ হয়। এসব বিষয় কিন্তু আমাদের সমাজ সংস্কৃতির মূল অংশ নয়। যেমন ফুল দিয়ে ঘর সজ্জিত করে, হরেক রকমের মোমবাতি প্রজ্বলন করে স্বামী স্ত্রীকে চমকে দেবে, এই যে হাইপার রিয়াল জগত নারীদের মনে তৈরি করছে তার পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করছে ভারতীয় সিরিয়ালগুলো। বেশিরভাগ সিরিয়ালগুলোতে এমন দৃশ্যায়ন খুবই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এসব বিষয় আরো বেশি প্রভাব বিস্তার করে। উত্তরদাতা হীরা আক্তার নিজ কন্যার কথা উল্লেখ করেন যে, তার সন্তান আবদার করেছে যে, এবারের জন্মদিনে তাকে 'বারবি' পুতুল কেক কিনে দিতে হবে, যেটা সে কোনো-এক সিরিয়ালে দেখেছে।

### বাচ্চাদের অনুষ্ঠান

আরো কিছু বাচ্চাদের অনুষ্ঠান আছে যেমন, এখন বাচ্চাদের 'বেবি সাওয়ার', মুখে ভাত এগুলো প্রধানত সনাতন ধর্মের অনুষ্ঠান ছিল। কিন্তু বর্তমানে সিরিয়ালগুলোর দরুণ তা উচ্চবিত্তদের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এখন বেশ আয়োজন করে এসব অনুষ্ঠান করা হয়। উত্তরদাতা শারমিন আক্তার বেশ অভিজাত পরিবারের হওয়ায় তার কাছে এসব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানা যায়। তিনি বলেন, "তার বাচ্চার মুখে ভাত অনুষ্ঠান বেশ জাঁকজমক করে করা হয়। সকল আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করা হয়।" এসব উচ্চবিত্ত অনুষ্ঠান মানুষের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৈরি করে দেয়। যা শিশুদের মনেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

### সামাজিক অনুষ্ঠান

সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে বিয়ে। পাড়াগাঁয়ে বিয়ে শুধু একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবারের নয় বরং সেই পুরো পাড়ার সকলের আনন্দের অনুষ্ঠান। বিয়েতে পাড়ার মানুষ নিজ দায়িত্বে সবাই মিলে কাজ করে অনুষ্ঠান সফল

করে। সে সময় সখিরা বা ঠাট্টা সম্পর্কের আত্মীয়রা মিলে গায়ে হলুদ মাখাত, হাতে মেহেদি দিয়ে দিত, নানা গীত গেয়ে হাসি তামাশার মধ্য দিয়ে বিয়ে সম্পন্ন হতো। এমনটাই ছিল বাংলার বিয়ের চিত্র। এমনটাই আমরা সাহিত্যের পাতায়ও খুঁজে পাই। যেখানে নেই কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নেই লোক-দেখানো বিষয়। তবে বর্তমানের প্রেক্ষাপট একদমই ভিন্ন। এখন বিয়ে মানে অনেকটা শুটিং টাইপ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিয়ের সব অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দেওয়া হয় কমিউনিটি সেন্টার বা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টকে। বিয়ে উদ্‌যাপনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন:

**ফটোগ্রাফি**

বিয়ের আগে কনে ব্রাইড, বউ সেজে বিভিন্ন ফটো শপে বা পার্কে গিয়ে ছবি তোলে, সাথে বরও থাকে। আর এসবের জন্য এক শ্রেণির ফটোগ্রাফারির উদ্ভব হয়েছে। যাকে বলা হয় প্রি-ওয়েডিং ফটোগ্রাফি।

**মেহেদি ও হলুদ**

এখন বিয়েতে পাঞ্জাবীদের মত মেহেদি হলুদ ও সংগীতের অনুষ্ঠান আলাদা হয়। এগুলোর অনুষ্ঠান বিয়ের থেকে কম জাঁকজমকপূর্ণ নয়। আর এসব প্রচলন চালু হয় মূলত ভিজুয়্যাল মাধ্যমগুলোর বদৌলতে। উত্তরদাতা নীলা আহমেদ, খুব সম্প্রতি যার বিবাহ হয়েছে, তিনি নিজের বিয়ের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে বলেন, "আমার বিয়েতে একদম হিন্দি সিরিয়ালের মত সব অনুষ্ঠান হয়েছে যেমন, মেহেদি অনুষ্ঠান, নাচ-গান, গায়ে হলুদ, ফটোগ্রাফি, যা ছিল আমার লাইফের সবচেয়ে ভালো মুহূর্তগুলোর একটি"। সাজের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি জানান, চার দিন তিনি পার্লারে সেজেছেন। আর তার বিয়ের গয়না, বেনারসী কেনা হয় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত হতে। বর্তমানে এটা একটা প্রচলন হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে উচ্চবিত্তদের সাধারণত বিয়ের কেনাকাটা দেশের বাইরে থেকে ক্রয় করতেই বেশি পছন্দ করেন। এখন, বিয়ের অনুষ্ঠান বিশেষত শহর এলাকায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে কমিউনিটি সেন্টার বা পার্টি সেন্টারে, যা ধীরে ধীরে গ্রাম অঞ্চলেও প্রচলিত হতে শুরু করেছে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে লোক দেখানোর অনুষ্ঠানের আড়ালে বিয়ের চিরাচরিত আসল আমেজটাই যেন হারিয়ে গেছে। যেমন: বিয়েতে বড়দের হলুদ মাখানো এবং দোয়া করা আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির অংশ। এছাড়া একসময় বিয়েতে দাদি, নানি সম্পর্কের নারীরা গীত (গান) গেয়ে ও নেচে বিয়ে বাড়ি মুখরিত করতেন। যা ফটোগ্রাফির আলোর ঝলসানি আর ডিজে গানের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

**বিয়ে বাজার**

এছাড়া গয়নার দোকান বা বিয়ের পোশাকের দোকানগুলোতে গেলে আরো ভালোভাবে দেখা যায়, সিরিয়াল কতটা প্রভাবিত করছে আমাদের। এসব দোকানে সিরিয়ালের নায়িকাদের গয়না এবং পোশাক কপি করা হয় বা ভারত থেকে আমদানি করা হয়। এছাড়া সাজ সজ্জার ক্ষেত্রেও তরুণীদের প্রথম পছন্দ রয়েছে ভারতীয় পণ্য।

**অন্যান্য উৎসব**

আমাদের দেশের স্বকীয়তা বোঝায় এমন উল্লেখযোগ্য কিছু উৎসব হচ্ছে, নবান্ন উৎসব, পৌষ-সংক্রান্তি, চৈত্র-সংক্রান্তি, বৈশাখ, হালখাতা, বর্ষা উৎসব, পৌষ মেলা, পহেলা ফাল্গুন, নৌকা

বাইচ, বাউল উৎসব, বিভিন্ন গানের উৎসব। আমাদের সংস্কৃতির মূল উপজীব্য ছিল এসব উৎসব। এক এক উৎসবের পিছনে ছিল এক-একটি গল্প বা কাহিনি, যা ধার করা নয় বরং আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত। তাই তো বাঙালি পরিচিত ছিল উৎসব-প্রিয় জাতি হিসাবে। আধুনিকতার জাঁতাকলে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সেসব দিন। এখন সেসব উৎসব হয় তবে তা কতটা আমাদের নিজস্ব তা দেখার বিষয়। নিজেদের এসব উৎসবে যেমন প্রাণের টান রয়েছে, ধার করা এসব উৎসবে রয়েছে জাঁকজমকতা আর লোক দেখানোর প্রবণতা। বাঙালির উৎসবে এখন দখল করে নিয়েছে, 'থার্টি ফার্স্ট নাইট' 'ভালোবাসা দিবস' 'প্রোপোজ ডে', 'ব্যাচেলর পার্টি', 'বার-বি-কিউ পার্টি', 'গালা ডিনার' ইত্যাদি। যার কোনোটিই আমাদের সংস্কৃতির অংশ নয়।

এসবের মাঝে যে দু'একটি নিজস্ব উৎসব দেখা যায়, যেমন: 'সাকরাইন', 'পহেলা বৈশাখ', 'পহেলা ফাল্গুন' তার টিকে থাকার পেছনে অবদান পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার। 'পহেলা ফাল্গুন' মনে করিয়ে দেয় হলুদ শাড়ি, সবুজ শাড়ি বা জামা কাপড়ের কথা। আর 'পহেলা বৈশাখ' মানেই সাদা শাড়ি লাল পাড়। এসব উৎসবকে ঘিরে নানা ব্র্যান্ডের শুরু হয় পোশাক প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা। যেখানে উৎসবের আসল আমেজটা বন্দী হয়ে পড়ে পুঁজিবাদের জালে। উত্তরদাতা অমি আক্তার ও রুবা তালুকদার এ সম্পর্কে বলেন, "বৈশাখে শাড়ি কিনতে না পারলে মনেই হয় না নতুন বছর শুরু হলো"। অর্থাৎ উৎসবগুলো খুব বেশি বাণিজ্যিক হয়ে গেছে। আর এর পেছনে বড় অবদান রাখছে দৃশ্যমান মিডিয়াগুলো। হলি আসলে সাদা শাড়ি বা জামা কাপড় পরে রং মাখা এই থিম আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে এসব সিরিয়ালগুলো। উত্তরদাতা অমি আক্তার বলেন, "সিরিয়ালগুলোতে যেকোনো উৎসব এমনভাবে প্রেজেন্ট করা হয়, যা দেখেই আকর্ষণ তৈরি হয়।"

### পোশাকের কাটিং

ভারতীয় সিরিয়ালের জনপ্রিয় নামধারী পোশাকই কেবল বাজার দখল করে আছে তা নয়। সিরিয়ালগুলোতে নায়িকার পরিহিত পোশাক ও হুবহু কপি করা হয় এখন। সিরিয়ালের নায়িকা চরিত্রের পোশাকের আদলে টেইলার্সের কাছে নিজের পোশাক তৈরি করে দেওয়ার আবদার করে থাকেন অনেকেই।

### ধর্মীয় উৎসব

ধর্মীয় উৎসবের ক্ষেত্রেও ভারতীয় সিরিয়ালগুলো বেশ প্রভাব বিস্তার করে। যেমন: হোলি, দীপাবলি। কিছুদিন আগের হোলি, দ্বীপাবলি এতোটা জাঁকজমকভাবে পালন করা হতো না। কিন্তু বর্তমানে এই অনুষ্ঠানটি বেশ জাঁকজমকভাবে পালন করা হয়। হোলিতে এখন সাদা শাড়ি পাঞ্জাবি পরতে হবে, অনেক রং মাখতে হবে এসব যেন সিরিয়ালের শিখিয়ে দেওয়া ব্যাপার। আবার ইদ, পুজোয়ও এসব সিরিয়ালের প্রভাব কম নয়। ইদ বা পুজোর বাজার প্রায় পুরোটাই দখল করে রাখে সিরিয়ালের নামধারী ভারতীয় পোশাক।

### উপসংহার

পুরুষত্ব, নারী-বিদ্বেষ এবং নারী অধস্তনতার মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই তিনটি বিষয়ের সাথে জড়িত আছে পিতৃতান্ত্রিকতা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নারী ও পুরুষের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্কগুলো কীরূপ হবে, তা একভাবে নির্ধারণ করে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে সমাজে পুরুষেরা নারীদের ওপর শাসন যন্ত্র চালায়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নারীরা তো প্রতিনিয়ত

সহিংসতার শিকার হচ্ছেই, আবার টিভি পর্দায়ও তারা উপস্থাপিত হচ্ছে নানা বৈষম্যমূলক চরিত্রে, যা নারীদের অধস্তন করে রাখারই ইঙ্গিত দেয়। নারীর প্রতি সহিংসতার মূল, তাই গ্রোথিত আছে আমাদের সমাজেই। ভারতীয় সিরিয়ালগুলো দিন দিন এতো বেশি নারী-কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে যে তা নারীদের মনে অনেক বেশি প্রভাব ফেলছে। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে নারীরা সিরিয়ালের জগৎটাকে বাস্তব জগৎ বলে মনে করছে। তাই তারা সিরিয়ালে দেখানো ফ্যাশন ও জীবনযাত্রা তাদের বাস্তব জীবনে অনুকরণ করার চেষ্টা করছে। প্রকৃতপক্ষে, তারা একটি অতিবাস্তব জগতে বসবাস করছে, যার প্রভাব বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে বেশ লক্ষণীয়ভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে।

## তথ্যনির্দেশ


১. মালভিলরা, ফাহমিদুল হক অনূদিত *চোখের আরাম ও বর্ণনাধর্মী চলচ্চিত্র* (*ঢাকা: যোগাযোগ*, সংখ্যা ৮, ২০০৭) পৃ. ১২০-১২৭।

২. হল, স্টুয়ার্ট, ফাহমিদুল হক অনূদিত *রিপ্রেজেন্টেশন*, (*ঢাকা: যোগাযোগ*, সংখ্যা ৮, ২০০৮) পৃ. ২৮-৩২।

৩. Razu, Shaharior Rahman, Noshin Yeasmin, and Sheikh Shareeful Islam, ‘‘Impact of Indian drama serials on Bangladeshi culture: A qualitative study based on perceived situation and risk factors in urban setting’’, *Social Communication. Online Journal* 2 (18) 2018, p. 59-69.

৪. Kabir, Rasel M., ‘‘Underrepresentation of gender in TV Series: Implications on the real-life relationship’’ (New Delhi, India: Iksad Publication 2018) p.92-96.

৫. Roy, Debanjali. ‘‘Reality or myth: Representation of women in Indian TV serials’’, India, *Global Media Journal: Indian Edition* 3.1 2012, p. 1-2.

৬. Baudrillard, Jean. *Simulacra and simulation* (USA: University of Michigan press, 1994) p.12-15.

৭. হল, স্টুয়ার্ট, *op.cit.,*পৃ. ২৮-৩২।

৮. মালভি, লরা, *op.cit.,*পৃ. ১২০-১২৭।

৯. Baudrillard, *op.cit.*, p.12-15.

১০. দৈনিক প্রথম আলো (অনলাইন পোর্টাল), ‘পাখি’ না পেয়ে এবার গাইবান্ধায় আত্মহত্যা, গাইবান্ধা প্রতিনিধি (ঢাকা: ২৭ জুলাই ২০১৪) পৃ. ২০:৪।

১১. Adorno, Theodor W., *The culture industry: Selected essays on mass culture* (London and New York: Routledge, 1991) p.169-171.

১২. দৈনিক প্রথম আলো (অনলাইন পোর্টাল), *op.cit.,* পৃ. ২০:৪।



জমা প্রদানের তারিখ : ১৫.০২.২০২২

গৃহীত হবার তারিখ : ২২.০৫.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২২

# বাংলাদেশের রাজনৈতিক পোস্টার: মুক্তিযুদ্ধের শৈল্পিক হাতিয়ার

মারুফ আদনান*

**Abstract**

Political posters are posters used in elections and other political events that provide insight into a country's political landscape and preferences. One of the characteristics of these posters is that they are used to bring attention to a certain party, people, or event, as well as to convey concise information about a political figure or ideology. Poster art played an indisputable part in Bangladesh's liberation movement. The poster, as a symbol of the engagement of the then Art Institute's artists in various movements against the misrule of East Pakistan during the 1950s and 1960s, contributed to develop public opinion, disseminate knowledge, and boost the spirit of the freedom fighters. During the Liberation War, posters disseminated from the Department of Fine Arts and Design, run by the Ministry of Information and Radio of the Provisional Government, have become part of history. Eight young artists toiled under the direction of artist Kamrul Hasan to create those iconic posters. This article attempts to dive into the history of the creation of posters that influenced the liberation war and other movements before to it, as well as the role of the artists involved.

## ভূমিকা

প্রচার ও গণজ্ঞাপনের অন্যতম মাধ্যম পোস্টার। বাংলা একাডেমির সহজ বাংলা অভিধান অনুযায়ী পোস্টার শব্দের বাংলা অর্থ প্রাচীরপত্র বা দেয়ালপত্র। অর্থাৎ পোস্টার হলো জনসাধারণকে তথ্য জানানো বা প্রচারণার উদ্দেশ্যে লেখা বা ছবি সম্বলিত কোন পত্র বা কাগজ যা প্রাচীরে বা দেয়ালে সেঁটে দেয়া হয়। তবে দেয়ালে সেঁটে দেয়া ছাড়াও বিভিন্ন উপায়ে পোস্টারের ব্যাবহার হতে পারে। সম্প্রতি দেখা যায় নির্বাচনী প্রচরণার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে পোস্টার ঝুলানো হয়। যানবাহনের ভেতরে-বাইরেও পোস্টার সেঁটে দিতে দেখা যায়। এছাড়াও বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন ধরনের প্রচারণার কাজে পোস্টারের ডিজিটাল ভার্সন করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পোস্টারে একটি অঞ্চলের সংস্কৃতি ও মানুষের রুচি-অভিরুচির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার বড় একটি মাধ্যম হলো পোস্টার। ক্ষমতার প্রসার ও রাজনৈতিক অস্তিত্বের উপস্থিতি সাধারণের কাছে তুলে ধরতে পোস্টার একটি কার্যকরী মাধ্যম। বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে চেহারা পরিচিতি বা দৃষ্টি আকর্ষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ফলে পোস্টারগুলোতে চেহারা প্রদর্শনের প্রবণতা ব্যাপকভাবে লক্ষ্যণীয়। পোস্টারে প্রতিকৃতির আকারের তারতম্য বা অবস্থানের মাধ্যমে (যেমন—উপরে অভিজ্ঞ বা বেশি ক্ষমতাবান এবং নিচের দিকে অপেক্ষাকৃত নতুন বা কম ক্ষমতাবান ব্যক্তিবর্গের অবস্থান) ক্ষমতা কাঠামোর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি দেখা যায়।

লেখা ও ছবির মাধ্যমে জনগণের কাছে তথ্য সরবরাহকে আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পোস্টারে বিভিন্ন নকশা, উজ্জ্বল রঙের প্রয়োগ ও ধর্মীয় চিহ্ন বা বাক্যের ব্যাবহার লক্ষণীয় (কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দল না হওয়া সত্ত্বেও)। বাংলাদেশে নির্বাচনী প্রচারণার

*সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

পোস্টার সাদা-কালো রঙে করার আইনত বিধি-নিষেধ[১] থাকলেও ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক, অনুষ্ঠান বা বিভিন্ন দিবস কেন্দ্রিক রাজনৈতিক পোস্টারগুলো রঙিন হয়ে থাকে। রঙের ব্যাবহারে দেশের পতাকা বা দলীয় পতাকার রঙের (সাধারণত রাজনৈতিক দলগুলোর পতাকার রঙ দেশের জাতীয় পতাকার রঙের সাথে সামঞ্জস্য থাকে) ব্যাবহার প্রাধান্য পায়। পাকিস্তান আমলেও নির্বাচনী প্রচারণা ও রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পোস্টারগুলোর কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিলো। তারমধ্যে একটি— প্রার্থী হিন্দু বা মুসলমান যেই হোক, উপরের অংশে 'আল্লাহু আকবর' কথাটি লেখা থাকতো।[২]মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরের চার/পাঁচ বছর পর্যন্ত নির্বাচনী পোস্টারে শুধু প্রার্থীর নাম ও মার্কা ছাপানো থাকতো তবে এরপর থেকে প্রার্থীর প্রতিকৃতির ব্যাবহার শুরু হয়।[৩]আশির দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত নির্বাচনী পোস্টার এক বা দুই রঙের মধ্যে ছাপানো হতো তবে একই দশকের মাঝামাঝিতে এসে চার রঙে ছাপানোর প্রচলন শুরু হয়।[৪] ওই সময় পোস্টারে নান্দনিক নকশা বা অলংকরণের চল দেখা যায়।[৫]

বাংলাদেশের ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ঘটনা যেখান থেকে এই দেশের নতুন যাত্রা শুরু। মুক্তিযুদ্ধের আগের দুই দশকের মধ্যে ভাষা আন্দোলনসহ অনেক রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও অন্যায়ের প্রতিবাদে লড়াই সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার ছিলো পোস্টার। তৎকালীন আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্র-শিক্ষক যুদ্ধে যোগদানের পাশাপাশি যে যেখান থেকে পেরেছেন মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে কাজ করেছেন। অনেক শিল্পী বাংলাদেশের শরণার্থীদের সহযোগীতামূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থেকেছেন। মুক্তিযুদ্ধকে বিষয়বস্তু করে ছবির প্রদর্শনী, পোস্টার, ব্যানার, লিফলেট তৈরিসহ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখেন। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অস্থায়ী সরকারের অধিনে পরিচালিত চারুকলা ও ডিজাইন বিভাগ থেকে প্রকাশিত পোস্টারগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধির পাশাপাশি সে সময় বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরি করতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। শিল্পী কামরুল হাসানের 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' শিরোনামের পোস্টারটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক প্রভাব তৈরি করেছিলো।

'বাংলাদেশের রাজনৈতিক পোস্টার' বৃহৎ এই পরিসরের ছোট একটি অংশ হলো মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার। এই প্রবন্ধে পোস্টারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বাংলাদেশে পোস্টার শিল্পের প্রচলন এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক পোস্টারের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ও তার আগে বিভিন্ন আন্দোলনে ব্যবহৃত পোস্টারের নান্দনিকতা ও বিষয়বস্তু নিয়ে অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

## ইতিহাসে পোস্টার

প্রচার মাধ্যম হিসেবে পোস্টারের নিদর্শন বেশ পুরানোই বলা যায়। কাগজ আবিস্কারের পূর্বে কাপড়, চামড়া, পাথর বা কাঠে রাজ্যের বিভিন্ন নির্দেশনা লিখে প্রজাদের উদ্দেশ্যে প্রচার করা হতো। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় পোস্টার সদৃশ ফলক ব্যাবহারের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।[৬] বাংলায় সম্রাট অশোকের সময় নগরের বাসিন্দাদের অবগতির জন্য পাথরের ফলকে রাজার বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ খোদাই করে প্রচারের চল ছিলো বলে জানা যায়।[৭] ঐতিহাসিকভাবেও পোস্টারের দালিলিক গুরুত্ব আছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন তথ্য ও ছবি যুগ যুগ ধরে পোস্টার শিল্পের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছায়। Robin Shepherd বলেন—'Posters reflect our culture and

are like visual graphic icons of the times in which they were created'.[৮]Magdalena Ficoń লিখেন—'It is a text of culture and a message strongly rooted in a specific historical context'.[৯]

গণজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে ১৬০০ শতকে পোস্টারের চল শুরু হলেও ১৮৫৯ থেকে ১৮৬৬ সালের দিকে শিল্পী Jules Chéret (French, 1836 –1932) লিথোগ্রাফিকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক পোস্টার ছাপাই পদ্ধতি আবিস্কার করেন ও মাধ্যমটিকে শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।তিনি'থ্রি স্টোন লিফোগ্রাফি প্রসেস' পদ্ধতিতে তিন রঙের লিথো প্লেট থেকে বিভিন্ন রঙের ছাপ তৈরির পদ্ধতি ব্যাবহার করেন। ১৮৯১ সালে খ্যাতিমান শিল্পী Henri De Toulouse-Lautrec এই পদ্ধতিতে তাঁর যুগান্তকারী পোস্টার 'Moulin Rouge' অঙ্কন করেন। পরবর্তীতে পোস্টার শিল্পকে তিনি অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেন।[১০] পশ্চিমা দেশগুলোতে পোস্টারের প্রচলন বেশ আগে হলেও এই উপমহাদেশে এর প্রচলন হয় অনেক পরে। বাংলাদেশের পোস্টার সংস্কৃতির ইতিহাস তুলনামূলক আরো নবীন।

**বাংলাদেশে পোস্টারের প্রচলন**

বাংলাদেশের জন্ম ১৯৭১-এ হলেও বৃটিশ-ভারত ও পূর্ব-পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে পোস্টারের প্রচলন ছিলো। এই অঞ্চল বিভিন্ন সময় বহিরাগত দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। স্বাধীনতার লড়াই সংগ্রামে দাবি আদায় ও প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে নানা সময়ে পোস্টার, দেয়ালচিত্র, প্লেকার্ড ইত্যাদির ব্যাবহার হয়ে আসছে। শাওন আকন্দ উল্লেখ করেন—'ব্রিটিশ ভারতে স্বাধিকার আন্দোলনের সময় থেকেই এদেশে আধুনিক পোস্টারের সূত্রপাত বলে একটি মত প্রচলিত আছে'[১১]এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের অত্যাচারের প্রতিবাদে 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' এই বক্তব্য সম্বলিত অনেক পোস্টার প্রকাশিত হয়েছিলো।[১২] দেশভাগের পর মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয় থেকে পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাসের উপর জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসানের আঁকা পোস্টার নিয়ে বর্ধমান হাউসে (বর্তমানে বাংলা একাডেমি) একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিলো।[১৩]শিল্পকলার প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরা এই প্রদর্শনী আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো।[১৪] দেশ ভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে সরকারিভাবে শিল্পকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৪ আগস্ট, ১৯৪৮ সালে ভারত উপমহাদেশে মুসলিম বিজয় ও পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাসকে বিষয়বস্তু করে একশত পোস্টার নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিলো।[১৫] পরবর্তীতে জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার ও বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণের বিভিন্ন আন্দোলনে পোস্টার, দেয়াল লিখন, প্লে-কার্ড ইত্যাদি মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করতো। ১৯৪৮-এর মার্চ মাসে জিন্নাহ'র উক্তি—'Urdu and only Urdu will be the State Language of Pakistan'; এরপর ঢাকার রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ঐ সময় শিল্পী আমিনুল ইসলাম এই বক্তব্যের প্রতিবাদে পোস্টার তৈরি করেছিলেন।[১৬] বামপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত তকিউল্লার ছোট ভাই মর্তুজা বশীরকে আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন রাজনৈতিক পোস্টার আঁকা শেখার উদ্দেশ্যে।[১৭] পরবর্তী সময়ে তিনি শিল্পের বিভিন্ন ধারায় কাজ করেন এবং বাংলাদেশের একজন প্রভাবশালী শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

৫২-এর ভাষা আন্দোলনসহ পাকিস্তান আমলে প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রতিবাদ ও দাবি আদায়ের অন্যতম হাতিয়ার ছিলো পোস্টার। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ সালের হামিদুর রাহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ১৯৬৬সালের ৬ দফা দাবি উত্থাপন, ৬৯'র ১১ দফা দাবি, ৭০'র নির্বাচন ও ৭১'র স্বাধীনতা সংগ্রামসহ বাংলাদেশের প্রতিটি আন্দোলনে পোস্টার একটি বড় ভূমিকা রেখেছে।শিল্পী বীরেন সোম বলেন—'১১ দফা দাবি আদায়ের আন্দোলনের সাথে তৎকালীন আর্ট কলেজের ছাত্ররা যুক্ত হয়েছিলেন'।[১৮] বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে মিটিং মিছিলে আন্দোলনের বিষয় তুলে ধরার জন্য ব্যানার, পোস্টার ইত্যাদি লেখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো আর্ট কলেজের ছাত্রদের উপর। রাত জেগে আর্ট কলেজের হোস্টেলে পোস্টার লেখা হতো।[১৯] প্রতিদিন এক রিম কাগজে পোস্টার লেখা হতো।[২০] সে সময় আর্ট কলেজের ছাত্র বীরেন সোম, শহীদ কবির, মঞ্জুরুল হাই, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, রেজাউল করিম, বিজয় সেন, স্বপন চৌধুরী, অলক রায়, হাসি চক্রবর্তী, ওয়াদুদ, মোফাজ্জল, মনসুরুল করিম, সিরাজ, আনসার আলী, নাসির বিশ্বাসসহ অনেক ছাত্র রাত জেগে পোস্টার তৈরির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।[২১] স্বাধীনতার আগে ও পরে প্রতিটি আন্দোলনে প্রতিবাদের অন্যতম মাধ্যম ছিলো পোস্টার। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে পোস্টারের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

## মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার পোস্টার

রাষ্ট্রীয় সমস্ত বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে জনমত তৈরি করার পেছনে পোস্টারেরভূমিকা ছিলো। ১৯৭০ সালে ৭ই ডিসেম্বর তৎকালীন অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রথম এবং শেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনী প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। দাবির পক্ষে বিভিন্ন লেখা সম্বলিত পোস্টার নিয়ে জনগণ সমাবেশে যোগ দেয়। নির্বাচনের আগে প্রচার প্রচারণার জন্য ওই সময় প্রচুর পোস্টার ছাপা হয়।

চিত্র০১: বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ছয়দফা দাবি উত্থাপন ও পোস্টারের মাধ্যমে জনসাধারণের সমর্থন
ছবির উৎস: বিবিসি বাংলা (অনলাইন), ডিসেম্বর ৭, ২০২০

নির্বাচনে জয় লাভ করার পরও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। তৎকালীন পাকিস্তানের সরকারের নীতি অনুযায়ী দুই অঞ্চলের (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) অর্থনৈতিক বৈষম্য চরমে উঠলেও তা স্বীকার করতে সরকার রাজি ছিলো না, উল্টো মিথ্যাচার করা হচ্ছিলো। গবেষক শ্যামলী ঘোষ উল্লেখ করেন—'পূর্ব-পাকিস্তানকে বন্ধক রেখে বৈদেশিক ঋণ

নিয়ে ঋণের ৮০ শতাংশ অর্থই ব্যয় করা হচ্ছিলো পশ্চিম-পাকিস্তানের উন্নয়নে'।[২২] অথচ বৈদেশিক আয়ের ৭০ শতাংশই উপার্জিত হতো পূর্ব-পাকিস্তানে উৎপাদিত পণ্য থেকে।[২৩]

৭০'র নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রচারণায় 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' শ্লোগানে নূরুল ইসলামের পরিকল্পনায় হাশেম খান একটি পোস্টার নকশা করেন।[২৪]পোস্টারে উল্লেখিত তথ্যথেকে সহজেই অনুমান করা যায়, অর্থনৈতিকভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর চরম বৈষম্যমূলক আচরণের চিত্র। পোস্টারে বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের আয়-ব্যয়, বৈদেশিক সাহায্য, আমদানি, চাকরির সুযোগ, দ্রব্যমূল্য এমন দশটি বিষয়ের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হয়েছে যেখানে সব খাতেই বাংলাদেশকে ঠকানোর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

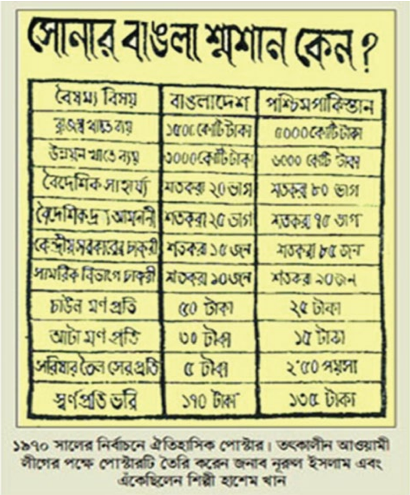
সোনার বাঙলা শ্মশান কেন?

| বৈষম্য বিষয় | বাঙলাদেশ | পশ্চিমপাকিস্তান |
|---|---|---|
| রাজস্ব খাতে ব্যয় | ১৫০০ কোটি টাকা | ৫০০০ কোটি টাকা |
| উন্নয়ন খাতে ব্যয় | ৩০০০ কোটি টাকা | ৬০০০ কোটি টাকা |
| বৈদেশিক সাহায্য | শতকরা ২০ ভাগ | শতকরা ৮০ ভাগ |
| বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী | শতকরা ২৫ ভাগ | শতকরা ৭৫ ভাগ |
| কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী | শতকরা ১৫ জন | শতকরা ৮৫ জন |
| সামরিক বিভাগে চাকুরী | শতকরা ১০ জন | শতকরা ৯০ জন |
| চাউল মণ প্রতি | ৫০ টাকা | ২৫ টাকা |
| আটা মণ প্রতি | ৩০ টাকা | ১৫ টাকা |
| সরিষার তৈল সের প্রতি | ৫ টাকা | ২.৫০ পয়সা |
| স্বর্ণ প্রতি ভরি | ১৭০ টাকা | ১৩৫ টাকা |

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ঐতিহাসিক পোস্টার। তৎকালীন আওয়ামী লীগের পক্ষে পোস্টারটি তৈরি করেন জনাব নূরুল ইসলাম এবং এঁকেছিলেন শিল্পী হাশেম খান

চিত্র০২: ১৯৭০ সালে নূরুল ইসলামের পরিকল্পনায় হাশেম খানের করা পোস্টার
ছবির উৎস: বণিকবার্তা (বিশেষ সংখ্যা), আগস্ট ১৫,২০২১

পোস্টারে তালিকা আকারে এইসব তথ্য তুলে ধরার কারণে সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে। হাশেম খানের লেখায় উল্লেখ পাওয়া যায়—'১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে দুই-তিন মাস ধরে তাঁরা অনেক পোস্টার এঁকেছিলেন'।[২৫] নূরুল ইসলাম দুই রাত জেগে এই পোস্টারের খসড়া তৈরি করেন।[২৬] শেখ মুজিবকে খসড়াটি দেখানো হলে তিনি বার বার পড়ে কিছুটা সংশোধন করে দেন এবং দ্রুত ছাপানোর জন্য তাগিদ দেন।[২৭] শিল্পী হাশেম খানের লিখনী থেকে আরো জানা যায় যে— 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' পোস্টারটি নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে ছোট আকারে প্রিন্ট করে ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের কাছে বিলি করা হয়, সাথে বড় আকারের পোস্টার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয় যাতে জনগণ বুঝতে পারে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলার মানুষের সাথে কেমন বৈষম্যমূলক আচরণ করে।[২৮] এর ফলে পোস্টারটির প্রভাব সারাদেশ তো বটেই আন্তর্জাতিকভাবেও সাড়া তৈরি করতে সমর্থ হয়।[২৯] গবেষক শ্যামলী ঘোষ উল্লেখ করেন—'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' শিরোনামের পোস্টারটি ৭০-এর নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো।[৩০] ১৯৭০-এর নির্বাচনে স্বৈরশাসক, সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্প্রদায়িক ধর্মভিত্তিক মোর্চার দলগুলোর পতন ঘটে এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

নিয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে এই পোস্টারটি মুক্তিযুদ্ধাদের জয় ছিনিয়ে আনতে প্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছে।[৩১]১৯৭১ সালে ১৬ইই মার্চ 'স্বা-ধী-ন-তা' শিরোনামে 'বাংলা চারু ও কারু শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ' নামের শিল্পীদের একটি সংগঠন স্বাধীনতার দাবিতে সমাবেশ ও মিছিল করে।[৩২] মিছিলের নেতৃত্ব দেন জয়নুল আবেদিন।[৩৩] পোস্টার-ব্যানার নিয়ে মিছিলে শিল্পী, লেখক ও নানা শ্রেণির মানুষ যোগ দেয়।[৩৪] মিছিলে একটি পোস্টার উল্লেখযোগ্য, যাতে কার্টুনের মাধ্যমে পাকিস্তানী সৈনিকদের ব্যঙ্গ করা হয়েছিলো। খালি গায়ে এক পায়ে জুতো ও বন্দুক কাঁধে পলায়নরত এক সৈনিকের দিকে এক কিশোর জুতো ছুঁড়ে দিয়ে বলছে—'তোর জুতোটাও নিয়ে যা'।[৩৫] তৎকালীন সরকারি চারু ও কারুকলা কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেন ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন 'বাংলা চারু ও কারু শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ' গঠনে ভূমিকা রাখেন এবং সংগঠনটির আহ্বায়ক ছিলেন শিল্পী মর্তুজা বশীর ও কাইয়ুম চৌধুরী ।[৩৬]

চিত্র ০৩: ১৯৭১ সালে ১৬ মার্চ বাংলার মানুষের মুক্তির আকাঙ্খায় 'বাংলা চারু ও কারু শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ' আয়োজিত 'স্বা-ধী-ন-তা' শীর্ষক মিছিল
ছবির উৎস: ফটোগ্রাফার- রশীদ তালুকদার, DW/M

মুক্তিযুদ্ধে চলাকালীন সময়ে গঠিত অস্থায়ী/প্রবাসী/মুজিবনগর সরকারের অধীনে পরিচালিত চারুকলা ও ডিজাইন বিভাগ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো। মুক্তিযুদ্ধেচারুশিল্পীদের বিশেষ অবদান বিষয়ে প্রখ্যাত শিল্পী বীরেন সোম লিখেন—'প্রবাসী সরকারের চারুকলা ও ডিজাইন বিভাগে কামরুল হাসানের নেতৃত্বে বীরেন সোম, নিতুন কুণ্ডু, দেবদাস চক্রবর্তী, নাসির বিশ্বাস ও প্রণেশ মণ্ডল যোগ দেন'।[৩৭] কামরুল হাসানের নির্দেশনায় সবাই ব্যানার, পোস্টার, লিফলেট, কার্টুন ইত্যাদি আঁকতেন, পোস্টার আঁকার ক্ষেত্রে বেশ কয়েক ধাপে কাজ করা হতো।[৩৮] 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' শীর্ষক জগদ্বিখ্যাত পোস্টারটি কামরুল হাসান তিন-চারবার পরিবর্তন করে অবয়বটি চূড়ান্ত করেছিলেন।[৩৯] তাঁর নেতৃত্বে প্রবাসী সরকারের সব নকশাবিদরা 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খৃষ্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান-আমরা সবাই বাঙালী'; 'সদাজাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী'; 'বাংলার মায়েরা, মেয়েরা সকলেইমুক্তিযোদ্ধা'; 'এক একটি বাংলা অক্ষর অ আ ক খ এক একটি বাঙালীর জীবন'; 'বাংলাদেশের সম্পদ বৃদ্ধি করুন পাকিস্তানি পণ্য বর্জন করুন'; 'বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক ছাত্র যুবক সকলেই আজ মুক্তিযোদ্ধা'; 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', 'রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেব' শীর্ষক পোস্টারগুলো তৈরি করেছিলেন যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অমূল্য দলিলে পরিণত হয়েছে।[৪০]

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ঘৃণিত শাসক ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নারকীয়গণহত্যা শুরু হয়। ক্ষোভে জ্বলে উঠে সর্বস্তরের মানুষ। প্রতিবাদ স্বরূপ শিল্পী কামরুল হাসান 'ইয়াহিয়া এই জানোয়ারটা আবার আক্রমণ করতে পারে' শিরোনামে প্রতিকৃতি নির্ভর দশটি পোস্টার আঁকেন এবং পোস্টারগুলো শহিদ মিনারে জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।[৪১] যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে কামরুল হাসান পশ্চিমবঙ্গে চলে যান এবং মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগের দায়িত্ব নেন।[৪২] পরবর্তী কালে সেখানে তাঁর সাথে নিতুন কুণ্ডু, দেবদাস চক্রবর্তী, বীরেন সোম, নাসির বিশ্বাস, প্রানেশ মণ্ডলসহ আটজন শিল্পী একযোগে কাজ শুরু করেন।[৪৩] কামরুল হাসানের 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' শিরোনামের পোস্টারটি ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানের ঘৃণিত শাসক ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তানি সৈনিকেরা বাংলার জনগণের উপর দানবীয় যে অত্যাচার চালিয়েছিলো তারই প্রতীকী রূপ কামরুল হাসান এই পোস্টারে তুলে ধরেছেন। ইয়াহিয়া খানের মুখাবয়ব অবলম্বনে তিনিদুটি পোস্টার করেছিলেন।[৪৪] একটি পোস্টারে ইয়াহিয়া খানের রক্তমাখা মুখমণ্ডল, বড় কান ও রক্তাক্ত দাঁতে যেন রক্তচোষা দানব। আরেকটিতে বড় রক্তচক্ষু, জানোয়ারের মতো কান ও দুই দিকে ঠোঁটের কোনায় বড় চারটি দাঁত বেরিয়ে আছে।[৪৫]

চিত্র ০৪: প্রবাসী সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আর্ট ও ডিজাইন সেন্টারে কামরুল হাসানের আঁকা যুগান্তকারী পোস্টার 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে'

এই পোস্টার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিকামী বাঙ্গালিকে পাকিস্তানি ঘাতকদের বিরুদ্ধে যেভাবে রুখে দাঁড়াতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলো আজো সেভাবে উজ্জীবিত করে। এই পোস্টারটির মধ্য দিয়ে ঘৃণ্য ও বর্বর শাসক ইয়াহিয়া খানের চেহারা বাংলার মানুষের মনেচিরকাল দাবন রূপে ভেসে উঠতে থাকবে।

অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয়ের হয়ে পোস্টার তৈরির সময় বেশির ভাগ লেটারিং শিল্পী বীরেন সোম ও প্রাণেশ কুমার মণ্ডল করতেন।[৪৬]ড্রইংপ্রধান নকশাগুলো করতেন প্রাণেশ কুমার মণ্ডল, নাসির বিশ্বাস ও নিতুন কুণ্ডু।[৪৭] সে সময় আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক নূরুল ইসলামের কথায় বীরেন সোম ও চক্রবর্তী যৌথভাবে কিছু পোস্টার নকশা পরিকল্পনা ও অঙ্কন করেন। তার মধ্যে 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো', 'রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেব' শিরোনামের পোস্টার দুটি উল্লেখযোগ্য।[৪৮]

যুদ্ধ চলাকালীন নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু পোস্টার প্রিন্ট করে সারাদেশসহ দেশের বাইরে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। শিল্পী নাসির বিশ্বাস অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয়ে কাজের স্মৃতিচারণ করে বলেন, ঐ সময় অনেক পোস্টার করা হলেও পনের থেকে ষোলটা ছাপানো হয়েছিলো।[৪৯] ওসব পোস্টারের হাজার হাজার কপি প্রিন্ট করে মুক্তাঞ্চল, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ও বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হতো।[৫০] ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হতো।[৫১] পোস্টারগুলো সাধারণ মানুষের মনে আশার সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলো। মানুষ উজ্জীবিত হয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতো। ঐ সময়ে করা শিল্পী নিতুন কুণ্ডুর 'সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী' ও শিল্পী প্রাণেশ কুমার মণ্ডলের 'বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা' শিরোনামের দুটি পোস্টার অনেকটা কাছাকাছি কম্পোজিশান ও রঙে করা হয়েছিলো। একটিতে একজন পুরুষ ও আরেকটিতে একজন নারীর অবয়ব লক্ষ্য করা যায়। দুজনের হাতে আছে বেয়োনেট যুক্ত বন্দুক, চেহারায় দৃঢ়তা, দিগন্তে দৃষ্টি ও বলিষ্ঠ শারীরিক গড়ন। মাটি রঙা অবয়বের উপর কালো রঙের কঠিন কাঠামোতে শারীরিক সামর্থ্যের বাইরে যেনো ঠিকরে পড়ছে তেজোদৃপ্ত প্রাণশক্তি। দুইটি পোস্টারে নারী-পুরুষ উভয়ই পাহাড়ের মতো অটল অবস্থানে দাঁড়িয়ে যেনো শত্রুর চোখ রাঙানোকে দারুণভাবে প্রতিহত করছে। অরুণ বসু লিখেন—

> '...দুইটি প্রতিকৃতিতেই যেন বাংলার পলিমাটির পেলব রূপ, অথচ বজ্রমুঠিতে ধরা রাইফেল। চোখেমুখে দৃঢ় প্রত্যয়। চিরন্তন বাঙালি মানসের বজ্র-কুসুম রূপ। এই শিল্পকীর্তি যুগ যুগ ধরে বাঙালির লড়াই, সংগ্রাম অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে'।[৫২]

চিত্র ০৫: বামপাশ থেকে ধারাবাহিকভাবে শিল্পী নিতুন কুণ্ডু, শিল্পী প্রাণেশ কুমার মণ্ডল ও শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তীর আঁকা পোস্টার

এই দুইটি পোস্টারের পাশাপাশি দেবদাস চক্রবর্তীর 'বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ বাংলার খৃষ্টান বাংলার মুসলমান আমরা সবাই বাঙালী' এই শিরোনামে করা পোস্টারটিও ব্যাপক সাড়া জাগায়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা ও শ্যামল গুপ্তের সুর করা গানের প্রথম তিনটি লাইন অবলম্বনে এই পোস্টারের নকশা করেনতিনি। পোস্টারে গানের কথা মূখ্য থাকলেও দুই রঙে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ চার ধর্মের উপসনালয়ের কাঠামোগত অবয়বকে সহজভাবে পাশাপাশি উপস্থাপন করেন। গানের মূলভাবের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে পোস্টারের নকশায় হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ

ও খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতীকী উপস্থাপন করেন এবং মানুষের ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে নৃতাত্ত্বিক ও জাতিগত পরিচয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এই পোস্টারে লক্ষণীয়, চিরায়ত পলিমাটির ভূমির উপর ভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসে ও মতাদর্শের জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যকে এক বাঙালি পরিচয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দেখিয়ে চিত্রিত করেছেন শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী। স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে বাঙালির ঐক্যবদ্ধতা সবচেয়ে বড় শক্তি ছিলো যা এই পোস্টারটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

চিত্র ০৮: প্রথম পোস্টারটি শিল্পী বীরেন সোমের আঁকা এবং দ্বিতীয় পোস্টারের শিল্পী অজানা

অস্থায়ী সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের চারুকলা ও ডিজাইন বিভাগ থেকে করা অসংখ্য পোস্টারের মধ্য থেকে বেশ কয়েকটি পোস্টার বাংলাদেশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। তার মধ্যে বীরেন সোমের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্র করে ও তাঁর ভাষণের কালজয়ী কথা নিয়ে করা একটি পোস্টার মুক্তির সংগ্রামকে বেগবান করতে ভূমিকা রেখেছিলো। পোস্টারটির নকশায় দেখা যায় গণসমাবেশে বঙ্গবন্ধু তর্জনী উঁচিয়ে ভাষণরত, যেনো বজ্র কণ্ঠে উচ্চারণ করছেন' '...এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', 'রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেবো'; 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো'। একই সময় করা পোস্টারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরো কয়েকটি হলো 'বাংলাদেশের সম্পদ বৃদ্ধি করুন পাকিস্তানী পণ্য বর্জন করুন', 'এক একটি বাংলা অক্ষর অ আ ক খ এক একটি বাঙালীর জীবন' এবং 'বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক ছাত্র যুবক সকলেই আজ মুক্তিযোদ্ধা'। ঐ সময় বেশির ভাগ পোস্টারই দুই রঙে (লাল ও কালো) ছাপা হতে দেখা যায়।সংগ্রামের প্রতীক লাল রঙের সাথে কালো রঙের সমন্বয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে পোস্টারের অবয়ব।

চিত্র ০৯: প্রবাসী সরকারের চারুকলা ও ডিজাইন বিভাগ থেকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রচারিত দুইটি পোস্টার।

**উপসংহার**

আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ও প্রশিক্ষিত পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বাঙালির ভারী যুদ্ধাস্ত্র না থাকলেও অসীম সাহস ও মনোবল নিয়ে আমৃত্যু লড়াই করে যাওয়ার মানসিকতা ছিলো। বঙ্গবন্ধুর কথা মতো যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেছিলো। সব শ্রেণি পেশার মানুষের মতো শিল্পীরাও নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী দেশ রক্ষার আন্দোলনে রং-তুলি নিয়ে শরিক হয়েছিলো। পোস্টার শিল্প সরাসরিযুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবিলা না করলেও নিরবে সুদূরপ্রসারী প্রভাব তৈরি করতে পারে। স্বাধীনতা সংগ্রামে এমনই চিত্র দেখা গিয়েছিলো। পোস্টারে ইয়াহিয়া খানের বিকৃত-দানবীয় চেহারা, শক্ত মনোবলে তেজী যোদ্ধা কিংবা সঞ্জীবনী ও স্বদেশ ভক্তিমূলক স্লোগানে জাতিভেদের উর্ধ্বে উঠে অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশের যে স্বপ্ন শিল্পীরা মূর্ত করে তুলেছিলেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। ১৯৪৭সালের দেশ ভাগের পর থেকেই বাঙলা অঞ্চল নানা রাজনৈতিক ঘটনার মঞ্চ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার আগে ও পরে ক্ষমতার পালাবদলে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির উত্তান-পতন হয়েছে আর পোস্টার শিল্প সব সময়ই সব ঘটনা ও আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. ‘Govt issues notice over using posters, leaflets’, *Dhaka Tribune* (Dhaka: December 20th, 2018),https://archive.dhakatribune.com/bangladesh/rules-and-regulations/2018/12/20/govt-issues-notice-over-using-posters-leaflets.

২. শাওন আকন্দ, *গ্রাফিক ডিজাইন*, চারু ও কারুকলা, সম্পা: লালা রুখ সেলিম, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭), পৃ. ১৮২

৩. তদেব

৪. তদেব

৫. তদেব

৬. তদেব, পৃ. ১৮৩, ১৮৪

৭. তদেব

৮. Green Olive Arts, ‘A history of travel posters’,https://greenolivearts.com/2014/03/27/history-travel-posters/.

৯. Magdalena Ficoń,The Poster in History – The History in Poster, p-111,https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/ff/ako-sa-pisu-dejiny-metody-pristupy-pramene.pdf#page=111.

১০. International Poster Gallery, ‘A Brief History of the Poster’, https://www.internationalposter.com/a-brief-history-of-the-poster/.

১১. শাওন আকন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

১২. তদেব

১৩. তদেব

১৪. তদেব

১৫. আমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর, (ঢাকা: ২০০৩), পৃ. ৩১

১৬. তদেব, পৃ. ৩৪

১৭. তদেব, পৃ. ৩৫

১৮. বীরেন সোম, স্বাধীনতা সংগ্রামে চিত্রশিল্পী সমাজ, *আর্টস.bdnews.com*, মার্চ ৩০, ২০১৫, https://arts.bdnews24.com/archives/6487.

১৯. তদেব

২০. তদেব

২১. তদেব

২২. শ্যামলী ঘোষ, *'আওয়ামী লীগ ১৯৪৯-১৯৭১'*,একাডেমিক পাবলিশার্স, (ঢাকা: ১৯৯০), পৃ. ১১০

২৩. তদেব

২৪. হাশেম খান, 'একটি পোস্টার সৃষ্টির কথা' *বণিকবার্তা* (বিশেষ সংখ্যা), আগস্ট ১৫, ২০২১, https://bonikbarta.net/magazine_details/3547.

২৫. তদেব

২৬. তদেব

২৭. তদেব

২৮. তদেব

২৯. তদেব

৩০. শ্যামলী ঘোষ, প্রাগুক্ত

৩১. তদেব

৩২. মর্তুজা বশীর, 'স্বা-ধী-ন-তা'র মিছিল', *দৈনিক ইত্তেফাক*, মার্চ ১৬, ২০১৬, https://archive1.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/2016/03/16/108255.html.

৩৩. তদেব

৩৪. তদেব

৩৫. তদেব

৩৬. তদেব

৩৭. বীরেন সোম, প্রাগুক্ত

৩৮. তদেব

৩৯. তদেব

৪০. তদেব

৪১. হিমা আক্তার হিরামণি, মুক্তিযুদ্ধে শিল্প ও শিল্পী, *সংবাদ*, এপ্রিল ২, ২০২১, https://sangbad.net.bd/literature/samoeky/31759/.

৪২. তদেব

৪৩. বীরেন সোম, প্রাগুক্ত

৪৪. তদেব

৪৫. তদেব

৪৬. বীরেন সোম, মুক্তিযুদ্ধে শিল্পীসমাজ, *দৈনিক প্রথম আলো*, সেপ্টেম্বর ১৬, ২০২১, https://www.prothomalo.com/supplements/victory-day/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C-2.

৪৭. তদেব

৪৮. তদেব

৪৯. অরুণ বসু, রং-তুলিতে মুক্তিযোদ্ধার বজ্র-কুসুম রূপ, *দৈনিক প্রথম আলো*, মার্চ ১৮, ২০১৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%B0%E0%A6%82-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA.

৫০. তদেব

৫১. তদেব

৫২. তদেব

জমা প্রদানের তারিখ : ১৩.০২.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ০৮.০৬.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২২

# স্বাস্থ্য-সুরক্ষায় ইসলামি নির্দেশনা : পরিপ্রেক্ষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

মুহাম্মদ ছালেহ উদ্দীন*

**Abstract**

Health is an asset. Physical, mental and spiritual well-being is required for proper observance of Allah's commands. Therefore, one should try to follow the rules and regulations of Allah by giving thanks for the blessings of good health. In the eyes of Islam, it is more important to follow the rules of hygiene to maintain normal health than to receive medical treatment. Therefore, in order to maintain good health in the life of a true believer, it is necessary to follow the instructions of Al-Quran and As-Sunnah. The observance of hygiene rules in maintaining good health and receiving medical treatment in case of illness is supported in the light of Islamic guidelines. The Prophet (sm) gave various prescriptions to the sick person at different times. He has also given psychotherapy (spiritual healing) at various times. At the same time, he has given special import permission ance to the compliance of specialist doctors. This article reviews Islam-guided hygiene and medical policies in the light of the UN Sustainable Development Goals. In this study, the issues identified in the Sustainable Development Goals declared in the field of health protection have been presented in the light of Islamic guidelines. At the same time, recommendations have been prepared to create awareness among the majority Muslim population of Bangladesh and to determine the course of action to be taken at the policy-making level in pursuit of the principles directed by Islam in the implementation of the SDG declared by the United Nations.

## ভূমিকা

স্বাস্থ্যই সম্পদ। আল্লাহর হুকুম যথাযথভাবে পালনের জন্য প্রয়োজন শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক সুস্থতা। একজন মুমিনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া এই সুস্থতা অন্যতম একটি আমানত। তাই সুস্থতার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহর বিধি-বিধান পালনে সচেষ্ট হতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করার চেয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার গুরুত্ব অত্যধিক। তাই একজন প্রকৃত মুমিনের জীবনে সুস্বাস্থ্য রক্ষায় আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর নির্দেশনা মেনে চলা আবশ্যক। আল-কুরআন ও আল-হাদিসে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন ভাষ্যই আজকের টেকসই স্বাস্থ্য সুরক্ষার মূলভিত্তি হিসেবে প্রতিয়মান। হাদিসে অসুস্থতা এসে যাওয়ার আগে সুস্থতাকে গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। সুতরাং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন এবং অসুস্থ হলে চিকিৎসা গ্রহণ ইসলামি নির্দেশনার আলোকে সমর্থিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন সময়ে রোগক্রান্ত ব্যাক্তিকে বিভিন্ন ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন ঔষধ হিসেবে তিনি দিয়েছেন মধু, দুধ, কালোজিরা, খেজুর, যয়তুন, মেথি, লাউ, পিয়াজ ও রসুন ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তিনি মনোচিকিৎসা (আত্মিক চিকিৎসা) এবং আধ্যাত্মিক (প্রার্থনা) ব্যবস্থাপত্র হিসেবে দিয়েছেন। একই সাথে তিনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র মেনে চলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ প্রবন্ধে ইসলাম নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি ও চিকিৎসা নীতিমালা জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

---

*সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

## গবেষণা পদ্ধতি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

এ প্রবন্ধে মৌলিক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research) অনুসরণ করা হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে ইসলামি নির্দেশনার তুলনামূলক পর্যালোচনায় ব্যাখ্যামূলক গবেষণা (Explanatory Research) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ গবেষণায় স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় নির্দেশিত বিষয়াদি ইসলামি নির্দেশনার আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের সাথে স্বাস্থ্য খাতের নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি করোনা মহামারি আমাদেরকে গভীরভাবে উপলব্দি করতে সাহায্য করেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ইসলাম নির্দেশিত নীতিমালা অনুসরণে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর সচেতনতা তৈরি ও নীতি-নির্ধারক পর্যায়ের করণীয় নির্ধারণে সুপারিশমালা প্রস্তুত এ গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত।

## স্বাস্থ্য-সুরক্ষা ও চিকিৎসা পরিচিতি

স্বাস্থ্য হলো– সুস্থতা, নিরাময়তা, শরীরের নীরোগ অবস্থা।[১] স্বাস্থ্য মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান অধিকার। কারণ এটি সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে। একজন মানুষের সুখ তার শারীরিক শক্ত ভিত্তির উপর নির্ভরশীল। Constitution of the World Health Organization-এ স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে, Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.[২] “স্বাস্থ্য শুধুমাত্র রোগ বা অসুস্থতা থেকে মুক্ত থাকা নয়; বরং সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণকর এক অবস্থার নাম।”

সুস্থ বলতে কেবল রোগমুক্ততাই বোঝায় না, স্বাভাবিক কাজকর্ম করার জন্য দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতাও (fitness) বুঝিয়ে থাকে।[৩] স্বাস্থ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির শরীরে কোনো রোগ বা অক্ষমতা না থাকলেই যে তিনি স্বাস্থ্যবান বা সুস্থ, তা ঠিক নয়। সুস্থ হতে হলে তাঁকে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে হবে। সুস্বাস্থ্যের বিপরীত শব্দ হলো রোগ বা অসুস্থতা। রোগ হলো মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাপনের পথে বাধা প্রদানকারী এক শারীরিক অবস্থার নাম। রোগের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়– "A disease is the sum of the abnormal phenomena displayed by a group of living organisms in association with a specified common characteristic or set of characteristics by which they differ from the norm for their species in such a way as to place them at a biological disadvantage."[৪] “রোগ হলো শরীরবৃত্তের অস্বাভাবিক কার্যকলাপের বিশৃঙ্খল রূপ যার বৈশিষ্ট্য জৈবিক ও কাঠামোগত পদ থেকে ভিন্নতর এবং এগুলো বিভিন্ন জৈবিক অসুবিধার সৃষ্টি করে।”

রোগ নিরাময়ের পদ্ধতিকেই বলা হয় চিকিৎসা। চিকিৎসার আরবি প্রতিশব্দ اَلطِّبُّ ‘আত তিব্ব’। লিসানুল আরব গ্রন্থকার বলেন, اَلطِّبُّ: علاجُ الْجِسْمِ والنَّفسِ. (দেহ ও মনের চিকিৎসা)।[৫] চিকিৎসা সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি হলো রোগ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে আর চিকিৎসাও আল্লাহর পক্ষ থেকেই। ইসলামি অনুশাসনে চিকিৎসা ব্যবস্থা কখনো ওয়াজিব (আবশ্যকরণীয়) অথবা, মান্দুব (নির্দেশিত) অথবা, মুবাহ (ইচ্ছানুযায়ী) অথবা, মাকরূহ (অপন্দনীয়) অথবা, হারাম

(নিষিদ্ধ) হিসেবে। এগুলো বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। ইসলাম রোগীর চিকিৎসা সেবা গ্রহণে উৎসাহিত করেছে। এমনকি হাদিসে বিভিন্ন রোগের ঔষধের বর্ণনা রয়েছে।

## টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে স্বাস্থ্য-সুরক্ষা

সুস্বাস্থ্য মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। শারীরিক সুস্থতার উপর ব্যক্তির কর্মদক্ষতা, উৎপাদনশীলতা, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি বিষয়াদি নির্ভরশীল। আধুনিক উন্নয়ন ধারণাসমূহের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন ধারণা অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর হিসেবে প্রমাণিত। টেকসই উন্নয়ন ধারণায় স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচিত। ২০১৫ সালের পর এমডিজি-র স্থলে প্রতিস্থাপিত করে ২০১৫ সালের ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ১৫ বছর মেয়াদি (২০১৬-২০৩০) পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে 'রূপান্তরিত আমাদের পৃথিবী : ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)' শিরোনামে নতুন উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।[৬] টেকসই উন্নয়নের ১৭টি প্রধানতম লক্ষ্যমাত্রার ৩য় লক্ষ্যমাত্রা হলো- সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ অর্থাৎ, টেকসই স্বাস্থ্য সুরক্ষা। এ চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রার অধীন ৫টি বিশেষ লক্ষ্য নির্ধারিত।

## বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-১ (মাতৃমৃত্যুর হার কমানো)

"২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মাতৃমৃত্যুর অনুপাত প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে ৭০ এর নিচে নামিয়ে আনা।"[৭]

এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয় হলো মাতৃমৃত্যুর হার কমানো। বর্তমান বিশ্বে মাতৃমৃত্যুর প্রধান কারণ হচ্ছে মাতৃকালীন মায়ের পরিচর্যায় দুর্বলতা, প্রজননকালীন রুগ্ণতা, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী চিকিৎসা সেবায় দুর্বলতা, প্রাথমিক মাতৃসেবার অপর্যাপ্ততা, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে অসচেতনতা, শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর অপর্যাপ্ততা ইত্যাদি। গর্ভধারণ মাতৃস্বাস্থ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায়। এ সময় তার শারীরিক-মানসিক সুস্থতা ও যত্নের প্রয়োজন। সময়মতো চিকিৎসকের মাধ্যমে প্রসব-পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসব-উত্তর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে নিরাপদ প্রসব ও সুষ্ঠুভাবে শিশুর জন্ম নিশ্চিত করা যায়। এ ক্ষেত্রে পুরুষদের অগ্রণী ভূমিকা ও সার্বিক সহায়তা সবচেয়ে জরুরি। ইসলামি দৃষ্টিকোণে সর্বাবস্থায় স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। স্বামী হলো স্ত্রীর দায়িত্বশীল। তাই স্বামীর জন্য স্ত্রীর অসুস্থতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। একদল ফকিহ মনে করেন, ইসলাম নির্দেশিত ওয়াজিব খোরপোষের অধীনে স্বামীর জন্য স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ওয়াজিব।[৮] মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"তোমাদের উপর স্ত্রীদের প্রাপ্য হলো সদাচারের সঙ্গে খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করা।"[৯]

মাতৃমৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে এক সন্তান হওয়ার পর দুই বছরের পূর্বে আরেকটি সন্তান না নেয়া। আল-কুরআনে কিছু নির্দেশনা রয়েছে যা একটি শিশু ও তার পরবর্তী ভাই-বোনের জন্মের মধ্যে একটি সময়ের ব্যবধানকে অবশ্যম্ভাবী করে দেয়। মূলত দুই বছরে শিশুর দুধ ছাড়ানোর এবং গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর জন্য ত্রিশ মাসের উল্লেখ করার তাৎপর্য এটাই।[১০] মহান আল্লাহ বলেন,

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

"তার মা কষ্ট স্বীকার করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট স্বীকার করে জন্ম দিয়েছে এবং তার অন্তসত্ত্বা থেকে শুরু করে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত ত্রিশ মাস লেগে গেছে।"[১১]

এ আয়াত থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, যারা শিশুদেরকে স্তন্যদান করাতে চায় তারা যেন পুরো ত্রিশ মাস শিশুকে দুধপান করায়। এ সবই মায়ের স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার, গর্ভধারণের কারণে যে জীবনীশক্তি ক্ষয়ে গেছে তার পুনরুদ্ধার এবং শিশুর সুস্থতার নিশ্চয়তা বিধান ও প্রাকৃতিক পন্থায় দুগ্ধপানের মাধ্যমে তার অধিকার আদায় করার উদ্দেশ্যে।

**বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-২ (শিশুমৃত্যুর হার কমানো)**

> "২০৩০ সালের মধ্যে নবজাতক ও অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুর প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু বন্ধের পাশাপাশি সকল দেশের লক্ষ্য হবে প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে নবজাতকের মৃত্যুহার কমপক্ষে ১২-তে এবং প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুমৃত্যুর হার কমপক্ষে ২৫ এ নামিয়ে আনা।"[১২]

এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয় হলো শিশুমৃত্যুর হার কমানো। মানব শিশু জন্মগ্রহণের সাথে সাথে তার বেঁচে থাকারও অধিকার অর্জিত হয়। তাই পিতা-মাতার উপর দায়িত্ব হলো তাঁর যথাযথ লালন-পালন করা, খাদ্য, বস্ত্র-বাসস্থানের পাশাপাশি তাকে চিকিৎসা সেবা দেয়া। শিশুমৃত্যুর হার কমানোর জন্য ইসলাম বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছে। যেমন-

**১. সন্তানকে শাল-দুধ পান করানো :** গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে ও প্রসবোত্তর ২-৪ দিন মায়ের স্তন হতে যে গাঢ় হলুদ রঙের দুধ আসে একে শালদুধ বা কোলোস্টিম বলে। এ দুধের পরিমাণ অল্প। কিন্তু নবজাতকের স্বাস্থ্য ও শরীরের জন্য খুবই উপাদেয়। আল-হাদিসে ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে এ দুধের উপকারিতার কথা প্রমাণিত। তাই এ দুধ শিশুকে খাওয়াতে হবে। এতে শিশুর মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও শরীর গঠনের প্রচুর উপাদান বিদ্যমান রয়েছে।[১৩] মহানবী (সা.) বলেন, إِنَّ الْمُسْلِمَةَ إِذَا حَمَلَتْ كَانَ لَهَا أَجْرُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ الْمُحْرِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا وَضَعَتْ فَإِنَّ لَهَا بِأَوَّلِ رَضْعَةٍ تُرْضِعُهُ أَجْرَ حَيَاةِ نَسَمَةٍ "একজন মুসলিম নারী যতদিন গর্ভবতী থাকে, ততদিন রোজাদার, দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারী এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সাওয়াব পায়। আর ঐ মুসলিস মহিলার নিজের শিশুসন্তানকে দুধের প্রথম ঢোক পান করানো একটি মানুষের জীবনদানকারীর সমান সওয়াব।"[১৪]

**২. দুই বছর ধরে দুধপান করানো :** শিশুর স্বাস্থ্য, মন ও মনন, রুচি ও ভবিষ্যৎ গঠনে মায়ের দুধের বিকল্প নেই এজন্য ইসলাম শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য মাকে নির্দেশ দিয়েছে। এটা মায়ের উপর সন্তানের অধিকার। এটি মাতৃত্বের দাবিও যে তিনি তার সন্তানকে দুধ পান করাবেন। শিশুকে মায়ের দুধ পান করানো সমাজেরও একটি সুপরিচিত নিয়ম। অপর দিকে মা নিজের সন্তানকে দুধ পান করানো প্রাকৃতিক ও সহজাত দায়িত্ব মনে করেন। নিজের পেটে সন্তানকে ধারণ, জন্মদান এবং তার প্রবৃদ্ধির জন্য নিজের দুধ পান করানো প্রত্যেক মায়েরই স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

"আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি, তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করে, এরপর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে।"[১৫]

কোনো দুধই শিশুর জন্য মায়ের দুধের বিকল্প হতে পারে না। যেসব মহিলা নিজ সন্তানকে দুধপান করায় না অথবা এ ভয়ে শিশুকে নিজের দুধ থেকে বঞ্চিত রাখে যে, দুধপান করালে তার রূপ-যৌবন ও কমনীয়তা নষ্ট হয়ে যাবে। এসব মা শিশুর অধিকার ক্ষুণ্ন করে। এ ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সা.) কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। নিজের সন্তানকে দুধপান করানো থেকে বঞ্চিতকারী মহিলাদেরকে মহানবী (সা.) অত্যন্ত মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আবু ওমামা আল বাহিলী বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন– ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، فَإِذَا اَنَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثُدِيَّهُنَّ الْحَيَّاتُ، قُلْتُ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ يَمْنَعْنَ اَوْلَادَهُنَّ اَلْبَانَهُنَّ "অতঃপর আমাকে আরও সামনে নিয়ে যাওয়া হল। এ সময় কতিপয় মহিলাকে দেখলাম, যাদের বুকের ছাতি সাপ দংশন করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কোন মহিলা? বলা হল, তারা সেসব মহিলা– যারা নিজের শিশুকে নিজের দুধপান করাতো না।"[১৬]

**৩. যথাযথ খাদ্য-বস্ত্র ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা :** শিশু-সন্তান জন্মগ্রহণের পর প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিশু প্রতিপালনের ব্যাপারে পিতা-মাতা ও অভিভাবকের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। হৃদয় নিংড়ানো ঐকান্তিক ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতার কোমল পরশে শিশুকে অতি যত্ন সহকারে প্রতিপালন করা কর্তব্য। পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের প্রতিটি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা, তাদের যথাযথ পরিচর্যা করা, তাদের জন্য উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং তাদের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ করা। এ বিষয়ে আল-কুরআনে এসেছে– وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "সন্তান ও জননীর ভরণ-পোষণের ভার পিতার উপরই ন্যস্ত।"[১৭]

পিতার নিকট সন্তানের অধিকার হচ্ছে সন্তানের খাদ্য, বাসস্থান ও পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা। বিশেষ করে যতদিন সে নিজস্ব ক্ষমতায় উপার্জন করতে সমর্থ না হয়। আর এটা না করলে পিতা গুনাহগার হবে। মহানবী (সা.) বলেন, كَفَى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ "কোনো ব্যক্তির জন্য এতেই তার বড় গুনাহ হবে, যে তার উপর অর্পিত ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন না করে।"[১৮]

**৪. এতিম শিশুর স্বাস্থ্যসেবা :** এতিম শিশুর স্বাস্থ্যসেবার ব্যাপারেও ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। প্রথমত, ইসলাম এতিম লালন-পালনকে অত্যধিক সাওয়াবের কাজ ঘোষণা দিয়ে এতিম লালন পালনে উৎসাহ দিয়েছে এবং এতিমের সাথে খারাপ আচরণ না করে ভালো আচরণের আদেশ দেয়া হয়েছে। কুরআনের বাণী, يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۔ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۔ وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۔. "আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ইয়াতীমদের সম্পর্কে। বলুন, সংশোধন করা তাদের জন্য উত্তম। আর যদি তাদেরকে নিজেদের সাথে মিশিয়ে নাও, তবে তারা তোমাদেরই ভাই।"[১৯]

দ্বিতীয়ত, এতিমের রক্ষণাবেক্ষণের সামগ্রিক দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের। সুতরাং সমাজের কেউ এগিয়ে না এলেও এতিমের রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِاَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَاِلَيَّ وَعَلَيَّ "কেউ যদি সম্পদ রেখে মারা যায় তবে ঐ

সম্পদ তার উত্তরাধিকারীর। কিন্তু যদি কেউ দুগ্ধপোষ্য সন্তান রেখে মারা যায় অথবা অসহায় শিশু রেখে মারা যায় তবে সে সন্তানের ব্যাপারে সার্বিক দায়িত্ব আমার।"[২০]

**৫. শিশু হত্যা না করা :** শিশু মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে ইসলামের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সর্বাবস্থায় শিশু হত্যাকে হারাম ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা। মহান আল্লাহ বলেন– قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ "অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা, যারা কোনো জ্ঞান ব্যতীত নির্বোধের ন্যায় তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করেছে।"[২১]

**বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৩ (সংক্রমক ব্যাধি থেকে সুরক্ষা)**

> "২০৩০ সালের মধ্যে এইডস, যক্ষ্মারোগ, ম্যালেরিয়া ও উপেক্ষিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগসমূহের মহামারীর অবসান ঘটানো এবং হেপাটাইটিস, পানিবাহিত রোগ ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মোকাবেলা করা।"[২২]

ইসলাম যেকোনো রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহ দেয়। তবে সংক্রামক ব্যধির ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে সংক্রমণ থেকে নিজে বেঁচে থেকে চিকিৎসা দিতে পরিবার-পরিজন, ডাক্তার, নার্সসহ সকলের প্রতি নির্দেশনা দিয়েছে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী- فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْاَسَدِ "তোমরা সিংহের ভয়ে পালানোর ন্যায় কুষ্ঠরোগী থেকে বেঁচে থাক।"[২৩] এ হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কলেরা ইত্যাদি মহামারী দেখা দেয়ার সময়ে সে অঞ্চল থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন এ বলে যে, কলেরা জাতীয় মহামারী হচ্ছে আল্লাহর শাস্তিরই একটি নিদর্শন বিশেষ। আল্লাহ তার বান্দাদের কিছু লোককে তাতে আক্রান্ত করে পরীক্ষা করেন। অতএব যখন কোনো অঞ্চলে মহামারী দেখা দেয়ার সংবাদ পাওয়া যায়, তখন ওই মহামারী আক্রান্ত অঞ্চলে প্রবেশ না করা তোমাদের কর্তব্য। আর যারা ওই আক্রান্ত অঞ্চলে রয়েছে তাদের সে অঞ্চলে থেকে বের না হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এ দুধরনের নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হচ্ছে মহামারী যেন ছড়িয়ে পড়তে না পারে এবং এর সংক্রমণ হতে না পারে। রোগ প্রতিরোধ ও তা থেকে বেঁচে থাকার সতর্কতা অবলম্বনই এর আসল উদ্দেশ্য। কাজেই ইসলামের যেকোনো নীতি ও নিষেধাজ্ঞার মধ্যে মানবতার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এর প্রতি কোনো উদাসীনতা কাম্য নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ "কোনো সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেন সুস্থ ব্যক্তিদের মাঝে না যায়।"[২৪]

**বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৪ (অকাল মৃত্যু কমানো ও মানসিক সুস্থতা)**

> "প্রতিরোধ ও চিকিৎসার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগের কারণে অকাল মৃত্যু এক-তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনা এবং মানসিক সুস্থতা ও কল্যাণ নিশ্চিতে সহায়তা প্রদান।"[২৫]

এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয়াদি হলো–

**১. অকাল মৃত্যুর হার কমানো :** অসংক্রামক রোগের কারণে অকাল মৃত্যুর হার কমানো এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রার মূখ্য বিষয়। দূরারোগ্যব্যাধি বলতে কোনো ব্যাধি নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, مَا اَنْزَلَ اللهُ دَاءً اِلَّا اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً "মহান আল্লাহ এমন কোনো রোগ বা ব্যাধি সৃষ্টি করেননি যার প্রতিষেধক তিনি পাঠাননি কিংবা ওষুধ সৃষ্টি করেননি।"[২৬]

সুতরাং কোনো রোগের কারণে মৃত্যু অবধারিত এমন ধারণা করা ইসলামি আকীদার পরিপন্থী। কেননা মৃত্যুর উপর ইমান এই বিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্ত করে যে, প্রত্যেকটি সৃষ্টির ধ্বংস অনিবার্য। প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।[২৭] তবে মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ের আগে আযরাঈল কারো রূহ কবজ করেন না। প্রত্যেকের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে। সেটা বাড়েও না; কমেও না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا. "আর কোনো প্রাণী আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মারা যায় না, তা নির্দিষ্টভাবে লিখিত আছে।"[২৮]

সুতরাং কোনো রোগের কারণে অকাল মৃত্যু হয়েছে এমন ধারণা ইসলাম সম্মত নয়। ইসলামি বিশ্বাস হলো মৃত্যুর নির্ধারিত সময়েই প্রতিটি মানুষ মারা যাবে।

**২. মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা :** মানসিক সুস্থতা স্বাস্থ্য সেবার এক অনিবার্য দিক। মানসিক সুস্থতা ব্যক্তির সামগ্রিক শরীরের সুস্থতা নিশ্চিত করে। ইসলামের বিভিন্ন ইবাদাত মানসিক প্রশান্তির নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- নামায ও যিকর। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী- اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণে রয়েছে তোমাদের অন্তরের প্রশান্তি।"[২৯]

মানসিক সমস্যার ইসলামি সমাধান হলো হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধারণ করা। মহান আল্লাহ বলেন, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ. "হে মুমিনগন! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"[৩০]

### বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৫ (মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ)

> "চেতনাবিনাশী ঔষধ ও অ্যালকোহলের অপব্যবহারসহ সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।"[৩১]

শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে মাদক একটি প্রতিবন্ধক উপাদান। মাদকাসক্তি নানাভাবে শারীরিক ক্ষতিসাধন করে।[৩২] ইসলাম মাদককে হারাম ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. "হে মুমিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো অপবিত্র শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৩৩]

একইসাথে মদ পান, মদ তৈরি এবং ক্রয়-বিক্রয় করাকেও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ اِلَيْهِ. "মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মদ ও এর পানকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা ও রস গ্রহণকারী ও রস যোগানদানকারী, সরবরাহকারী ও যার নিকট সরবরাহ করা হয়– সবার উপরই লা'নত।"[৩৪]

### বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৬ (সড়ক দুর্ঘটনা কমানো)

> *"বিশ্বব্যাপী সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ও আহতের সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা।"*[৩৫]

বর্তমান সময়ে সড়ক দুর্ঘটনা একটি বহুল আলোচিত বিষয়। টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে যানবাহন, সড়ক ইত্যাদির উন্নয়নের বিকল্প নেই। কিন্তু এই সড়ক ও পরিবহনই যদি নিরাপদ না হয়, তাহলে তা কখনো টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে না। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ও আহতের সংখ্যা কমানোর ব্যাপারে ইসলামি নির্দেশনা রয়েছে, নিম্নে এ সংক্রান্ত নির্দেশনাবলি আলোচনা করা হলো-

**১. বেপরোয়া গতিতে যানবাহন না চালানো :** দ্রুতগতিতে যানবাহন চালানো এবং রাস্তা পারাপার উভয়টিই মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। ইসলাম এ কাজগুলো ধীরস্থিরভাবে করার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا 'রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে অত্যন্ত বিনম্রভাবে চলাফেরা করে।'[৩৬]

**২. দক্ষ চালক নিশ্চিতকরণ :** চালকদের অদক্ষতা ও অসাবধানতার কারণে অনেক সময় সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 'প্রকৃত মুসলিম ওই ব্যক্তি যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।'[৩৭] এ হাদিসের আলোকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সড়ক দুর্ঘনায় মৃত ও আহতের সংখ্যা কমানোর জন্য দক্ষ চালক নিয়োগের বিকল্প নেই।

**৩. যানজট নিরসনে ইসলামি বিধানের বাস্তবায়ন :** সড়ক দুর্ঘটনার পেছনে যানজন একটি নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। যানজটের ফলে দীর্ঘ সময় আটকে থাকার পর যানজট পরবর্তী দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাতে গিয়ে, যানজটের ফলে বেপরোয়া অভারটেকিং, যানজটের ফলে ফুটপাতে গাড়ি চালানো ইত্যাদি মাধ্যমে দুর্ঘটনায় হতাহতের ঘটনা ঘটে। সুতরাং যানজট নিরসনে চলাচলের রাস্তায় কোনো প্রতিবন্ধকতা না রেখে নির্বিঘ্নে যানবাহন চলতে সাহায্য করতে হবে। ফুটপাত দখল করে হকারি, রাস্তা দখল করে গাড়ি পার্কিং, যেখানে সেখানে যাত্রি উঠানো-নামানো, রাস্তায় ময়লার স্তূপ, রাস্তা ব্যবস্থাপনায় অবহেলা ইত্যাদি যানজট সৃষ্টি করে। ইসলাম এ সমস্যা সমাধানে বিধান প্রবর্তন করেছে। ইসলাম রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোকে ঈমানের অঙ্গ ঘোষণা দিয়েছে।[৩৮] একইসাথে রাস্তা দখল করতে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ।يَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا اَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسَ فَاَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟، قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْاَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ "তোমরা রাস্তায় বসার ব্যাপারে সাবধান থাকবে। সাহাবীরা বললেন, আমাদেরতো আর বসার স্থান নেই, এখানে বসে আমরা আলাপ-আলোচনা করি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা যাতে বলছো তোমাদের আর কোনো বসার স্থান নেই তাহলে রাস্তার হক আদায় করো। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তার হক কী? হে রাসূলুল্লাহ (সা.)? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা, সালামের উত্তর প্রদান, সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ করা।"[৩৯]

**৪. সড়ক দুর্ঘটনায় দোষী ব্যক্তিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া :** ইসলামি শাস্তি আইনের একটি মূলনীতি হলো জনসম্মুখে শাস্তি কার্যকর করা এজন্য যে, যাতে সমাজের অন্য কেউ এ ধরনের অপরাধ করতে সাহস না পায়। সড়ক দুর্ঘনার ক্ষেত্রেও অপরাধীকে শাস্তি দেয়া সম্পর্কে হাদিসের বাণী, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, مَنْ اَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ اَوْ فِي سُوقٍ مِنْ اَسْوَاقِهِمْ فَاَوْطَاَتْ بِيَدٍ اَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ "মুসলমানদের কোনো পথে বা কোনো বাজারে যদি কেউ

কোনো জন্তু দাঁড় করিয়ে রাখে এরপর জন্তুটি যদি সামনের বা পেছনের পা দিয়ে কোনো কিছু মাড়ায় তাহলে মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে।”[৪০] অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি তার যানবাহনের মাধ্যমে অন্যের ক্ষতি করলে সে জরিমানা দিতে বাধ্য। একই সাথে এর দ্বারা যদি কারো প্রাণহানি হয় তাহলে তার উপর ইসলামি শাস্তি আইনের আলোকে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। যদি গাড়ির ড্রাইভার দায়ী হয়, যেমন বেপরোয়া গতিতে কাউকে ধাক্কা দিয়ে আহত বা নিহত করা এক্ষেত্রে তাকে কিসাস দিতে হবে। আর যদি পথচারী বা অন্য কারো ভুলে ড্রাইবার ধাক্কা দিতে বাধ্য হয় তাহলে তাহলে তাকে দিয়াত দিতে হবে।

**বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৭ (পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা)**

> “২০৩০ সালের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, তথ্য ও শিক্ষাসহ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবায় সর্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যকে জাতীয় কৌশল ও কর্মসূচির অঙ্গীভূত করা।”[৪১]

এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয়াদি হলো-

**১. পরিবার পরিকল্পনা :** পরিবার পরিকল্পনা বলতে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের কার্যক্রমকে নির্দেশ করে। তবে সাধারণভাবে পরিবার পরিকল্পনা হলো পরিকল্পিত উপায়ে পরিবার গঠন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। ইসলাম একটি পরিকল্পনা ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা। মুসলিম জীবনের সাফল্য অর্জন করতে হলে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এ পৃথিবীর সব কিছুই মহান আল্লাহর সুন্দরতম পরিকল্পনা এবং বিধানানুসারে সৃষ্টি হয়েছে। এ সত্যটি আল কুরআনে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে, اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ . “আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।”[৪২]

ভিন্নার্থে পরিবার পরিকল্পনা বলতে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণ বুঝায়, যদিও পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ এক নয়; বরং পরিবার পরিকল্পনার একটি উপাদান হলো জন্মনিয়ন্ত্রণ। পরিবার পরিকল্পনার সাথে জন্মনিয়ন্ত্রণকে একীভূত করে দেখায় সাধারণ মানুষ বিশেষ করে ধর্মভীরু মানুষদের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধা তৈরি হয়, বস্তুত পরিবার পরিকল্পনা মানেই জন্মনিয়ন্ত্রণ নয়। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নেমে আসবে এ ভয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা ইসলামে হারাম। যদিও অধিক সন্তানসন্ততি ও ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্য অনেক সময়ই পরিবারে অশান্তি-আনয়ন করে। তাই পরিবারের সদস্য সংখ্যা এমন একটা সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে হবে যাতে তারা কোনোভাবেই অবাধ্যতার সুযোগ না পায়। কারণ সন্তান জন্ম দিলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা পিতা-মাতার আসল দায়িত্ব। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ . “হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।”[৪৩]

মানবজাতি ও মানববংশগতি রক্ষাই বিয়ের চরম লক্ষ্য। এ কারণে ইসলাম বংশবৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিয়েছে। একইসাথে ইসলাম যুক্তিসঙ্গত কারণ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি হিসেবে ‘আযল’ করার অনুমতি দিয়েছে। আযল পদ্ধতির বৈধতা প্রসঙ্গে হযরত যাবের (রা.) বলেছেন, كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَنْهَنَا . "আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে আযল করতাম, এই সময়ে আল-কুরআন নাযিল হতো। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) জানতেন, তবুও তিনি আমাদের আযল করতে নিষেধ করেননি।"[৪৪]

ইসলামি বিধি-বিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনুসারীদের জন্য অত্যধিক কঠোরতা নয়; বরং সরলতা। এ বিষয়টি আল কুরআনে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সহজভাবে বলা হয়েছে, يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ . "আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না।"[৪৫]

ইসলাম যে গুরুত্বপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বৈধতা দিয়েছে, তাহলো স্ত্রীর স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ। এ সম্পর্কে ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন, "স্ত্রীর দৈহিক সৌন্দর্য কর্মোচ্ছলতা যাতে স্থায়ী আনন্দের উৎস হয়ে থাকে; দীর্ঘ জীবন ও যৌনতা যাতে লাভ হয় এবং স্বাস্থ্যগত কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা যাতে দেখা না দেয়, সেজন্য গর্ভনিরোধ পদ্ধতি গ্রহণ জায়েয।"[৪৬] উক্ত বক্তব্যের আলোকে বলা যায় যে, স্ত্রী ও সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে গর্ভনিরোধক ব্যবহার করা যাবে, যাতে স্ত্রী তার দৈহিক সৌন্দর্য ও কর্মক্ষমতা না হারিয়ে ফেলে এবং সন্তান বিকলাঙ্গ না হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, ইসলাম প্রদর্শিত নিয়ম তথা আযলের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ করার বৈধতা ইসলাম দিয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, মায়ের জীবন বা স্বাস্থ্যের উপর যদি রোগ বা প্রসবকালীন সংকটের দরুন হুমকি দেখা দেয়, তাহলে পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এ সংকট বা হুমকির কথা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জানা যাবে, কিংবা কোনো বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য চিকিৎসাবিদ তা বলে দিবেন।[৪৭]

**২. প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা (বন্ধ্যাত্ব এবং অন্যান্য যৌন সমস্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) :** আমাদের দেশে বন্ধ্যাত্ব সম্পর্কে নানা ধরনের কুসংস্কার ও ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে। এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রতিটি নারী ও পুরুষের জন্য জরুরি। তাই বন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু চিকিৎসা ও পরামর্শ নেয়া একান্ত প্রয়োজন। ইসলাম বন্ধ্যাত্ব সমস্যায় কোনো নারী বা পুরুষকে দোষারোপ করে না; বরং ছেলে বা মেয়ে সন্তান হওয়া মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। মহান আল্লাহ বলেন, يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَاَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. "তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা করে দেন বন্ধ্যা।"[৪৮]

তাই কোনো দম্পতির সন্তান না হলে প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে, অন্যায়ভাবে কাউকে দোষারোপ করা যাবে না। এমনকি ডাক্তারের পরীক্ষাতেও কোনো স্বামী অথবা স্ত্রীর সমস্যা পরিলক্ষিত হলে তাকে চিকিৎসার সুযোগ দিতে হবে।

যৌনস্বাস্থ্য বিষয়ে আমাদের দেশের নারী পুরুষের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে বিভিন্ন ধরনের যৌন রোগের সংক্রমণ ঘটে। এ ছাড়া বিষয়টি লজ্জাকর মনে করে সঠিক চিকিৎসাও নেয়া হয় না। তাই সঠিক সময়ে সুচিকিৎসা নিলে পরবর্তীতে এ ধরনের সংক্রমণ হয় না এবং জটিলতাও সৃষ্টি হয় না। এইডস হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে প্রধান কারণ হলো অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্ক। ইসলাম বিবাহ বহির্ভূত যৌন মিলনকে নিষিদ্ধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓی اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِیْلًا "আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।"[৪৯]

**বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৮ (মানসম্মত, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা)**

> "সকলের জন্য অসুস্থতাজনিত আর্থিক ঝুঁকিতে নিরাপত্তা, মানসম্মত অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ, কার্যকর, মানসম্মত আবশ্যক ঔষধ ও টিকা সুবিধা প্রাপ্তির পথ সুগম করাসহ সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জন।"[৫০]

নিরাপদ স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। বর্তমান এ যুগে ওষুধেও ভেজাল মিশ্রিত হচ্ছে। একই সাথে এমন এক শ্রেণি দেখা যায় যারা স্বাস্থ্যসেবার নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছে। ফলে সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবার বিপরীতে অপ্রয়োজনীয় টেস্ট, অপ্রয়োজনীয় সার্জারি, অপ্রয়োজনীয় ওষুধ গ্রহণে রোগীরা বাধ্য হচ্ছে। এভাবে টেকসই স্বাস্থ্য সেবায় প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবার প্রতি গুরুত্বারোপ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى اَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ "এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের পাঁচটি হক্ব। সালামের প্রচলন করা, হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দেয়া, দাওয়াত কবুল করা, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা, জানাযার অনুসরণ করা।"[৫১] মানসম্মত, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা ইসলামি নির্দেশনাবলি নিম্নরূপ-

**ক. কোনো ক্ষতিকর ওষুধ ব্যবহার না করা :** তাই মানহীন ও অনিরাপদ ওষুধ ব্যবহার ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) নাপাক কোনো কিছু ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তবে নিরুপায় হলে কোনো নাপাক বস্তুকেও ওষুধ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।[৫২] তবে মানহীন ও অনিরাপদ ওষুধ ব্যহারে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে হাদিসের বাণী, "আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ، يَعْنِي السُّمَّ রাসূলুল্লাহ (সা.) জীবন বিনাশী ওষুধ অর্থাৎ, বিষ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।"[৫৩] সুতরাং এমন কোনো ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না, যার মেয়াদ নেই। একই সাথে এমন ওষুধও ব্যবহার করা যাবে না যা এক রোগের উপকার করলেও অন্য রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রাখে।

**খ. অভিজ্ঞতা ব্যতীত ডাক্তারি না করা :** ডাক্তার মানুষকে রোগের জন্য ওষুধ দেয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা না নিয়ে চিকিৎসা করলে রোগীর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি দেখা দেয়। এজন্য ইসলাম হাতুড়ি ডাক্তারি করতে নিষেধ করেছে। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۚ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا "আর যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ- এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৫৪]

**বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৯ (ক্ষতিকর রাসায়নিকের অপব্যবহার রোধ)**

> "ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা বায়ু, পানি ও ভূমি দূষণে সৃষ্ট সংক্রমণ ব্যাধি এবং মৃত্যুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা।"[৫৫]

এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় রাসায়নিক দ্রব্য ও পরিবেশ দূষণগত কারণে সৃষ্ট ব্যাধিতে মৃত্যুর হার কমানোর প্রতি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইসলাম স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় গুরুত্বারোপ

করেছে। ইসলামে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অঙ্গ বলা হয়েছে। আবু মালিক আশআরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, . الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ "পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংশ।"[৫৬]

ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা বায়ু, পানি ও ভূমি দূষিত হয়ে মানব স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে থাকে। ইসলাম সর্বাবস্থায় বায়ু, পানি ও ভূমি দূষণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলামে পানি দূষিত করা মারাত্মক অমার্জনীয় অপরাধ। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। পানির উৎস মুখে ময়লা-আবর্জনা ফেলা, পানির অপচয় করা, অপবিত্র শরীর নিয়ে বদ্ধ পানিতে গোসল করা ইত্যাদি ইসলামে নিষিদ্ধ কাজ। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, . لاَ يَبُولَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِى لاَ يَجْرِى "তোমাদের কেউ যেন এমন বদ্ধ পানিতে মূত্রত্যাগ না করে, যা প্রবাহিত হয় না।"[৫৭]

ভূমি ও বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ হলো যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা। ইসলাম যেখানে সেখানে ময়লা ফেলতে নিষেধ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে ইহুদীদের অভ্যাস ছিলো ঘর-বাড়ির পাশেই ময়লা-আবর্জনা ফেলা, জমা করে রাখা। ফলে তাদের বাড়ি-ঘরের পুরো পরিবেশটি দুর্গন্ধময় হয়ে যেতো, রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলমানদেরকে তাদের বিপরীত ঘর-বাড়ির আঙ্গিনা ও আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখার জোর তাকিদ দিয়ে বলেন, اِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيْمٌ يُحِبُّ الكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الجُودَ، فَنَظِّفُوا اَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُوْدِ . "নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্রতা ভালোবাসেন। তিনি নির্মল-পরিষ্কার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন। তিনি সুমহান, মহত্ত্বকে ভালোবাসেন। তিনি দানশীল, বদান্যতা ভালোবাসেন। সুতরাং তোমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো এবং তোমরা সেগুলোকে ইয়াহুদীদের মতো (অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময় করে) রেখো না।"[৫৮]

**বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-১০ (তামাক নিয়ন্ত্রণ)**

> "প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সকল দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের বাস্তবায়ন জোরদার করা।"[৫৯]

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ২০০৩ সালে Framework Convention on Tobacco Control (GCTC) গ্রহণ করে, বাংলাদেশ ২০০৪ সালে এর অনুসমর্থন করে।[৬০] এর আলোকে বাংলাদেশ ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করে। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে এ আইনের বিভিন্ন ধারায় সংশোধনী করে সংশোধিত 'তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩' পাশ করে। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি ২০১৬ এর '৬.৬ জনসচেতনতা ও প্রচারণা' উপবিধি অনুসারে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে তামাকের ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। ইসলাম তামাক হারাম ঘোষণা করেছে। সৌদি আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতি শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায রা. তামাক হারাম বিষয়ে ফতোয়া দিয়ে বলেন, أن التبغ بكل أنواعه محرم كالخمر لكونه خبيثا ويشتمل على أضرار كثيرة ولا يجوز بيعه ولا تدخينه ولا التجارة فيه "সকল প্রকার তামাক হারাম। ঠিক মদের মতোই। কেননা তা নিকৃষ্ট এবং এর রয়েছে বহু অনিষ্টকারিতা। তামাক বিক্রি করা, সেবন করা, তামাকের ব্যবসা-বাণিজ্য সবই অবৈধ।"[৬১]

তামাক বিভিন্ন রোগের কারণ ও স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকারক, যা মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। ইসলামে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ। "নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না।"[৬২]

## বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-১১ (স্বাস্থ্য গবেষণায় পারস্পরিক সহায়তা)

> "উন্নয়নশীল দেশসমূহে যে ধরনের সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগব্যাধির প্রকোপ বেশি, সে ধরনের রোগের টিকা ও ওষুধ উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন সহায়তা দান এবং ট্রিপস সমঝোতা (TRIPS Agreement) ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে দোহা ঘোষণা অনুযায়ী আবশ্যকীয় সকল ওষুধপত্র ও টিকা সাশ্রয়ীমূল্যে সকলের জন্য সহজলভ্য করা; উল্লেখ্য, এই ঘোষণার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রেস্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সকলের জন্য ওষুধ প্রাপ্তি সহজলভ্য করাসহ অন্যান্য সুবিধাদির পরিপূর্ণ ব্যবহারে উন্নয়নশীল দেশসমূহের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।"[৬৩]

ইসলাম যেকোনো কল্যাণকর কাজে পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ আচরণে উৎসাহিত করে। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী, وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى "সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর।"[৬৪]

## বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-১২ (স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন)

> "উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রসমূহে স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা, এই খাতে নিয়োজিত জনবলের স্থায়ীত্ব এবং তাদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।"[৬৫]

ইসলাম স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন বৃদ্ধি, এ খাতে নিয়োজিত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামো উন্নয়নে উৎসাহ দেয়। ডাক্তারদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিতে হবে। কারণ ইসলাম অভিজ্ঞতা ব্যতীত ডাক্তারি করতে নিষেধ করেছে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ "যে ব্যক্তি অন্যের চিকিৎসা করে, অথচ তার চিকিৎসা জ্ঞান আছে বলে ইতোপূর্বে জানা যায়নি তাহলে সেই দায়ী হবে।"[৬৬]

## বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-১৩ (স্বাস্থ্যঝুঁকি ব্যবস্থাপনা)

> "জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি প্রশমন এবং এ সংশ্লিষ্ট পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে সকল দেশের, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।"[৬৭]

স্বাস্থ্যখাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো স্বাস্থ্যঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ, রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি, সংকমক ব্যাধির ক্ষেত্রে জনসমাগম এড়িয়ে চলা, স্বাস্থ্য বিষয়ক পারস্পরিক পরামর্শ ও অভিমত বিনিময় করা। যেমন- বর্তমান করোনা মহামারি মোকাবিলায় উন্নত, উন্নয়শীল ও অনুন্নত সকল দেশের সামগ্রিক কল্যাণে বৈশ্বিক বিমান যোগাযোগ বন্ধ করা, সম্ভাব্য টিকা আবিষ্কারের প্রচেষ্টা এবং টিকা বিতরণে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশসমূহের প্রতি উন্নত দেশসমূহের মানবিক আচরণ। ইসলাম এ ধরনের প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আদেশ করে। এক্ষেত্রে সংকমক ব্যাধি মোকাবিলায় হাদিসের বাণী প্রণিধানযোগ্য, হযরত উসামা বিন

যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, মহামারি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) আলোচনা করলেন এবং বললেন, بَقِيَّةُ رِجْزٍ، اَوْ عَذَابٍ اُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بني إسرائيل، فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهَا "এটি আল্লাহর গজব বা শাস্তি, বনি ইসরাঈলের এক গোষ্ঠীর উপর এসেছিল, তার বাকি অংশই হচ্ছে মহামারি। অতএব, কোথাও মহামারি দেখা দিলে এবং সেখানে তোমরা অবস্থানরত থাকলে সে জায়গা থেকে চলে এসো না। অন্যদিকে কোনো এলাকায় এটা দেখা দিলে এবং সেখানে তোমরা অবস্থান না করলে সে জায়গায় যেয়ো না।"[৬৮] সুতরাং এমন মহামারি দেখা দিলে আতঙ্কিত না হয়ে, ধৈর্যসহকারে নিজ ঘরে অবস্থান করতে হবে।

## সুপারিশমালা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে স্বাস্থ্য-সুরক্ষায় ইসলামি নির্দেশনা পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত সুপারিশমালা গ্রহণ করা যেতে পারে–

- শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার সাথে আত্মিক রোগেরও চিকিৎসা করে সুস্থ সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখা।
- স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে তাকে সুস্থ ও সবল রাখার প্রচেষ্টা করা।
- শিশুকে দু'বছর মাতৃ দুগ্ধপান করানোর ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশনা মেনে চলা, এতে রোগমুক্ত থাকা যেমন সম্ভব, তেমনী অর্থনৈতিক সুরক্ষার সুযোগ ঘটে।
- এতিম অনাথ অসহায় শিশুদের লালন পালনে রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশিত বিধান মেনে চলে তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেষ্ট থাকা।
- সড়ক নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং শাস্তি প্রয়োগে গুরুত্বারোপ করা।
- স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে স্বামী আযল বা বাইরে বীর্যপাত ঘটানের পদ্ধতি অবলম্বন করে পারিবারিক স্বচ্ছলতা সুরক্ষিত করা।
- চিকিৎসা খাতের দুর্নীতি দূরীকরণে ইসলামি নির্দেশনার আলোকে মূল্যবোধ জাগ্রত করা।
- দক্ষ প্রশাসক, চিকিৎসক ও নার্স দ্বারা সরকারি হাসপাতাল পরিচালনা করে চিকিৎসা সেবা সহজীকরণ ও মানসম্মত চিকিৎসা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

## উপসংহার

মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম একটি বিষয় স্বাস্থ্য, যা সমগ্র জীবনের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে সুন্দর থাকতে সহায়তা করে। স্বাভাবিক জীবন যাপন করার দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা সুস্থতার অন্যতম লক্ষণ, তাই সুস্থতার জন্য চিকিৎসার পরামর্শ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম সুন্নাহ। একজন মানুষের সঠিক পদ্ধতিতে ইবাদত করার জন্য শারীরিক ও মানুষিক সুস্থতার প্রয়োজন। কিছু ইবাদতে সুস্থ্যার বিধান আল-কুরআন দ্বারা স্বীকৃত। তাই আমরা স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসলাম বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। ইসলাম শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি

মানসিক সুস্থতায় আধ্যাত্মিক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করে। সর্বোপরি, স্বাস্থ্য সেবায় ইসলামি নির্দেশনা অনুসরণ করে টেকসই স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব।

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামূল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ. ১১৮৯

২. International Health Conference, *Constitution of the World Health Organization* (New York : World Health Organization, 1946), p. 100

৩. ড. মোঃ মামুনুর রশীদ, *মৌলিক পুষ্টি পরিচিতি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ৭১

৪. E J M Campbell, J G Scadding and R S Roberts, "The concept of disease", *British Medical Journal*, London, 29 September 1979, p. 757

৫. আবুল ফযল জামালুদ্দিন ইবনে মানযুর আল আনসারী, *লিসানুল আরব*, ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারু সদর, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৫৫৩

৬. The General Assembly, *4th plenary meeting 25 September 2015* (New York : United Nations, 2015), p. 1

৭. *ibid*, P. 16

৮. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ-২ (ইসলামের পারিবারিক আইন)*, ২য় খণ্ড *(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৬)*, পৃ. ১২৬

৯. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন নিশাপুরী আল কুসাইরী (ইমাম মুসলিম), *আস সহীহ* (বৈরুত : দারু এহয়া তুরাসুল আরবী, তা.বি.), হাদিস নং : ১২১৮/১৪৭

১০. আল-কুরআন, ৩১ : ১৪

১১. আল-কুরআন, ৪৬ : ১৫

১২. The General Assembly, *op.cit*, P. 16

১৩. মাওলানা আমীনুল ইসলাম, *তাফসীরু নূরুল কুরআন*, ২য় খণ্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০), পৃ. ৩১৪

১৪. 'আলা উদ্দিন আলী মুত্তাকী ইবনে হুসামুদ্দিন আল হিন্দি আল বুরহানপুরী, *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফ'আল* (আলেপ্পো, ১৩৭৯ হি.), হাদিস নং : ৪৫০৭৯

১৫. আল-কুরআন, ৩১ : ১৪

১৬. মুহাম্মদ ইবনি হাব্বান ইবনি আহমদ আবু হাতিম আত্ তামিমি আল্ বাসতি, *সহিহ ইবনে হিব্বান* (বৈরুত : মাকতাবাতুল ইসলামি, তা.বি.), হাদিস নং : ১৯৮৬

১৭. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩

১৮. আবু দাউদ সূলায়মান বিন আশআস বিন ইসহাক আসসিজিস্তানী (ইমাম আবু দাউদ), *আস সুনান* (বৈরুত : মাকতাবা আসরীয়াহ, তা.বি.), হাদিস নং ১৬৯২

১৯. আল-কুরআন, ২ : ২২০

২০. ইমাম আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং : ২৯৫৪

২১. আল-কুরআন, ৬ : ১৪০

২২. The General Assembly, *op.cit*, P. 16

২৩. আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, *আল মুসনাদ* (মিশর : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২০০১), হাদিস নং- ৯৭২২

২৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারি (ইমাম বুখারি), *আস সহিহ* (মিশর : দারু তাওকুন নাজাত, ১৪২২ হি.), হাদিস নং : ৫৭৭১

২৫. The General Assembly, *op.cit*, P. 16

২৬. ইমাম বুখারি, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং : ৫৬৭৮

২৭. আল-কুরআন, ৩ : ১৮৫

২৮. আল-কুরআন, ৩ : ১৪৫

২৯. আল-কুরআন, ১৩ : ২৮

৩০. আল-কুরআন, ২ : ১৫৩

৩১. The General Assembly, *op.cit*, P. 16

৩২. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯), পৃ. ৬৩৪

৩৩. আল-কুরআন, ৫ : ৯০

৩৪. ইমাম আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং : ৩৬৭৪

৩৫. The General Assembly, *op.cit*, P. 16

৩৬. আল-কুরআন, ২৫ : ৬৩

৩৭. ইমাম বুখারি, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং : ৬৪৮৪

৩৮. ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং : ৩৫/৫৮

৩৯. ইমাম বুখারি, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং : ৬২২৯

৪০. আলী বিন উমর আদ দারাকুতনী, *আস সুনান* (কায়রো : দারুল মাহাসিন, ১৩৮৬হি.), হাদিস নং : ৩৩৮৫। এ হাদীছের বর্ণনাকারীদের একজন হল সারিয়ু বিন ইসমাঈল আল হামদানী। তার বর্ণনা পরিত্যাগযোগ্য। তবে শরয়ী নীতিমালা এ হাদিসের বিষয়টিকে সমর্থন করে।

৪১. The General Assembly, *op.cit*, P. 16

৪২. আল-কুরআন, ৫৪ : ৪৯

৪৩. আল-কুরআন, ৬৩ : ৯

৪৪. ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং : ১৪৪০/১৩৮

৪৫. আল-কুরআন, ২ : ১৮৫

৪৬. ইমাম আল গাযালী, মাওঃ ফজলুল করীম অনূদিত, *এহইয়াও উলুমুদ্দীন*, ২য় খণ্ড (ঢাকা : বকশী বাজার, ১৯৬১), পৃ. ৫৩-৫৪

৪৭. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম অনূদিত, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪), পৃ. ২৬

৪৮. আল-কুরআন, ৪২ : ৪৯-৫০

৪৯. *আল-কুরআন*, ১৭: ৩২

৫০. The General Assembly, *op.cit*, P. 16

৫১. ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং : ২১৬২

৫২. আল-কুরআন, ২ : ১৭৩

৫৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ (ইমাম ইবনে মাজাহ), *আস সুনান* (মিশর : দার এহয়া কুতুবুল আরাবী, তা.বি.), হাদিস নং : ৩৪৫৯

৫৪. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৬

৫৫. The General Assembly, *op.cit*, P. 16

৫৬. ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং : ৫৩৪/১

৫৭. ইমাম বুখারি, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং : ২৩৯

৫৮. আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযি (ইমাম তিরমিযি), *আস সুনান* (মিশর : শিরকাতু মাকতাবাতু মাতবাআতু মুসতফা আল বালী আল হালী, ১৩৯৫৪ হি.), হাদিস নং : ২৭৯

৫৯. The General Assembly, *op.cit*, P. 16

৬০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি* ২০১৭ (ঢাকা : বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, নভেম্বর, ৮, ২০১৭), পৃ. ১৬৬৯৮

৬১. *দৈনিক আল কাবাস*, কুয়েত, ২.৬.১৯৯৪ ইং

৬২. আল-কুরআন, ২ : ১৯৫

৬৩. The General Assembly, *op.cit*, P. 16

৬৪. আল-কুরআন, ৫ : ২

৬৫. The General Assembly, *op.cit*, P. 17

৬৬. ইমাম ইবনে মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং : ৩৪৬৬

৬৭. The General Assembly, *op.cit*, P. 17

৬৮. ইমাম তিরমিযি, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং : ১০৬৫

---

জমা প্রদানের তারিখ : ১৫.০২.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ০৮.০৬.২০২২

**জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস**
**ভলিউম-১২, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২২**

# হাদিস লিপিবদ্ধকরণ : রাসুলুল্লাহর (সা.) নির্দেশনা ও বাস্তবতা বিষয়ে একটি অনুসন্ধান

মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক*

**Abstract**

The prime objective of this study is to investigate the satisfactory indications of the Prothet (Sm.) that would confirm starting of Hadith compilation during the lifetime of the prophet (Sm.). On the otherside, due to the presence of a most widely famous narration that prohabits Hadith compilation, suspicions and doubts arisen that the Hadiths did not recorded in writing throughout aforesaid period. Reconciling such two seemingly conflicting traditions could satisfy and reconfirm the authentication of compiling prophetic traditions in presence of Muhammad (Sm.). This article is intended to explore fitting instructions and evidences that are undoubtedly verified compilations of prophetic narations in writing forms. Thus a large number of written documents have also been textually scrutinized with a view to rationalize the altimate objective of this study.]

## ভূমিকা

পবিত্র কুরআনের সাথে মিশে যাওয়ার আশংকায় রাসূলুল্লাহর (সা.) প্রাথমিক দিকে হাদিস লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে যেমন নিষেধ করেছেন, তেমনি বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে হাদিস লিপিবদ্ধ করার আদেশও করেছেন। অথচ হাদিস লিপিবদ্ধকরণ ইতিহাসে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, রাসূলুল্লাহর (সা.) জীবদ্দশায় তা লিপিবদ্ধ হয়নি; বরং তখন হাদিস লিখন একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। সমকালীন বাস্তবতায় লিখন নিষেধাজ্ঞার রিওয়ায়াতের উপর হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা অস্বীকার করার ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এমন মতামতের অসার বাস্তবতা অনুসন্ধান উক্ত প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহর (সা.) হিজরতের পূর্বাপর নানা ঘটনায় লেখালেখির বাস্তবতা, রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট প্রেরিত পত্রাবলি, বিভিন্ন গোত্রের সাথে সন্ধি-চুক্তি, কোনো ব্যক্তি বা অঞ্চলের উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ-নিষেধ বার্তা ইত্যাদি তথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধান ও ভাষ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে হাদিস লিপিবদ্ধের অনুমোদন প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসুলুল্লাহর (সা.) জীবদ্দশায় বিভিন্ন পরিস্থিতি ও প্রেক্ষিতে হাদিস লিখনের নির্দেশনা সমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করে হাদিস লিপিবদ্ধকরণের সাধারণ অনুমতি বিদ্যমান থাকা প্রমাণ করা প্রবন্ধের লক্ষ্য।

## সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিভাষা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

হাদিস লিপিবদ্ধকরণে রাসুলুল্লাহর (সা.) নির্দেশনাসমূহ অনুসন্ধানে ব্যবহৃত নমুনা ও সে আলোকে মূল ভাষ্যে প্রাপ্ত কিছু পরিভাষা নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো:

**এক. আল-হাদিস (الحديث)**: হাদিস শব্দটির আভিধানিক অর্থ কথা, বাণী, ব্যাপার ও বিষয়[১], নবোদ্ভুত বিষয় যা পূর্বে ছিল না[২], সংবাদ প্রদান[৩] ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ أَصْدَقُ

*সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

مِنَ اللهِ حَدِيثًا অর্থাৎ 'আল্লাহর চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে'।[৪] রাসুলুল্লাহর (সা.) সাথে সম্পৃক্ত সকল কথা, কাজ, সমর্থন ও অনুমোদনকে হাদিস বলা হয়।[৫] উক্ত প্রবন্ধে হাদিস ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রাসুলুল্লাহর (সা.) জীবদ্দশায় তাঁর কথা, কাজ, সমর্থন কিংবা অনুমোদনের লিপিবদ্ধ উপাত্ত এ প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**দুই. কিতাব (كتاب):** আরবি 'কিতাব' শব্দটি একবচন। বহুবচনে 'কুতুব' (كتب)। শব্দটির আভিধানিক অর্থ কিতাব, কেতাব, পুঁথি, নথি, খাতা, চিঠি, পত্র, আমলনামা। নির্দিষ্ট করে 'আল-কিতাব' বলা হলে তা দ্বারা পবিত্র কুরআন বুঝানো হয়।[৬] পবিত্র কুরআনে আল-কিতাব বলে কুরআনকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।[৭] উক্ত প্রবন্ধে উপস্থাপিত কোনো কোনো উদ্ধৃতিতে কিতাব শব্দটি লিপিবদ্ধ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

**তিন. তাক'ইদ (تقييد):** আরবি 'কয়দ' শব্দ মূল থেকে বিশেষ্যবাচক আরেকটি রূপান্তরিত শব্দ তাক'ইদ যার অর্থ কয়েদ করা, বন্দী করা, লিপিবদ্ধ করা, সীমাবদ্ধ করা, শর্তযুক্ত করা, তালিকাভুক্ত করা।[৮] হাদিসের ভাষ্যে শব্দটি লিপিবদ্ধ করা অর্থে প্রয়োগ হয়েছে, যা উক্ত প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য প্রমাণে প্রাসঙ্গিক।

**চার. সনদ (سند):** আরবি সনদ শব্দটি একবচন। বহুবচনে আসানিদ (أسانيد)। শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'আল-মু'তামাদ (المعتمد) নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা।[৯] সনদের উপর হাদিসের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল হওয়ায় তাকে সনদ বলা হয়। হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষায় হাদিস বর্ণনার পদ্ধতিকে সনদ আখ্যায়িত করা হয়।[১০] হাদিস লিপিবদ্ধ করার সময় বর্ণনাকারীদের ক্রমধারার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

**পাঁচ. সহিফাহ (صحيفة):** আরবি 'সহিফাহ' শব্দটি একবচন। বহুবচনে 'সুহুফ' (صحف)। শব্দটির আভিধানিক অর্থ পত্রিকা, সংবাদপত্র, ক্ষুদ্র গ্রন্থ, পুস্তিকা।[১১] পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী নবীগণের উপর নাযিলকৃত পুস্তিকাগুলোকে 'সুহুফ' বলা হয়েছে।[১২] তবে তা পবিত্র কুরআনের অপর নাম হিসেবেও এসেছে।[১৩] সাহাবীগণ কর্তৃক সঙ্কলিত হাদিসের পুস্তিকা 'সহিফাহ' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

**ছয়. হিফজুল হাদিস (حفظ الحديث):** আরবি 'হিফজ' শব্দটির অর্থ রক্ষা, যত্ন, তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ, হেফাজত, মুখস্তকরণ ইত্যাদি।[১৪] হিফজুল হাদিস অর্থ হাদিস মুখস্তকরণ। রাসুলুল্লাহর (সা.) হাদিসে 'হিফজুল হাদিস' পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১৫] হাদিস লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীদের মুখস্তকরণ ও স্মরণশক্তি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

**সাত. কিতাবাতুল হাদিস (كتابة الحديث):** আরবি 'কিতাবাহ' শব্দের অর্থ লিখন, লিপি, লিখিত বিষয়, লেখা, রচনা।[১৬] কিতাবাতুল হাদিস অর্থ হাদিস লিপিবদ্ধ করা। উক্ত প্রবন্ধে হাদিস লিপিবদ্ধকরণে রাসুলুল্লাহর (সা.) নির্দেশনা বলতে 'কিতাবাতুল হাদিস' বিষয়ক তাঁর নির্দেশনা বুঝানো হয়েছে এবং সে প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা সমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**আট. তাদবীনুল হাদিস (تدوين الحديث):** 'তাদবীন' শব্দের অর্থ লিপিবদ্ধ করা, নথিভুক্ত করা, প্রণয়ন করা, সঙ্কলন করা, সংগ্রহ করা।[১৭] হাদিসের লিখিত রূপ কিংবা সংকলনকে 'তাদবীনুল হাদিস' বলা হয়। এটা কিতাবাতুল হাদিসের সমার্থক আরেকটি পরিভাষা।

উপরিউক্ত পরিভাষা সমূহ হাদিস লিপিবদ্ধকরণ ইতিহাসের সাথে প্রাসঙ্গিক। রাসুলুল্লাহর (সা.) মুখনিসৃত ভাষায় এ সকল শব্দের ব্যবহৃত ও সাহাবীগণ কর্তৃক অনুরূপ বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে হাদিস সঙ্কলন তাঁর জীবদ্দশায় শুরু হয় প্রমাণ করে।

**আল-হিফজ: কুরআন-হাদিস লিপিবদ্ধকরণের গুরুত্বাপূর্ণ পরিভাষা**

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন অবতরণের পর তা সংরক্ষণের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করেছেন।[১৮] পবিত্র কুর'আন নাযিল হওয়ার পর তা লিখে নিতে রাসুলুল্লাহ (সা.) বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) কর্তৃক তিনি তা লিখে নিয়ে ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে কি-না যাচাই করে নিতেন এবং তারপর তা নিয়ে জনসমক্ষে বের হতেন।[১৯] নিম্নোক্ত হাদিসটি থেকে তা প্রমাণিত হয়।

عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: " لَمَّا نَزَلَتْ: لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صلعم ادْعُ لِي زَيْدًا وَلْيَجِئْ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ وَالْكَتِفِ أَوِ الْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ، ثُمَّ قَالَ: اكْتُبْ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ

> "বারা ইবন আজিব (রা.) বর্ণিত 'নিষ্ক্রিয় মু'মিন লোক ও আল্লাহর পথে জিহাদকারী লোক কখনো সমান হতে পারে না।' এই আয়াত যখন নাযিল হল, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন যায়েদকে ডেকে দাও এবং তাকে দোয়াত, তখতি ইত্যাদি নিয়ে আসতে বল। তিনি যখন আসলেন, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আয়াতটি লিখ।"[২০]

> অনুরূপভাবে রাসুলুল্লাহর (সা.) জীবদ্দশায়ই পুরো কুরআন নির্দিষ্ট লেখকের দ্বারা লিখিত হয়। পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের পাশাপাশি হাদিস সংরক্ষণেও রাসুলুল্লাহ (সা.) ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। হাদিস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মুখস্থকরণের পাশাপাশি লিখে রাখার পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহর (সা.) হাদিস সংরক্ষণের অনুমতি এবং নির্দেশ প্রদান করেছেন। নিম্নোক্ত হাদিসটি থেকে তা প্রমাণিত হয়।

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: "نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ

> "যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিকে আলোকোজ্জাসিত করে দিবেন, যে আমার কথা শুনে তা সংরক্ষণ করল, এটিকে পূর্ণ হিফাযত করল এবং অপরের নিকট তা পৌঁছিয়ে দিল। অনেক জ্ঞান বহনকারী লোকই এমন ব্যক্তির নিকট এটা পৌঁছিয়ে দেয়, যে তার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।"[২১]

**হাদিস লিপিবদ্ধকরণে নিষেধাজ্ঞা ও অনুমতি: ভাষ্য বিশ্লেষণ**

রাসুলুল্লাহর (সা.) জীবদ্দশায় হাদিস লিপিবদ্ধকরণ বিষয়ে সাহাবীগণ থেকে দু'ধরনের উপাত্ত পাওয়া যায়।

**এক. লিপিবদ্ধকরণে নিষেধাজ্ঞা:** ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিশেষ প্রেক্ষাপটে হাদিস লিপিবদ্ধকরণের সাধারণ অনুমতি ছিল না। ফলে ব্যাপকভাবে তখন হাদিস লিপিবদ্ধ করা হয়নি। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে হাদিস লিখতে নিষেধ করেছিলেন। নিম্নোক্ত হাদিস দু'টি থেকে তা প্রমাণিত হয়।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ

"আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "তোমরা আমার নিকট হতে কোন কথাই লিপিবদ্ধ করবে না। আমার থেকে কুরআন ব্যতীত কেউ কিছু লিখে থাকলে সে যেন তা মুছে ফেলে।"[২২]

রাসুলুল্লাহ (সা.) যে সকল কারণে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে হাদিস লিখতে নিষেধ করেছেন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

**ক. কুরআনের সাথে মিলে যাওয়ার আশঙ্কা:** নব মুসলিমদের মাঝে কুরআন পরিচিত হওয়ার পূর্বে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য ছিল। কারণ এতে কুরআনের সাথে হাদিস মিশে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। পরে যখন এরূপ আশঙ্কা তিরোহিত হয়, তখন হাদিস লিখনের অনুমতি দেয়া হয়।

**খ. একই কাগজে লিখনের নিষেধাজ্ঞা:** সাহাবীগণ কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা শুনে কখনও কুরআনের সাথেই তা লিখে রাখতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) হাদিসকে কুরআনের সাথে একই কাগজে একই সাথে লিখতে নিষেধ করেছিলেন। এতে কুরআন ও হাদিস একত্রে মিলে যাওয়ার ভয় ছিল।

**গ. লিখিত বিষয়ে রদ-বদলের সম্ভাবনা:** অনেক সময় লিখিত বিষয়কে অন্যের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা যায় না। কিন্তু যে কথা মানুষের স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়ে যায়, তার মধ্যে কেউ রদ-বদল করতে পারে না। এ জন্যই হাদিস লিখার চেয়ে মুখস্থ করার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

**ঘ. লোকবল ও উপকরণ সংকট:** বদরের যুদ্ধবন্দী মুক্তি বিষয়ক সিদ্ধান্ত থেকে অনুমেয় যে, মুসলিমদের মাঝে লেখাপড়া জানা লোকের অভাব ছিল। যেখানে পবিত্র কুরআনের লিখনের জন্য উপকরণের অভাব ছিল, সেখানে প্রাথমিক দিকে হাদিস লিখন নিষেধ হওয়ায় সমীচিন।

**ঙ. প্রাথমিক সময়ে লিখনের নিষেধাজ্ঞা:** হাদিস লিখনের অনুমতি না থাকার বিষয়টি ছিল প্রাথমিক সময়ে। পরবর্তীতে তার অনুমতি দেয়া হয়। আর নিষেধ করা হয়েছিল কুরআনের সাথে মিলিয়ে একই জায়গায় লিখতে। কেননা তাতে কুরআন ও হাদিস সংমিশ্রিত হয়ে যেত এবং তা পাঠকদের কাছে বড় সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়াত।[২৩]

**দুই. লিপিবদ্ধকরণের অনুমতি:** প্রথম পর্যায়ে সকলকেই কুরআন ব্যতীত অপর কিছু লিখতে নিষেধ করা তাতে ব্যতিক্রম ছিল। প্রচণ্ড স্মরণশক্তি সম্পন্ন সাহাবীদেরকে হাদিস মুখস্থ পরিত্যাগ করে কেবল লেখনী শক্তির উপর নির্ভরশীল হতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যাঁরা স্মরণশক্তি ও লেখনী উভয় শক্তির ব্যবহার করতে চেয়েছেন তাদেরেক তিনি হাদিস লিখতে নিষেধ করেননি; বরং তাদেরকে তিনি অনুমতিই দিয়েছেন। নিম্নোক্ত দু'টি হাদিসটি থেকে তা প্রমাণিত হয়।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَرْوِيَ مِنْ حَدِيثِكَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَعِينَ بِكِتَابِ يَدِي مَعَ قَلْبِي، إِنْ رَأَيْتَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، إِنْ كَانَ قَالَهُ: " حَدِيثِي، ثُمَّ اسْتَعِنْ بِيَدِكَ مَعَ قَلْبِكَ"

> “আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহর (সা.) নিকট এসে বলেন, হে রাসুল! আমি হাদিস বর্ণনা করতে চাই। এ জন্য আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে লেখনীর সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেছি, অবশ্য আপনি যদি তা পছন্দ করেন। তখন নবী (সা.) বলেন, আমার হাদিস লিখতে চাইলে তা স্মরণ রাখার সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখার কাজও করতে পার।”[২৪]

> عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: " قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ" - “আনাস (রা.) বলেন, ইলমে হাদিসকে লিপিবদ্ধ করে রাখ।”[২৫]

হাদিস দু'টি থেকে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পর্যায়ে সকলকেই কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখতে নিষেধ করা হলেও তাতে ব্যতিক্রমও ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের প্রখর স্মৃতিশক্তিকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। এ জন্য প্রখর ধীশক্তি সম্পন্ন সাহাবীগণকে হাদিস কণ্ঠস্থ করা বাদ দিয়ে কেবল লিখনীর উপর নির্ভরশীল হতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু যারা স্মৃতিশক্তি ও লিখনী উভয় মাধ্যমকেই কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, পরবর্তীতে তাদেরকে তিনি হাদিস লিখতে নিষেধ করেননি, বরং তাদেরকে লিখার অনুমতিই প্রদান করেছিলেন। এ বিষয়ে ইবন কুতাইবার (র.) বিশ্লেষণটি প্রণিধানযোগ্য।

> نهى في أول الأمر ، عن أن يكتب قوله ، ثم رأى بعد - لما علم أن السنن تكثر وتفوت الحفظ - أن تكتب وتقيد .

> “প্রথমে হাদিস লিখতে নিষেধ করেন এবং পরে লিখে হিফাজত করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন।”[২৬]

ফলে রাসুলুল্লাহর (সা.) যুগেও হাদিস লিখে রাখা বৈধ ছিল এবং তা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অধিভুক্ত ছিল। হাদিস সাধারণভাবে মুখস্থ করা, মৌখিক চর্চা, বর্ণনা ও আলোচনার মাধ্যমেই সংরক্ষিত হয়। এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সাহাবীগণকে হাদিস লিখনের অনুমতি প্রদান করা হয়। তখন হাদিস সংরক্ষণের ব্যাপারে কুরআনের মতই সাহাবীদের স্মরণশক্তি, পারস্পরিক চর্চা ও বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে লেখনী শক্তিরও পূর্ণ ব্যবহার হতে থাকে।

## রাসুলুল্লাহর (সা.) জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হাদিস: উপাত্ত অনুসন্ধান

রাসুলুল্লাহ (সা.) জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয়, রাসুলুল্লাহর (সা.) উপস্থিতিতে হাদিস লিপিবদ্ধের অসংখ্য ঘটনা বিধৃত হয়েছে। তিনি স্বয়ং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিখে রাখার জন্য বহু সংখ্যক সাহাবীকে লেখক নিযুক্ত করেছিলেন। ওহী লিখার কাজে আব্দুল্লাহ ইবন আকরাম (রা.) ও আল'উলা ইবন উকবা (রা.), খেজুরের ফসলের ওপর যাকাতের পরিমাণ লিখার জন্য হুযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা.), গণীমতের মালের বিবরণ লিখার জন্য মু'যায়কীব ইবন আবু ফাতিমা আদ-দূসী (রা.) দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। হানযালা (রা.) অনুপস্থিত কোন লেখকের দায়িত্ব পালন করতেন। রাসুলুল্লাহর (সা.) সীলমোহরও তিনি ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতেন। রাসুলুল্লাহর (সা.) আদেশক্রমে যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) সুরিয়ানী ভাষা শিখে নিয়েছেন এবং তাঁকে তাদের পত্রাবলী পড়ে শুনাতেন।[২৭]

**এক. সুরাকাকে লিখিত নির্দেশনা:** রাসুলুল্লাহ (সা.) হিজরতকালীন মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার পথে সুরাকা ইবন মালিক মুদলেজিকে একটি নিরাপত্তালিপি লিখে দিয়েছিলেন।[২৮]

**দুই. মদিনা সনদ:** রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরত করে স্থানীয়ভাবে বসবাস শুরু করার পর সর্বপ্রথম যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেন, মদিনার ইয়াহূদী ও আশেপাশের খৃষ্টান এবং মদিনার আনসার ও মুহাজির মুসলমানের পারস্পরিক অনাক্রমণ ও অন্যান্য শর্ত সম্বলিত এক দীর্ঘ চুক্তিনামা রচনা করা তার অন্যতম। নিম্নে মদিনা সনদটির ভাষা উদ্ধৃত হল:

هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ، أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ دُونَ النَّاسِ

"আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সা.) কর্তৃক কুরাইশ বংশের মুমিন-মুসলিম ও মদিনাবাসরীর মাঝে এটি লিখিত চুক্তি; যারা তাদের অনুগামী হবে ও তাদের সাথে মিলিত হবে এবং তাদের সঙ্গে মিলে জিহাদ করবে; অন্য মানুষেরা বাদ দিয়ে তারা সবাই এক উম্মাহ।"[২৯]

মদিনা সনদে মোট বায়ান্নটি দফা সন্নিবেশিত হয়েছিল। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি হতে প্রমাণিত হয় যে, চুক্তিনামা যথারীতি লিখিত হয়েছিল এবং ইসলামে এটাই সর্বপ্রথম লিখিত সনদ।

عَنْ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: إِنَّ مَكَّةَ إِنْ تَكُنْ حَرَمًا، فَإِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلَانِيٍّ

"রাফি' ইবন খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, মক্কা যেমন একটি হারাম মদিনাও একটি হারাম। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আমাদের নিকট এই চুক্তিনামা খাওলানী চর্মে রয়েছে।"[৩০]

আলীর (রা.) নিকট এই লিখিত চুক্তিনামা পরবর্তীকাল পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল।

**তিন. আদমশুমারী:** রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর মুসলিম নাগরিকদের আদমশুমারী গ্রহণ করেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে নিম্নোদ্ধৃত এক নির্দেশ প্রদান করেন,

عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي ﷺ اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له ألفا وخمس مائة رجل

"যেসব লোক ইসলাম কবুল করার কথা বলেছেন, তাদের নাম আমার জন্য লিখে দাও। হুযাইফা (রা.) বলেন, অতঃপর আমরা তাঁকে এক হাজার পাঁচশত ব্যক্তির নাম ও পরিচয় লিখে দিলাম।"[৩১]

এটিও রাসুলুল্লাহর (সা.) জীবদ্দশায় লিখিত হয়।

**চার. আবু শাহকে লিখিত ভাষণ:** আবু হুরাইয়া (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, মক্কা বিজয়ের বছর খোজয়া গোত্রের লোকগণ লাইস গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। এই সংবাদ রাসুলুল্লাহর (সা.) নিকট পৌঁছলে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। ভাষণ সমাপ্ত হলে আবু শাহ নামক জনৈক সাহাবী রাসুলুল্লাহকে (সা.) বলেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُبُوا لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ"

"হে রাসুল! আমার জন্য ভাষণটি লিখে দিন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) তার আবেদন মঞ্জুর করে জনৈক সাহাবীকে বললেন, আবূ শাহকে তা (ভাষণটি) লিখে দাও।"[৩২]

**পাঁচ. পবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা সম্পর্কিত নির্দেশ:** রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক আমর ইবন হাযম ও অন্যান্যকে সাদকা, দিয়ত, ফরয ও সুন্নাত সম্পর্কে একটি লিখিত নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লামা শাওকানী (১১৭২-১২৫০/১৭৫৮-১৮৩৫) বিভিন্ন স্থানে এই কিতাবটির উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালিক (র.) বর্ণনা করেন,

> عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه " لا يمس القرآن إلا طاهر "
>
> “আব্দুল্লাহ ইবন আবু বকর ইবন হাযম হতে এই কথাটি বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমর ইবন হাযমের জন্য যে কিতাবটি লিখে দিয়েছিলেন তাতে লিখিত রয়েছে কুরআনকে কেবল পবিত্র ব্যক্তিই স্পর্শ করবে।”[৩৩]

**ছয়. নাজরানবাসীকে লিখিত নির্দেশ:** রাসুলুল্লাহ (সা.) হিজরী দশম সনে আমর ইবন হাজমকে (রা.) নাজরানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি যখন নাজরান এলাকার দিকে রওয়ানা হচ্ছিলেন তখন তাকে একটি লিখিত আদেশ প্রদান করা হয়।

> عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهْلَ نَجْرَانَ ، وَكَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا : " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا كَتَبَ مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ نَجْرَانَ"
>
> “রাসুলুল্লাহ (সা.) নাজরান বাসীদের সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং তাদের জন্য একটি কিতাব লিখিয়ে দিয়েছেন। ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, এটা নাজরানবাসীর জন্যে রাসুলুল্লাহ নবী মুহাম্মদের (সা.) যা লিখে দিচ্ছেন।”[৩৪]

**সাত. ইয়ামেনবাসীকে ‘কিতাবুল জিরাহ’ নামক ‘দস্তাবেজ’ প্রেরণ:** রাসুলুল্লাহ (সা.) ইয়েমেনের অধিবাসীদের জন্য অন্য একটি লিখিত নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন, যা ‘কিতাবুল জিরাহ’ নামে প্রসিদ্ধি পায়।

> حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه قال : هذا كتاب رسول الله ﷺ عندنا، الذي كتبه لعمرو بن حزم ، حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ، ويأخذ صدقاتهم . فكتب له كتابا وعهدا ، وأمره فيه بأمره، فكتب : " بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ، هذا كتاب من الله ورسوله : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) عهد من محمد رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم ، حين بعثه إلى اليمن ، أمره بتقوى الله في أمره كله ، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون"
>
> “আব্দুল্লাহ ইবন আবি বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন হাজম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, এটি আমাদের নিকট রাসুলুল্লাহর (সা.) লিখিত নির্দেশ, যা তিনি আমর ইবন হাযমকে (রা.) ইয়ামেনে প্রেরণকালীন লিখেছেন যে, তিনি তার অধিবাসীকে ফিকহ শিক্ষা দিবেন; তাদেরকে সুন্নাহ শিক্ষা প্রদান করবেন; তাদের থেকে সাদাকাহ আদায় করবেন। তিনি তার উদ্দেশ্যে একটি নির্দেশনা ও অঙ্গিকার লিখে দিয়েছেন, তাতে তিনি এ বিষয়ে আদেশ করেছেন এবং লিখেছেন যে, ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে লিখিত নির্দেশ: হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ কর।’ আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদের (সা.) পক্ষ থেকে আমর ইবন হাযমের জন্য অঙ্গিকার; যখন তাকে ইয়ামেনে প্রেরণ করা হয়, তিনি তাকে যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করতে নির্দেশ দেন। কেননা আল্লাহ তাকওয়া অবলম্বলকারী এবং অতিব সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছেন।”[৩৫]

এই ঘোষণাপত্র উষ্ট্রচর্মের উপর লিখিত ছিল। হাফিয ইবন কাসীরের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই অঙ্গিকারটি ইসলামের প্রাথমিক ও পরবর্তীকালের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কর্তৃক সমাদৃত, নিয়মিত পঠিত ও সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জ্ঞান উৎসরূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। সাহাবীগণ এই নির্দেশনার প্রতি সবসময়ই লক্ষ্য রাখতেন এবং নিজেদের মতামত পরিহার করতেন।[৩৬]

**আট. সদকা ও যাকাত সম্পর্কিত লিখিত দস্তাবেজঃ** রাসুলুল্লাহ (সা.) সদকা ও যাকাত সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধানদের নিকট প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করেন। কিন্তু তা পাঠাবার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। পরে এটা খিলাফতে রাশেদার কার্যপরিচালনার ব্যাপারে পুরোপুরি দিকদর্শন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) এই লিখিত আদেশটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন,

> عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله ﷺ قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفى قال فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى توفى ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها
>
> "রাসুলুল্লাহ (সা.) সদকা সম্পর্কে একটি রচনা করিয়েছিলেন। কিন্তু উহা তাঁর কর্মচারীদের নিকট প্রেরণ করার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তারপর আবু বকর তা বের করে তদানুযায়ী আমল করেন। তার ইন্তিকালের পর উমর এটাকে বের করে আনেন এবং তদানুযায়ী কাজ করেন। উমরের ইন্তিকালের পর এটা তার এক অসিয়তের সাথে নথি করা অবস্থায় পাওয়া যায়।"[৩৭]

উমরের (রা.) সন্তান সন্ততিগণ তা সংরক্ষণ করেন। ইমাম ইবন শিহাব জুহুরী (র.) এই দস্তাবেজটি দেখতে পেয়েছেন এবং বলেছেন, এটা রাসুলুল্লাহর (সা.) সদকা সম্পর্কে লিখিত কিতাব। তিনি সালিম ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমরের নিকট তা পাঠ গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি তা নিজের মধ্যে আয়ত্ত করে নিয়েছেন।[৩৮] উত্তরকালে উমর ইবন আবদুল আযীয খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে আবদুল্লাহ ইবন উমরের বংশধরদের নিকট হতে তা গ্রহণ করেন এবং এর প্রতিলিপি তৈরি করে নেন।

**নয়. হুদায়বিয়ার সন্ধিঃ** ৬ষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হুদায়বিয়ার সন্ধি আলীর (রা.) মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.) লিখিয়েছিলেন যা সর্বজন স্বীকৃত।

**দশ. বিভিন্ন ব্যক্তি ও অঞ্চলে প্রেরিত পত্র ও নির্দেশনামাঃ** রাসুলুল্লাহর (সা.) লিখিত বহুসংখ্যক সন্ধিচুক্তি ও অন্যান্য দলীল দস্তাবেজ পাওয়া গিয়েছে, যার সংখ্যা প্রায় তিন শতাধিক। তম্মধ্যে বিভিন্ন গোত্রের প্রতি বিভিন্ন সময়ে লিখিত ফরমান, বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের নিকট লিখিত ইসলামী দাওয়াতের পত্রাবলি[৩৯], ইয়েমেনবাসীদের প্রতি বিভিন্ন ফসলের যাকাত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক লিখিত ও প্রেরিত এক দস্তাবেজ।[৪০] ওয়ায়েল ইবন হাজার সাহাবীর জন্য সালাত, মদ্যপান ও সুদ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধান, জাহাক ইবন সুফিয়ান সাহাবীর নিকট স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রী কর্তৃক রক্তপাতের বদলা আদায় করা সম্পর্কিত বিধান, ইয়েমেনবাসীকে নবদিক্ষিত মুসলিমদের অধিকার ও কর্তব্য এবং অমুসলিম ইহুদী ও খ্রীস্টানদের 'জিযিয়া' সম্পর্কিত বিধান[৪১], হুযাইফা ইবন আয়ামানকে (রা.) যাকাতের ফরজ সম্পর্কিত বিধান, আলা ইবনুল হাজারামীকে যাকাতের মাসয়ালা, আবু বকরকে (রা.) আমীরে হজ্জ নিযুক্ত করে হজ্জের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কিত বিধান[৪২], নগ্নাবস্থায় কাবা তওয়াফ নিষিদ্ধের বার্তাসহ আলীকে (রা.) মক্কায় প্রেরণ[৪৩], উমর ইবন আকসা সুলামীকে (রা.) সদকা যাকাত সম্পর্কিত আইন-কানুন লিখিত পাঠানো, গালিব ইবন আবদুল্লাহকে

(রা.) গনীমতের মাল, সুমামা প্রতিনিধিদলকে ফরযসমূহ এবং সাদাকা বিষয়ে, আবূ রাশেদুল আজদীকে (রা.) সালাতের নিয়ম-কানুন, নাজরানবাসীদের এক পাদ্রীকে দাওয়াত ও জিযিয়ার আদেশ, 'হাজরামাউত' শাসনকর্তাকে সালাত, যাকাত ও গণীমতের মালের বিবরণ, 'দুমাতুল জান্দাল' অধিবাসীদেরকে জিযিয়া, যাকাত ও উশরের বিধান, হর্‌রা ও আজরাহ্ গোত্রকে জিযিয়ার বিধান, বনূ নাহাদ কবীলাকে যাকাতের পশু সম্পর্কে নির্দেশ, বনূ হানিফাকে জিযিয়া বিষয়ক, হিজরবাসীদের শাসনকর্তার আনুগত্য, আয়লা ও ইউহানাবাসীদিগকে আমানতনামা, বনু ইয়ারককে ফল ও চারণভূমি সম্পর্কিত বিধান, আম্মানের শাসনকর্তা জাফর ও আবদকে দাওয়াত, উশর' ও 'যাকাত' ইত্যাদির মাসয়ালা, খালিদ ইবন জামাদকে ইসলামের 'আরকান', জুরয়া ইবন সাইফকে জিযিয়া ও যাকাতের বিধান, রবীয়া ইবন যী-মারহাব হাজরীকে শুল্ক ইত্যাদি মাসয়ালা, বনু আবদু-কালানকে গনীমতের মাল, ওশর ও যাকাত বিষয়ে, আদা ইবন খালিদকে বিক্রয় করার পূর্বে পণ্যদ্রব্যের দোষ প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, উমরকে (রা.) সাদাকা বিষয়ে, আবূ বকরকে (রা.) যাকাতের যাবতীয় হুকুম, মুনযির ইবন সাবীকে জিযিয়া ও অগ্নিপূজকদের প্রতি ইসলামের ভূমিকা সম্পর্কে, তামীমদারী একখণ্ড জমি[৪৪], মতরফ ইবন কাহেন বাহেলীকে যাকাত বিষয়ে, খায়বরের ইয়াহুদীদেরকে দিয়তের বিধান[৪৫], ইয়ামেনবাসীদেরকে মধুরও যাকাত[৪৬], মু'য়ায ইবন জাবালকে (রা.) নগদ অর্থ ও স্বর্ণের যাকাত সম্পর্কে বিধান[৪৭], আরবের সকল গোত্রকে দিয়তের বিধান[৪৮], খায়বরের দখলকৃত জমি ইয়াহুদীদের মধ্যে বণ্টনের চুক্তিনামা[৪৯], 'হামদান' গোত্রকে দাওয়াত, জুরবা ও আযরাহবাসীকে নিরাপত্তা চুক্তি, হিমইয়ার শাসনকর্তাকে পত্র, নাজরানের বিশপ পাদ্রীকে পত্র[৫০] লিখিত রূপে প্রেরণ করেন।

**সাহাবীগণ কর্তৃক সংকলিত সহিফা সমূহ: গ্রন্থাবদ্ধতার প্রমাণিক বিশ্লেষণ**

হাদিস সংকলনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ কর্তৃক সংকলিত সহিফাহ সমূহের গুরুত্ব অবিসংবাদিত। কেননা ঐ সকল সহিফাগুলো রাসুলুল্লাহ (সা.) যুগে হাদিস লিপিবদ্ধ ও সংকলিত হওয়ার উজ্জল প্রমাণ। নিম্নে সাহাবীগণ কর্তৃক সংকলিত সহিফাহ সমূহের ঐতিহাসিক বর্ণনা ও তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হলো:

**ক. আস-সহিফাহ আস-সাদিকাহ:** প্রবন্ধের শুরুর দিকে সহিফাহ শব্দটির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আরবি আস-সাদিকাহ শব্দটির বাংলা অর্থ সত্য বা সঠিক। রাসুলুল্লাহর (সা.) জীবদ্দশায়[৫১] বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) তা সংকলন করেন।[৫২] তিনি সংকলিত হাদিসগুলো মধ্যস্থতা ব্যতিরেকেই সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ফলে হাদিসের সংকলনটির নাম সাদিকাহ রেখেছেন।[৫৩] তিনি এই সহিফাটি বিনষ্ট হওয়ার আশংকায় তা সিন্দুকে অত্যন্ত যত্নসহ সংরক্ষণ করেছেন এবং তাঁর ইন্তিকালের তা তাঁর পৌত্র 'আমর ইবন শু'আইবের নিকট সুরক্ষিত থাকে। ইবন হাজার আল-আসকালানী ইয়াহিয়া ইবন মাঈন ও 'আলী ইবনুল মাদানী থেকে বর্ণনা করেন যে, যদি হাদিস عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده সনদে বর্ণিত হয়, তাহলে তা সহিফা আস-সাদিকাহ এর অন্তর্গত হাদিস মনে করতে হবে।[৫৪]

**খ. সহিফাতু আবি হুরাইরা (রা.):** হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে আবূ হুরাইরা (রা.) অধিকাংশ হাদিস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। মুখস্তকরণের পাশাপাশি হাদিস সমূহকে সহিফাতে লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করার ফলে-ই তা সম্ভব হয়েছিল। ফুদাইল ইবন হাসান ইবন আমর ইবন উমাইয়্যা আল-দামরী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

تحدثت عند ابي هريرة بحديث فانكره، فقلت إنى قد سمعته منك، فقال إن كنت سمعته منى فهو مكتوب عندي، فأخذ بيدى الى بيته فارانا كتبا كثيرة من حديث رسول الله ﷺ، فوجد ذلك الحديث، فقال قد أخبرتك اني ان كنت حدثتك به فهو مكتوب عندى

"আমি আবূ হুরাইরার (রা.) নিকট একটি হাদিস বর্ণনা করলে তিনি তা অস্বীকার করলেন। আমি তাকে বললাম যে, এটি আমি আপনার নিকট থেকে শ্রবণ করেছি। তিনি বললেন, যদি তুমি আমার নিকট থেকে এ হাদিস শ্রবণ করে থাক তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে লিখা রয়েছে। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে আমাকে স্বীয় বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) অনেক লিখিত হাদিস দেখালেন। তার পর তিনি উক্ত হাদিস পেয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে বলছিলাম যে, যদি আমি এ হাদিস তোমার নিকট বর্ণনা করে থাকি তাহলে অবশ্যই এটি আমার নিকট লেখা আছে।"[৫৫]

**গ. সহিফাতু আনাস (রা.):** আনাস ইবন মালিক (রা.) রাসুলুল্লাহর (সা.) বিশিষ্ট খাদিম ছিলেন। ফলে তিনি রাসুলুল্লাহর (সা.) অবস্থা ও কর্ম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবগত ছিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহর (সা.) কথা ও কাজ সহিফাতে লিখে রাখতেন। তিনি লিখিত বাণী আবার তাঁকে পড়ে শুনাতেন। সা'ঈদ ইবন হিলাল (রা.) বর্ণনা করেন যে তিনি আনাস ইবন মালিকের (রা.) নিকট গমন করলে আনাস (রা.) একটি সুরক্ষিত হাদিসের অনুজ্ঞা নিয়ে এসে বললেন, هذه سمعتها من النبى صلى الله عليه و سلم فكتبتها و عرضتها অর্থাৎ এটি আমি নবী (সা.) থেকে শ্রবণ করেছি। অতঃপর তা লিখে উপস্থাপন করেছি।[৫৬]

**ঘ. সহিফাতু ইবন মাসউদ (রা.):** আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভূক্ত। তিনি রাসুলুল্লাহর (সা.) বহু হাদিস গ্রন্থাবদ্ধ করে একটি সহিফাহ সংকলন করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর স্বীয় ছেলে এ সহিফাটি সংরক্ষণ করেন। মুসহির মাআনের বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের পুত্র আব্দুর রহমান (র.) শপথ করে বলেন যে, এই কিতাবটি আমার পিতার হস্ত লিখিত। হাদিসের এ সংকলনটি 'সহিফা ইবন মাসউদ' নামে খ্যাত।[৫৭]

**ঙ. সহিফাতু ইবন আব্বাস (রা.):** আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) রাসুলুল্লাহর (সা.) দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। তিনি রাসুলুল্লাহর (সা.) যাবতীয় কথা ও কাজ সহিফাবদ্ধ করার প্রয়াস পান। তাঁর ইন্তিকালের পর সংকলিত সহিফাহটির পরিমাণ এক উট বোঝার সমান ছিল। তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র হলেন সা'ঈদ ইবন যুবাইর। তিনি যা বলতেন, সাঈদ তা লিখতেন। অতঃপর কাগজ যখন শেষ হয়ে যেত, তখন তিনি কাপড়, জুতা ও হাতের তালুতে লিখে রাখার নির্দেশ দিতেন। তারপর তা তিনি সহিফায় লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। তাঁর সংকলিত এই সহিফাটি দীর্ঘকাল যাবৎ জনসমাজে সমধিক প্রসিদ্ধতা লাভ করে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র 'আলী এ সহিফাটি সংরক্ষণ করেন। পরবর্তীকালে এ সহিফা থেকেই হাদিস ও তাফসীর গ্রন্থে রিওয়ায়াত সন্নিবেশিত করা হয়।[৫৮]

**চ. সহিফাতু 'আলী (রা.):** আলীর (রা.) ছিলেন প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারী এবং রাসুলুল্লাহর (সা.) সার্বক্ষণিক সাথী। তিনি রাসুলুল্লাহর (সা.) হাদিস সমূহ লিপিবদ্ধ করে একটি সহিফাহ সংকলন করেছিলেন। তার এ সহিফাটি তৎকালীন সময়ে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তিনি নিজেই এই সহিফাটির কথা উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী, তিরমিযী, ইবন মাজাহ হুযাইফা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আলী (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনার নিকট

কি কোন কিতাব আছে? তদুত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব এবং তা বুঝার জন্য প্রজ্ঞা, যা একজন মুসলিম ব্যক্তিকে দেয়া হয়েছে এবং এ সহিফাহ ব্যতীত আমার কাছে কোন কিছুই নেই। তিনি এ সহিফাটি তাঁর তরবারির কোষের মধ্যে রাখতেন। ইমাম মুসলিম আবূ তুফায়লি থেকে বর্ণনা করেন যে, 'আলী (রা.) বলেন,

ما خص رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا لم يعم الناس كافة الا ما في قراب سيفى هذا واخرج الصحيفة مكتوبة فيها لعن الله من ذبح بغير الله

"অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সা.) কিছু কিছু জিনিস নির্দিষ্ট করেছেন, যা সর্বসাধারণের জন্য ব্যাপক করেননি। তবে আমার এ সহিফাতে যা রয়েছে তা ব্যতীত। অতঃপর তিনি স্বীয় সহিফাহ বের করলেন তাতে লেখা ছিল, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ব্যতিরেকে অন্যের নামে জবাই করে তার উপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেন।"[৫৯]

**ছ. সহিফাতু জাবির (রা.):** জাবির ইবন 'আব্দিল্লাহ (রা.) আল-আনসারী (রা.) অতি অল্প বয়সে ইসলামের সান্নিধ্যে আসেন। তিনি হজ্জের আহকাম সম্পর্কীয় হাদিসের একটি সহিফাহ সংকলন করেন। এ গ্রন্থ থেকে তিনি মসজিদে নববীতে শিক্ষার্থীদেরকে হাদিস শিক্ষা দিতেন। তাঁর ছাত্র হাম্মাম ইবন মুনাব্বিহ (র.) এ সহিফাহ থেকে হাদিস শুনতেন এবং লিখে রাখতেন।[৬০] আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন উকাইল বলেন, عبد الله أنا و محمد و أبو جعفر و معنا ألواح نكتب فيها অর্থাৎ "আমি, মুহাম্মদ ও আবু জা'ফর জাবিরের (রা.) নিকট আসতাম; আমাদের সাথে ফলক থাকতো যাতে আমরা হাদিস লিখতাম।"[৬১]

**জ. সহিফাতু সা'দ (রা.):** সা'দ ইবন 'উবাদাহ আনসারী (রা.) বাইয়াতুল আকাবার সদস্য ছিলেন। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ও তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেন যে, সা'দ আল-আনসারীর (রা.) সংকলিত একটি সহিফাহ ছিল। তিনি এতে রাসুলুল্লাহর (সা.) হাদিস সন্নিবদ্ধ করেন। তাঁর ছেলে কায়িস (রা.) এ সহিফাহ থেকে হাদিস রিওয়ায়াত করতেন।[৬২] ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেন যে, এটি মূলতঃ 'আব্দুল্লাহ ইবন আবী 'আওফার (রা.) সহিফার কপি।[৬৩]

**ঝ. সহিফাতু 'আমর (রা.):** 'আমর ইবন হাযম রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে শ্রুত হাদিস সমূহ সংরক্ষনের জন্য তা লিখে রাখতেন। তাঁর লিখিত এ হাদিসসমূহ সংকলন করে তিনি এর নাম দেন সহিফায়ে আমর ইবন হাযম। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে একটি অনুজ্ঞা দিয়ে ইয়ামানের ওয়ালী বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এতে ফারায়িজ, সুন্নাহ ও দিয়াত সংক্রান্ত হাদিস লিপিবদ্ধ ছিল।[৬৪]

**ঞ. সহিফাতু সামুরা (রা.):** সামুরা ইবন জুনদুব (রা.) হাদিস মুখস্তকারী সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহর (সা.) অনেক হাদিস লিপিবদ্ধ করে একটি বৃহৎ সংকলন তৈরি করেন। ইবন হাজার আল-'আসকালানী (র.) বর্ণনা করেন যে, সামুরার পুত্র সুলাইমান স্বীয় পিতা থেকে এ সহিফার হাদিসগুলো বর্ণনা করেন। এ সহিফাটি মূলতঃ সামুরা ইবন জুনদুবের একটি রিসালাহ।[৬৫] ইমাম বুখারী এই রিসালাহটির প্রথমাংশ নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করেছেন,

بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نصلي كل ليلة صلاة ما قل أو كثروتجعلها وترا

"আল্লাহর নামে শুরু করছি। এটি সামুরাহ ইবন জুনদুবের পক্ষ থেকে তার সন্তানদের প্রতি। এ সহিফাতে রয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে প্রত্যেক রাতে কমবেশি বিজোড় রাকা'আত সালাত আদায় করতে আদেশ দিয়েছেন।[৬৬] ইমাম মুহাম্মদ ইবন সীরিন বলেন যে, এই সহিফাটিতে অনেক 'ইলম রয়ছে।"[৬৭]

**উপসংহার:** ইসলামী জীবন বিধানে আল-কুর'আনের পরই রাসুলুল্লাহর (সা.) হাদিসকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। হাদিসেই পবিত্র কুর'আনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলামী জীবন বিধানের বিস্তৃত রূপরেখোর প্রতিফলন ঘটেছে। এ কারণে পবিত্র কুরআনের সংরক্ষনের প্রয়োজনে হাদিস সংরক্ষিত হয়; বরং পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের প্রক্রিয়ার সাথে সাথে হাদিসের সংরক্ষণ শুরু হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহর (সা.) জীবদ্দশায় হাদিস ব্যাপক পর্যায়ে মুখস্থকরণ এবং বাস্তব জীবনে আমল করার মাধ্যমে যেভাবে হাদিসের চর্চা করা হয়েছে, অনুরূপভাবে যথাসময়ে লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে হাদিসের সংরক্ষন করা হয়েছে। সাহাবী ও তাবি'ঈ যুগে ইলমু হাদিস চর্চা ও তার সংরক্ষণ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয় এবং সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক হাদিসের সংরক্ষণ-সংকলন, শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান, প্রচার ও প্রসারের আদেশ হাদিস লিখনে সাহাবীদের উৎসাহিত করেছে। তবে হাদিস লিখন নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত রিওয়ায়াতের ব্যাপকতার ফলে হাদিস লিপিবদ্ধকরণ ইতিহাসের ভুল পাঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত নিবন্ধে হাদিস লিখনের অনুমতি সম্বলিত নির্দেশনা সমুহের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসুলুলাহর (সা.) জীবদ্দশায় হাদিস লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

## তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে মুকাররম আল-মা'রূফ ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব* (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ১৩১

২. আবুল হাসান আহমদ ইবন ফারিস ইবন যাকারিয়া, *মু'জামু মিকইয়াসিল লুগাহ* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৩৯৯/১৯৭৯), খ.২, পৃ. ৩১

৩. আইয়ূব ইবন আল হুসাইনী আবুল বাকা, *কুল্লিয়াত ফিল-লুগাহ* (আল আমাবিয়্যাঃ ১২৮১ হি.) পৃ. ১৫২; ড. সুবহী সালীহ, *উলূমূল হাদীস ওয়া মুসতালাহাতুহু* (দামিস্কঃ দামিস্ক বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩), পৃ. ৩

৪. আল-কুরআন, ৪:৮৭

৫. হাফিয ইবন হাজার আসকালানী, *নুযহাতুন নযর ফী তাওযীহি নুখবাতুল ফিকর* (দেওবন্দঃ মাকতাবাত থানবী, তা.বি.), পৃ. ৫

৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল আল-ওয়াফী: আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৭), পৃ. ৮২৩

৭. আল-কুরআন, ২:২

৮. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১৬

৯. ইবরাহীম মাদকূর, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত* (দেওবন্দঃ কুতুবখানা হুসাইনিয়াহ, তা.বি.), পৃ. ৪৫৪; ইবন মানযূর আল-আফ্রিকী, *লিসানুল আরব* (বৈরূতঃ দারু ছদর, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ২২০-২২১

১০. আব্দুল হক্ক আল-মুহাদ্দিস আল-দেহলভী, *আল-মুকাদ্দিমাহ* (লাহোরঃ মুয়াস্‌সাসাহ আল-সাফাহা, তা.বি.), পৃ. ৩৮

১১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৮

১২. আল-কুরআন, ৮৭:১৮-১৯

১৩. আল-কুরআন, ৮০:১৩

১৪. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, পৃ. ৪১৪

১৫. মুহাম্মাদ ইবন ‘ঈসা আত তিরমিযী, *আল জামে‘আত তিরমিযী (*দিল্লী :আসাহহুল মাতাবি, তা, বি), খ. ৪, হাদীস নং ২৬৫৮

১৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২৩

১৭. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৫

১৮. আল-কুরআন, ৮৯:৯

১৯. তিবরানী, *আল-মুজাম আল-কাবীর* (কায়রো: মাকতাবা ইবন তাইমিয়া, তা.বি.), হাদীস নং ৪৮৮৯, খ. ৫, পৃ. ১৪২

২০. মুহাম্মাদ ইবন ইসম‘ঈল আল বুখারী, *আস-সহীহ* (পাকিস্তানঃ নূর আসাহহুর-মাতাবি’, ১৩৮১ হি.), খ. ২, হাদীস নং ৪৯৯০

২১. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আসসিজিস্তানী, *আস-সুনান* (ইন্ডিয়াঃ মাতবা‘আহ, আসাহহুল-মাতাবি’, ১৯৮৫ খৃ.), খ. ২, হাদীস নং ৩৬৬২

২২. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ* (বৈরূতঃ দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, তা.বি.), খ. ৪, হাদীস নং ৩০০৪

২৩. মুহাম্মদ মুস্তফা আল-আজমী, *দিরাসাত ফিল হাদীস আন-নব্বী ওয়া তারীখ তাদবিনী* (আল-মাকাতাব আল-ইসলামী, ১৯৮৩), পৃ. ৭৮-৭৯

২৪. আব্দুল্লাহ আদ-দায়েমী, *সুনান আদ-দারেমী* (পাকিস্তানঃ হাদীস একাডেমী, নাশাত আবাদ, ১৪০৪ হি.), হাদীস নং ৪৮৫, পৃ.১২৬

২৫. ইবন আব্দিল বার, *জামি‘উ-বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহী* (সউদী আরবঃ দারু ইবনুল জাওযী, ১৪১৯ হি.), খ. ১, পৃ. ৭২

২৬. ইবন আব্দিল বার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬

২৭. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৩৬৪৫, খ. ৩, পৃ. ৩১৮

২৮. আল-হাকিম, *আল মুসতাদরাক* (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল আরবী, তা.বি), খ. ৩, পৃ.৭; ইবন কাসীর, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* (বৈরূতঃ দারু ইহইয়া আত-তুরাসুল আরবী, ১৪১৭ হি.), খ. ৩, পৃ.১৮৫

২৯. আবূ বকর আল-বাইহাকী, *আস-সুনান কুবরা বায়হাকী* (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪ হি.), খ. ৮, হাদীস নং পৃ. ১৬৩৬৯, পৃ. ১৮৪

৩০. আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ* (বৈরূতঃ মুয়াস্‌সাতু রিসালাহ, ১৪২১ হি.), খ. ২৮, হাদীস নং ১৭২৭২, পৃ. ৫০৮

৩১. মুহাম্মাদ ইবন ইসমা‘ঈল আল বুখারী, *আস-সহীহ*, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৩০৬০, পৃ. ৮৯৬

৩২. মুসলিম ইবনু'ল-হাজ্জাজ, *আস-সহীহ*, *প্রাগুক্ত*, খ.১, পৃ.৪৩৯

৩৩. মালিক ইবন আনাস, *আল-মুয়াত্তা* (বৈরূতঃ দারু ইহইয়া আত-তুরাসিল আরবী, ১৪০৬ হি.), খ. ১, হাদীস নং ২৩৪, পৃ. ১৯৯

৩৪. আবু উবায়দ আল কাসিম ইবন সালাম, *কিতাবুল আমওয়াল* (কায়রোঃ নাশর মুস্তফা মুহাম্মদ, ১৩৫৩ হি.), পৃ.১৮৮

৩৫. ইবন কাসীর, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* (বৈরূতঃ দারু ইহইয়া আত-তুরাসিল আরবী, ১৪১৭ হি.), খ. ৫, পৃ.৭৬

৩৬. আবু উবায়দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯০

৩৭. মুহাম্মদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *নায়লুল আওতার* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৪০৩ হি.), খ. ৪, পৃ. ১৮৯; আবু উবায়দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ.৩৬২

৩৮. ইব্রাহীম মীর, *তারীখে আহলে হাদীস* (নয়াদিল্লীঃ তাওহীদ লাইব্রেরী, ১৯৮৩), পৃ. ৩২০

৩৯. আবু উবায়দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২০-২৩

৪০. মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *নায়লুল আওতার* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৪০৩ হি.), খ.৪, পৃ.৩৫

৪১. আবু উবায়দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১, ১৭৩

৪২. শিহাবুদ্দীন আল আলুসী, *তাফসীরে রুহুল মায়ানী* (মিসরঃ আল মুতবায়াতুল মুনিরিয়্যাহ, ১৩৩৫ হি.), খ. ১০, পৃ. ৪৪

৪৩. ইবন হিশাম, *সীরাতু ইবন হিশাম* (বৈরূতঃ দারুল-ফিকির, ১৪১৫ হি.) পৃ. ৫৫৩

৪৪. আবু উবায়দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫, ২০০-২০১, ২৮০-২৮১, ৩৭৪

৪৫. ইবন হিশাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৭৩

৪৬. ইবন হাজার আসকালানী, *আদদিরায়াহ ফী তাখরীজে আহাদীসিল হিদায়াহ ওয়া নাসবুর রাইয়াহ লিলযাইলা'য়ী* (বৈরূতঃ দারুল মা'য়রিফ, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ১৮২

৪৭. ইবন হাজার আসকালানী, *আদদিরায়াহ ফী তাখরীজে আহাদীসিল হিদায়াহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫

৪৮. মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *নায়লুল আওতার* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৪০৩ হি.), খ. ৭, পৃ.২৪২

৪৯. আবুল হাসান আল-বালাযুরী, *ফতহুল বুলদান* (বৈরূতঃ দারু ওয়া মাকতাবাতুল হেলাল, ১৯৮৮), পৃ.৩৬-৪২

৫০. ইবন কাসীর, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ১৬-১৭, ৩৫, ৭৫, ১০৫

৫১. ড. সুবহি সালিহ, *উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু* (বৈরূতঃ দারুল ইলম, ১৯৮৪), পৃ. ২৭

৫২. মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ আল-খাওলী, *মিফতাহুস সুন্নাহ* (মিসরঃ আল-মাকতাবা আল-আরবিয়া, ১৯২৮), পৃ. ১৬

৫৩. মুহাম্মদ ইবন সাআদ, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা* (লাইডেনঃ বেরিল প্রেস), খ. ১, পৃ. ১৮৯; আর-রাম হারমাযী, *আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল* (মিসরঃ দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, তা.বি), খ. ২, পৃ. ২৩

৫৪. মাওলানা তাকী উসমানী, *দারসি তিরমিজী* (দেওবন্দঃ আনওয়ার বুক ডিপো, ১৩৯৬ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৯

৫৫. ড. সুবহি সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

৫৬. মানাযির আহসান গিলানী, *তাদবীনে হাদীস* (লাহোরঃ সুহাইল একাডেমী, তা.বি.), পৃ. ৬৭

৫৭. ইবন আব্দিল বার, *জামিউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাদলুহু* (মিসরঃ ইদারাতুল মাতবাআতিল মুনীরিয়াহ, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৭২

৫৮. ইবন সা'দ, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.), খ. ৫, পৃ. ২১৬ ও খ. ৬, পৃ. ১৭৯

৫৯. আব্দুর রহমান মোবারকপুরী, *মুকাদ্দিমাতু তুহফাতিল আহওয়াযী* (দিল্লীঃ যায়েদ বারকি প্রেস, তা.বি.), পৃ. ১৯

৬০. হাম্মাদ ইবন মুনাব্বিহ, সহীফাহ, (দামিস্কঃ আল-মুজাম্মাউল আরাবী, ১৩৭২), পৃ. ১৪

৬১. খতীব বাগদাদী, তাকঈদুল ইলম (দামিস্কঃ দারুল কলম, ১৯৪৯), পৃ. ১০৪

৬২. ড. সুবহি সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪

৬৩. ড. মুহাম্মদ আজাজ আল-খতীব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৬

৬৪. ইবন হাজার আস-কালানী, *আল-ইসাবা* (মিসরঃ মুস্তাবা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩২৩ হি.), খ. ৪, পৃ. ২৯৩

৬৫. ড. মুহাম্মদ আজাজ আল-খতীব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৮

৬৬. ইমাম বুখারী, *আত-তারীখুল কাবীর* (হায়দ্রাবাদঃ ১৩৬০ হি.), পৃ. ২৬

৬৭. ড. সুবহি সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

---

জমা প্রদানের তারিখ : ১৫.০২.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ২২.০৫.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-১, জানুয়ারি–জুন ২০২২

# প্রাচীন বাংলার নারী সমাজ

মোছা. রূপালী খাতুন*

**Abstract**

In ancient Bengal, women enjoyed high status and respect in family and society. Then women were provided an opportunity to attain high intellectual and spiritual standards. At the matriarchal society, women holdings more central positions than men. Since the later Vedic period women started being discriminated. Gradually child marriage, the satidah system, purdah and polygamy worsen the women's position. Women had no legal and social rights other than that derived from their position in the family. During the Pala reign (750-1174 C.E.) women enjoyed a relatively good status in society. They tended to be educated and traveled freely even along with men. But during the Sena rule (1070-1230 C.E) the society of Bengal became more stratified. Then cast purity undoubtedly harmed women lives. While men (Brahmins) occupied a superior class, women slowly began to lose their prior status and to live in a strict environment. After ages, in the 16th century by Chaitanya's religious revolution (chaitanyism) had close ties to fold culture and women also enjoyed more rights. However , This paper is prepared completely following the analytical research method.

প্রাচীন বাংলার সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে মতান্তর রয়েছে। প্রাচীন কালে দেখা যায়, দ্রাবিড়দের প্রতিষ্ঠিত মাতৃতান্ত্রিক পরিবার তথা সমাজব্যবস্থা বৈদিক যুগের প্রথম দিকেও বলবৎ ছিল। এ সমাজে নারীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন পরিবারে অর্থনৈতিক ভূমিকায় নারীরা ছিলেন প্রধান শক্তি, তাই পরিবারের সকল সদস্য নারীর উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে কৃষিকাজ ও পশুপালন সহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুরুষের হস্তগত হয় এবং সমাজে পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়। এ সময় থেকে গৃহের কাজ ও সন্তানপালন করাই নারীর প্রধান কাজে পরিণত হয়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীকে ঘরের কোনে বন্দি করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন বাংলার সমাজে নারীর ভূমিকা ও মর্যাদাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শাস্ত্রীয় বর্ণনা, সামাজিক প্রথা ও আচরণ এবং সাহিত্যিক বর্ণনায় নারীর বিপরীতধর্মী চিত্র তথা নারী সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য পাওয়া যায়। দেখা যায়, বাংলার সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠা নারীর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটায়। অন্যদিকে মনুর ধর্মে নারীকে শ্রদ্ধা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হলেও এখানে পিতৃতন্ত্রের কঠোরতা প্রমাণিত হয়েছে। পাল আমলে শাস্ত্রীয় নীতির নামে নারীকে নানাভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে, সেন আমলে এসেও নারীর প্রতি বাংলার সমাজ কঠোরতা দেখিয়েছে। নারীরা প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও তা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ তারা লাভ করেননি এবং নারী স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা পায়নি। এভাবে দেখা যায় যে, সভ্যতার শুরুতে নারীর সামাজিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হলেও পরবর্তীতে তারা পুরুষের অধস্তন হয়ে সার্বিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে সেন শাসনামলের শেষ পর্যায় (১২০৬ খ্রি.) পর্যন্ত সময়কালে বাঙালি নারীর সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এ কাল পর্বে বাংলার সমাজে ও পরিবারে নারীর ভূমিকা কেমন ছিলো, শাস্ত্র ও ধর্ম প্রচারকরা নারীকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, নারীর অধিকার কিভাবে খর্ব করে তাকে অধস্তন করা হয়েছে ইত্যাদি বিষয় বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরে এর স্বরূপ নির্ণয় করার প্রত্যয় রয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রাচীন কালে বাংলার নারী সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় নিয়ে অনেক লেখক ও গবেষক আলোকপাত করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আনিসুজ্জামান রচিত *বাঙালি নারী সাহিত্যে ও সমাজে*, পূরবী বসু'র *প্রাচ্যে পুরাতন নারী*, মাহমুদা ইসলাম এর *নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা*, মালেকা বেগম রচিত *বাংলার নারী আন্দোলন*, ক্ষিতিমোহন সেন এর *প্রাচীন ভারতে নারী*, রতিকান্ত ত্রিপাঠী রচিত *প্রাচীন বাংলার শিলা ও তাম্রলিপিতে সমাজ ও সংস্কৃতি*, Shahanara Hussain এর *The Social Life of Women in Early Medieval Bengal* প্রভৃতি। লক্ষণীয় যে, এসব গ্রন্থের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী প্রসঙ্গটি প্রসঙ্গিকভাবে এলেও পৃথকভাবে প্রাচীন বাংলার নারীর সামাজিক অবস্থার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে আলোচনা লক্ষ করা যায় না। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে প্রাচীন বাংলার নারী সমাজ বিষয়ে সুস্পষ্ট আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অসীম। এমতাবস্থায় প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে সমসাময়িক বেদ সাহিত্য, প্রথম যুগের পুরাণ, বৌদ্ধ সাহিত্য, শিলালিপি, পোড়ামাটির ফলকে বিভিন্ন লেখনী প্রভৃতি প্রাথমিক উৎস হিসেবে এবং আধুনিক গবেষকদের রচিত নানাবিধ তথ্যসমৃদ্ধ রচনাবলী দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য প্রবন্ধটি রচনায় মানবিকবিদ্যা গবেষণা ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ রীতি (Analytical Method) অনুসরণ করার প্রচেষ্টা রয়েছে। এখানে বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনার উদ্দেশ্য হলো- প্রাচীন বাংলায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা এবং এ সমাজে নারী কিভাবে অধিকার হারিয়ে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হতে থাকে, অবরোধপ্রথা তথা পর্দার দোহাই দিয়ে নারীকে গৃহে একপ্রকার বন্দি রাখা, সম্পত্তি ও শিক্ষা সহ নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের দোহায় দিয়ে সমাজে নারীকে অধস্তন করে রাখা সম্পর্কিত বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস তুলে ধরা। উক্ত বিষয়ে তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে ইতিহাসের শিক্ষার্থী, জেন্ডার সমতা নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং পাঠক শ্রেণির জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করা, আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনার মৌল উদ্দেশ্য। সর্বোপরি বর্তমান নারীসমাজকে সচেতন করা।

বাংলার সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনধারার যে ভিত্তি শতকের পর শতক ধরে গড়ে উঠেছে তার সম্পূর্ণ রূপায়ণ ঘটেছে অ্যালপাইন ও আদি অস্ট্রেলিয় জাতির কর্মকাণ্ড ও চিন্তাচেতনার ফলস্বরূপ। পরবর্তিতে আর্য ভাষাভাষী আদি নর্ডিক জনগোষ্ঠীর বিস্তার ঘটলেও তা বাঙালির সমাজ জীবনের উঁচু স্তরেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, নানাকারণে গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। আদি নর্ডিক জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করে বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি। আর্যদের পূর্বে বাংলায় তথা ভারতবর্ষে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের বসবাস ছিল। সে সময় জাতিভেদপ্রথা ছিল না। বিবাহসহ নানা রকম সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার সমন্বয় বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। দ্রাবিড়দের[১] মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থাতে অন্যদের তুলনায় নারীর প্রাধান্য বেশি ছিল। এদের একদল যেমন নারীর স্বেচ্ছাচার মানত তেমনি উচ্চতর অংশ বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসধর্মকে নারীর ভূষণ বলে মনে করতো।[২] দ্রাবিড়দের মধ্যে নারীর প্রভূত্ব এবং কর্তৃত্ব প্রচলিত থাকায় এ সময় সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। নারীরা পছন্দমত পুরুষ নির্বাচন করে সংসার করতো। নারীর এ প্রাধান্যের কারণে সে সময় বংশ ও অধিকার পুত্রগত ছিল না, ছিল কন্যাগত।[৩] ক্রমে এদেশে আর্যদের আগমন ঘটে। দ্রাবিড়দের মাতৃতন্ত্রের প্রভাব আর্যদের মধ্যে প্রথমদিকে কার্যকর থাকায় সমাজে নারীর স্থান কিছুটা উচ্চ পর্যায়ে ছিল। তাই আর্য সমাজে এ সময় নারীর মাতৃত্ব ছিল শ্রদ্ধার বিষয়। প্রাথমিক অবস্থায় আর্যসমাজে নারীর সম-অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে বহু তথ্য প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়।[৪] এমনকি খ্রিস্টপূর্ব আঠারো শতকের শেষভাগে ব্যবিলনের শাসক হাম্বুরাবি (আনুমানিক ১৭৯২-১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) আইন সংহিতা

প্রণয়ন করেন, যা পৃথিবীর প্রথম লিখিত আইন। এ আইনে নারী বিষয়ে বলা হয়েছে, সন্তানের ব্যাপারে নারী ও পুরুষের কর্তৃত্ব ও অধিকার সমান, নারী উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির মালিক হতে পারবে এবং নিজ সম্পত্তি ইচ্ছামত উইল(দান) করতে পারবে। বিয়েতে পুরুষ নয় বরং নারী যৌতুক পাবে এবং স্ত্রী প্রয়োজনে নিষ্ঠুর স্বামীকে তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে। নারী সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে এবং সে বিচারক, কুলপতি, সাক্ষী ও করণিক হতে পারবে বলে আইনে প্রয়োজনীয় বিধান রাখা হয়। ফলে সহজেই অনুমান করা যায় তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা যথেষ্ট উচ্চ পর্যায়ে ছিল।[৫] কিন্তু প্রাচীন বাঙালি সমাজে এ ধরণের কোন সুযোগ নারীর জন্য বহুলাংশে কার্যকর ছিলো না।

অন্যদিকে *বেদ* এর মন্ত্রে কোন কোন পণ্ডিত মেয়েদের অধিকার না দিলেও জানা যায় বহু বেদমন্ত্র নারী কর্তৃক রচিত।[৬] বৈদিক যুগে নারী পৈতা (উপনয়ণ) গ্রহণ করতেন ও পুরোহিত হতেন। গার্গী, অপলা, মৈত্রেয়ী, শতরুপা, মদালসা, ঘোষা, লোপামুদ্রা, লীলাবতী, কাক্ষীবতী, বাক ব্রক্ষবাদিনী, মুদগালিনী, বিশপলা, বধ্রিমতী প্রমুখ নারী *বেদ* এর বহু শ্লোকের রচয়িতা।[৭] অন্যদিকে লক্ষণীয় যে, মেয়েদের অন্তঃপুর ও অবরোধপ্রথার কথা *মহাভারতে* উল্লেখ আছে।[৮] ঐতিহাসিকরা মনে করেন, প্রাচীন কালে ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার আর্য জাতির মধ্যে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। অনার্যদের কাছ থেকেই এ প্রথা আর্যসমাজে এসেছে। পঞ্চনদ প্রদেশের তক্ষশিলা অঞ্চলে গ্রিকদের প্রভাব ছিল বলে জানা যায়; যীশু খ্রিস্টের জন্মের তিন-চারশ বছর আগে এ সকল স্থানে সতীদাহ বেশি হতো।[৯] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সতীদাহপ্রথা নারীর উচ্চ অবস্থান নিশ্চিত করে না। এটি ছিলো পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী নিস্পেষণের ব্যবস্থা মাত্র। অন্যদিকে *ঋগ্বেদের* যুগে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০-১১০০ অব্দ) নারী পুরুষের সমমর্যাদার কথা জানা যায়। গোষ্ঠীবদ্ধতা থেকে বৃহত্তর সমাজ চেতনার দিকে যাত্রার এ সময়ে পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকায় নারী গো-চারণ, কৃষিকাজ, গৃহকাজ ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরির কাজ করতো।[১০] অর্থাৎ উৎপাদনের কাজে নারী ছিল মূল শক্তি। বহুবিবাহ তখন সামাজিক আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতো না, যদিও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না।[১১] উল্লেখ্য নারীর অবরোধের কথা *বেদ* সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

বৈদিক যুগে আর্যদের প্রধান দু'টি জীবিকা ছিল কৃষিকাজ ও পশুপালন, যা প্রথম আবিষ্কার করে নারীরা। ফসল ও দুধ উৎপাদন করে নারী পরিবারের সকলের খাদ্যের সংস্থান, বন্য শণ ও গৃহপালিত ভেড়ার লোম দিয়ে কাপড় বুনে সকলের পোশাক-পরিচ্ছদ সরবরাহ, সন্তান জন্মদান ও লালনপালন এবং পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতায় গাছগাছড়া ও লতা-পাতা দিয়ে ঔষধ তৈরি করে পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা দিয়েছে। কাজেই জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে নারী ছিল প্রধান শক্তি। ঘরে-বাইরে সকল উৎপাদনমুখী কাজে সর্বত্র তাদের অবাধগতি ছিলো। পুরুষ নারীর উপর জীবনধারণের জন্য নির্ভরশীল হলেও এসময় কিন্তু নারীরা পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করেনি বরং পুরুষকে নিয়ে পরস্পরের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে জীবন যাপন করেছে ; অর্থাৎ তখন নারী পুরুষের মধ্যে সমতা ছিল।[১২] কিন্তু ক্রমে সমাজে সম্পত্তির মালিকানার উপর ভিত্তি করে সামাজিক অসাম্য দেখা দেয় এবং ধনী দরিদ্রের ব্যবধানের সূত্রপাত হয়। নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নারীকে পুরুষের অধীনতাপাশে আবদ্ধ করার প্রচলন ঘটে। এভাবে দেখা যায় বৈদিক যুগের প্রথমদিকে যাযাবর সমাজে নারীর কিছুটা স্বতন্ত্র্য অবস্থান ও স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু যখন আর্যরা প্রাগার্যদের কাছে কৃষিবিদ্যা শিখল, তাঁবুর বদলে পোড়া মাটির বাড়িতে বাস করতে শুরু করলো, যাযাবর জীবন যাত্রার বদলে সমাজ কৃষিনির্ভর হয়ে উঠল, লাঙলের ব্যবহার শিখল,

পেশি শক্তির মাধ্যমে উৎপাদন বেড়ে গেল এবং জমিতে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হল তখন নারীরা পরিবার ও সমাজে নিজের স্বতন্ত্র্য অবস্থান ও অধিকার হারাতে শুরু করে। অর্থাৎ নারীর সামাজিক অবস্থানের একটি পরিবর্তন এ সময় লক্ষ করা যায়।

বৈদিক আর্যসমাজে ধীরে ধীরে ক্রীতদাস প্রথার আবির্ভাব ঘটে। যুদ্ধবন্দিদের শ্রম সহজে ও বিনা পারিশ্রমিকে পাওয়ার সুবিধার জন্য প্রথমে যুদ্ধবন্দীরাই দাস হিসেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু ক্রমেই ধনীর ঘরে সমাজের দরিদ্র মানুষ কাজ করার মাধ্যমে ক্রীতদাস হিসেবে গণ্য হতে থাকে। দানা ফসল গুঁড়া করার জন্য মেয়ে ক্রীতদাস নিয়োগের খবর *অথর্ববেদে* পাওয়া যায়।[১৩] ক্রীতদাস প্রথার অস্তিত্বসম্পন্ন বৈদিক আর্যসমাজকে অপরিণত পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাই বলা যায়। এতকাল উৎপাদন ব্যবস্থায় একচ্ছত্র শক্তি হিসেবে নারীর যে ক্ষমতা ও অধিকার ছিল তা ক্রমে পুরুষ ও দাস দখল করলো। আবার সম্মানজনক অধিকার থেকে সরিয়ে বিবাহপ্রথার মধ্যদিয়ে নারীকে পরিবারের দাস হতে হলো এবং নারীর দাসশ্রমের উপর গড়ে উঠল বাঙালি পরিবার প্রথা।[১৪] তবে শুধু বাঙালি নারীর জীবনেই এমনটা ঘটেনি। মানব জাতির মধ্যে নারীরাই সর্বপ্রথম দাসত্বের শৃঙ্খল পরেছে, এটা পৃথিবীর সকল সমাজেই প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাসে দাসপ্রথারও আগে নারীর দাসত্ব শুরু হয়েছে, সেটিও বিশ্বখ্যাত সমাজতাত্ত্বিকরা প্রমাণ করেছেন।[১৫]

আর্যসমাজ প্রথম পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, পাশাপাশি 'নারী বিনিময়' শুরু হয়।[১৬] পরিবার ও সমাজে নারীকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়। ইতোপূর্বে সন্তান মায়ের পরিচয়েই বেশি পরিচিত হতো। কিন্তু পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সন্তান পিতার সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। তখন পরিবারের কর্তা হতেন স্বামী, ফলে সমাজে নারীর পদমর্যাদার পরিবর্তন হয়ে তাকে স্বামী ও ছেলের উপর নির্ভরশীল করে তোলে এবং বিয়ে পদ্ধতির দ্বারা মেয়েরা সম্পত্তির মতো হস্তান্তরিত হতে থাকে। বিয়ের সময় পণ দিয়ে স্ত্রী কিনে নেওয়ার প্রথার মধ্যদিয়ে পুরুষ অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে স্ত্রীকে ব্যবহার করার অধিকার পেল। এমনকি অর্থের বিনিময়ে স্বামী স্ত্রীকে বিক্রি করতে বা জুয়া খেলায় তাকে বাজি রাখতে দ্বিধা করতো না। বিয়ের ব্যাপারে নারীর সামান্য অধিকারও ছিল না। তখন অন্ধকারে পিঞ্জরাবদ্ধ রেখে কোনো রকমে ভাত কাপড় দিয়ে কন্যাকে পাত্রস্থ করতে পারলেই পিতা তাঁর পিতৃত্বের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে তৃপ্তি লাভ করতেন।[১৭] তাছাড়া, মেয়েদের বিয়ে হতো এতো কম বয়সে যে, তাদের মতামত নেয়ারও কোনো প্রয়োজন হতো না এবং পরবর্তীতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার শিকার হতে হতো নারীকেই।[১৮] মূলত মেয়েদেরকে সমাজে হীন করে রাখার জন্য বা দমিয়ে রাখার জন্য অল্পবয়সে বিয়ে দিয়ে তাকে একজন পুরুয়ের অধীনে রাখা হতো। অন্যদিকে জাতিভেদ প্রথা চালু হওয়ায় সমাজ আর মেয়েদের স্বয়ংবর প্রথা (নিজে স্বামী পছন্দ করার রীতি) মেনে নেয়নি। কেননা জাতিকুল রক্ষার জন্য অভিভাবকদের মতানুসারে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিয়ের ব্যবস্থা চালু হয়।[১৯]

প্রথমদিকে আর্যসমাজে যাগ-যজ্ঞের আগুন জ্বালিয়ে নাচ গান করে মেয়েরা পূজা করতো। কিন্তু ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে নারীসমাজ পূজা করার অধিকার হারায়।[২০] সন্তান জন্মদানের মাধ্যম হিসেবে তো বটেই, বংশধরের মধ্যে বেঁচে থাকার ও সম্পত্তির অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার নিশ্চয়তার জন্য স্ত্রীকে শুধু স্বামীর ভোগের বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা শুরু হলো। সন্তানের পিতৃত্বের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নারীকে প্রায় আধা কয়েদি করা হলো। সে সাথে সতীত্ব রক্ষার জন্য নারীকে অন্য পুরুষের চোখের আড়ালে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে প্রায় আটক রাখা হতো। তার মুখমণ্ডল,

শরীর সবকিছু ঢেকে রাখা হতো। এভাবেই ঘোমটা, বোরকা ও পর্দাপ্রথা তথা অবরোধপ্রথার প্রচলন শুরু হয়।[২১] কিন্তু পুরুষের বহুগামিতা বন্ধ হলো না। উল্লেখ্য দরিদ্র পরিবারে মেয়েদের কাজ করার প্রয়োজন থেকেই গেল। সংসার পরিচালনায় গরিব মেয়েরা অর্থ উপার্জনে কার্যকর অবদান রাখতে যাওয়ায় তাদের অবগুণ্ঠিত রাখা সম্ভব হতো না। কিন্তু অন্যভাবে তাদের উপর অত্যাচার চলত। এভাবে দেখা যায় আর্য সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থান ধীরে ধীরে অবনতির দিকে যেতে থাকে। অন্যদিকে তৎকালে নারীরা সম্পত্তিতে কোনো অধিকার দাবি করতে পারতো না। শুধু সম্পত্তি নয়, নিজের দেহের উপরও নারীর অধিকার ছিল না। *উপনিষদে* উল্লেখ করা হয়েছে, সম্ভোগে অনিচ্ছুক স্ত্রীকে প্রথমে মিষ্টি কথা বলতে হবে, তাতেও সম্মত না হলে তাকে বস্ত্রালংকার দিতে হবে, তাতেও সম্মত না হলে তাকে প্রহার করতে হবে।[২২] এককথায় ব্রাহ্মণ্যবাদ নারী সমাজের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে এবং ধর্মের নামে নারীকে সমাজে কোনঠাসা করে রাখার প্রয়াস চালায়।

*মনুসংহিতায়*[২৩] বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যায় বিধাতার অর্ধেক পুরুষ, অর্ধেক নারী হয়ে উঠার কথা বলেন মনু। অথচ তিনি নারী চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অবলীলায় তাদের সম্পর্কে বহু অবমাননাকর কথা বলেছেন। পাশাপাশি নারীর কিছু অধিকার এবং তা সুরক্ষার পরামর্শও দিয়েছেন। এখানে বলা হয়েছে, নারীজাতিকে শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী ও স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলের অধীনেই থাকতে হবে। তবে অনাদরে ও অমর্যাদায় মেয়েরা যেখানে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং তারা অপমানিত বা বৈষম্যের শিকার হয়ে যে বংশকে উদ্দেশ্য করে অভিশাপ দেয়, সে বংশ বিষপান করা ব্যক্তির ন্যায় সর্বতোভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অন্যত্র বলা হয়, যারা ঐশ্বর্য কামনা করে, তারা স্ত্রীলোকদের সম্মান প্রদর্শন দ্বারা সুখী রাখবে এবং উত্তম অলংকার, পোশাক ও খাদ্য দ্বারা সন্তুষ্ট রাখবে। নারীজাতিকে সর্বদা পবিত্র হিসেবে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করবে।[২৪] এ শাস্ত্রে স্ত্রীকে ত্যাগ করার অধিকার পুরুষ পায়, কিন্তু স্বামী ত্যাগ করা স্ত্রীর জন্য নিষিদ্ধ হয়। এ ধর্মাশ্রিত সমাজব্যবস্থায় দেখা যায়, স্ত্রী কোন কারণে অবিশ্বাসী হলে ভয়ানক শাস্তিসহ মৃত্যুদণ্ড ধার্য হয়। আবার ছেলেমেয়েদের উপর বাবার অধিকার ও কর্তৃত্ব ছিল এমন চূড়ান্ত যে, বাবা ইচ্ছা করলে সন্তানদের বিলিয়ে দিতে পারতো।[২৫] অর্থাৎ সন্তানের উপর মায়ের অধিকার খর্ব করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মনুর ধর্মে নারীর অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে এবং পিতৃতন্ত্রের ভিত্তিকে এখানে আরো মজবুত করা হয়েছে।

বৈদিক যুগের পর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর শাসকগোষ্ঠী বাংলা শাসন করেছে। প্রতি যুগেই শাসননীতিতে শাসকের ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শাসনকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে শাসক ও শাসিতের মধ্যে ধর্মের নামে শোষণ এবং বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। একইসাথে নারী ও পুরুষের ব্যবধানও সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধের বৌদ্ধ ধর্মের মুক্তির দর্শন নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে। এ ধর্মে পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস না থাকায় পুত্রসন্তানের প্রয়োজন জরুরি হয়নি। বৌদ্ধ ধর্মে ছেলে না থাকলে বাবার সম্পত্তি ও বংশ রক্ষায় মেয়ের অধিকার স্বীকৃত হয়।[২৬] গৌতম বুদ্ধ পুরুষের পাশাপাশি নারী সমাজের পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। যে কোনো সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতির প্রয়োজনে তিনি নারী সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ প্রদর্শনকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। ফলে বৌদ্ধযুগে নারীর সামাজিক মর্যাদার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এসময় নারীরা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কাজ করার অবাধ সুযোগ পায়।[২৭] তবে বৌদ্ধ ধর্মের সূচনাপর্বে চলতি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার আশায় হাজার হাজার নারী সংসার ধর্ম ত্যাগ করে 'ভিক্ষু সংঘ' তে আশ্রয় নেয়। আবার বৌদ্ধ ধর্ম নারীকে মঠজীবনের অধিকার দিলেও পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়নি। এ ধর্ম ব্যবস্থায় একদিকে নারীর বিভিন্ন লুপ্ত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে, আবার

অন্যদিকে তাদের অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে মঠ জীবনযাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে অনেক বৌদ্ধ নারী এসময় সংসার ছেড়ে স্বাধীনভাবে বসবাসের জন্য মঠ জীবনে চলে আসে, যা নারীকে গৃহহীন করে এবং তাদের সামাজিক মূল্য হ্রাস করে। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হলেও তখনকার সমাজ চলতো মনুর মন্ত্রে। এ কারণে সমাজে নারীর অবস্থান উন্নত হয়নি বরং আরো অবনত হতে থাকে।

বাংলায় পাল বংশের শাসনামলে রাজা রামপালের (১০৯২-১১৪১ খ্রি.) তাম্রলিপি থেকে জানা যায়, এ যুগে গর্ভবতী নারী যেন সুদর্শন সন্তান জন্ম দিতে পারে এজন্য অনুষ্ঠান করে তাকে নতুন চাঁদ দেখানো হতো।[২৮] আবার সমাজে পুত্র সন্তানের কদর বেশি ছিল। যে নারী পুত্র সন্তান জন্ম দিতে পারতো স্বামীর পরিবারে তাঁর দীর্ঘদিন বসবাস করার বিষয়টি পাকাপোক্ত হতো। তবে কন্যা সন্তানও কিছুটা সম্মানিত ছিল, কেননা মেয়েরা পরিবারের পুরুষ অভিভাবকদের সেবা করতো।[২৯] অন্যদিকে শাস্ত্রীয় নীতির কারণে এ সময় বঞ্চনার স্বীকার হয় নারীরা, যাদের শূদ্র হবারও প্রয়োজন ছিল না। নারীরা শুদ্রের ন্যায় বেদপাঠে ছিলো অনুপযুক্ত, এ ব্যাপারে প্রতিবাদী বেশ কিছু নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একজন ছিলেন খনা। বাস্তবজীবনে খনা নামে সত্যিকার অর্থে কোনো একজন বিশেষ নারী ছিলেন কিনা এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদরা সম্পূর্ণ একমত নন। অনেকটা কিংবদন্তীসম এ নারীকে একটি শ্রেণিবদ্ধ নারীর মিলিত কণ্ঠস্বর বলে দাবি করা হয়। তর্কের খাতিরে আমরা ধরে নিই খনা বলে অত্যন্ত বুদ্ধিমতি, বাস্তববাদী, কৃষি ও পরিবেশ সম্পর্কে অত্যন্ত প্রখর জ্ঞানী এক সনাতন নারীর অস্তিত্ব ছিল।[৩০] অনুমান করা হয় সপ্তম শতকের পূর্বে খনার আবির্ভাব ঘটে। তখন বাংলায় বৌদ্ধ, বৈদিক, চার্বাক দর্শন ছাড়াও জৈন, শাক্ত, সহজিয়া, বাউল, শৈব, তান্ত্রিক ও নাথপন্থী মতবাদসমূহ পরস্পরের সীমানা ছাড়িয়ে একটি সমন্বয়বাদের সৃষ্টি করে। স্বাধীন চিন্তা ও বিশ্লেষণের অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে সমাজে খনার উপস্থিতি ক্ষমতাধর পুরুষ সমাজপতিরা সহ্য করতে পারেনি। তাই খনার জিহ্বা কেটে নেয়া হয় এবং ক্রমাগত অত্যাধিক রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়।[৩১] এটি দ্বারা প্রমাণিত হয় তৎকালীন সমাজের পুরুষরা কোনো নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি মেনে নেয়নি। এরপর ধীরে ধীরে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ থেমে যায়, বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাসী পাল বংশের রাজত্ব শেষ হয়। এভাবে দেখা যায়, পাল আমলে বাঙালি নারীরা সামাজিকভাবে অধস্তন অবস্থায়ই থেকে যায়।

পরবর্তীতে সেন শাসনের সূচনাপর্বে সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেন যুগে বাংলায় নারীসমাজের জীবনকাল মনুর মতাদর্শের ন্যায় তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। প্রথমত: পিতৃগৃহে বসবাসের সময়, দ্বিতীয়ত: স্বামীগৃহে বসবাসের সময় এবং তৃতীয়ত: পুত্র সন্তানের গৃহে বসবাসের সময়। তখনকার শাস্ত্রে পাওয়া যায় যে, 'পিতাই যোগ্য পাত্রে কন্যা সম্পাদন করিবেন, কন্যা বর প্রার্থনা করিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম'।[৩২] কিন্তু অন্যত্র বলা হয়েছে, 'বিবাহযোগ্য হওয়ার তিন বৎসরের মধ্যে পিতা বা অভিভাবক কন্যা বিবাহের ব্যবস্থা না করিলে তাহারা স্বীয় বর্ণে নিজেদের পছন্দমাফিক স্বামী নির্বাচিত করিবে। ইহার জন্য কন্যা অথবা স্বামী পাপযুক্ত হইবেন না'।[৩৩] তখন কন্যা বিবাহে পিতা জামাতাকে যৌতুক প্রদান করতেন, *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে* পিতা কর্তৃক যৌতুক দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৪] *চর্যাগীতের* একটি গীতেও বর কর্তৃক যৌতুক গ্রহণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৩৫] প্রাচীন বাংলায় (পাল ও সেন শাসনামল) যদি কোনো মেয়ে বিবাহের পূর্বে পিতৃগৃহে বয়ঃসন্ধিকালে উপস্থিত হয়, তবে সে সমাজে শুদ্রের ন্যায় নিগৃহীত হয় এবং যৌতুক ছাড়া কোনো ছেলে যদি তাকে বিয়ে করে, তাহলে সেই ছেলেও নিগৃহীত হয় এবং

সমাজ তাকে ঘৃণা করে। অন্যদিকে মেয়ের পিতা সমাজের শত্রুতে পরিণত হয়।[৩৬] স্ববর্ণে বিবাহই ছিল তৎকালীন সামাজিক আদর্শ এবং স্বাভাবিকভাবে একটি মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করাই ছিল সাধারণ নিয়ম। তবে রাজা, সামন্তবর্গ, অভিজাত ও বিত্তবানরা অনেকসময় বহুপত্নী গ্রহণ করতেন। উল্লেখ্য এ সময় এক স্ত্রী যে সুখী পরিবারের আদর্শ তা সাধারণভাবে স্বীকৃত ছিল। সম্ভবত প্রাচীন বাংলায় স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান অনুমোদিত ছিল না।[৩৭] এক্ষেত্রে মনুর উক্তি উল্লেখযোগ্য, "বিবাহ বিচ্ছেদ কোনক্রমে অনুমোদিত হইবে না, স্ত্রীকে স্বামী যাহাতে পরিত্যাগ না করেন ইহার জন্য স্ত্রী অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিবেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই তাহাদের দাম্পত্য জীবনের স্থায়িত্বের জন্য যত্নবান হইবেন"।[৩৮]

প্রাচীন বাংলায় বিধবারা স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্র সন্তান না থাকলে সম্পত্তির মালিক হতো। তবে এ সম্পত্তি বিক্রি, হস্তান্তর বা উইল(দান) করতে পারতো না।[৩৯] এ সময় তারা স্বামীর পিতৃলয়ে বাস করতো ও সম্পূর্ণরূপে সে পরিবারের সদস্যদের অনুগত হতো। যদি মৃত স্বামীর পরিবারে কোন পুরুষ সদস্য না থাকতো তাহলে তাকে অবশ্যই নিজের পিতৃলয়ে চলে যেতে হতো।[৪০] উল্লেখ্য স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারী অত্যন্ত নিম্নমানের জীবন যাপন করতো, তাদেরকে বিলাসিতা বা জাঁকজমকতা বর্জন করতে হতো। অন্যদিকে সুস্বাদু খাবার যেমন মাংস, মাছ, মধু ইত্যাদি খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।[৪১] তারা তখন বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করতে পারতো না। সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট নানা রকম রীতি-নীতি মেনে চলতো যেন মৃত স্বামীর আত্মা শান্তি পায় এবং বিধবাদের অন্যতম কাজ ছিল সমাজের লোকদের উৎসাহিত করা যেন তাদের স্ত্রীরা নিজেদেরকে স্বামীর চিতায় আত্মবলিদান করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়।[৪২]

প্রাচীন কালে বাংলার অভিজাত পরিবারের মেয়েদের সুখ্যাতি ছিল। বাৎস্যায়ন তাদেরকে মৃদুভাষিণী, কোমলাঙ্গী ও অনুরাগবর্তী বলে বর্ণনা করেন।[৪৩] এ সময় স্বামীর যথার্থ সহধর্মিনী হওয়া নারীর কামনা বাসনা ছিল। তাছাড়া গুণীপুত্রের মাতা হিসেবে সমাজ ও সংসারে প্রতিষ্ঠিত হতে চরম বাসনা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতো। বল্লালসেনের (আনুমানিক ১১৬০-১১৭৮ খ্রি.) নৈহাটি তাম্রলিপি হতে দেখা যায় বিজয় সেনের (আনুমানিক ১০৯৭-১১৬০ খ্রি.) স্ত্রী বিলাস দেবীকে লক্ষ্মী এবং গৌরীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। তিনি যে বীর ও গুণী পুত্র বল্লালসেনের জন্মদাত্রী একথাও উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৪] এতে প্রমাণিত হয় পুত্র সন্তানের জননী হিসেবে স্ত্রীর মর্যাদা স্বামীর সংসারে নিশ্চয় বৃদ্ধি করতো। আবার অনেক সময় স্বামীর সংসারে স্ত্রীর প্রাধান্য এতটা বেশি হতো যে, তিনি বহুক্ষেত্রে স্বামীকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। স্ত্রী, স্বামীর পথচলার দিকনির্দেশক হতেন এবং তাঁর সংকোচে স্বামী অনেক অসৎ কাজ হতেও বিরত থাকতো। সেন যুগে সকল বর্ণের স্ত্রীদের প্রাত্যহিক দায়িত্বের মধ্যে ছিল স্বামী ও সন্তানের পরিচর্যা, রান্না-বান্না, ভিখারীদের ভিক্ষা দেওয়া, অতিথি আপ্যায়ন করা প্রভৃতি। তবে মাতা হিসেবে সন্তান লালন-পালন প্রধান দায়িত্ব ছিল। এ সময় সম্পদশালী নারীরা বাড়িতে দাসী রাখতেন।[৪৫] অপেক্ষাকৃত কম স্বচ্ছল পরিবারের নারী প্রয়োজনের তাগিদে কোনো শিল্প সংস্থায় সুতা কেটে, তাঁত বুনে অথবা অন্য কোন শিল্পকার্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে পরিবার পরিচালনায় সহায়তা করতেন।[৪৬] তৎকালে নিম্ন শ্রেণির ডোম্বীনিদের পাটনীর কাজ এবং মদ বিক্রয় করে জীবিকা অর্জনের কথাও জানা যায়।[৪৭] অর্থাৎ সেন যুগে পিতৃতন্ত্রের কঠোরতা পরিলক্ষিত হলেও নারীর কর্মসংস্থানের বিষয়টি এখানে নতুন মাত্রা যোগ করে, যা পরবর্তিতে বাংলার নারীসমাজকে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে অনুপ্রাণিত করে। তবে বৃদ্ধ বয়স নারীর জন্য দুর্ভোগের ছিল, এ সময় তারা ঘরের বাইরে যেতেন না।

তৎকালীন নারীরা নানা কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। এর মধ্যে নৃত্যগীত অন্যতম। সম্ভবত সমাজের উচ্চ স্তরের নারীরাও নাচ-গানের চর্চা করতেন। জয়দেব পত্নী পদ্মাবতী একজন উঁচুমানের গায়িকা ও নর্তকী ছিলেন। *সেকশুভোদয়া* গ্রন্থে উল্লেখ আছে, লক্ষ্মণসেনের (আনুমানিক ১১৭৮-১২০৬ খ্রি.) সভায় পদ্মাবতী একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। জয়দেব তাঁর *গীতগোবিন্দের* গান করতেন এবং সে গানের রাগ-তাল ধরে পদ্মাবতী নাচতেন।[৪৮] এগারো বা বারো শতকে লীলাবতী নামে একজন বিদূষী নারী প্রখর বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন ভারতের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'র লেখক ভাস্করাচার্যের কন্যা। লীলাবতী পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় অভূতপূর্ব প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। লীলাবতী পিতা কর্তৃক রচিত 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'র তিনটি খণ্ড স্বহস্তে লিখে দেন।[৪৯] উল্লেখ্য এসময় সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের মধ্যে পর্দা ও ঘোমটার প্রচলন ছিল। কেশবসেনের 'ইদিলপুর লিপি'তে উল্লেখ আছে, বল্লালসেন তাঁর শত্রু রাজলক্ষ্মীকে জয় করে পালকিতে চড়িয়ে নিজ সাম্রাজ্যে নিয়ে আসেন।[৫০] ফলে সহজেই অনুমান করা যায়, অভিজাত ও উচ্চ শ্রেণির পরিবারের নারীদের জন্য পর্দার প্রচলন ছিল এবং এতে তাদের অভিজাত্য প্রকাশ পেত। তবে এ যুগে নারীর বিশেষ কোন স্বাধীন সত্ত্বা সমাজে স্বীকৃত ছিল না। তাদেরকে পুরুষের করুণা, বিবেচনা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করতে হতো। শাস্ত্র নারীদের আচার-আচরণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ প্রদান করে তাদের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করে।

এভাবে প্রচীন বাংলায় দেখা যায়, পিতা পরিবারের প্রধান হওয়ায় স্ত্রী, সন্তান ও সকল সম্পত্তির মালিক তিনিই হয়েছেন। মূলত পিতৃতন্ত্র এমন একটি অমানবিক ব্যবস্থা যেখানে সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রে নারী অধিকারহীন এবং পুরুষের উপর নির্ভরশীল ও অধস্তন। নারী একপ্রকার দাসী হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, পুরুষ সমাজ নারীকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে নির্যাতনও করেছে। তখনকার দিনে নারীর প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ছিল না, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না এবং তাদেরকে কোনরকম ব্যবসা-বাণিজ্যও করতে দেয়া হয়নি। এ সময় নারীর অন্যতম দায়িত্ব ছিল- সন্তান পালন, স্বামীসেবা ও গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা। কিন্তু সে পরিশ্রমেরও মূল্যায়ন করা হয়নি। প্রাচীন বাংলায় নারীদের জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভ করার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল এবং সম্পত্তি পরিচালনার কর্তৃত্ব স্বীকৃত ছিল না। পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ছিল না, এমনকি বিয়ের ক্ষেত্রে নিজে পাত্র পছন্দ করার অধিকার সমাজ নারীকে দেয়নি। সমাজে বিধবার পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। এককথায় সমাজ কোন রকম নাগরিক অধিকার নারীদের দেয়নি। অন্যদিকে নারীকে এক স্বামী গ্রহণ করতে হতো, অথচ পুরুষ একাধিক বিয়ে করতো এবং রক্ষিতা রাখতে পারতো। সমাজে অবরোধপ্রথা বিদ্যমান থাকায় মেয়েদের অবাধে সর্বত্র চলাফেরার অধিকার ছিল না। এভাবে নারীকে সর্বদিক থেকে অধস্তন রাখার একটি প্রক্রিয়া লক্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে, নারী ও পুরুষ নিয়েই সমাজ গড়ে উঠে। নারী-পুরুষে সমতা, নায্যতা ও পরস্পরের সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এ সত্যটি তখন উপেক্ষিত হয়েছে। প্রাচীন কালে নারীকে সমানভাবে পাশে রেখে পুরুষ যদি সর্বক্ষেত্রে অগ্রসর হতো তবে সভ্যতার বিকাশ অনেক আগেই ত্বরান্বিত হতো।

পরিশেষে বলা যায়, রাজনৈতিক উত্থান পতনের মধ্যদিয়ে বাংলার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও শাসন ব্যবস্থায় বহু পরিবর্তন ঘটলেও দীর্ঘদিন ধরে সমাজ ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই বাঙালি

নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের কোনো উন্নয়ন ঘটেনি। তবে সভ্যতার শুরুতে সমাজে নারীর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। প্রচীন বাংলায় কতিপয় ক্ষেত্রে নারীরা সুযোগ সুবিধা পেলেও ধর্মীয় অনুশাসনের নামে তাদের দমিয়ে রাখার প্রয়াস লক্ষণীয়। বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে কিছুটা স্বাধীনতা দেয়া হলেও তারা অবমাননার শিকারই বেশি হয়েছেন। উপরন্তু বাঙালি সামাজের অবরোধপ্রথা মুসলিম নারীর পাশাপাশি হিন্দু নারীর জীবনকেও দুর্বিষহ করে তুলেছিল। পাল আমলে এসেও দেখা যায় নারীর সামাজিক অবস্থার খুব একটা ইতিবাচক পরিবর্তন হয়নি। সেন শাসনামলে সীমিত পরিসরে নারীর বিদ্যার্জন ও জ্ঞানচর্চার তথ্য পাওয়া গেলেও তা ছিল অত্যন্ত নগন্য সংখ্যক। এসময় অসচ্ছল পরিবারের নারী জীবন যাপনের তাগিদে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করলেও সার্বিকভাবে নারীরা ছিল অর্থনৈতিক ভূমিকায় অনুপস্থিত। পরবর্তীতে মধ্যযুগে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর অভিজাত পরিবারের নারীরা গৃহ অভ্যন্তরে শিক্ষাসহ নানা সুযোগ সুবিধা পায় এবং প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর বাংলার নারীর অবস্থা পূর্বের তুলনায় আরো বেশি শোচনীয় হয়। সতীত্ব, পতিব্রত্য ও নারীত্বের মহিমায় নারীসমাজকে বিভোর রেখে এবং ধর্মীয় অনুশাসনের নামে সমাজপতিদের চাপিয়ে দেওয়া বিধি-নিষেধ তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে শৃঙ্খলিত করে রাখে। অবশেষে উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের মাধ্যমে বাঙালি সমাজে মানসিকতার সদর্থক পরিবর্তনের প্রভাবে ধীরে ধীরে নারীর সার্বিক অবস্থার উন্নতি হওয়া শুরু করে।

## তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. 'দ্রাবিড়রা' ছিল ভারতবর্ষের ভূমিসন্তান। পরবর্তীতে আর্যরা এসে দ্রাবিড়দের পরাজিত করে। পূরবী বসু, *প্রাচ্যে পুরাতন নারী* (ঢাকা : অবসর প্রকাশনা, ২০১৩), পৃ. ১৯

২. ক্ষিতিমোহন সেন, *প্রাচীন ভারতে নারী* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থমালা, ১৯৮২), পৃ. ৮২-৮৫

৩. *তদেব*, পৃ. ৮২-৮৫

৪. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন* (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১০), পৃ. ২

৫. মাহমুদা ইসলাম, *নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১২), পৃ. ৪১-৪২

৬. পূরবী বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩

৭. *তদেব*, পৃ. ২৪

৮. প্যারীচাঁদ মিত্র, *এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা* (কলকাতা : শ্রীকালীকিঙ্কর কর্তৃক প্রকাশিত), ১৮৮০, পৃ. ১০৫

৯. সতীদাহ প্রথা অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার সমাজে প্রচলিত ছিল। এমনকি প্রাচীন ব্রিটেন, গ্রিস, মিশর, চীন, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও এ প্রথার প্রচলন ছিল। বৈদিক সাহিত্যে, *রামায়ণ* ও *মহাভারতে* তথা হিন্দুযুগে ভারতের নানাস্থানে সতীদাহ প্রথার প্রচলন দেখা যায়। সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের (১৬০৫-১৬২৭) রাজত্বকালে সতীদাহ প্রথা রদ করার চেষ্টা করা হয়। আধুনিক কালে মিশনারি সম্প্রদায় ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান কর্মচারিরা এ নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করার জন্য সচেষ্ট হন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক যখন গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে ভারতে আসেন, তিনি এ প্রথা বিলোপ করার কাজ শুরু করেন। তবে ইতোপূর্বে রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে কলকাতায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন শুরু হয়। শীলা বসাক "রামমোহন ও নারীর স্বাধিকার", ড. তাহা ইয়াসিন কর্তৃক সম্পাদিত ও সংকলিত, *নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহন রায়* (ঢাকা : শোভা প্রকাশ, ২০১৬), পৃ. ৩৬৯

১০. মাহমুদা ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৮

১১. *তদেব*, পৃ. ৪৬

১২. মাহমুদা ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯-৪০

১৩. মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২

১৪. জ্ঞানেশ মৈত্র, *নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য* (কলকাতা : ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৮৭), পৃ. ২৭

১৫. August Bebel (Eng. tr.), *Woman in the Past, Present and Future*, Vol. I (London : The Modern Press, 1885), pp. 37-38

১৬. নারী নিজেই নিজের বিনিময় নির্ধারণ করেছে। তারা মনে করেছিল নিজেকে বিনিময় করলে আন্তঃগোত্রীয় বন্ধন স্থাপনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে। যে নারী নিজ গোত্র ছেড়ে নতুন গোত্রে যাবে সে দুই গোত্রের মধ্যে যোগসূত্র হয়ে উভয় গোত্রের সংস্কৃতি শিখতে ও আত্মস্থ করতে সক্ষম হবে। এভাবে তারা যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে তা নারীকে ক্ষমতা ও প্রভাব অর্জনে সহায়তা করবে- এ ধারণার বশবর্তী হয়ে নারী নিজের বিনিময়ে নিজেই সম্মতি দেয়। নারী বিনিময়ে নারীকে দুই গোত্রের মধ্যে যোগসূত্রের মাধ্যমে উভয় গোত্রে ক্ষমতা ও প্রভাব প্রদান করবে; নারী একথাই ভেবেছিল। সে ভাবতে পারেনি যে আসলে ঘটবে উল্টো, সে (নারী) ক্ষমতা ও প্রভাবের মাপকাঠি না হয়ে বরং পুরুষের অধীন হবে এবং স্বাধীনতা হারাবে। (মাহমুদা ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫)

১৭. আবুল ফজল, *আবুল ফজলের রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড (চট্টগ্রাম : বইঘর, ১৯৭৫), পৃ. ৬৪০

১৮. গোলাম মুরশিদ, *নারীপ্রগতির একশো বছর রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া* (ঢাকা : অবসর প্রকাশনা, ১৯৯৩), পৃ. ১৪

১৯. মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

২০. *তদেব*, পৃ. ৪

২১. *তদেব*, পৃ. ৫

২২. পূরবী বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৪

২৩. *মনুসংহিতা* পৌরাণিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থকে হিন্দু আইনের ভিত্তিস্বরূপ বিবেচনা করা হয়। হিন্দু ধর্মের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ, আচার-আচরণ, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মের নিয়ম কানুন সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। মনু কর্তৃক সংকলিত বলে এর নাম *মনুসংহিতা*। পৌরাণিক কাহিনীমতে মনু ব্রহ্মার মন থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন (মন অর্থ বোধ করা বা জানা), সে কারণেই তিনি মনু হিসেবে পরিচিত। কথিত আছে, একে একে ১৪ জন মনু পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তাঁরা হলেন স্বয়ম্ভুব, স্বরোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত বা সত্যব্রত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবতা সাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। (পূরবী বসু, *তদেব*, পৃ. ৫৬)

২৪. সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (অনুদিত), *মনুসংহিতা* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫), পৃ. ২৪৮-২৪৯

২৫. মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪

২৬. জ্ঞানেশ মৈত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২

২৭. জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, “নারীর অবস্থান : গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম”, *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, ৫৭বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৩), পৃ. ৭৯-৮৫

২৮. Shahanara Hussain, *The Social Life of Women in Early Medieval Bengal* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1985), p. 38

২৯. *Ibid,* p. 29

৩০. পূরবী বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫০

৩১. *তদেব*

৩২. পঞ্চানন তর্করত্ন (অনূদিত ও সম্পাদিত), *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ*, শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড (কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৬০৮

৩৩. ভরতচন্দ্র শিরোমণি, *মনুসংহিতা* (কলিকাতা : অরুণোদয় ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৩), পৃ. ৩৪৩

৩৪. পঞ্চানন তর্করত্ন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯৩

৩৫. সৌমেন্দ্রনাথ সরকার (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকোষ*, গীত নং ১৯ (কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৮), পৃ. ১৩৮

৩৬. Shahanara Hussain, *op.cit.*, p. 29

৩৭. *Ibid*, p. 32

৩৮. সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (অনূদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০১, ৪৪৫

৩৯. R.C Majumder (ed.), *The History of Bangal,* Vol. I (Dhaka : University of Dhaka, 1943), pp. 609-610

৪০. *Ibid,* p. 610

৪১. Bhavadeva Bhatta, *Prayaschitta-Prakarana,* ed. Girish Chandra Vidyaratna (Rajshahi : Varendra Research Society, 1927), p. 69; *Brihaaddharma Purana*, ed. Panchanan Tarkaratna (Calcutta : Nabavarat Pablishers, 1396), p. 70

৪২. *Brihaaddharma Purana*, *op.cit.*, p. 71

৪৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশার্স, ২০০১), পৃ. ৪৭২; Vatsyayana, *Kamasutra*, (Eng. tr. Richard Francis Burton), vol. 5, London; Haran Chandra Chakladar, *Social Life in Ancient India : Studies in Vatsyayana's Kamasutra* (New Delhi : cosmo, 1984), p. 117

৪৪. Nani Gopal Majumder, *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, (containing inscriptions of the Chandras, the Varmans and the Senas, and of Isvaragosa and Damadora), Verse no.10, *Naihatee Copper Plate* (Rajshahi : Varendra Research Society, 1929), p. 77

৪৫. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ*, শ্লোক নং ৩০ (কলিকাতা : সান্যাল এন্ড কোম্পানী, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২১৫

৪৬. R.C Majumder (ed.), *op.cit.,* p. 611; Jimutavahana, *Dayabhaga*, (Eng. tr. H. T Colebrooke), *The Hindu Law of Inheritance in Bengal* ( England : Oxford University press, 1810), p. 85

৪৭. সুকুমার সেন (সম্পাদিত), *চর্যাগীতি পদাবলী (চর্যাচর্যটীকা সমেত)*, গীত নং ১৪ (কলকাতা : ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭৩), পৃ. ১৬৮-১৬৯

৪৮. সুকুমার সেন, *বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (কলকাতা : ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৬৩), পৃ. ৪৩

৪৯. পূরবী বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫০-২৫১

৫০. Nani Gopal Majumder, *op.cit.,* pp. 72-76

জমা প্রদানের তারিখ : ১৪.০২.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ০৮.০৬.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২২

# নাগরিক সেবায় ইসলামি নির্দেশনার প্রতিফলন: প্রসঙ্গ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

মোহাম্মদ নুরুল আমিন*
মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন**

**Abstract**

In this age of modern mechanical civilization, people are moving towards cities day by day, as a result of which urbanization is increasing. Urbanization is an ever evolving process. In the last 1000 years of history, unimaginable changes have taken place in the development of urban shelter, economy, society and civilization. As a result of urbanization, more people live in small areas. Challenges have to be met in terms of efficiency, capability, financial resources, government patronage etc of the institutions engaged in providing essential services to a greater number of citizens. As a result, people who gather in search of happiness in the life of a citizen, in pursuit of livelihood, are often deprived of services. This article discusses issues related to citizen services those are related to Quran, Sunnah and Islamic directions in order to create positive awareness among the majority Muslim population of Bangladesh. The paper is made by following the method of qualitative research. We know that the Dhaka South City Corporation is trying to move forward the citizen services with its limited resources, limited manpower and a large number of unconscious people. But the citizens are being deprived from the desired service. In this situation, it will be possible to improve the quality of citizen service by creating public awareness of the majority Muslim population of Dhaka South City Corporation and by practicing accountability, moral, economic integrity etc. in the light of Islamic guidelines.

## ভূমিকা

নগরায়ণ বর্তমান সময়ের একটি অতি পরিচিত বিষয়। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার এ যুগে মানুষ নানাবিধ কারণে দিন দিন শহরমুখী হয়ে পড়ছে, যার ফলশ্রুতিতে নগরায়ণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরায়ণ একটি ক্রমাগত বিকাশমান প্রক্রিয়া। গত ১০০০ বছরের ইতিহাসে নগর আশ্রয়ী শাসন, অর্থনীতি, সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে। গত ৬০ বছরে উন্নত ও উচ্চ আয়ের দেশগুলো ছাড়াও মধ্যম আয়ের দেশগুলোয় দ্রুত নগরায়ণ শুরু হয়। জাতিসংঘের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ১৯৯০ সালে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর মধ্যে ৫০ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত নগরের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৪টি, সে সংখ্যা ২০২০ সাল নাগাদ ৬১ অতিক্রম করেছে। নগরায়ণের ফলে স্বল্প পরিসরে অধিক জনগণের বসবাস হয়। অধিক সংখ্যক নাগরিকের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা, সক্ষমতা, আর্থিক সংস্থান, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। ফলে নাগরিক জীবনে সুখের সন্ধানে, জীবিকার তাগিদে জড়ো হওয়া মানুষগুলো অনেক সময় সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। অথচ

*অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
**পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্রই হলো নগর। সেবাস্টিয় ম্যানরিক এর বর্ণনা আনুযায়ী ১৬৪০ সালে ঢাকা শহরের পরিধি ছিল, পশ্চিমে মনেশ্বর থেকে শুরু করে পূর্ব নারিন্দা এবং উত্তরে ফুলগারী (ফুলবাড়িয়া) পর্যন্ত প্রায় সাত কিলোমিটার। আর এখন ঢাকার আয়োতন যে কত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেবল ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ১০৯.২৫১ বর্গ কি. মি.। (http://www.dscc.gov.bd/) জনসংখ্যা প্রায় এক কোটি বিশ লাখ। এ বিশাল আয়তনের নগরের বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে সুষম নাগরিক সেবা প্রদান সহজ কোন কাজ নয়। এজন্য প্রয়োজন এ নগরীর যুগোপযোগী বাস্তবসম্মত গবেষণা। ইসলাম একটি জীবনঘনিষ্ঠ দ্বীন বা ধর্ম। এখানে রয়েছে মানবজীবনের সার্বিক নির্দেশনা। ইবাদতের পাশাপাশি মুয়ামালাত-মুআশারাত এবং নগর ও নাগরিক জীবন সম্পর্কে রয়েছে কল্যাণকর সব নির্দেশনা। বর্তমানে ইসলামের এসব নির্দেশনা সমাজের সাথে সাযুজ্যপূর্ণভাবে উপস্থাপনের অভাবে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন নাগরিক সমাজ। নগরপিতারাও পাচ্ছেন না ওহির গাইডলাইন। প্রস্তাবিত গবেষণায় ইসলামি নির্দেশনার আলোকে নাগরিক সেবা উন্নয়নের এ অতীব জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলে আনার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস নগর ও নাগরিক সম্পর্কিত ইসলামের নির্ভুল নির্দেশনাবলী গবেষণার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে এটা মেয়রসহ সংশ্লিষ্টদের জন্য নাগরিক সেবা উন্নয়নে বিশেষত দেশ গঠন ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ প্রবন্ধে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনসচেতনতা তৈরি, সরকারের নীতি নির্ধারণ, এনজিও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে নাগরিক সেবার বিষয়াদি কুরআন, সুন্নাহসহ ইসলামি বিধি বিধান আলোচনা করা হল।

## গবেষণা পদ্ধতি

এ প্রবন্ধে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা (Qualitative Research) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে (Document Study) এবং লাইব্রেরি পদ্ধতি (Library Method) অনুসরণ করা হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সেবা উন্নয়নে ইসলামি নির্দেশনা সম্পর্কিত তুলনামূক পর্যালোচনায় কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কিরামের কর্মপদ্ধতি এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের গৃহিত বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা, বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

## নাগরিক সেবা পরিচিতি

রাষ্ট্র প্রদত্ত বিভিন্ন অবকাঠামো এবং পরিষেবা নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। পরিভাষায়, নাগরিকগণকে কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/কার্যালয় হতে সরাসরি যে সেবা প্রদান করা হয় তাকে নাগরিক সেবা বলে।[১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির (সিটিজেন্স চার্টার) অংশ হিসেবে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা নাগরিক সেবার বিষয়াদি ঘোষণা করে থাকে এবং সেবা দিয়ে থাকে। এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো- "সর্বসাধারণকে আরো অধিকতর উন্নত সেবাদানসহ সরকারের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।"[২] পরিভাষায় প্রতিশ্রুতি হলো- Citizen's Charter is considered as an efficient, appropriate, and relevant mode of delivering quality services on the basis of citizen's interests, needs, and aspiration as well as encouraging their participation in the formulation and implementation of policies that are essential to their daily life. In this regard attention is given in keeping the

cost of producing services low, timely delivery of services, efficient functioning of complaint system, and establishing close proximity between service producer and citizens.[৩] অর্থাৎ, "নাগরিক সনদকে নাগরিকের স্বার্থ, চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের পাশাপাশি তাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য একটি দক্ষ, উপযুক্ত এবং প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে সেবা প্রাপ্তির খরচ কম রাখা, সময়মতো সেবা প্রদান, অভিযোগ ব্যবস্থার দক্ষ কার্যকারিতা এবং সেবা দাতা ও নাগরিকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে মনোযোগ দেওয়া হয়।"

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ২০০০ সালে জনপ্রশসান সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রণীত 'একুশ শতকের জনপ্রশাসন' শীর্ষক প্রতিবেদনে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। এ সুপারিশমালায় বলা হয়েছে "জনসাধারণের অধিকার রক্ষায় 'সিটিজেনস চার্টার' বা নাগরিকদের অধিকার সম্বলিত 'নাগরিক সনদ' প্রবর্তনের প্রয়োজন। এ নাগরিক অধিকার সনদ মূলত একটি দলিল, যাতে থাকবে প্রাপ্য সেবার একটি তালিকা এবং এ ধরণের সেবা যেসব সংস্থা দিয়ে থাকে তাদের তরফ থেকে দক্ষতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে তা দেয়ার অঙ্গীকার।"[৪] এর ধারাবাহিকতায় 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' বা 'নাগরিক সনদ' প্রবর্তনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২১ মে, ২০১৭ সালে একটি পরিপত্র জারি করে। এরই ধারাবাহিকতায় সচিবালয় নির্দেশমালা-২০০৮ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৫]

## ইসলামি নির্দেশনার আলোকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সেবা কার্যক্রম

১৬১০ সালে সুবেদার ইসলাম খানের শাসনকালকে ধরে ঢাকার বয়স ২০১০-এ ৪০০ বছর পূর্ণ হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীন-সার্বভৌম একটি দেশের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এ শহরের বৃদ্ধিতে আরো অনেক নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। কিন্তু বিশ্বের অন্যতম বিশটি জনবহুল মেগা সিটির অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও এ শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিয়মিত, ট্রাফিক ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল, যোগাযোগ ব্যবস্থার বেহাল দশা। নগরীয় ভূমির অপব্যবহার, অপদখল ও বেদখলের প্রতিযোগিতায় প্রাকৃতিক জলাধারের প্রবহমানতা, সড়ক, উন্মুক্ত স্থান, শহরের পশ্চাৎভূমি সর্বত্র নির্মাণ আর নির্মাণ জঞ্জালে শ্বাসরুদ্ধকর একটি অবস্থা। রাজনৈতিক ঢাকা, প্রশাসনিক ঢাকা, শিল্প-অর্থ-বাণিজ্যের ঢাকা এবং ঢাকার নাগরিকদের ঢাকা এভাবে একাধিক সত্তায় বিকশিত ঢাকা থেকে ঢাকাকে উদ্ধার এ মুহূর্তে অত্যন্ত দুরূহ। ঢাকা একটি মহানগর বা একটি জেলা, একটি বিভাগ এবং একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের রাজধানী। যার সাথে নগর উন্নয়নের এবং নাগরিক সেবার অত্যন্ত গূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। এ ঢাকার আরও অন্তত ৪টি এলাকা ও কার্যক্রমগত পৃথক সত্তা বিরাজমান। এ চারটি পৃথক ঢাকার প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ও কাঠামোসমূহ হচ্ছে যথাক্রমে-

(১) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন।
(২) ঢাকা স্ট্যাটাসটিক্যাল মেট্রোপলিটান এরিয়া।
(৩) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)।
(৪) ঢাকা স্ট্রেটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান।

অপরদিকে ঢাকা শহরের পানি, পরিবেশ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, সড়ক, আইন-শৃঙ্খলাসহ অন্যান্য রেগুলেটরি কার্যক্রম, ট্রাফিক, আবাসন, পরিকল্পনা, গবেষণা প্রভৃতি সেবা ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনার

জন্য রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত প্রায় পঞ্চাশটি প্রতিষ্ঠান। ১৭ অক্টোবর ২০১১ মন্ত্রিপরিষদে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ সংশোধন করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে উত্তর ও দক্ষিণ দুটি পৃথক সিটি কর্পোরেশনে বিভক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ২০১১ সাল থেকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নামে দুটি সিটি কর্পোরেশনে বিভক্ত।[৬] ১০৯.২৫১ বর্গ কি.মি আয়তনের ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৭৫টি ওয়ার্ডে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ বসবাস করছে। উপরন্তু সেবা প্রদানকারী সংস্থা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগে রয়েছে তীব্র জনবল সংকট, পুরনো জনবল কাঠামোয় এ বিশাল জনগোষ্ঠীর নাগরিক সেবা প্রদান খুবেই দূরহ কাজ। উদাহরণস্বরূপ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীর সংখ্যা ৫১৯৮ জন, যেখানে প্রতি মাসে আনুমানিক ৮৯,২৩৫ টন বর্জ্য উৎপাদিন হয়। বর্তমানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদিত পদ ২৪২২টি, করর্মত ১৬১৫, শূন্য পদ ৮০৭;[৭] উপরন্তু এসকল শূন্য পদে নিয়োগের পাশাপাশি আরো পদসৃজনের আবশ্যকতা রয়েছে।

বিশ্বজুড়ে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণত প্রধান ও আন্তঃনগর অবকাঠামো যেমন: মহাসড়ক ও সেতু, জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য জাতীয় মান নিয়ন্ত্রণসহ ইত্যাদি পরিসেবা প্রদান করে থাকে। অপরদিকে স্থানীয় সরকার স্থানীয় জনচাহিদা বিবেচনায় স্থানীয় রাস্তা, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পাবলিক পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, সড়ক বাতি ইত্যাদি পরিষেবা প্রদান করে থাকে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান সেবাসমূহ হলো-

ক) সড়ক, নর্দমা, ফুটপাথ ও ট্রাফিক অবকাঠামো মেরামত/সংস্কার ও উন্নয়ন;
খ) সড়ক বাতি স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত;
গ) নাগরিক সুবিধা সংশ্লিষ্ট ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
ঘ) গৃহস্থালী ও হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও অপসারন;
ঙ) সড়ক ও নর্দমা পরিষ্কারকরণ সংক্রান্ত কাজ;
চ) সিটি কর্পোরেশন আইন এর অধীন কর, টোল, ফিস, রেইট ধার্য্য ও আদায় করা;
ছ) দরিদ্র মা, শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং প্রতিষেধকমূলক সেবা প্রদান।

ইসলামি নির্দেশনার আলোকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সেবা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

### ১. স্বাস্থ্য-সেবা

স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। স্বাস্থ্য মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে। একজন মানুষের সুখ তার শারীরিক শক্ত ভিত্তির উপর নির্ভরশীল। স্বাস্থ্য সেবাকে চিকিৎসা সেবাও বলা হয়। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ যেসকল চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে সেগুলো হলো-

১. মশা নিধন কার্যক্রম
২. শিশু ও মহিলাদের জন্য নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রম
৩. কুরবানীসহ বিভিন্ন সময়ে জীবাণুমুক্তকরণ কার্যক্রম
৪. হাসপাতাল, প্রসূতি কেন্দ্র এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে ক্লিনিকাল সেবা।

৫. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম।
৬. খাদ্য ও স্যানিটেশন কার্যক্রম।
৭. জনস্বাস্থ্য ল্যাবরেটরির মাধ্যমে ভেজাল শনাক্ত করার জন্য খাবারের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা
৮. স্বাস্থ্যকর পশুর মাংস সরবরাহ নিশ্চিত করা, পোষা কুকুর নিবন্ধন, অবৈধ মাংস বিক্রেতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা।
৯. ক্ষতিকর প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণ।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতাল তিনটি, ১. ঢাকা মহানগর জেনারেল হাসপাতাল, ২. ঢাকা মহানগর শিশু হাসপাতাল, ৩. নাজিরা বাজার মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র। এ তিনটি হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রম নিম্নরূপ-

| হাসপাতালের নাম | জরুরী বিভাগ | বহিঃবিভাগ | অন্তঃবিভাগ | অপারেশন | নরমাল ডেলিভারি |
|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা মহানগর জেনারেল হাসপাতাল | ৪৩৬৪ | ১২৭৮৯০ | ১৪৫২৪ | ১৭১ | ০ |
| ঢাকা মহানগর শিশু হাসপাতাল | ৯৮৭৯ | ৭৬৪৩০ | ৪০২৪ | ০ | ০ |
| নাজিরা বাজার মাতৃসদন | ৪৪ | ১০৪৯৩ | ১৬৮ | ৩৩ | ৪৮ |

রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রতি ওয়ার্ডে সকাল ৯.০০ টা হতে ১.০০ টা পর্যন্ত লার্ভিসাইডিং এবং দুপুর ২.৩০ টা হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এডাল্টিসাইডিং কার্যক্রমকে আরও নিবিড়করণ (Intensify) করা হয়েছে; এডিস মশার লার্ভার উৎসস্থল অপসারণের লক্ষ্যে আইনী পদক্ষেপ হিসাবে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। ডেঙ্গ/চিকুনগুনিয়া রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে ডিজিটাল বোর্ড, বোর্ড লিফলেট, স্টিকার, দৈনিক জাতীয় পত্রিকা, ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করা হচ্ছে।[৮] ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৪০টি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে ডেঙ্গু কীটের সাহায্যে বিনামূল্যে ডেঙ্গু জ্বরের পরীক্ষা করা হচ্ছে।[৯] ২০২০-২১ অর্থবছরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোর্পেরেশনের বিভিন্ন অঞ্চল হতে ৬২,৮০৬টি জন্ম নিবন্ধন সনদ এবং ৮৫৩টি মৃত্যু নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়েছে।[১০]

স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে ইসলামি নির্দেশনা হলো অসুস্থতায় সেবা পাওয়া অসুস্থ ব্যক্তির অধিকার। এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের পাঁচটি হক্ব। সালামের প্রচলন করা, হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দেয়া, দাওয়াত কবুল করা, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা, জানাযার অনুসরণ করা।[১১]

ইসলাম স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকে বিশেষ সাওয়াবের কাজ হিসেবে বিবেচনা করেছে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, কোন মুসলিম যদি কোন মুসলিম রোগীকে ভোরে দেখতে যায় তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দোয়া করেন। আর যদি সন্ধ্যার সময় কোন মুসলিম রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে যায় তবে তার জন্য ভোর পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা দোয়া করেন। আর তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান হবে।[১২]

## ২. বিদ্যুৎ সেবা

নগরজীবনে বিদ্যুৎ এক অপরিহার্য উপাদান। বিদ্যুৎ ছাড়া নাগরিক জীবন কল্পনা করা যায় না। আমাদের গবেষণার পরিধি হলো ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন। এ এলাকায় বিদ্যুৎ সেবা দানে দুটি প্রতিষ্ঠান কাজ করে থাকে।

**ক. ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ডিপিডিসি) :** ডিপিডিসি'র আওতাভুক্ত এলাকা হলো- উত্তরে শ্যামলী, শের-এ-বাংলা নগর, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, রামপুরা ব্রিজ থেকে বালু নদী; দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী; পশ্চিমে গাবতলী বাস টার্মিনাল থেকে তুরাগ নদী ও বুড়িগঙ্গা নদী পর্যন্ত।[১৩] ২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১ সাল পর্যন্ত ডিপিডিসি'র সফলতা নিম্নরূপ[১৪]

| **বিবরণ** | **১৬-১৭** | **১৭-১৮** | **১৮-১৯** | **১৯-২০** | **২০-২১** |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন কি.মি. | ২২৮ | ২২৮ | ২২৪ | ২৩৪ | ২৪৯ |
| ৩৩ কেভি বিতরণ লাইন কি.মি. | ৩৯০ | ৩৯০ | ৪৩১ | ৪৬১ | ৪৮৫ |
| ১১ কেভি লাইন কি.মি. | ৩১০৫ | ৩৩২৫ | ৩৪৭৭ | ৩৪৯৩ | ৩৫৩৪ |
| ০.৪ কেভি লাইন কি.মি. | ১৩২৬ | ১৪২৮ | ১৫২৮ | ১৫৫৩ | ১৫৬৬ |
| মোট সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন | ৫০৪৯ | ৫৩৭১ | ৫৬৬০ | ৫৭৪১ | ৫৮৩৪ |
| বিতরণ ট্রান্সফারমারের সংখ্যা | ১৭৬৯৮ | ১৮৯৮৬ | ১৯৫৮৭ | ২০২৭০ | ২০৮৬৬ |

**খ. ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড:** ডেসকো আওতাধীন এলাকা হলো- মিরপুর, পল্লবী, কাফরুল, কল্যাণপুর, ক্যান্টনমেন্ট, গুলশান, বনানী, মহাখালী, উত্তরা, উত্তরখান, দক্ষিণখান, বারিধারা, বাড্ডা, টঙ্গী এবং পূর্বাচলসহ প্রায় ৪০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিঃ এর আওতাভূক্ত।[১৫] ডেসকো'র বিগত ১২ বছরের অর্জন নিম্নরূপ[১৬]

| **ক্রম** | **বিবরণ** | **জুন ২০০৯** | **জুন ২০২১** |
|---|---|---|---|
| ১ | গ্রাহক সংখ্যা (জন) | ৪,১৫,৮৪২ | ১০,৮১,৮৪৭ |
| ২ | প্রি-পেমেন্ট/স্মার্ট মিটার (সংখ্যা) | ৯,৭৫৫ | ৫,৬২,৮৯২ |
| ৩ | সিস্টেম লস (%) | ৯.৭৯ | ৫.৫৮ |
| ৪ | বকেয়ার সমমাস | ২.৭৩ | ১.৪ |
| ৫ | ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র (সংখ্যা) | ২ | ৫ |
| ৬ | ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র (সংখ্যা) | ২১ | ৫৪ |
| ৭ | ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ) | ৭৬০/১০৬৪ | ২৯২০/৪০৮৮ |
| ৮ | সর্বোচ্চ চাহিদা (মেগাওয়াট) | ৫৪৫ | ১০৭৬ |
| ৯ | ১১ কেভি ফিডার (সংখ্যা) | ২১১ | ৪৪৭ |
| ১০ | বিতরণ লাইন (কিঃমিঃ) | ৩১৩৭ | -- |

ব্যক্তি পর্যায়ে বিদুৎ সেবায় ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) ও ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি ঢাকা দক্ষিণ

সিটি কর্পোরেশন নাগরিক সেবায় আওতায় নগরের বিভিন্ন রাস্তায় স্থাপিত লাইটে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা করছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ইলেকট্রিট সাব ষ্টেশন ২১টি, রাস্তার এলইডি বাতির সংখ্যা ৫৪১৮৬টি এবং টিউব লাইটের সংখ্যা ১৭,০০০ টি প্রায়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের এছাড়াও বদ্যমান ৩৬ টি ওয়ার্ডে আধুনিক এলইডি সড়কবাতি স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।[১৭] বিদ্যুৎ মানুষের জীবনের অপরিহার্য উপাদান। বিদ্যুৎ শক্তির মূল উৎস সূর্য। সূর্য শক্তির মূল উৎস। সূর্যের আলো সবচেয়ে বেশি কার্যকর এবং সহজলভ্য। মহান আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً. "তিনিই সূর্যকে তেজস্কর করেছেন।"[১৮]

মহান আল্লাহ মানুষের ব্যবহারের সুবিধার্থে বিভিন্ন পদার্থ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপাদান রেখেছেন। তবে এ সকল উপাদান মহান আল্লাহ পরিমিত আকারের দিয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ.

"আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুরই ভাণ্ডার আছে। আমি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতীর্ণ করি।"[১৯]

সুতরাং আমাদের উচিত এগুলোর অপচয় না করে সঠিক ব্যবহার করা। বর্তমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার সাথে সাথে মানুষ কয়লা, পানি, বায়ু ও পারমানবিক শক্তি কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে থাকে। কিন্তু এগুলোর উৎপাদন মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সুতরাং আমরা অপ্রয়োজনে বিদ্যুৎ অপচয় করবো না।

### ৩. বিনোদন ও সংস্কৃতি

নাগরিক জীবনের ব্যস্ততায় একটুখানি অবসর যেখানে সোনার হরিণ, সেখানে বিনোদন ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বিনোদন ও সাংস্কৃতিক চর্চায় সুযোগ দিতে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ১৮টি খেলার মাঠ, ২৫টি পার্ক, ১২টি সঙ্গীত, ৩৬টি কমিউনিটি সেন্টার, ২০টি শরীর চর্চা কেন্দ্র ও ১টি জাদুঘর পরিচালনার মাধ্যমে সংস্কৃতি চর্চা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করে থাকে।

নাগরিক জীবনে সংস্কৃতি চর্চা ও বিনোদনের গুরুত্ব অপরিসীম। নগরের কোলাহল, ব্যস্ততার মাঝে বিনোদনের প্রয়োজন রয়েছে। ইসলাম যেকোনো শরিয়াসম্মত সংস্কৃতি চর্চা ও বিনোদনে নির্দেশনা দেয়। শরীয়াসম্মত বিনোদনের উদ্দেশ্যে খেলার মাঠ, জলাশয়, পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন। ইসলাম সুস্থ বিনোদনকে সমর্থন করে এবং বিকাশে সুস্থ বিনোদন চর্চায় অনুপ্রেরণা দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) ক্লান্তি দূরীকরণ, বিনোদন ও ঘোরাফেরার জন্য মদিনা শহরের অদূরে আকিক উপত্যকাকে নির্ধারণ করেন। সেখানে বৃক্ষ রোপণ করেন এবং পশু চরানোরও ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজেও মাঝেমধ্যে আকিক উপত্যকায় গিয়ে আরাম করতেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) স্ত্রী আয়িশা (রা.)-এর সাথে তাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং সাহাবিগণকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। হযরত আয়িশা (রা.) বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) দৌড়ে আমার সাথে প্রতিযোগিতা করলেন। তখন আমি দৌড়ে আগে পৌঁছে গেলাম।"[২০]

একইভাবে শরীর চর্চার জন্য পার্ক ও ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠাও ইসলাম সমর্থন করে। মদিনার ছেলেরা বিভিন্ন মাঠ-প্রান্তরে বৈধ খেলাধুলা যথা শরীরচর্চা, দৌড় প্রতিযোগিতা, তরবারি চালনা, তীরন্দাজি ও ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা করত। একদা মসজিদে নববীর পাশে ছেলেরা খোলা মাঠে তরবারি চালনা প্রতিযোগিতার খেলা করছিল। হজরত ওমর (রা.) তা দেখে বাধা দিতে চাইলে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে নিষেধ করেছেন এবং ছেলেদের খেলতে উৎসাহ দিলেন। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, "হযরত আয়িশা (রা.) আরো বলেছেন, হাবশীরা যখন মসজিদে (এর প্রাঙ্গণে) খেলাধূলা করছিল, তখন আমি তাদের দেখছিলাম এবং আমি দেখেছি, নবী (সা.) আমাকে আড়াল করে রেখেছেন। 'উমার (রা.) হাবশীদের ধমক দিলেন। তখন নবী (সা.) বললেন, ওদের ধমক দিও না। হে বনূ আরফিদা! তোমরা যা করছিলে তা কর।"[২১]

## ৪. মৃতব্যক্তি সৎকার সেবা (কবর ও ভস্মীকরণ স্থান)

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৩টি কবরস্থান ও ২টি শ্মশানঘাট রয়েছে। এলাকাভেদে প্রয়োজনীয় কবরস্থান নির্মাণ করা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে ইসলামি নগর প্রতিষ্ঠার পর সেখানে কবরস্থান নির্ধারণ করেন। মদিনায় এসে শুরুতেই রাসুলুল্লাহ (সা.) মসজিদে নববী নির্মাণ করলেন। এর পাশেই 'বাকি' নামক স্থানে মুসলিমদের কবরস্থান গড়ে ওঠে। এ ছাড়া আশপাশের এলাকাগুলোতেও মসজিদ ও কবরস্থান গড়ে ওঠে। ইসলাম মৃতব্যক্তিকে কবরস্থ করার নির্দেশনা দেয়। এ শিক্ষা পৃথিবীতে প্রথম মানব হাবিলের মৃতদেহ কবরস্থ করার মাধ্যমেই শুরু হয়। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهُ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ . فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ .

"সুতরাং তার নফস তাকে বশ করল তার ভাইকে হত্যা করতে। ফলে সে তাকে হত্যা করল এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল। অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যা মাটি খুঁড়ছিল, যাতে তাকে দেখাতে পারে, কীভাবে সে ভাইয়ের লাশ গোপন করবে। সে বলল, 'হায়! আমি এই কাকটির মত হতেও অক্ষম হয়েছি যে, আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করব'। ফলে সে লজ্জিত হল।"[২২]

ইসলাম মৃতব্যক্তি দ্রুততার সাথে কবর দেয়ার নির্দেশনা দেয়। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, "আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) সূত্রে নবী (সা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুতগতিতে চলবে। কেননা, সে যদি পুণ্যবান হয়, তবে এটা উত্তম, যার দিকে তোমরা তাকে এগিয়ে দিচ্ছ আর যদি সে অন্য কিছু হয়, তবে সে একটি আপদ, যাকে তোমরা তোমাদের ঘাড় হতে জলদি নামিয়ে ফেলছ।"[২৩]

## ৫. রাস্তা ও ফুটপাত ব্যবস্থাপনা

নাগরিক সেবা যাতায়াত ও পরিবহনকাজে রাস্তা ও ফুটপাত নির্মাণ ও সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগের আওতায় রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাত উন্নয়ন ও নির্মাণ, পার্ক উন্নয়ন, খেলার মাঠ উন্নয়ন, ফ্লাইওভার নির্মাণ, ফুটওভারব্রীজ নির্মাণ, ক্যাম্বার ও সারফেস ড্রেন, আন্ডারপাস, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, ক্লিনারদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ,

এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ, বিভিন্ন আধুনিক যানযন্ত্রপতি ক্রয়, এলইডি সড়ক বাতি স্থাপনের কাজ করা হয়। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগ সড়ক নির্মাণ, সড়ক সংস্কার, ফুটপাত নির্মাণ, ফুটপাত সংস্কার, ফুট ওভারব্রীজ, আন্ডারপাস ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরের অবকাঠামো উন্নয়নে সড়ক/ফুটপাত ইত্যাদি বিবরণ-[২৪]

| খাত | একক | পরিমাণ |
|---|---|---|
| বিদ্যমান সড়ক উন্নয়ন | কি:মি: | ২২১.২২ |
| বিদ্যমান সড়ক মেরামত | কি:মি: | ৫৬.১২ |
| সড়ক বাতি স্থাপন | সংখ্যা | ৬৫৬৩ |
| নতুন ড্রেন নির্মাণ | কি:মি: | ১৮৫.০২ |
| ড্রেন মেরামত/উন্নয়ন | কি:মি: | ৬১.১৬ |
| ফুটপাত নতুন নির্মাণ | কি:মি: | ৩৬.১০ |
| ফুটপাত মেরামত/ উন্নয়ন | কি:মি: | ১৮.৬১ |
| ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ | সংখ্যা | ৬টি(২৫%) |
| পার্ক রক্ষণাবেক্ষণ/ উন্নয়ন | সংখ্যা | ১৮টি(৩৫%) |
| খেলার মাঠ | সংখ্যা | ১১টি(৩৫%) |
| রক্ষণাবেক্ষণ/উন্নয়ন | সংখ্যা | ৩টি(২৫%) |
| কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ | সংখ্যা | ২টি |
| কমিউনিটি সেন্টার মেরামত/সংস্কার | সংখ্যা | ৩টি(৬০%) |
| কবরস্থান উন্নয়ন | সংখ্যা | ১টি(৩০%) |
| শশ্মানঘাট উন্নয়ন | সংখ্যা | ৯টি(৩৫%) |
| ক্লিনার কলোনী নির্মাণ | সংখ্যা | ২টি(১৫%) |
| আধুনিক জবাইখানা নির্মাণ | সংখ্যা | ২টি(১৫%) |

ইসলামি দৃষ্টিকোণে রাস্তার গুরুত্ব অত্যধিক। রাস্তা ব্যবহারে সকল মানুষ সমান অধিকার পাবে। সুতরাং অন্যায়ভাবে রাস্তা দখল করা যাবে না এবং রাস্তায় ময়লা-আবর্জনা রাখা যাবে না। সিটি কর্পোরেশনের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো ফুটপাত দখল মুক্ত রাখা। রাস্তা দখল করতে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে হাদিসের বাণী, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক। সাহাবীরা বললেন, হে রাসূল (সা.) আমাদের রাস্তা আর বসার স্থান নেই। এখানে বসে আমরা আলাপ-আলোচনা করি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা যাতে বললে, রাস্তা ছাড়া তোমাদের আর বসার স্থান নেই, তবে তোমরা রাস্তার হক আদায় করো। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তার হক কী? হে রাসূলুল্লাহ (সা.)? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা, সালামের উত্তর প্রদান, সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ করা।"[২৫]

নাগরিক জীবনে রাস্তা যেন অনেক সময় ময়লা রাখার আদর্শ ডাস্টবিনে পরিণত হয়। অথচ ইসলাম মানুষের চলাচলের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোকে ঈমানের অঙ্গ ঘোষণা দিয়েছে। রাস্তায় ময়লা-আবর্জনা ফেলতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কঠোর বাণী, "তোমরা তিনটি অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম থেকে বেঁচে থাকো। তা হলো, ঘাটে, মাঝ রাস্তায় এবং ছায়ায় মল-মূত্র ত্যাগ করা।"[২৬]

## ৬. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

নর্দমা/পয়ঃনিষ্কাশন লাইন সংস্কার, পাবলিক টয়লেট স্থাপন, সংস্কার ও ব্যবস্থাপনা নাগরিক সেবার অন্যতম অনুসঙ্গ। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকাকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও টেকসই বর্জ্য ব্যস্থাপনার লক্ষ্যে প্রায় ৫৪৮০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার বর্জ্য পরিবহনে প্রতিদিন প্রায় ২৮০ টি বর্জ্যবাহী গাড়ী ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া ল্যান্ডফিলে বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা কাজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হুইল ডোজার, এক্সকাভেটর, বুলডোজার নিয়োজিত রয়েছে।[২৭] ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে গৃহিত প্রকল্প নিম্নরূপ-[২৮]

| ক্র নং | ২০২০-২১ অর্থবছরে গৃহিত প্রকল্প | কাজের অগ্রগতি |
|---|---|---|
| ০৯। | বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতায় গৃহিত উন্নয়ন কাজ: | |
| | (ক) মান্ডা-জিরানী ও শ্যামপুর খাল পরিষ্কার- ২০ কি.মি. এবং পান্থপথ ও সেগুনবাগীচা বক্স কালভার্ট পরিষ্কার- ২.৫ কি.মি.-মোট কাজ- ৬ টি, প্রাক্কলিত ব্যয়- ১.৫৯ কোটি | ১০০% |
| | (খ) সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ কাজ-মোট কাজ- ৪০ টি, প্রাক্কলিত ব্যয়- ৬.৩০ কোটি | ৬টি সমাপ্ত ও ৩৪টি চলমান |
| | (গ) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ওয়াসার নর্দমা পরিষ্কার করণ কাজ-মোট কাজ- ৬৭ টি, প্রাক্কলিত ব্যয়- ৩৬.২৪ কোটি | ৪০% |
| | (ঘ) খিলগাঁও-বাসাবো, ধোলাইখাল ও পীরবাগ বক্স কালর্ভাট পরিষ্কার কাজ-মোট কাজ- ৩ টি, প্রাক্কলিত ব্যয়- ১.৭৩ কোটি | ২০% |
| | (ঘ) অঞ্চল- ৩, ৪ ও ৫ এর স্লুচি গেট সংস্কার কাজ-মোট কাজ- ৩ টি, প্রাক্কলিত ব্যয়- ৩.৫২ কোটি | ১০% |

এছাড়াও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাধ্যমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন পাবলিক টয়লেট স্থাপন ও পাবলিক টয়লেট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) ওয়ার্ড সংখ্যা ৭৫টি। পুরান ঢাকা অধ্যুষিত এই সিটির বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর জন্য পাবলিক টয়লেট আছে মাত্র ৫৮টি। প্রয়োজনের তুলনায় পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা অনেক কম হলেও এ চাহিদা পূরণে ডিএসসিসির উদ্যোগ থাকলেও তা আশানুরুপ নয়। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহায়তা এবং দুর্যোগ প্রশমন প্রকল্পের আওতায় স্বল্পপরিসরে কিছু পাবলিক টয়লেট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।[২৯]

সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইসলামে বিশেষভাবে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কেননা সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানুষের জাগতিক কষ্ট লাঘব হয। ইসলাম মানুষের জাগতিক কষ্ট দূর করতে নির্দেশনা দেয়। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের জাগতিক একটি কষ্ট দূর করে, মহান আল্লাহ তার পরকালীন একটি কষ্ট নিবারণ করবেন।”[৩০]

বর্জ্য যথাস্থানে রাখতে হবে, যেন সিটি কর্পোরেশন সহজে তা সংগ্রহ করে নিষ্কাশন স্থানে নিয়ে যেতে পারে। এজন্য ইসলাম বাসস্থান থেকে দূরে নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য রাখার নির্দেশনা দেয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে ইহুদীদের অভ্যাস ছিলো ঘর-বাড়ির পাশেই ময়লা-আবর্জনা ফেলা, জমা করে রাখা। ফলে তাদের বাড়ি-ঘরের পুরো পরিবেশটি দুর্গন্ধময় হয়ে যেতো, রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলমানদেরকে তাদের বিপরীত ঘর-বাড়ির আঙ্গিনা ও আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখার জোর তাগিদ দিয়ে বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্রতা ভালোবাসেন। তিনি নির্মল-পরিষ্কার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন। তিনি সুমহান, মহত্ত্বকে ভালোবাসেন। তিনি দানশীল, বদান্যতা ভালোবাসেন। সুতরাং তোমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো এবং তোমরা সেগুলোকে ইয়াহুদীদের মত (অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময় করে) রেখো না।"[৩১]

### ৭. বাজার ব্যবস্থাপনা

নাগরিক জীবনে দৈনন্দিন ব্যবহার্য বিভিন্ন পণ্য ক্রয়ে এবং গৃহস্থালির মাছ, মাংস ও কাঁচা তরকারির জন্য নির্দিষ্ট বাজার ব্যবস্থাপনা আধুনিক নগর ব্যবস্থাপনার অন্যতম দিক। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন বাজার ইজারা, ভাড়া দান এবং বাজারের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত, ভূগর্ভস্থ মার্কেট-১টি, ডিএসসিসি মার্কেট-৭৩টি, কাঁচাবাজার-১৩টি (ডিএসসিসি) এবং ১৬টি সিটি কর্পোরেশন অনুমতি বর্হিভূত বাজার।

মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য, ব্যবহার্য পণ্য, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি সংগ্রহ করতে বাজারে যেতে হয়। তাই নাগরিক সেবার মধ্যে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা অন্যতম। নাগরিক প্রয়োজনে মার্কেট নির্মাণ ও এর তত্ত্বাবধান করা ইসলামের নীতি। মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর মদিনার নাগরিকদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সহজলভ্যতার জন্য পূর্ব থেকেই চলে আসা বাজারের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) নতুন করে বাজার খুলে দিয়েছেন। এই বাজারের ব্যবসা সম্প্রসারণে রাসুলুল্লাহ (সা.) অসামান্য প্রচেষ্টা চালান। পূর্ণ আরব উপদ্বীপ করায়ত্ত হওয়ার পর থেকে আমদানি-রপ্তানির কাজেও নতুন মাত্রা যোগ হয়। এমনকি এ ঘোষণা করে দিলেন যে মদিনার বাজারে ব্যবসায়ীদের জন্য শুল্ক ট্যাক্স নেই। তা ছাড়া বাজার পরিচালনার জন্য প্রাথমিকভাবে ১২ জনের কমিটি বানিয়ে দিলেন, যার প্রধান ছিলেন হজরত ওমর (রা.)। ইসলাম নাগরিকদের কল্যাণার্থে বাজার ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন মূলনীতি নির্ধারণ করেছে। **প্রথমত,** ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল আর সুদ হারাম করেছে।[৩২]

**দ্বিতীয়ত,** প্রত্যেক হারাম বস্তুর ব্যবসা নিষিদ্ধ। কেননা ইসলাম নির্দেশিত প্রতিটি হারাম বস্তু মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত। যেমন: মদ, শূকর ইত্যাদি। এসব ক্রয়-বিক্রয় উভয়টি হারাম।[৩৩]

**তৃতীয়ত,** অজানা ও ধোকার ব্যবসা নিষিদ্ধ।[৩৪] একই সাথে প্রতারণার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিজের পণ্যের গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে পাশাপাশি অন্যের দ্রব্যের সমালোচনা করা যাবে না।[৩৫]

**চতুর্থত,** পণ্যের দাম বৃদ্ধি তথা বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পণ্য মজুত করা নিষিদ্ধ।[৩৬]

**পঞ্চমত,** ওজনে কম দেয়া যাবে না।[৩৭]

### ৮. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (দারিদ্র্য বিমোচন ও বস্তি উন্নয়ন)

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক বিভাগ কর্তৃক সরাসরি দারিদ্র বিমোচন কর্মসূর্মচি গ্রহণ করা হয়নি। তবে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাজেটে বরাদ্দকৃত কল্যাণমূলক ব্যয়ের

খাতে ৪৪.৪০ কোটি টাকার বিপরীতে ঢাকা মহানগরীতে বসবাসরত বিভিন্ন স্তরের অসহায় ও দুঃস্থ জনসাধারণের কল্যাণমূলক কাজে যেমন- বিবাহ, চিকিৎসা, লেখাপড়া এবং মসজিদ/মন্দিরের সংস্কার, সাংস্কৃতিক আয়োজনে অনুদান হিসেবে এককালীন অর্থ বিতরণের উদ্যোগ অব্যাহত ছিল। এ খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৩০.৮৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়।[৩৮] বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বস্তি এলাকায় স্যানিটেশন কার্যক্রম কার্যক্রম পরিচালিত হয়।[৩৯] কর্মজীবি মহিলাদের শিশুদের জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ডে কেয়ার সেন্টার চালু করেছে, যা নগর ভবনের ১১তলা পশ্চিম ব্লক এ স্থাপিত। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নিম্ন আয়ের জনপদ ও বস্তিবাসীর আবাসস্থল নিরাপদ রাখার জন্য ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ফায়ার হাইড্রেন্ট বসানো হবে এবং এই খাতে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।[৪০]

নাগরিক জীবনে দরিদ্রতা একটি মারত্মক সমস্যা হিসেবে প্রতিয়মান। নাগরিক জীবেন বিভিন্ন ছিন্নমূল মানুষ রাস্তায়, বস্তিতে বা বিভিন্ন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানবেতন জীবনযাপন করে। ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন প্রেক্ষাপটে ইসলামি নির্দেশনা মূল্যায়ন। সে বিবেচনায় দারিদ্র্য বিমোচন নগর প্রশাসনের দায়িত্বসমূহের মধ্যে অন্যতম। নগর প্রশাসন দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মপকিল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারে। ইসলাম শাসক শ্রেণিকে দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি অর্থ যোগানের উৎস হিসেবে গণীমতের এক পঞ্চমাংশ নির্ধারিত করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْلَمُوٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ

"আর তোমরা জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু গনীমতরূপে পেয়েছ, নিশ্চয় আল্লাহ ও রাসূলের জন্য তার এক পঞ্চমাংশ, নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য।"[৪১]

এছাড়াও যাকাত, সাদাকাত, ওয়াকফ ইত্যাদির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাষ্ট্র ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল শ্রেণির দারিদ্র্যের অবসানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। আর এসকল উদ্যোগ সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তত্ত্বাবধান করতে পারে।

নাগরিক জীবনে বস্তি সমস্যা একটি সাধারণ সমস্যা হিসেবে পরিগণিত। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বেকারত্ব, অতি দারিদ্র্য ইত্যাদি নানাবিধ কারণে ঘর-বাড়ি হারিয়ে প্রতিনিয়তই মানুষ বস্তিতে আশ্রয় নিচ্ছে। এসকল বস্তিবাসী খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ নানাবিধ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অধিকার বঞ্চিত এসকল মানুষকে বাদ দিয়ে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। ইসলামি দৃষ্টিকোণে সমাজের যেকোনো বঞ্চিত দরিদ্রের বিপদে সহায়তা করা ধনীদের উপর কর্তব্য। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَفِيٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"তোমাদের ধনীদের সম্পদে গরীবদের হক রয়েছে।"[৪২]

এছাড়াও ফকীর, বিবধা, প্রতিবন্ধি ও পথশিশুদের নিরাপত্তা প্রদান করাও সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব। হযরত ওমর (রা.) এর খিলাফতকালে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য দশ দিরহাম হারে ভাতা

নির্দিষ্ট ছিলো। শিশু কিছু বড় হলে দুইশত দিরহাম ভাতা পেত এবং পূর্ণবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে ভাতাও বৃদ্ধি পেত। রাষ্ট্রপ্রধান, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব কোষাগার থেকে তাদের খাবার, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ সকল ব্যাপারে সাহায্য করবে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, "হযরত জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতেন, আমি মুমিনদের পক্ষে তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। কেউ সম্পদ রেখে গেলে তা তার পরিজনের জন্য। কেউ ঋণ অথবা পোষ্য (অসহায় শিশু অথবা বিধবা স্ত্রী) রেখে গেলে তার দায়দায়িত্ব আমার উপর।"[৪৩]

## ৯. শিক্ষা কার্যক্রম

সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিষেবা প্রদান করে থাকে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহিত সেবাসমূহ নিশ্চিত করে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ শিক্ষা উন্নয়ন এবং স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্যও দায়বদ্ধ। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন | সংখ্যা |
|---|---|
| বিশ্ববিদ্যালয় (ডিগ্রি/অনার্স/মাস্টার্স) | ১৯টি |
| কলেজ | ১৭৮টি |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২২৮টি |
| প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮৮টি |
| মাদ্রাসা | ৪৬টি |
| টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট | ২৩টি |
| মোট পাঠাগার | ৭টি |

এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইত্যাদি দ্বারা কেন্দ্রীয়ভাবে সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। তবে বিভিন্ন সময় সিটি কর্পোরেশন পথশিশু, ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর শিক্ষা সেবা, বস্তি এলকায় শিক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি সাময়িক বিভিন্ন প্রকল্প দ্বারা শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সুরভীর এডুকেশন ইকুইটি ফর আউট অফ স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচির আওতায় ৬৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে অঞ্চল- ৩, ৪ ও ৫ এর (ওয়ার্ড নং- ৩০, ৩৩ ৩৪, ৩৫,৪২, ৪৩, ৪৯, ৫১, ৫৪) বিদ্যালয় বর্হিভূত, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া বা কখনো বিদ্যালয়ে যায়নি এমন ৮-১৪ বৎসরের ২০০০ জন শিশুকে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়।[৪৪]

শিক্ষা কোনো নির্দিষ্ট দেশ, জাতি, অঞ্চল, ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা বিশেষ কোনো বর্ণের লোকদের জন্য নয়। ইসলাম সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার ঘোষণা করেছে। এ কারণে ইসলাম সকল নর-নারীর জন্য শিক্ষা অর্জনকে ফরজ করে দিয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ .

"প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।"[৪৫]

তাই শিক্ষাকে ইসলাম মানুষের সর্বজনীন অধিকার বলে ঘোষণা করেছে। শিক্ষা থেকে কাউকে বঞ্চিত রাখা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন,

تعلموا العلم و علموه الناس-

“তোমরা জ্ঞান অর্জন কর এবং মানুষকে শিক্ষা দাও।”[৪৬]

## ১০. নিরাপদ খাদ্য

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নাগরিকদের নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে জনস্বাস্থ্য খাদ্য পরীক্ষাগারের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ২০২০-২১ অর্থবছরের নিরাপদ খাদ্য আইন- ২০১৩ এর আলোকে অঞ্চলভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকগণ ১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোবাইল কোর্ট ও কোর্ট বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে ৪৩টি নিয়মিত মামলার মাধ্যমে ১,১৩,২৫,০০০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।[৪৭] ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রমে খাদ্য পরিদর্শকগণ দক্ষতার সাথে কার্য পরিচালনা করছে। তদুপরি জনবল সংকট, খাদ্য পরিক্ষাগারের সংকট, নাগরিকদের অসচেতনতা ইত্যাদি কারণে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা অনেকাংশে ব্যর্থ বলেই প্রতিয়মান। প্রায়শই বিভিন্ন মিডিয়ায় খাদ্যে ভেজাল সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ হতে দেখা যায়, যা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাই ফুটে উঠে।

খাদ্য পণ্যে ভেজাল মিশ্রণ মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ইসলাম প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ভেজাল মিশানো দ্রব্যাদি বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) (বাজারে) এক খাদ্যরাশির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাতে নিজ হাত প্রবেশ করালেন। তিনি আঙুলে অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, “ওহে ব্যবসায়ী! এ কি ব্যাপার?” ব্যবসায়ী বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! ওতে বৃষ্টি পড়েছে।’ তিনি বললেন, “ভিজাগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে না কেন, যাতে মানুষে দেখতে পেত? (জেনে রেখো!) যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”[৪৮]

ইসলামি শাস্তি আইনের আওতায় পণ্যে ভেজাল মিশ্রণকারীকে বেত্রাঘাত, আর্থিক জরিমানা বা দেশান্তর করতে পারবে। যাতে করে সমাজে কেউ এ ধরনের অপরাধ করতে সাহস না পায়।[৪৯]

## ১১. হোল্ডিং নম্বর প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স, দোকানের নামজারি, ভবন নির্মাণ ছাড়পত্র

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নাগরিক জীবনের শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নাগরিক সেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানে বিভিন্ন সেবার বিপরীতে কর আরোপ করে থাকে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মোট হোল্ডিং সংখ্যা ২,৪৮,৮৭৬ টি এবং ট্রেড লাইসেন্স এর সংখ্যা ২,০০৯৯৯টি। সিটি কর্পোরেশন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুষ্ঠুভাবে এসকল সেবা প্রদান করে আসছে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন সেবার বিপরীতে বিভিন্ন ফি এবং বিভিন্ন কর আদায় করে থাকে। নাগরিক জীবনে সেবা প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হলো কর আদায়। ইসলাম যাকাত ভিত্তিক কর কাঠামো গড়ে তোলার নির্দেশনা দেয়। তবে সকল ব্যয়ে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায় না। ইসলামি দৃষ্টিকোণে কর আয়কে দু'ভাবে ভাগ করা যায়। ১. কল্যাণমূলক কর ও ২. সাধারণ কর। কল্যাণমূলক কর আয়ের মধ্যে থাকবে- যাকাত, গণীমত বা খুমুস, ফাই বা যুদ্ধবিহীন শত্রু সম্পদ, জিযিয়া, খারাজ ইত্যাদি। সাধারণ কর আয় এর আওতায় থাকবে- প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর।

যাকাত যথাযথ উত্তোলন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর সমাজের অর্থনৈতিক সাম্য, দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি নির্ভরশীল। আর এ বিষয়গুলোর উপর উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে ইসলামি রাষ্ট্র যাকাত ভিত্তিক কর কাঠামোর প্রবর্তন করবে। যাকাত ফরজ ঘোষণা করে মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।"[৫০]

যাকাত ছাড়াও অন্যান্য দানের প্রধান যুক্তি হলো মহান আল্লাহ তায়ালা ধনীদের সম্পদে যাকাত ছাড়াও অন্যান্য দান আবশ্যক করেছেন। মহান আল্লাহর বাণী,

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

"আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে।"[৫১]

সুতরাং ইসলামি নির্দেশনার আলোকে জনগণের আর্থিক অবস্থা এবং সেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজনে ইনসাফপূর্ণ যেকোন কর আদায় এবং আদায়কৃত কর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় ইসলামি নির্দেশনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও অনুকরনীয় ।

সুপারিশমালা

নাগরিক সেবা কার্যক্রম যুগোপযোগী, আধুনিক ও টেকসই করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হলো-

১. নগরের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক সেবার উন্নয়ন ও নগরবাসীর কাঙ্খিত সেবাপ্রাপ্তির লক্ষ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাথে সম্পর্কিত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তর এবং সেবা প্রদানকারী (সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি) সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের সমন্বয় রক্ষা করতে হবে।
২. নগর এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ওয়ার্ডভিত্তিক সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
৩. সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজনে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।
৪. জনবল সংকট সমস্যার আশু সমাধান করা।
৫. বর্ষা মৌসুমে সড়ক সংস্কার না করে, পরিকল্পনা করে সড়ক সংস্কার করা।
৬. সড়কের অভ্যন্তরে থাকা ওয়াসা, গ্যাস, টেলিফোন ইত্যাদি সংযোগ সংস্কারে সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় করে উন্নয়ন/সংস্কার কাজ পরিচালনা করা।
৭. ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে জনসচেতনতা তৈরি করা।
৮. ফুটপাতের ছিন্নমূল হকারদের ব্যবসার স্থান নির্ধারণ করে ফুটপাত দখলমুক্ত করা।
৯. নর্দমায় ময়লা-আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকতে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১০. সড়ক আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা।
১১. সড়ক বাতি স্থাপন, রক্ষনাবেক্ষণ, মেরামতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় করা।
১২. নগরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং প্রতিটি সংযোগ সড়কে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা।
১৩. ভবন নির্মাণ নির্দেশনা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা।
১৪. পুরান ঢাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা।
১৫. বর্জ্য সংগ্রহে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সহযোগিতা করা।
১৬. সিটি কর্পোরেশন এর অধীন কর, টোল, ফিস যথাযথভাবে প্রদান করা।
১৭. দুর্নীতি রোধকল্পে দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারী, কর্মকর্তা, ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা এবং দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করা।
১৮. সেবা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
১৯. কাজের দক্ষতা অনুযায়ী ইনসেনটিভ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
২০. সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে মোটিভেশনাল বা প্রেরণামূলক প্রোগ্রামের আয়োজন করা এবং সশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
২১. প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী ব্যক্তিদের ধর্মীয় বিধানানুসারে দায়িত্বানুভূতির বিষয়ে এবং পরকালে জবাবদিহিতার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা।
২২. সেবা গ্রহীতাদেরকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।
২৩. প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে দায়িত্বপালন এবং ব্যর্থতার পরিনতি সম্পর্কে অবহিতকরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
২৪. সরকার যেহেতু রাজস্ব আয় থেকে নাগরিক সেবার ব্যবস্থা করে, তাই সকলকে যথাসময়ে নির্ধারিত কর প্রদানে উৎসাহিত করা।
২৫. প্রত্যেক অফিসের সামনে এবং এলাকার গুরুত্বপূর্ণ ও দর্শনীয় স্থানে সিটিজেন চার্টার সাঁটানোর ব্যবস্থা করা, যাতে সেবাগ্রহীতা কোথায়, কখন ও কিভাবে সেবা পাবে তা জানতে পারে।

## উপসংহার

বাংলাদেশে নগরায়ন অভাবনীয় গতিতে বেড়ে চলেছে এবং এটা অনুমিত যে, আগামী ২০৩৫ সাল নাগাদ দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি শহর এলাকায় বসবাস করবে (জাতিসংঘ প্রাক্কলন, ২০১৮ অনুযায়ী)। এ ধারা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনেও প্রভাব বিস্তার করবে। এজন্য প্রয়োজন নগর শাসন, নাগরিক সেবা ও নগর সরকারের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর নানামুখী গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের প্রয়োগ ঘ। নগরায়ণের সাথে ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, পরিবেশ, স্থাপত্য, অর্থনীতি, রাজনীতির ইত্যাদির প্রভাব নির্ভরশীল। সর্বোপরি মানব সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে নগর ও নাগরিক সমাজের বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই নাগরিক সেবায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং এতৎসম্পর্কিত ইসলামি নির্দেশনা এ গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। এ পর্যালোচনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, নাগরিক সেবা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সীমিত সম্পদ, সীমিত জনবল এবং অসচেতন বিশাল জনগোষ্ঠীকে সাথে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে নাগরিকরা বঞ্চিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি

কর্পোরেশনের বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনসচেতনা তৈরি ও ইসলামি নির্দেশনা আলোকে জবাবদিহিতা, নৈতিক, অর্থনৈতিক শুদ্ধাচার ইত্যাদি উত্তম চর্চার মাধ্যমে নাগরিক সেবার মানোন্নয়ন করতে হবে।

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৭* (ঢাকা : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৭), পৃ. ২

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সচিবালয় নির্দেশমালা ২০০৮* (ঢাকা : সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ২০০৮), পৃ. ৫৭

৩. Ishtiaq Jamil and others, *Understanding Governance and Public Policy in Bangladesh* (Dhaka : North South University, 2011), p. 175

৪. জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, *একুশ শতকের জন প্রশাসন*, ১ম খণ্ড (ঢাকা : জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, ২০০০), পৃ. ১৭

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৬. তোফায়েল আহমেদ ও বিধান চন্দ্র পাল, *নগরায়ণ ও নগর সরকার* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০১৮), পৃ. ৩৫-৩৮

৭. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ঢাকা : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২১), পৃ. ১৮৩-১৮৪

৮. স্থানীয় সরকার বিভাগ, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০২০-২০২১ (ঢাকা : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২১), পৃ. ১৯২

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

১১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন নিশাপুরী আল কুসাইরী (ইমাম মুসলিম), *আস সহীহ* (বৈরুত : দারু এহয়া তুরাসুল আরবী, তা.বি.), হাদিস নং : ২১৬২

১২. আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযি (ইমাম তিরমিযি), *আস সুনান* (মিশর : শিরকাতু মাকতাবাতু মাতবাআতু মুসতফা আল বালী আল হালী, ১৩৯৫৪ হি.), হাদিস নং : ৯৬৯

১৩. ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি, *বার্ষিক প্রতিবেদন অর্থবছর* ২০২০-২০২১ (ঢাকা : ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, ২০২১), পৃ. ১৬

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

১৫. https://www.desco.org.bd/bangla/descoataglance_e.php

১৬. ibid

১৭. স্থানীয় সরকার বিভাগ, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০২০-২০২১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

১৮. আল কুরআন, ১০ : ৫

১৯. আল কুরআন, ১৫ : ২১

২০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ (ইমাম ইবনে মাজাহ), *আস সুনান* (মিশর : দার এহয়া কুতুবুল আরাবী, তা.বি.), হাদিস নং : ১৯৭৯

২১. ইমাম বুখারি, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ৯৮৮

২২. আল কুরআন, ৫ : ৩০-৩১

২৩। আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারি (ইমাম বুখারি), *আস সহিহ* (মিশর : দারু তাওকুন নাজাত, ১৪২২ হি.), প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ১৩১৫

২৪. স্থানীয় সরকার বিভাগ, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৯-২০২০ (ঢাকা : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২০), পৃ. ২১৮

২৫. ইমাম বুখারি, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ৬২২৯

২৬. আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশআস বিন ইসহাক আস-সিজিস্তানী, *আস সুনান* (বৈরুত : মাকতাবা আসরীয়াহ, তা.বি.), হাদিস নং : ২৬

২৭. স্থানীয় সরকার বিভাগ, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০২০-২০২১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২-১৯৩

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

২৯. দৈনিক যুগান্তর, ২৯ জানুয়ারি, ২০২০, পেইজ-নগর-মহানগর।

৩০. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ২৬৯৯

৩১. ইমাম তিরমিযি, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ২৭৯

৩২. আল কুরআন, ২ : ২৭৫

৩৩. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত্তুওয়াইজিরী, *কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ফিকাহ*, আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল অনূদিত, ২য় খণ্ড (রিয়াদ : ইসলাম হাউস, ২০১৯), পৃ. ২৫৮

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

৩৫. এম এ হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ* (ঢাকা : দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২), পৃ. ১০৯-১১০

৩৬. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ১৬০৫

৩৭. আল কুরআন, ৮৩ : ১-৩

৩৮. স্থানীয় সরকার বিভাগ, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

৪০. স্থানীয় সরকার বিভাগ, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

৪১. আল কুরআন, ৮ : ৪১

৪২. আল কুরআন, ৫১ : ১৯

৪৩. ইমাম আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ২৯৫৪

৪৪. স্থানীয় সরকার বিভাগ, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

৪৫. ইমাম ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ২২৪

৪৬. আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন ফাদল বিন বাহরাম বিন আব্দুস সামাদ দারেমি, *আস সুনান* (সৌদি আরব : দারুল মুগনী লিল নশর ওয়াত তাওযীহ, ২০০০), হাদিস-২২৭

৪৭. স্থানীয় সরকার বিভাগ, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

৪৮. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ১০২

৪৯ মুহাম্মাদ হোসাইন হাইকাল, *আল-ফারুক ওমর* (মিসর : মাকতাবা নাহদা, তা.বি), খ. ২, পৃ. ২৬৮

৫০. আল কুরআন, ২ : ৪৩

৫১. আল কুরআন, ২ : ১৭৭

জমা প্রদানের তারিখ : ০৬.০২.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ০৮.০৬.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-১, জানুয়ারি–জুন ২০২২

# মধ্যযুগে বাংলার প্রস্তর লিপির অলংকরণ শৈলী: একটি পর্যালোচনা

মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস*

**Abstract**

Scriptural ornamentation occupies a special place in the stone carvings in the Muslim architecture of Bengal in the Middle Age. The use of stone in several ways inscriptions as decorative design has been observed in Muslim architecture. In Islam, the Muslims have adopted calligraphy as a means of art as there is a strictly prohibited on drawing anything animalistic. The use of inscriptions carved in stone is of special importance in architectural decoration. During the spread of Islam, the Arabic writing style spread. The use of stone script started with the arrival of Muslims in Bengal. A few stone inscriptions dating back to the pre-Muslim period have been found in Bengal. During the Muslim period (1204-1757 C.E) the use of stone calligraphy on the walls of buildings are increased. Although its use in architectural decoration is limited, stone inscriptions have been introduced in most medieval buildings. It is mentioned here to the point of topic. Inscriptions are also considered as an important source in the study and reconstruction of the history of Medieval Bengal (1204-1757 C.E). Apart from providing historical information, it is also considered as a means of beautification to impelhiment of architecture. Muslim rulers were able to bring calligraphy to the level of art. The article in subject attempts to highlight the different types of stone inscriptions and its ornamental style in medieval Bengal architecture.

স্থাপত্য নির্মাণে সাধারণত উপাদান হিসেবে ইট, প্রস্তর এবং কাঠের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তবে ভৌগোলিক অবস্থান স্থাপত্য নির্মাণের উপাদান নির্ধারণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। বাংলার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। নদী বিধৌত পলি মাটি দ্বারা গঠিত বাংলাতে কাদা মাটির আধিক্য হওয়ায় স্থাপত্য নির্মাণে উপাদান হিসাবে ইটের ব্যবহার প্রাধান্য পেয়েছিল। সহজলভ্য ইটের পাশাপাশি স্বল্প পরিসরে প্রস্তরের ব্যবহার মধ্যযুগে (১২০৪-১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলার স্থাপত্যে দেখা যায়। প্রাক মুসলিম পর্বের অর্থাৎ ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারত হতে মুসলমানরা প্রস্তর সংগ্রহ করে সাবধানতা অবলম্বন করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে নিজেদের স্থাপত্যে ব্যবহার করেছেন (চিত্র: ১, ২)।[১] আবার শাসকগণ বাইরের দেশ থেকেও প্রস্তর আমদানি করতেন। ব্যবহৃত প্রস্তরের অধিকাংশই ভারতের রাজমহল থেকে সংগ্রহ করা হতো। বাংলাতে প্রস্তর দুর্লভ হওয়ায় ইট নির্মিত স্থাপত্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রস্তরকে ব্যবহার করা হয়েছে। মধ্যযুগে বাংলার প্রথম পর্বে অর্থাৎ সুলতানি আমলে (১২০৪-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) প্রস্তরের বহুবিধ ব্যবহার দেখা গেলেও মোগল আমলে (১৫২৬-১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) এর ব্যবহার অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে। নির্মাণ রীতি এবং অলংকরণের ক্ষেত্রেও বাংলার কাদামাটি ব্যবহারের আধিক্যের পাশাপাশি প্রস্তরের নানাবিদ ব্যবহার দেখা যায়। তবে প্রস্তরের ব্যবহার বাংলার মুসলিম ইমারতে সীমিতাকারে পরিলক্ষিত হয়। প্রস্তরের ব্যবহার সীমিত হলেও মুসলিম শাসকগণ তাদের অধীনে নির্মিত প্রায় সকল ইমারতে শিলালিপি হিসেবে প্রস্তর খণ্ড ব্যবহার করেছেন। শিলালিপির আকার ছোট হলেও এর স্থাপত্যিক গুরুত্ব অত্যধিক। প্রস্তরের

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১১০০, বাংলাদেশ

স্থায়িত্বের দিক শিল্পীরা বিবেচনা করে শিলালিপিতে এর ব্যবহার করেছিলেন। শিলালিপিতে সাধারণত নির্মাণকাল, নির্মাতা এবং আল কুরআনের তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত লিপিবদ্ধ থাকতো। ধর্মীয় দিক বিবেচনা করে শিলালিপির মতো স্বল্প পরিসরে মুসলিম শাসকগণ লিপিকলাকে শিল্পের পর্যায়ে উপনীত করতে সক্ষম হন। মূলত সুন্দর লিপি ছিল শিল্পের মাধ্যমে ধর্মের বাণী প্রচারের একমাত্র উপায়।[২] শিলালিপি প্রস্তরের হওয়ায় ইমারত ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও এর উপস্থিতি পরবর্তী সময়ে ইতিহাস পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুসলমানগণ তাদের ইমারতের সৌন্দর্য বর্ধন ও অলংকরণের ক্ষেত্রেও লিপিকলাকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলন। প্রস্তর খোদাইয়ে লিপির বিন্যাস ও সৌন্দর্য স্থাপত্য শিল্পকে প্রাণীবাচক চিত্রের চেয়ে অধিক প্রাণবন্ত ও আকর্ষনীয় করে তুলেছিল। প্রবন্ধে শিলালিপির খোদাইয়ে ফুটে ওঠা বিভিন্ন অলংকরণ শৈলীর বিশ্লেষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

মধ্যযুগের বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে অলংকরণের মোটিফ (Motifs) হিসাবে প্রস্তর লিপির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। স্থাপত্যে প্রস্তর লিপির ব্যবহার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সভ্যতা বিকাশের প্রাথমিক পর্বে প্রাচীন যুগে মিশরে নির্মিত পিরামিডের গাত্রে লিপি উৎকীর্ণের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩] মিশরের হায়রোগ্লিফিকস (Hieroglyphyes), মেসোপটেমীয়দের কিউনিফরম (Cuneform) ও চীনের ইডিয়গ্রাফ (Ideograph) প্রাচীন লিপির সাক্ষ্য বহন করে। খ্রিস্টীয় ছয় শতকের শুরুতে নাবাতীয় বর্ণমালা হতে আধুনিক আরবি বর্ণমালার বিকাশ ঘটে।[৪] উমাইয়া (৬৬১-৭৫০ খিস্টাব্দ) ও আব্বাসী (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) আমলে মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় ইমারতে আরবি লিপিকলার ব্যবহার দেখা যায়।[৫] ইসলামের সম্প্রসারণের যুগে এ লিখন রীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলায় মুসলিমদের আগমনে প্রস্তর লিপির ব্যবহার শুরু হয়। বাংলা হতে প্রাক মুসলিম আমলে হাতে গোনা কয়েকটি প্রস্তর লিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রস্তর স্তম্ভ ও ভাস্কর্যে লিপিকলার প্রয়োগ প্রাক মুসলিম আমলে দেখা যায়। খননে মহাস্থানগড় হতে বাংলার প্রাচীনতম ব্রাহ্মী লিপি পাওয়া গেছে। মুসলিম আমলে ইমারতের গাত্রে প্রস্তর লিপিকলার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রস্তরের স্বল্পতা স্থাপত্য অলংকরণের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার সীমিত হলেও মধ্যযুগের অধিকাংশ ইমারতে প্রস্তর লিপি উপস্থাপিত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস চর্চা ও পুনর্গঠনে শিলালিপি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে বিবেচিত। শিলালিপিতে সাধারণত নির্মাণকাল, নির্মাতা এবং আল কুরআনের তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত লিপিবদ্ধ থাকতো। ঐতিহাসিক তথ্য প্রদানের পাশপাশি শিলালিপি সৌন্দর্য বর্ধনের মাধ্যম হিসাবেও বিবেচিত। মুসলিম শাসকগণ লিপিকলাকে শিল্পের পর্যায়ে উপনীত করতে সক্ষম হন। ইসলাম ধর্মে প্রাণীবাচক কোনো কিছু অঙ্কনের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকায় মুসলিমগণ লিপিকলাকে শিল্পচর্চার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে। কোণিক (Anguler) ও গোলায়িত (Cursive) দু'টি লিখন রীতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন লিখন পদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। কৌণিক লিখন রীতি 'কুফিক' এবং গোলায়িত লিখন রীতি 'নাখস' নামে পরিচিতি লাভ করে।[৬] তালিক, নাসতালিক, সুলস, মুহাক্কাক, রায়হান, রিকা, গুবার, তাওকী, তুমার, বিহার, শিকাস্তা প্রভৃতি লিপি শৈলীরও পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাতে তোঘরা নামে পরিচিত একটি লিখন রীতি জনপ্রিয় হয়েছিল। তোঘরা কোনো স্বতন্ত্র লিখন পদ্ধতি না হলেও বাংলায় লিখন রীতি এ নামেই প্রকাশ ঘটেছিল। উৎকীর্ণ লিপিকে অধিক প্রাণবন্ত ও সজীব করে তোলার জন্য লতাগুল্ম, বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা এবং পুষ্প মোটিফ দ্বারা আবৃত করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।[৭] স্থাপত্যের দেয়াল গাত্রের অলংকরণে প্রস্তর লিপিকলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মধ্যযুগে বাংলার মুসলিম

স্থাপত্যে ব্যবহৃত প্রস্তর লিপির বেশিরভাগ বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে এবং কিছু সংখ্যক ইমারতে স্থাপিত আছে। শিলালিপি আরবি ও ফারসি ভাষায় উৎকীর্ণ। প্রস্তর খোদাই শিল্পে লিপি শৈলীর অলংকরণ বিশ্লেষণে প্রতিনিধিত্বমূলক কয়েকটি প্রস্তর লিপির বিবরণ নিম্নে উপস্থাপিত হলো-

চিত্র ৩: লিপিযুক্ত প্রস্তরের সর্দল, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, সংগ্রহ নং VRM-৭৩১।

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে লিপি উৎকীর্ণ কালো পাথরের সর্দল সংরক্ষিত আছে। বর্তমান রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত সুলতানগঞ্জ হতে প্রস্তর লিপিটি সংগ্রহ করা হয়েছে। আনুমানিক চৌদ্দ শতকে নির্মিত কোনো ইমারতের সর্দল হিসাবে প্রস্তর লিপিটি ব্যবহার করা হয়েছিল। শিলাখণ্ডে আল কুরআনের আয়াত আরবি ভাষায় নাখস রীতিতে উৎকীর্ণ আছে। সূরা আল বাকারাহ্‌র ২৫৫ নম্বর আয়াত (আয়াতুল কুরসি) প্রস্তর খণ্ডে লিপিবদ্ধ আছে।[৮] লিপিকলার উপস্থাপনে ব্যবহৃত প্রস্তর খণ্ডের খোদিত অলংকরণ অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর (চিত্রঃ ৩)। আয়তাকার প্রস্তরের দুই প্রান্তে কীর্তিমুখ সদৃশ নকশা পরিলক্ষিত হয়। কীর্তিমুখ হতে পুঁতির মালা বের হয়ে নিম্নে ঝুলে আছে। এর উপরে বর্গাকার কাঠামোতে আট পাঁপড়িযুক্ত একটি করে পুষ্প শৈলী লক্ষণীয়। কীর্তিমুখ সদৃশ নকশার পাশে দরজার পাল্লার ন্যায় আয়তাকার কাঠামো যার উপরে লতা-পাতার নকশা দেখা যায়।

প্রস্তর খোদাইয়ে তিনটি খিলান নকশা দেখা যায়। ত্রিখাঁজ বিশিষ্ট খিলান নকশা প্রস্তর ভাস্কর্য হতে গৃহীত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে এরূপ ত্রিখাঁজ খিলানের ব্যবহার দেখা যায় না। খিলান নকশার উপরের অংশে লতা-পাতার সারি বিদ্যমান। খিলান নকশার অলংকরণে ব্যবহৃত কলামের নকশার নিম্নভাগে কলসাকৃতির শৈলী পরিদৃষ্ট হয়। কলসের উপর পদ্ম পাঁপড়ি নকশাসহ ক্ষুদ্রাকৃতির স্তম্ভ কাণ্ড যা দেখতে ফুলদানির ন্যায় মনে হয়। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের (১৩৯২-১৪১০ খ্রিষ্টাব্দ) সমাধি সৌধে এরূপ কুলঙ্গী আকৃতির পঞ্চ পত্র খিলান নকশা দেখা যায়। মধ্যবর্তী খিলান নকশার উপরের দুই দিকে গুটিকা/পুঁতি দানার সমন্বয়ে ব্যান্ড আকৃতির শৈলী পার্শ্ববর্তী খিলান নকশা পর্যন্ত প্রবহমান। পুঁতি দানার তিনটি করে সারি প্রতি পাশে দৃশ্যমান। মধ্যবর্তী খিলান নকশার উভয় পাশে আয়তাকার কাঠামোর মধ্যখানে ত্রিভুজাকৃতির শৈলী পত্রসহ বৃক্ষের ন্যায় নকশাতে পরিশোভিত। জ্যামিতিক নকশার প্রয়োগ, পুষ্প, লতা-পাতার শৈলী ও খিলান নকশার অলংকরণ প্রস্তর লিপির সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। খিলান নকশার গর্ভে ও ত্রিভুজাকার নকশার দুই পাশে মোট সাতটি অংশে লিপি উৎকীর্ণ আছে। নাখস্‌ রীতির প্রতিনিধিত্বকারী এই প্রস্তর লিপির আলঙ্কারিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাবেশ প্রস্তর খোদাই শিল্পের উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে পরিগণিত হতে পারে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে মান্দ্রা হতে সংগৃহীত একটি আরবি ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি সংরক্ষিত আছে। সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৪১৫-১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) একটি মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত প্রস্তর লিপিটি নাখস রীতিতে লিখিত (চিত্রঃ ৪)।[৯] চার সারিতে বিন্যস্ত শিলালিপিতে উলম্ব দণ্ড ও অনুভূমিক বাহু ঢালু করে উপস্থাপন করা হয়েছে। অনুভূমিক বাহুতে কোনো প্রকার বাঁক দেখা যায় না। নোকতার সংযোজন লিপির স্পষ্টতা বাড়িয়ে দিয়েছে। নোকতার ব্যবহারে বৃত্তাকার নকশার ব্যবহার শিলালিপিতে লক্ষণীয়। শিলালিপিতে লম্ব দণ্ডের ব্যবহার হলেও অক্ষরসমূহ গোলাকৃতিতে লিপিবদ্ধ। লম্ব দণ্ডের উপরের দিক কিছুটা প্রশস্ত ও নিম্নভাগ সরু করে কাঁটার ন্যায় আকৃতি দেওয়া হয়েছে। উপরের সারির বাম কোণে পুষ্প/পাতা সদৃশ নকশা শিলালিপিতে দেখা যায়। বাংলাতে নাখস রীতির আরও উন্নত উপস্থাপন পরবর্তী সময়ে দেখা যায়। শিলালিপির বিপরীত দিকে মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। মূর্তির উপস্থিতি প্রমাণ করে প্রস্তর খণ্ডটি কোনো ভগ্ন মন্দিরের অংশ ছিল। মুসলিম আমলে ঢাকা অঞ্চলের প্রথম দিকের মসজিদ নির্মাণের প্রমাণ বহন করে। লিপি শৈলীর বিন্যাস ও ঐতিহাসিক তথ্য প্রদানকারী এ প্রস্তর খণ্ড আকারে ছোট হলেও খোদিত বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র ৪: মান্দ্রা শিলালিপি, মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, সংগ্রহ নং ই-১৪৩।

চিত্র ৫: নবগ্রাম শিলালিপি, সিরাজগঞ্জ, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, সংগ্রহ নং VRM, A-৩১৭১।

বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ থানার অন্তর্গত নবগ্রাম হতে সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৪৩৭-১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দ) আমলের একটি প্রস্তর লিপি সংগৃহীত হয়েছে (চিত্রঃ ৫)।[১০] শিলালিপিটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। আরবি ভাষায় উৎকীর্ণ লিপিটি গুবার রীতিতে লিখিত। নাখস পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ লিপি তোঘরা হিসাবে গণ্য করা যায় বলে এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী মত প্রদান করেছেন।[১১] ঐতিহাসিক দিক দিয়ে লিপিটি গুরুত্ব বহন করে। অলংকরণের দিক দিয়ে প্রস্তর লিপিটি মনোমুগ্ধকর। তিন লাইনে লিপিটি উদগত রেখা দ্বারা বিভক্ত। উলম্ব দণ্ড তরবারীর সদৃশ নকশাতে উৎকীর্ণ। অক্ষরসমূহ তরবারীর রশির ন্যায় মনে হয়। লম্ব দণ্ড সারিকে জানাজায় দণ্ডায়মান ব্যক্তিবর্গ বা বাঁশের বেড়া এবং নিম্নের গোলায়িত অক্ষরকে মৃতদেহ বা ক্ষেতের শস্য হিসাবে কল্পনা করা যায়।[১২]

চিত্র ৬: মুহাম্মদ তাহিরের সমাধি গাত্রে লিপি শৈলীর অলংকরণ।

চিত্র ৭: প্রস্তর লিপি, খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর, সংগ্রহ নং কেএম ৮৮।

শিলালিপির সাথে লতা-পাতা ও পুষ্প কুঁড়ি শৈলীর নান্দনিক সমাবেশ খান জাহানের সমাধি সৌধে পরিলক্ষিত হয়। সর্পিল লতার সারি অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। প্রস্তর খোদাইয়ে লিপি শৈলীর সমাবেশ সমাধি সৌধের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। মুসলিম ধর্মীয় আদর্শের কথা মাথায় রেখে প্রস্তর খোদাইয়ে আরবি ও ফারসি লিপির সাথে লতা-পাতার উপস্থাপন গুরুত্ব পেয়েছে। প্রস্তরে লিপি শৈলীর অলংকরণে জ্যামিতিক নকশার ব্যবহার দেখা যায়। বৃত্তাকার কাঠামোতে নির্মাণ সম্পর্কিত লিপি এবং উপরের অর্ধ গোলাকার অংশ উদ্‌গত ব্যান্ড দ্বারা একশত চারটি চতুর্ভুজ আকৃতির কাঠামোর মধ্যে লিপি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। খান জাহানের সমাধি সৌধে নাখস্ রীতির সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অলংকরণ শিল্প হিসাবে প্রস্তর লিপি খোদাইয়ে লিপিকারের শৈল্পিক দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে খান জাহানের সমাধি সৌধে। এ সমাধি সৌধের পশ্চিম পাশে প্রস্তরে নির্মিত লিপি অলংকৃত মুহাম্মদ তাহিরের সমাধি সৌধ পরিলক্ষিত হয়। খান জাহানের সমাধি সৌধের ন্যায় এ সমাধি গাত্রে লিপি অলংকরণ করা হয়েছে। সমাধি গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতে ডালপালা, পুষ্প কুঁড়ি ও বৃক্ষ সদৃশ নকশা সন্নিবেশিত আছে (চিত্রঃ ৬)। খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরে কয়েকটি প্রস্তর লিপি সংরক্ষিত আছে। সংরক্ষিত শিলালিপির মধ্যে একটির চতুর্দিকের পাড়ে পুষ্প, লতা-পাতা ও কুঁড়ির নকশা প্রস্তর খোদাইয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্রঃ ৭)। চার পাঁপড়ি যুক্ত পুষ্পের সাথে কার্পাস

তুলার কুঁড়ি/সুপারির ন্যায় কুঁড়ি নকশা লক্ষণীয়। প্রস্তর লিপির আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ পাঠ উদ্ধার করা যায়নি। লিপি শৈলীর নান্দনিকতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন মোটিফের আকৃতিতে। কিছু অক্ষরের বিন্যাস সর্প ফণার ন্যায় মনে হয়। হাতল যুক্ত কাস্তের কাঠামোর ন্যায় কাফ (ک) অক্ষর উপস্থাপিত হয়েছে। ইয়া (ي) এর মাথা ত্রিভুজের ন্যায় শৈলীতে অলংকৃত। শিলাফলকে বিন্দু ও বৃত্তের ব্যবহার দেখা যায়। আল কুরআনের আয়াত সম্বলিত প্রস্তর লিপিটির অলংকরণ শৈলী অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও সজীব করেছে বর্ডারে ব্যবহৃত পুষ্প, লতা-পাতার নকশা।

চিত্র ৮: মাহীসন্তোষ মসজিদ শিলালিপি, পাহাড়পুর জাদুঘর।

নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার আলমপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত চৌঘাট মৌজার মাহীসন্তোষ হতে সুলতান রুকুনউদ্দিন বারবক শাহের (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) আমলে একটি মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত শিলালিপির সন্ধান পাওয়া যায়। শিলালিপিটি বর্তমানে পাহাড়পুর জাদুঘরে রক্ষিত আছে। আরবি ভাষায় নাখস্ রীতিতে উৎকীর্ণ লিপিটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের পাশাপাশি লিপি শৈলীর অলংকরণও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে (চিত্র: ৮)। লম্ব দণ্ডের সাথে অনুভূমিক ঢালু করে অক্ষরের বিন্যাস দেখা যায়। লম্ব দণ্ডের মাথা বাম দিকে হাঁসের ঠোঁটের সদৃশ বলে কল্পনা করা যায়। উলম্ব দণ্ডের নিম্ন ও উপরাংশ প্রায় একই আকৃতিতে লিখিত। দুই লাইনে উৎকীর্ণ লিপির নিম্ন সারিতে ইয়া (ي) নৌকার ন্যায় আকৃতিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দুই লাইনের মাঝে ও চতুর্দিকে উদগত রেখার ন্যায় কাঠামো বিদ্যমান। প্রস্তর লিপিতে ব্যবহৃত নোকতা ডায়মন্ড সদৃশ নকশার ন্যায় অলংকৃত। উৎকীর্ণ লিপি শৈলী প্রস্তর খোদাইয়ে উন্নত শিল্পের পরিচায়ক।

রাস্তি খান মসজিদের কোনো অস্তিত্ব বর্তমানে না থাকলেও শিলালিপি এর সাক্ষ্য বহন করে যাচ্ছে। নতুন নির্মিত আলাউল মসজিদে শিলালিপিটি সংস্থাপিত আছে (চিত্র: ৯)। আরবি ও ফারসি ভাষার সংমিশ্রণে উন্নত নাখস রীতির এ লিপি হতে জানা যায় সুলতান রুকুনউদ্দিন বারবক শাহের (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) আমলে রাস্তি খান ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন।[১৩] লিপি শৈলীতে অলংকরণ মোটিফের ব্যবহার প্রস্তর লিপিটির শিল্পমাধুর্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। লম্ব দণ্ডের ব্যবহার এবং ঢালু ও গোলায়িত করে অক্ষরসমূহের বিন্যাস লক্ষ করা যায়। লম্ব দণ্ডের মাথা হাঁসের ঠোঁটের আকৃতিতে উপস্থাপিত হয়েছে এবং নিম্নাংশ সরু ও কাঁটার ন্যায়। অর্ধ চন্দ্রের আকৃতিতে নুন (ن) অক্ষরের ব্যবহার লিপিতে রয়েছে। প্রস্তর লিপির শুরুতেই বাল্ব সদৃশ

কাঠামোতে বর্ণমালা উপস্থাপন করা হয়েছে। নোকতা, তাশদীদ ও হরকতের ব্যবহার শিলালিপির বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছে। নোকতার প্রতিটি বিন্দু ডায়মন্ড আকৃতিতে এবং হরকত পাতার ন্যায়, তাশদীদ দন্ত মোটিফের ন্যায় নকশাতে অলংকৃত। পুষ্পের উপস্থিতি লিপি শৈলীর নান্দনিকতাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। তারার ন্যায় নকশা, আট পাঁপড়িযুক্ত পুষ্পের ব্যবহার এ লিপিফলককে দেখা যায়। দুই সারিতে শিলালিপি উৎকীর্ণ । উপরের সারির বাম কোণে ছয়টি লম্ব দণ্ডকে বেষ্টন করে আছে চন্দ্রের ন্যায় কাঠামো যা গোলাকার খাঁচার ন্যায় আকৃতি ধারণ করেছে এবং এর মধ্যে দুই পাতার ন্যায় ছোট চারা গাছের সদৃশ নকশা কল্পনা করা যায়। প্রস্তর লিপিতে আরবি ও ফারসি ভাষার সংমিশ্রণ একটি বিশেষত্ব প্রকাশ করেছে।

চিত্র ১৪: সুলতানগঞ্জ শিলালিপি, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, সংগ্রহ নং VRM, A-২৬৬১।

রাজশাহীর সুলতানগঞ্জ হতে সংগৃহীত সুলতান শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দ) একটি শিলালিপি বর্তমানে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে (চিত্র: ১৪)।[১৪] শিলালিপিতে তীর ধনুক আকৃতিতে অক্ষর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উলম্ব দণ্ডে আলিফ ও লাম আলিফ (لا) ও লাম (ل) অক্ষরের বিন্যাস এবং নুন (ن) অনুভূমিকভাবে লিখিত আছে। নুনের অবস্থা ধনুকের ন্যায় এবং আলিফ ও লামের মাথা তীরের সদৃশ কল্পনা করা যেতে পারে। নুনকে চাঁদের সাথে, নৌকার সাথে এমনকি বেড়ায় ব্যবহৃত বাতার সাথেও তুলনা করা যায়। তাশদীদের সাথে নোকতা বা বিন্দুর পাশাপাশি অবস্থান চাবির ন্যায় আকৃতি ধারণ করেছে বলে মনে হয়। প্রস্তর খোদাইয়ে আঙ্গুর থোকা/আতা ফল ও পুষ্প কুঁড়ি সদৃশ নকশার অলংকরণ শিলালিপির নান্দনিকতা বৃদ্ধি করেছে। নোকতাকে ডায়মন্ড আকৃতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। সামগ্রিক বিবেচনায় শিলালিপির শৈল্পিক বিকাশ প্রস্তর খোদাইয়ে ফুটে উঠেছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কানসাট হতে সংগৃহীত সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের (১৫১৯-১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দ) একটি প্রস্তর লিপি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে (চিত্র: ১৫)।[১৫] তোঘরা

লিপি শৈলীর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে এটিকে বিবেচনা করা যায়। এ শিলালিপিতে উলম্ব দণ্ডের উপরাংশ হংসের মুখের সদৃশ আকৃতিতে উপস্থাপিত হয়েছে। উলম্ব দণ্ডগুলোকে বাঁশের খাঁচা বলে অনুমান করা যায়। শিলালিপির মধ্যভাগে ফা (ف), নুন (ن), ইয়া (ي), গাঈন (غ) অক্ষরগুলো হাঁসের আকৃতিতে সাঁতাররত অবস্থায় কল্পনা করা যায়।

চিত্র ১৬: আরশনগর, ডুমুরিয়া, খুলনা হতে প্রাপ্ত প্রস্তর লিপি, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, সংগ্রহ নং VRM, A-৩৬১৫।

সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ) আমলের আরশনগর শিলালিপির শৈল্পিক অলংকরণ অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। শিলালিপিতে তোঘরা লিপির ভিন্নধর্মী শৈলী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শিলালিপিটি ৯০৭ হিজরি/১৫০১ খ্রিষ্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণের সাক্ষ্য বহন করে। প্রস্তর লিপির উপরাংশে ও নিম্নাংশে ষোলটি করে বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি বর্গের মধ্যে আট পাঁপড়িযুক্ত পদ্ম সদৃশ পুষ্পের নকশা পরিলক্ষিত হয় (চিত্র: ১৬)। শিলালিপির অলংকরণে এ নকশা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং দেশজ পুষ্পের উপস্থিতি শিল্পীর লোকজ শিল্পমানসের পরিচয় বহন করে। প্রস্তরের মধ্যবর্তী অংশে উৎকীর্ণ লিপির অলংকরণে তোঘরা লিপির একটি অনন্য উপস্থাপনা লক্ষণীয়। উলম্ব দণ্ডের উপরাংশ তরবারীর হাতল হিসাবে কল্পনা করা যায়। মধ্যভাগে নুন (ن), ইয়া (ي) অক্ষরকে মধ্যবর্তী অংশে নৌকার সদৃশ বলে মনে হয়। কুঁড়ে ঘরের চালা হিসাবেও এ শৈলীকে মনে করা যায়।[১৬] শিলালিপিতে সুলতানকে জল স্থলের সম্মানিত ব্যক্তি (আকরামু বারবিন ওয়া বাহ্‌রিন) হিসাবে উল্লেখের সাথে রণতরী হিসাবে উক্ত শৈলীকে কল্পনা করা যেতে পারে। লিপির অলংকরণ শৈলীতে প্রস্তর খোদাই শিল্পের উন্নত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের (১৫১৯-১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দ) নবগ্রাম শিলালিপিতে এরূপ নৌকার সদৃশ নকশা কল্পনা করা যায়। শিলালিপিতে নুন (ن) অক্ষরকে নৌকা অথবা নব উদিত চন্দ্রের ন্যায় মনে করা যায় (চিত্র: ১৭)। শিলালিপিটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সোনারগাঁও হতে সংগৃহীত সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের (১৫১৯-১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দ) অপর একটি শিলালিপি

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। শিলালিপিতে নুন (ن) অক্ষরকে হংসের আকৃতির ন্যায় রূপ দেওয়া হয়েছে (চিত্র: ১৮)। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ) অপর একটি শিলালিপি কুড়িগ্রামের উলিপুর হতে সংগৃহীত হয়েছে। শিলালিপিটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[১৭] নাখস রীতিতে উৎকীর্ণ লিপির পাশাপাশি পুষ্প শৈলীর উপস্থাপনা শিলালিপির সৌন্দর্য বর্ধন করেছে (চিত্র: ১৯)।

চিত্র ৯: রাস্তি খান মসজিদের শিলালিপি, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

লম্ব দণ্ডের প্রতিনিধিত্বকারী লিপি সমূহের মধ্যে খনিয়া দিঘি/রাজবিবি মসজিদের প্রস্তর লিপিটি অন্যতম। কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপরে শিলালিপিটির অস্পষ্ট অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। নোকতা এবং তাশদীদের ব্যবহার লিপিতে থাকলেও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ছোট সোনা মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরের দিকে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত একটি শিলালিপি সংস্থাপিত আছে। শিলালিপির লিপি বিন্যাস অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত। তোঘরা রীতির ন্যায় নাখস পদ্ধতিতে আরবি লিপি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। লম্ব দণ্ডের উপরের অংশ ডান দিকে হংসের মুখ সদৃশ নকশাতে অঙ্কিত। নোকতা ও তাশদীদের ব্যবহারে বৈচিত্র্য দেখা যায়। প্রস্তর লিপি তিনটি লাইনে বিন্যস্ত এবং মধ্য সারিতে তিনটি গোলাপ ফুলের সমাবেশ এর সৌন্দর্যকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে (চিত্র: ১০) পুষ্পের মাঝে 'আল্লাহু' শব্দটি উৎকীর্ণ আছে। পুষ্প শৈলী সম্বলিত এরূপ একটি প্রস্তর লিপি শাহ নিয়ামত উল্লাহর সমাধি অঙ্গনে পরিলক্ষিত হয় (চিত্র: ১১)। লিপি শৈলীর অলংকরণে শিল্পীর শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় এ শিলালিপিতে পাওয়া যায়। শাহ নিয়ামত উল্লাহর সমাধি কক্ষে একটি ভঙ্গুর প্রস্তর লিপিতে পুষ্প, লতা-পাতা, কুঁড়ি ও ফলের অনুকৃতি লক্ষ করা যায় (চিত্র: ১২)। বর্তমান ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকাইল থানার অন্তর্গত রানীশংকাইল-নেকমরদ পাকা সড়কের পূর্ব দিকে মহিশপুর মৌজায় বিশবাঁশ জামে মসজিদ নামে একটি মসজিদ পরিলক্ষিত হয়।[১৮] আ. কা. মো. যাকারিয়া মসজিদটির বিবরণ প্রথম তুলে ধরেন। মসজিদ অঙ্গন হতে তিনি একটি শিলালিপি সংগ্রহ করেন, যা দিনাজপুর জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[১৯] আরবি ভাষায় নাখস রীতিতে তিন লাইনে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে পুষ্প শৈলীর ব্যবহার দেখা যায় (চিত্র: ১৩)।[২০]

চিত্র ১২: শাহ নিয়ামত উল্লাহর সমাধি কক্ষে রক্ষিত প্রস্তর লিপি খোদাইয়ে লতা-পাতা, গাছপালা ও ফল নকশার দৃশ্য।

চিত্র ১৩: বিশবাঁশ মসজিদ শিলালিপি, রানীশংকাইল, দিনাজপুর জাদুঘর।

তোঘরা নামে বাংলার একটি নিজস্ব লিখন রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। আকর্ষণীয় শৈল্পিক অলংকরণ সমৃদ্ধ এ রীতির বেশ কিছু প্রস্তর লিপির সন্ধান বাংলাতে পাওয়া গিয়েছে। তোঘরা লিপির জনপ্রিয়তার কারণে বিভিন্ন আকৃতিতে এর ব্যবহার দেখা যায়। বাংলার উন্নত শিল্পকলার পরিচয় এই তোঘরা লিপি শৈলীর প্রয়োগে দেখা যায়। তোঘরা লিপি উপস্থাপনে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রস্তর লিপির বর্ডারে ও মধ্যে অলংকরণ মোটিফ ব্যবহার করা হয়েছে। হস্তলিখন শিল্পে বাংলার এই ধারার সাথে বিশ্বের লিখন শৈলীর কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এই আকর্ষণীয় ও অভিনব লিখন কৌশল অবশ্যই বাংলার একটি স্বতন্ত্র অবদান।[২১] বাংলার প্রকৃতি ও পরিবেশকে তোঘরা লিপির মাধ্যমে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এ লিখন শৈলীতে অক্ষরের বিন্যাসে অনেক কিছু কল্পনা করা যেতে পারে। গ্রাম বাংলার কুঁড়ে ঘর হতে শুরু করে সৈন্য ব্যারাকের সদৃশ শৈলী তোঘরা লিপিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ লিপির কোনো কোনোটির আকৃতি ধনুকের মতো বক্র, কোনো কোনোটি জলকেলিরত হাঁসের পালের মতো, কোনোটি গ্রামের চালা ঘরের আকৃতিতে অঙ্কিত।[২২] কয়েকটি শিলালিপির আলোকে উক্ত বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করা হবে।

চিত্র ৬: মুহাম্মদ তাহিরের সমাধি গাত্রে লিপি শৈলীর অলংকরণ।

চিত্র ৭: প্রস্তর লিপি, খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর, সংগ্রহ নং কেএম ৮৮।

শিলালিপির সাথে লতা-পাতা ও পুষ্প কুঁড়ি শৈলীর নান্দনিক সমাবেশ খান জাহানের সমাধি সৌধে পরিলক্ষিত হয়। সর্পিল লতার সারি অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। প্রস্তর খোদাইয়ে লিপি শৈলীর সমাবেশ সমাধি সৌধের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। মুসলিম ধর্মীয় আদর্শের কথা মাথায় রেখে প্রস্তর খোদাইয়ে আরবি ও ফারসি লিপির সাথে লতা-পাতার উপস্থাপন গুরুত্ব পেয়েছে। প্রস্তরে লিপি শৈলীর অলংকরণে জ্যামিতিক নকশার ব্যবহার দেখা যায়। বৃত্তাকার কাঠামোতে নির্মাণ সম্পর্কিত লিপি এবং উপরের অর্ধ গোলাকার অংশ উদগত ব্যান্ড দ্বারা একশত চারটি চতুর্ভুজ আকৃতির কাঠামোর মধ্যে লিপি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। খান জাহানের সমাধি সৌধে নাখস্ রীতির সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অলংকরণ শিল্প হিসাবে প্রস্তর লিপি খোদাইয়ে লিপিকারের শৈল্পিক দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে খান জাহানের সমাধি সৌধে। এ সমাধি সৌধের পশ্চিম পাশে প্রস্তরে নির্মিত লিপি অলংকৃত মুহাম্মদ তাহিরের সমাধি সৌধ পরিলক্ষিত হয়। খান জাহানের সমাধি সৌধের ন্যায় এ সমাধি গাত্রে লিপি অলংকরণ করা হয়েছে। সমাধি গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতে ডালপালা, পুষ্প কুঁড়ি ও বৃক্ষ সদৃশ নকশা সন্নিবেশিত আছে (চিত্রঃ ৬)। খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরে কয়েকটি প্রস্তর লিপি সংরক্ষিত আছে। সংরক্ষিত শিলালিপির মধ্যে একটির চতুর্দিকের পাড়ে পুষ্প, লতা-পাতা ও কুঁড়ির নকশা প্রস্তর খোদাইয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্রঃ ৭)। চার পাঁপড়ি যুক্ত পুষ্পের সাথে কার্পাস তুলার কুঁড়ি/সুপারির ন্যায় কুঁড়ি নকশা লক্ষণীয়। প্রস্তর লিপির আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ পাঠ উদ্ধার করা যায়নি। লিপি শৈলীর নান্দনিকতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন মোটিফের আকৃতিতে। কিছু অক্ষরের বিন্যাস সর্প ফণার ন্যায় মনে হয়। হাতল যুক্ত কাস্তের কাঠামোর ন্যায় কাফ (ک) অক্ষর উপস্থাপিত হয়েছে। ইয়া (ی) এর মাথা ত্রিভুজের ন্যায় শৈলীতে অলংকৃত। শিলাফলকে বিন্দু ও বৃত্তের ব্যবহার দেখা যায়। আল কুরআনের আয়াত সম্বলিত প্রস্তর লিপিটির অলংকরণ শৈলী অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও সজীব করেছে বর্ডারে ব্যবহৃত পুষ্প, লতা-পাতার নকশা।

চিত্র ৮: মাহীসন্তোষ মসজিদ শিলালিপি, পাহাড়পুর জাদুঘর।

নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার আলমপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত চৌঘাট মৌজার মাহীসন্তোষ হতে সুলতান রুকুনউদ্দিন বারবক শাহের (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) আমলে একটি মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত শিলালিপির সন্ধান পাওয়া যায়। শিলালিপিটি বর্তমানে পাহাড়পুর জাদুঘরে রক্ষিত আছে। আরবি ভাষায় নাখস্ রীতিতে উৎকীর্ণ লিপিটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের পাশাপাশি লিপি শৈলীর অলংকরণও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে (চিত্র: ৮)। লম্ব দণ্ডের সাথে অনুভূমিক ঢালু করে অক্ষরের বিন্যাস দেখা যায়। লম্ব দণ্ডের মাথা বাম দিকে হাঁসের ঠোঁটের সদৃশ বলে কল্পনা করা যায়। উলম্ব দণ্ডের নিম্ন ও উপরাংশ প্রায় একই আকৃতিতে লিখিত। দুই লাইনে উৎকীর্ণ লিপির নিম্ন সারিতে ইয়া (ي) নৌকার ন্যায় আকৃতিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দুই লাইনের মাঝে ও চতুর্দিকে উদগত রেখার ন্যায় কাঠামো বিদ্যমান। প্রস্তর লিপিতে ব্যবহৃত নোকতা ডায়মন্ড সদৃশ নকশার ন্যায় অলংকৃত। উৎকীর্ণ লিপি শৈলী প্রস্তর খোদাইয়ে উন্নত শিল্পের পরিচায়ক।

রাস্তি খান মসজিদের কোনো অস্তিত্ব বর্তমানে না থাকলেও শিলালিপি এর সাক্ষ্য বহন করে যাচ্ছে। নতুন নির্মিত আলাউল মসজিদে শিলালিপিটি সংস্থাপিত আছে (চিত্র: ৯)। আরবি ও ফারসি ভাষার সংমিশ্রণে উন্নত নাখস রীতির এ লিপি হতে জানা যায় সুলতান রুকুনউদ্দিন বারবক শাহের (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) আমলে রাস্তি খান ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন।[২৩] লিপি শৈলীতে অলংকরণ মোটিফের ব্যবহার প্রস্তর লিপিটির শিল্পমাধুর্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। লম্ব দণ্ডের ব্যবহার এবং ঢালু ও গোলায়িত করে অক্ষরসমূহের বিন্যাস লক্ষ করা যায়। লম্ব দণ্ডের মাথা হাঁসের ঠোঁটের আকৃতিতে উপস্থাপিত হয়েছে এবং নিম্নাংশ সরু ও কাঁটার ন্যায়। অর্ধ চন্দ্রের আকৃতিতে নুন (ن) অক্ষরের ব্যবহার লিপিতে রয়েছে। প্রস্তর লিপির শুরুতেই বাল্ব সদৃশ কাঠামোতে বর্ণমালা উপস্থাপন করা হয়েছে। নোকতা, তাশদীদ ও হরকতের ব্যবহার শিলালিপির বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছে। নোকতার প্রতিটি বিন্দু ডায়মন্ড আকৃতিতে এবং হরকত পাতার ন্যায়, তাশদীদ দন্ত মোটিফের ন্যায় নকশাতে অলংকৃত। পুষ্পের উপস্থিতি লিপি শৈলীর নান্দনিকতাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। তারার ন্যায় নকশা, আট পাঁপড়িযুক্ত পুষ্পের ব্যবহার এ লিপিফলকে দেখা যায়। দুই সারিতে শিলালিপি উৎকীর্ণ । উপরের সারির বাম কোণে ছয়টি লম্ব দণ্ডকে বেষ্টন করে আছে চন্দ্রের ন্যায় কাঠামো যা গোলাকার খাঁচার ন্যায় আকৃতি ধারণ করেছে এবং এর মধ্যে দুই পাতার ন্যায় ছোট চারা গাছের সদৃশ নকশা কল্পনা করা যায়। প্রস্তর লিপিতে আরবি ও ফারসি ভাষার সংমিশ্রণ একটি বিশেষত্ব প্রকাশ করেছে।

চিত্র ৯: রাস্তি খান মসজিদের শিলালিপি, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

লম্ব দণ্ডের প্রতিনিধিত্বকারী লিপি সমূহের মধ্যে খনিয়া দিঘি/রাজবিবি মসজিদের প্রস্তর লিপিটি অন্যতম। কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপরে শিলালিপিটির অস্পষ্ট অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। নোকতা এবং তাশদীদের ব্যবহার লিপিতে থাকলেও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ছোট সোনা মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরের দিকে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত একটি শিলালিপি সংস্থাপিত আছে। শিলালিপির লিপি বিন্যাস অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত। তোঘরা রীতির ন্যায় নাখস পদ্ধতিতে আরবি লিপি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। লম্ব দণ্ডের উপরের অংশ ডান দিকে হংসের মুখ সদৃশ নকশাতে অঙ্কিত। নোকতা ও তাশদীদের ব্যবহারে বৈচিত্র্য দেখা যায়। প্রস্তর লিপি তিনটি লাইনে বিন্যস্ত এবং মধ্য সারিতে তিনটি গোলাপ ফুলের সমাবেশ এর সৌন্দর্যকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে (চিত্র: ১০) পুষ্পের মাঝে 'আল্লাহু' শব্দটি উৎকীর্ণ আছে। পুষ্প শৈলী সম্বলিত এরূপ একটি প্রস্তর লিপি শাহ নিয়ামত উল্লাহর সমাধি অঙ্গনে পরিলক্ষিত হয় (চিত্র: ১১)। লিপি শৈলীর অলংকরণে শিল্পীর শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় এ শিলালিপিতে পাওয়া যায়। শাহ নিয়ামত উল্লাহর সমাধি কক্ষে একটি ভঙ্গুর প্রস্তর লিপিতে পুষ্প, লতা-পাতা, কুঁড়ি ও ফলের অনুকৃতি লক্ষ করা যায় (চিত্র: ১২)। বর্তমান ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকাইল থানার অন্তর্গত রানীশংকাইল-নেকমরদ পাকা সড়কের পূর্ব দিকে মহিশপুর মৌজায় বিশবাঁশ জামে মসজিদ নামে একটি মসজিদ পরিলক্ষিত হয়।[২৪] আ. কা. মো. যাকারিয়া মসজিদটির বিবরণ প্রথম তুলে ধরেন। মসজিদ অঙ্গন হতে তিনি একটি শিলালিপি সংগ্রহ করেন, যা দিনাজপুর জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[২৫] আরবি ভাষায় নাখস রীতিতে তিন লাইনে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে পুষ্প শৈলীর ব্যবহার দেখা যায় (চিত্র: ১৩)।[২৬]

চিত্র ১২: শাহ নিয়ামত উল্লাহর সমাধি কক্ষে রক্ষিত প্রস্তর লিপি খোদাইয়ে লতা-পাতা, গাছপালা ও ফল নকশার দৃশ্য।

চিত্র ১৩: বিশবাঁশ মসজিদ শিলালিপি, রানীশংকাইল, দিনাজপুর জাদুঘর।

তোঘরা নামে বাংলার একটি নিজস্ব লিখন রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। আকর্ষণীয় শৈল্পিক অলংকরণ সমৃদ্ধ এ রীতির বেশ কিছু প্রস্তর লিপির সন্ধান বাংলাতে পাওয়া গিয়েছে। তোঘরা লিপির জনপ্রিয়তার কারণে বিভিন্ন আকৃতিতে এর ব্যবহার দেখা যায়। বাংলার উন্নত শিল্পকলার পরিচয় এই তোঘরা লিপি শৈলীর প্রয়োগে দেখা যায়। তোঘরা লিপি উপস্থাপনে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রস্তর লিপির বর্ডারে ও মধ্যে অলংকরণ মোটিফ ব্যবহার করা হয়েছে। হস্তলিখন শিল্পে বাংলার এই ধারার সাথে বিশ্বের লিখন শৈলীর কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এই আকর্ষণীয় ও অভিনব লিখন কৌশল অবশ্যই বাংলার একটি স্বতন্ত্র অবদান।[২৭] বাংলার প্রকৃতি ও পরিবেশকে তোঘরা লিপির মাধ্যমে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এ লিখন শৈলীতে অক্ষরের বিন্যাসে অনেক কিছু কল্পনা করা যেতে পারে। গ্রাম বাংলার কুঁড়ে ঘর হতে শুরু করে সৈন্য ব্যারাকের সদৃশ শৈলী তোঘরা লিপিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ লিপির কোনো কোনোটির আকৃতি ধনুকের মতো বক্র, কোনো কোনোটি জলকেলিরত হাঁসের পালের মতো, কোনোটি গ্রামের চালা ঘরের আকৃতিতে অঙ্কিত।[২৮] কয়েকটি শিলালিপির আলোকে উক্ত বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করা হবে।

চিত্র ১৪: সুলতানগঞ্জ শিলালিপি, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, সংগ্রহ নং VRM, A-২৬৬১।

রাজশাহীর সুলতানগঞ্জ হতে সংগৃহীত সুলতান শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দ) একটি শিলালিপি বর্তমানে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে (চিত্রঃ ১৪)।[২৯] শিলালিপিতে তীর ধনুক আকৃতিতে অক্ষর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উলম্ব দণ্ডে আলিফ ও লাম আলিফ (**لا**) ও লাম (**ل**) অক্ষরের বিন্যাস এবং নুন (**ن**) অনুভূমিকভাবে লিখিত আছে। নুনের অবস্থা ধনুকের ন্যায় এবং আলিফ ও লামের মাথা তিরের সদৃশ কল্পনা করা যেতে পারে। নুনকে চাঁদের সাথে, নৌকার সাথে এমনকি বেড়ায় ব্যবহৃত বাতার সাথেও তুলনা করা যায়। তাশদীদের সাথে নোকতা বা বিন্দুর পাশাপাশি অবস্থান চাবির ন্যায় আকৃতি ধারণ করেছে বলে মনে হয়। প্রস্তর খোদাইয়ে আঙ্গুর থোকা/আতা ফল ও পুষ্প কুঁড়ি সদৃশ নকশার অলংকরণ শিলালিপির নান্দনিকতা বৃদ্ধি করেছে। নোকতাকে ডায়মন্ড আকৃতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। সামগ্রিক বিবেচনায় শিলালিপির শৈল্পিক বিকাশ প্রস্তর খোদাইয়ে ফুটে উঠেছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কানসাট হতে সংগৃহীত সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের (১৫১৯-১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দ) একটি প্রস্তর লিপি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে (চিত্রঃ ১৫)।[৩০] তোঘরা লিপি শৈলীর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে এটিকে বিবেচনা করা যায়। এ শিলালিপিতে উলম্ব দণ্ডের উপরাংশ হংসের মুখের সদৃশ আকৃতিতে উপস্থাপিত হয়েছে। উলম্ব দণ্ডগুলোকে বাঁশের খাঁচা বলে অনুমান করা যায়। শিলালিপির মধ্যভাগে ফা (**ف**), নুন (**ن**), ইয়া (**ي**), গাঈন (**غ**) অক্ষরগুলো হাঁসের আকৃতিতে সাঁতাররত অবস্থায় কল্পনা করা যায়।

চিত্র ১৬: আরশনগর, ডুমুরিয়া, খুলনা হতে প্রাপ্ত প্রস্তর লিপি, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, সংগ্রহ নং VRM, A-৩৬১৫।

সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ) আমলের আরশনগর শিলালিপির শৈল্পিক অলংকরণ অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। শিলালিপিতে তোঘরা লিপির ভিন্নধর্মী শৈলী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শিলালিপিটি ৯০৭ হিজরি/১৫০১ খ্রিস্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণের সাক্ষ্য বহন করে। প্রস্তর লিপির উপরাংশে ও নিম্নাংশে ষোলটি করে বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি বর্গের মধ্যে আট পাঁপড়িযুক্ত পদ্ম সদৃশ পুষ্পের নকশা পরিলক্ষিত হয় (চিত্রঃ ১৬)। শিলালিপির অলংকরণে এ নকশা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং দেশজ পুষ্পের উপস্থিতি শিল্পীর লোকজ শিল্পমানসের পরিচয় বহন করে। প্রস্তরের মধ্যবর্তী অংশে উৎকীর্ণ লিপির অলংকরণে তোঘরা

লিপির একটি অনন্য উপস্থাপনা লক্ষণীয়। উলম্ব দণ্ডের উপরাংশ তরবারীর হাতল হিসাবে কল্পনা করা যায়। মধ্যভাগে নুন (ن), ইয়া (ي) অক্ষরকে মধ্যবর্তী অংশে নৌকার সদৃশ বলে মনে হয়। কুঁড়ে ঘরের চালা হিসাবেও এ শৈলীকে মনে করা যায়।[৩১] শিলালিপিতে সুলতানকে জল স্থলের সম্মানিত ব্যক্তি (আকরামু বারবিন ওয়া বাহ্‌রিন) হিসাবে উল্লেখের সাথে রণতরী হিসাবে উক্ত শৈলীকে কল্পনা করা যেতে পারে। লিপির অলংকরণ শৈলীতে প্রস্তর খোদাই শিল্পের উন্নত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের (১৫১৯-১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দ) নবগ্রাম শিলালিপিতে এরূপ নৌকার সদৃশ নকশা কল্পনা করা যায়। শিলালিপিতে নুন (ن) অক্ষরকে নৌকা অথবা নব উদিত চন্দ্রের ন্যায় মনে করা যায় (চিত্র: ১৭)। শিলালিপিটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সোনারগাঁও হতে সংগৃহীত সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের (১৫১৯-১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দ) অপর একটি শিলালিপি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। শিলালিপিতে নুন (ن) অক্ষরকে হংসের আকৃতির ন্যায় রূপ দেওয়া হয়েছে (চিত্র: ১৮)। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ) অপর একটি শিলালিপি কুড়িগ্রামের উলিপুর হতে সংগৃহীত হয়েছে। শিলালিপিটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[৩২] নাখস রীতিতে উৎকীর্ণ লিপির পাশাপাশি পুষ্প শৈলীর উপস্থাপনা শিলালিপির সৌন্দর্য বর্ধন করেছে (চিত্র: ১৯)।

চিত্র ২০: সেতু নির্মাণ সম্পর্কিত শিলালিপি, সিলেট, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, সংগ্রহ নং ৭৪.১৬৫।

বগুড়া জেলার শেরপুর মোর্চার খন্দকারতোলা গ্রামে খেরুয়া মসজিদ অবস্থিত। মসজিদের প্রধান প্রবেশপথের বামদিকে একটি প্রস্তর লিপি পরিলক্ষিত হয়। ফারসি ভাষায় নাখস রীতিতে উৎকীর্ণ লিপিটির আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য বাংলার প্রাপ্ত লিপির মধ্যে ভিন্নধর্মী। প্রস্তর লিপির মাঝে একটি কুলঙ্গী আকৃতির নকশা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ) ফারসি ভাষায় উৎকীর্ণ একটি প্রস্তর লিপি সংরক্ষিত আছে। সিলেট হতে

সংগৃহীত শিলালিপিতে ১০৮৫ হিজরি অর্থাৎ ১৬৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে একটি সেতু নির্মাণের তথ্য সংযোজিত আছে। সম্রাটের জনহিতকর কাজের স্বাক্ষর বহন করে এই সেতু নির্মাণ সম্পর্কিত শিলালিপিটি।[৩৩] প্রস্তর লিপিটির আলঙ্কারিক বিন্যাস অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত (চিত্রঃ ২০)। রেখার সাহায্যে বাইশটি ত্রিখাঁজ খিলানের নকশাতে শিলালিপিটি বিভক্ত। খিলান নকশাসমূহ একটি অপরটির সাথে যুক্ত। শিলালিপির ডান ও বামদিকে দুটি করে পুষ্প নকশা পরিলক্ষিত হয়। দু'টি খিলানের মধ্যে এবং একটি খিলানের উপরের দুই দিকে একটি করে গোলাপ সদৃশ পুষ্প শিলালিপির নান্দনিকতা বৃদ্ধি করেছে। দু'টি গোলাপের মধ্যবর্তী অংশে খিলান শীর্ষে পুষ্প কুঁড়ির ন্যায় নকশা লক্ষণীয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে সংরক্ষিত সম্রাট শাহজাহানের আমলের (১৬২৮-১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) একটি কামানের লিপিতে এরূপ খিলান নকশা ও খিলানের শীর্ষে পুষ্প কুঁড়ি বিদ্যমান।[৩৪] চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে হাজি মসজিদে একটি অলংকৃত শিলালিপি প্রত্যক্ষ করা যায়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে নির্মিত মসজিদটি বর্তমানে টিকে নেই। একটি আধুনিক মসজিদের মিহরাবের ডান দিকে শিলালিপিটি স্থাপিত। ফারসি ভাষায় দুই লাইনে উৎকীর্ণ লিপির সৌন্দর্য বর্ধন করে আছে চতুর্দিকের আলঙ্কারিক নকশা। লতা-পাতা, ফুল, ফল ও কুঁড়ির নকশা প্রস্তর খোদাইয়ে পরিলক্ষিত হয়। মোগল আমলে এরূপ আরও কিছু সংখ্যক শিলালিপির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের প্রস্তর লিপির খোদাইয়ে ফুটিয়ে তোলা অলংকরণ শৈলী বিশ্লেষণে কয়েকটি দিক গবেষণাতে স্পষ্ট রূপে খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন-

**এক:**

মধ্যযুগে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে ব্যবহৃত প্রস্তরের যোগান দিয়েছিল প্রাক ইসলামি যুগে বাংলার নির্মিত ভগ্ন ইমারত বিশেষকরে পড়ো মন্দির। জাফর খান গাজীর সমাধি ও মসজিদ, আদিনা মসজিদ, মাহীসন্তোষ মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, মান্দ্রা মসজিদ শিলালিপি (চিত্রঃ ২), শীতল মঠ (জয়পুরহাট) শিলালিপি, করোটিয়া মসজিদ (টাঙ্গাইল) শিলালিপি, চাটমোহর মসজিদ (পাবনা) শিলালিপি, গায়েবি দিঘি মসজিদ (সিলেট) শিলালিপি প্রভৃতি এর প্রমাণ বহন করে। দেবদেবী উৎকীর্ণ প্রস্তর মুসলিমগণ তাদের ইমারতে ব্যবহার করলেও এর কোনো প্রভাব প্রস্তর লিপির খোদাই শিল্পে দেখা যায় না। সংগৃহীত প্রস্তরের বিপরীত দিক ব্যবহারে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে।

**দুই:**

মধ্যযুগে বাংলায় নির্মিত ধর্মীয় ইমারতে বিশেষকরে মসজিদ ও সমাধিতে প্রস্তর খোদাই শিল্পের উপস্থিতি দেখা যায়। প্রস্তর লিপির দিক বিবেচনা করে বলা যায়, মধ্যযুগের বাংলায় নির্মিত অধিকাংশ মসজিদে প্রস্তর অলংকরণ ব্যবহৃত হয়েছে। সুলতানি আমলে ইস্টক নির্মিত মসজিদে প্রস্তর লিপি এবং প্রস্তর স্তম্ভের ব্যবহার দেখা যায়। সুলতানি ও মোগল আমলে নির্মিত কয়েকটি সমাধি সৌধে প্রস্তর অলংকরণ ও প্রস্তর লিপি পরিলক্ষিত হয়। তবে মূল বেদি প্রস্তরে নির্মিত বেশকিছু উন্মুক্ত সমাধির সন্ধান বাংলাতে পাওয়া যায়।

**তিন:**

প্রস্তর লিপিকে খোদাই শিল্পের পর্যায়ে উন্নীতকরণে বাংলার মুসলমানগণ সফল হয়েছে। প্রস্তর খোদাইয়ে লিপিকলাকে অলংকরণ মোটিফ হিসাবে মুসলিমগণ বাংলার ইমারতে ব্যবহার করেছে। লিপিকলা প্রস্তর খোদাইয়ে খান জাহানের সমাধি সৌধ ও মুহাম্মদ তাহিরের সমাধিসৌধে শিল্পে রূপ দেওয়া হয়েছে (চিত্র: ৬)।

**চার:**

স্বতন্ত্র লিখন রীতি তোঘরা বাংলার নিজস্ব উদ্ভাবন। তোঘরা লিপি উৎকীর্ণকরণে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি এবং উৎকীর্ণ লিপির সাথে মিল করে অক্ষর বিন্যাসিত হয়েছে। যেমন আরশনগর, ডুমুরিয়া, খুলনা হতে সংগৃহীত শিলালিপিতে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে জল স্থলের মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে এবং অক্ষর বিন্যাসে সুসজ্জিত রণতরীর সদৃশ নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লিপিকলায় বাংলার মুসলমানদের উদ্ভাবিত তোঘরা লিপির সাথে মুসলিম বিশ্বের লিপিকলার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। মোগলদের আগমনে এ লিপিকলা চর্চা হ্রাস পেয়েছিল এবং নাখস, নাসতালিক এবং শিকাস্তা তোঘরার স্থান দখল করেছিল।

**পাঁচ:**

প্রস্তর খোদাইয়ে লিপিমালাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য প্রদান করা হয়েছে। লিপিমালার শৈলী ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার মোটিফের ব্যবহার দেখা যায়। পুষ্প মোটিফের নান্দনিক বিন্যাস শিলালিপিতে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। পুষ্প শৈলীর অলংকরণে গোলাপ ফুলের প্রাধান্য এবং পাঁপড়ি বিন্যাসে আট ও পাঁচ পাঁপড়ির ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। স্বর্গীয় পুষ্প এবং বেহেশতের আটটি স্তর ও ইসলামের মূল পাঁচটি ভিত্তির দিকে শিল্পীর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এ রীতির শৈলীর অলংকরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। চন্দ্র, তারা, দেশজ লতা-পাতা, গুল্ম, খিলান সদৃশ নকশাও শিলালিপিতে পরিলক্ষিত হয়।

**ছয়:**

মধ্যযুগে বাংলাতে নির্মিত ইমারতের একটি বৃহৎ অংশ আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও প্রস্তর লিপি নির্মাণকাল, নির্মাতার নাম ও উপাধি, শাসকের নাম ও উপাধি, সুফি-সাধকগণের নাম, আল কুরআন ও আল হাদীসের শিক্ষামূলক ও গুরুত্বপুর্ণ বাণী, প্রশাসনিক ইউনিট[৩৫] এবং নগর বিন্যাসের তথ্য প্রদান করে যা বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে বিবেচিত।

**সাত:**

প্রস্তর লিপিতে বর্ডারে নকশি কাঁথায় ব্যবহৃত হাসিয়ার ন্যায় শৈলী ফুটিয়ে তোলার প্রবণতা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। প্রস্তর লিপির খোদাই শিল্পে দেশজ শৈলীর অলংকরণ প্রধান্য পেয়েছিল বলেও ধারণা করা যায়।

**আট:**

শিলালিপি হতে মধ্যযুগের বাংলার ইমারতের প্রকরণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা যায়। মসজিদ, খানকাহ, দরগাহ, ঈদগাহ, সমাধি, কদমরসুল ধর্মীয় ইমারতের পরিচয় বহন করে। মাদ্রাসা, দুর্গ, প্রাসাদ, সেতু, দিঘি, বিজয় তোরণ প্রভৃতি লৌকিক ইমারতের পরিচয়ও পাওয়া যায় শিলালিপি হতে। ইমারতসমূহে উৎকীর্ণ শিলালিপিগুলো ইসলাম ধর্ম প্রচার ও সমাজ গঠনেও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

**নয়:**

মধ্যযুগে প্রাপ্ত শিলালিপি পাঠ হতে ভাষা সম্পর্কে জানা যায়। শিলালিপিসমূহের মধ্যে সুলতানি আমলে আরবি ও ফারসি ভাষায় ব্যবহার দেখা যায়। মোগল আমলে ফারসি ভাষার ব্যবহার বেশি পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগে বাংলাতে আরবি-ফারসি ভাষার সংমিশ্রিত প্রয়োগও কিছু শিলালিপিতে লক্ষ করা যায়। সংস্কৃত ভাষা ও বাংলা হরফের ব্যবহারও বাংলায় মধ্যযুগের একটি শিলালিপিতে ব্যবহৃত হয়েছে।[৩৬]

আমাদের বর্তমান আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, মধ্যযুগে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে প্রস্তর খোদাই শিল্পে লিপিকলার অলংকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বিমূর্ত অলংকরণ মোটিফ হিসাবে প্রস্তর খোদাইয়ে লিপি শৈলীর উপস্থাপনা একটি নব সংযোজন হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। বাংলায় লিপিকলার নান্দনিক চর্চার ফসল হিসাবে তোঘরা লিপি আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রস্তর লিপি আকারে ছোট হলেও ঐতিহাসিক তথ্য প্রদানের পাশাপাশি অলংকরণ মোটিফ হিসাবে স্থাপত্যের সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। প্রস্তর লিপির আলঙ্কারিক ও শিল্প মাধুর্য বর্ধনে পুষ্প, লতা-পাতা, ফলমূলের সংযোজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রস্তর লিপিতে স্থানীয় অনুরাগের প্রকাশ শিল্পীর উন্নত মননশীলতারও পরিচয় বহন করে। অলংকরণ মোটিফ হিসাবে প্রস্তর লিপির উপস্থিতি বিবেচনা করে বলা যায় স্বল্প পরিসরে হলেও মধ্যযুগে বাংলার অধিকাংশ মুসলিম স্থাপত্য প্রস্তর খোদিত ছিল। মূলত প্রস্তর খোদাইয়ে লিপি শৈলী একটি আকর্ষণীয় অলংকরণ মোটিফ হিসাবে বাংলার তথা বিশ্বের মুসলিম শিল্পকলাকে সুষমামণ্ডিত ও সমৃদ্ধ করেছে বলে ধারণা করা যায়।

## আলোকচিত্র:

চিত্র ১: মাহীসন্তোষ মসজিদে ব্যবহৃত প্রস্তরের বিপরীত পার্শ্ব।

চিত্র ২: মান্দ্রা মসজিদ শিলালিপির বিপরীত পার্শ্ব, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

চিত্র ১০: কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের অনুভূমিক ফ্রেমের পুষ্প নকশা, ছোট সোনা মসজিদ।

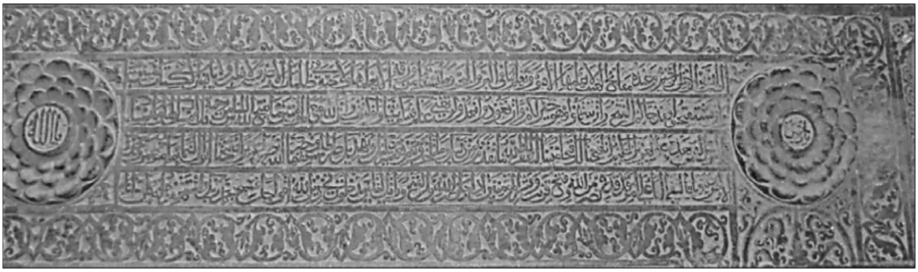

চিত্র ১১: শাহ নিয়ামত উল্লাহর সমাধি অঙ্গনের প্রস্তর ফলকে লতা-পাতা ও কুঁড়ির জ্যামিতিক নকশা।

চিত্র ১৩: পাকুরিয়া, কানসাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শিলালিপি, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর (সংগ্রহ নং VRM, A-৯২৬৪)।

চিত্র ১৭: নবগ্রাম শিলালিপি, সিরাজগঞ্জ, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর (সংগ্রহ নং VRM, A-৩৬১৫)।

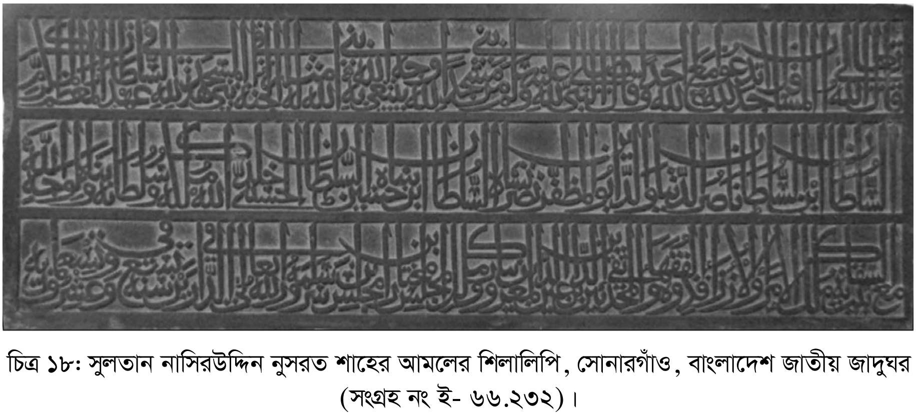

চিত্র ১৮: সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহের আমলের শিলালিপি, সোনারগাঁও, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (সংগ্রহ নং ই- ৬৬.২৩২)।

চিত্র ১৯: সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলের শিলালিপি, উলিপুর, কুড়িগ্রাম, বরেন্দ্র গবেষণ জাদুঘর (সংগ্রহ নং VRM, A-২৯১৩)।

## তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত মাহীসন্তোষ মসজিদের মিহরাবের উল্টা দিকের অলঙ্করণে দেবদেবী উৎকীর্ণ আছে। মুসলমানগণ এখানে প্রস্তরের বিপরীত দিক ব্যবহার করে অলঙ্করণ করেছে যা অত্যন্ত নান্দনিক এবং মূর্তি অলঙ্কৃত পিঠ দেয়ালের অংশে পরিণত করা হয়েছে। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত সম্রাট জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ আকবরের একটি আরবি-ফারসি শিলালিপিতে মসজিদ নির্মাণের তথ্য জানা যায়। শিলালিপিটি পাবনার চাটমোহর থেকে সংগ্রহ করা হয়। এখানে মসজিদ নির্মাণের তারিখ উল্লেখ আছে ৯৮৯ হিজরি অর্থাৎ ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দ। শিলালিপিটির উল্টা পিঠে মূর্তির উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত জালাল উদ্দিন মুহম্মদ শাহের একটি শিলালিপির বিপরীত পিঠে মূর্তির দৃশ্য চোখে পড়ে।

২. এবনে গোলাম সামাদ, *ইসলামী শিল্পকলা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯), পৃ. ১২-১৩।

৩. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা* (রাজশাহী: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ১৯৯৬), পৃ. ২৫৯; এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *বরেন্দ্র অঞ্চলে মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০২), পৃ. ৩৫।

৪. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি* (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউজ, ২০১৮), পৃ. ৬৩; Khan Shahib Maulavi Zafar Hasan, *Specimens of Calligraphy in the Delhi Museum of Archaeology* (Calcutta: Gov. of India, Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 29, 1926); M. Ziauddin, *A Monograph on Moslem Calligraphy* (Calcutta: Visva-Bharati Bookshop, No. 6, 1936), p. 16; Yasin Hamid Safadi, *Islamic Calligraphy* (London: Thames & Hudson , 1987), p. 7.

৫. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মসজিদের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ১৭৬।

৬. আরবী লিখনের প্রাথমিক লিখন রীতি হিসেবে কুফি বা কুফিক এর উদ্ভব হয় এবং তা প্রায় সর্বক্ষেত্রে প্রধান্য বিস্তার লাভ করে। ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে ওহী লিখে রাখার ক্ষেত্রে কুফিক পদ্ধতির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সে সময়ে লিখনের জন্য পশুর মসৃণ চামড়া, প্রস্তর খণ্ড, কাঠ জাতীয় শক্ত বস্তু

উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এই শক্ত উপকরণসমূহে লিখতে গিয়ে অক্ষরগুলো কৌণিক আকৃতির রূপ লাভ করে। এই রীতিতে অক্ষরগুলো লম্ব ও উলম্ব দণ্ডাকৃতিতে বিন্যস্ত থাকে যা কোণের আকৃতি সৃষ্টি করে। আর এই কৌণিক আকৃতির লিখন রীতি লিপিকলার ইতিহাসে কুফি বা কুফিক নামে পরিচিত। কুফা শহরে এই পদ্ধতির উদ্ভব হয় বলে কুফি বা কুফিক নামে পরিচিতি লাভ করে। কুফিক পদ্ধতির বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরবর্তী সময়ে যে সকল লিখন রীতির উদ্ভব হয় নাখস রীতি তারমধ্যে অন্যতম। একটি জনপ্রিয় লিখন পদ্ধতি হিসেবে নাখস রীতি দ্রুত বিকশিত হয়। এই পদ্ধতিতে অক্ষরগুলোর লম্ব দণ্ড ও আনুভূমিক বাহু ঢালু করে উপস্থাপিত হতো, যা কিছুটা গোলায়িত রূপ লাভ করে। লিখন রীতির এই গোলায়িত পদ্ধতি নাখস নামে খ্যাত।

৭. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯), পৃ. ৩৩৭; এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা* (রাজশাহী: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ১৯৯৬), পৃ. ২৯৫।

৮. শিলালিপির পাঠ দেখুন Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur'an*: Text, Translation and Commentary* (Lahore: Kashmiri Bazar, 1934-1938, II. 255), p. 33; (আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরজীবিত ও নিত্য বিরাজমান। তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছ এমন যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ব্যতীত? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তিনি তা পরিজ্ঞাত আছেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাছাড়া তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোনো বিষয়ই কেউ ধারণা করতে পারে না। তাঁর আসন আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান।)

৯. শিলালিপির পাঠ দেখুন Abdul Karim, *Corpus of the Arabic and Persian Inscription of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh,1992), p. 106 (Henceforth this source may be referred to as CAPIB);A. H. Dani, Bibliography of the Muslim Inscription of Bengal, Appendix, *The Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, Vol. II (Pakistan: Dacca,1957), p. 14; Shamsud-din Ahmed, *Inscriptions of Bengal*, vol. IV (Rajshahi: Varendra Research Museum, 1960), PP. 45-46 (Henceforth this source may be referred to as IB).

১০. শিলালিপির পাঠ দেখুন A. K. M. Yakub Ali, "Two Unpublished Inscriptions ", *Journal of the Varendra Research Museum,* vol. 6 (University of Rajshahi: Varendra Research Museum, 1980-81), pp. 101-106.

১১. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০।

১২. A. K. M. Yakub Ali, *op.cit.*, pp. 101-106.

১৩. শিলালিপির পাঠ দেখুন Abdul Karim, *CAPIB*, p. 173-74; S. Ahmed, *IB*, P. 91.

১৪. শিলালিপির পাঠ দেখুন Abdul Karim, *CAPIB*, p. 181-82;S. Ahmed, *IB*, pp, 94-96.

১৫. শিলালিপিতে সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের রাজত্বকালে ১৫২৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ আছে। মুহাক্কাক (তোঘরা) লিখন রীতিতে শিলাফলকের অক্ষর বিন্যাস অত্যন্ত নান্দনিক।

১৬. A. K. M. Yaqub Ali, *Selected Arabic and Persian Epigraphs (*Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1988), p.11.

১৭. শিলালিপির পাঠ দেখুন A. K. M. Yaqub Ali, "An Arabic Inscription of Ala al-Din Husayan Shah", *Journal of the Varendra Research Museum,* vol. II (University of Rajshahi: Varendra Research Museum, 1973), pp. 67-70; Abdul Karim, *CAPIB*, pp. 281-82 .

১৮. বাস্তব পর্যবেক্ষণে অবস্থান নির্ণয়।

১৯. বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য; আ. কা. মো. যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ* (ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ৭২।

২০. আ. কা. মো. যাকারিয়া, *পূর্বোক্ত*, *শিলালিপির পাঠ দেখুন* A. K. M. Yakub Ali, *Aspects of Society and Culture of the Varendra* (Rajshahi : M. Sajjadur Rahim, 1998), Appendix A, p.373-74.

২১. Pares Islam Syed Mustafizur Rahman, *Islamic Calligraphy in Medieval India* (Dhaka: UPL, 1979), p. XI.

২২. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬; Pares Islam Syed Mustafizur Rahman, *Ibid*, pp. 50-51; এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪১-৪২।

২৩. শিলালিপির পাঠ দেখুন Abdul Karim, *CAPIB*, p. 173-74; S. Ahmed, *IB*, P. 91.

২৪. বাস্তব পর্যবেক্ষণে অবস্থান নির্ণয়।

২৫. বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য; আ. কা. মো. যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ* (ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ৭২।

২৬. আ. কা. মো. যাকারিয়া, *পূর্বোক্ত*, *শিলালিপির পাঠ দেখুন* A. K. M. Yakub Ali, *Aspects of Society and Culture of the Varendra* (Rajshahi : M. Sajjadur Rahim, 1998), Appendix A, p.373-74.

২৭. Pares Islam Syed Mustafizur Rahman, *Islamic Calligraphy in Medieval India* (Dhaka: UPL, 1979), p. XI.

২৮. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬; Pares Islam Syed Mustafizur Rahman, *Ibid*, pp. 50-51; এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪১-৪২।

২৯. শিলালিপির পাঠ দেখুন Abdul Karim, *CAPIB*, p. 181-82;S. Ahmed, *IB*, pp, 94-96.

৩০. শিলালিপিতে সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের রাজত্বকালে ১৫২৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ আছে। মুহাক্কাক (তোঘরা) লিখন রীতিতে শিলাফলকের অক্ষর বিন্যাস অত্যন্ত নান্দনিক।

৩১. A. K. M. Yaqub Ali, *Selected Arabic and Persian Epigraphs (*Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1988), p.11.

৩২. শিলালিপির পাঠ দেখুন A. K. M. Yaqub Ali, "An Arabic Inscription of Ala al-Din Husayan Shah", *Journal of the Varendra Research Museum,* vol. II (University of Rajshahi: Varendra Research Museum, 1973), pp. 67-70; Abdul Karim, *CAPIB*, pp. 281-82 .

৩৩. ওয়াকিল আহমদ, "শিলালিপি-সাহিত্য", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পঞ্চম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৭), পৃ. ১২।

৩৪. বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।

৩৫. মধ্যযুগে বাংলার শিলালিপি বিশ্লেষণ করে বেশ কয়েকটি ভৌগোলিক স্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়; যা হতে বাংলার নগর বিন্যাস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব। শিলালিপিতে আরজা সজিলা মংকাহবাদ, শহর অথবা থানা লাওবলা, খিত্তা সিমলাবাদ, আরশা-মহল অথবা শহর হাদিগড়, শহর মশহুর হুসাইনাবাদ, ইকলিম মুবারকাবাদ, ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদ, আরশা শ্রীহট্ট, মাহমুদাবাদ, থানা লাও, জামিন তিবুর, শহর মশহুর বারবকাবাদ, শহর মশহুর ফিরূযাবাদ, ভাতুরিয়া খাস প্রভৃতি প্রশাসনিক ইউনিটের নাম পাওয়া যায়। বিস্তারিত দেখুন, এ কে এম শাহনাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, পরিশিষ্ট-১ (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউজ, ২০১৮), পৃ. ২৫৯-২৭৪।

৩৬. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পঞ্চম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

---

জমা প্রদানের তারিখ : ১৪.০২.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ২২.০৫.২০২২

---

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-১, জানুয়ারি–জুন ২০২২

# বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: বাঙালি জাতির মুক্তির অনুপ্রেরণার স্বরূপ সন্ধান

মোঃ শাহ আলম*

**Abstract**

Achieving the ultimate goal of any nation requires the right direction at the right time. Such a direction was needed to inspire the Bengali nation towards the goal of independence when there was a turning point in the life of the Bengali nation. Just then a great man named Sheikh Mujibur Rahman came to inspire the Bengali nation. He delivered a significant speech at the historic 'Race Cource Ground' (Present Suhrawardy Udyan) on March 7, 1971 to transform the hopes, aspirations and dreams of the Bengali nation into reality. His speech made the unarmed Bengalis armed at night. This speech brought freedom to the Bengali nation which led to the creation of an independent state called Bangladesh on the map of the world. The importance of this speech in world history is immense. This article attempts to discuss how this inspired the Bengali nation to achieve freedom as well as the utlimate goal. The article also discusses how this speech has been ranked as one of the best speeches in the history of the world.

## ভূমিকা

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালি জাতীর জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে ঢাকার রেসকোর্স ময়দান (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এ প্রায় ১০ (দশ) লক্ষ মানুষের সামনে যে ভাষণ প্রদান করেন তা শুধু বাঙালি জাতির জন্যই নয় বরং সমগ্র বিশ্বের শোষণ-নির্যাতিত জাতির জন্যও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ। তিনি লাখো মানুষের উপস্থিতিতে তাৎক্ষণিক শব্দচয়নের মাধ্যমে একটি মহাকাব্যিক ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর এই ভাষণে উঠে এসেছে শাসকদের শোষণের কথা, নির্যাতিত সাধারণ মানুষের কথা, রাজনৈতিক ইতিহাস, নানা বৈষম্য ও অসংগতির কথা এবং তার সাথে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। এই ভাষণের পর সমগ্র বাংলাদেশের জনগণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। সেই সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযুদ্ধের মাঝে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে এই ভাষণটি। ৭ই মার্চের ভাষণটির বিষয়বস্তু, শব্দচয়ন, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, ভবিষ্যৎ দিঙ্‌নির্দেশনাসহ নানা কারণে বিশ্ব ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী ৪১টি ভাষণের মধ্যে এটি স্থান পায় ২০১৩ সালে ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ Jacob F. Field এর "We shall Fight on the Beaches: The Speeches that Inspired History" শিরোনামের গ্রন্থটিতে।[১] এছাড়াও এই ভাষণটিকে "বিশ্ব-ঐতিহ্য দলিল" হিসেবে UNESCO কর্তৃক ৩০শে অক্টোবর ২০১৭ সালে স্বীকৃতি দিয়ে তা সংস্থাটির "International Memory of the world Register"-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই প্রবন্ধে ৭ই মার্চের ভাষণের পটভূমি, প্রতিক্রিয়া, ভাষাগত মাধুর্য, কীভাবে ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির মুক্তির অনুপ্রেরণা দিয়েছে, বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক, সামাজিক ও কৌশলগত দিক, কেন এটি বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ– প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

---

*প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পুটিবিলা ইসলামিয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদরাসা, মহেশখালী, বাংলাদেশ

## ২. গবেষণা-পদ্ধতি

যেকোনো বিষয়ের গবেষণা-পদ্ধতি হলো গবেষণার মৌলিক বিষয়। গবেষণাপত্র রচনার পদ্ধতি এর মৌলিকতা অনুধাবনকে সহজসাধ্য করে তোলে এবং সেজন্য এই বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া আবশ্যক। আলোচ্য গবেষণাটি মূলত একটি পর্যালোচনা মূলক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের গবেষণায় বিশ্লেষণ ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণার মৌলিক উৎস জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ১৯ মিনিটের ভাষণ। এ ছাড়াও এ বিষয়ে অন্যান্য গবেষকদের গবেষণা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

## ৩. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে বাঙালিরা শাসকদের মাধ্যমে কীভাবে শোষিত, নির্যাতিত ও বৈষ্যম্যের শিকার হয়েছে, ন্যায্য দাবি না মেনে সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন করা হয়েছে এবং কিভাবে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করা থেকে শুরু করে আন্দোলন সংগ্রাম চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন তা তুলে ধরা এই গবেষাণার উদ্দেশ্য। একই সাথে স্বাধীনতা অর্জনসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এই ভাষণের প্রভাব ও গুরুত্ব প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও সঠিক তথ্য উপস্থাপন করাই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাছাড়া বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার মাধ্যমে তাদেরকে দেশপ্রেমে উৎসাহী করাও আলোচ্য প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

## ৪. গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী, তাঁর রাজনৈতিক জীবন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, তাঁর প্রদত্ত ভাষণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়েও কিছু প্রবন্ধ রচনা হয়েছে। যদিও এসব প্রবন্ধে প্রবন্ধকারগণ তাঁদের মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন কিন্তু তাঁর এই ভাষণের মধ্যে তাঁর দুটি মৌলিক উদ্দেশ্য (একটি স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং অন্যটি জাতীয় পরিষদে যোগ দেয়ার ৪টি পূর্বশর্ত) থেকে কিভাবে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তা সম্পর্কে তেমন কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। একই সাথে বর্তমানে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এর প্রভাব সম্পর্কে তেমন কোন গবেষণা হয়নি। তাই এই বিষয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা অপরিহার্য। ৭ই মার্চের ভাষণের যে শব্দচয়ন হয়েছে এবং আপামর জনতার সামনে সাবলীল ভাষায় তাঁর মনের ভাবনা-চিন্তা এবং স্বাধীনতার মাধ্যমে মুক্তির যে মূল লক্ষ্য তা এই প্রবন্ধে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এই প্রবন্ধে বিভিন্ন গবেষণায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণটি গুরুত্ব পাওয়ার কারণসহ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার সূত্রে এই প্রবন্ধের গুরুত্ব অপরিসীম।

## ৫. প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানরক নিয়ে অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর প্রদত্ত ভাষণ নিয়েও অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়। এদের মধ্যে শামসুজ্জামান খান (২০১৮) সম্পাদিত "বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ"; হারুন-অর-রশিদ-এর (২০১৮) "৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব সাহিত্য সম্পদ: বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ"; মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (২০১৪)-এর "ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ: কিছু স্মৃতি" এছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

এবং সেমিনারে পাঠিত প্রবন্ধসমূহে ৭ই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এই সকল প্রবন্ধ ও গ্রন্থ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এবং গুরুত্বপূর্ণ দুটি উদ্দেশ্য, শব্দচয়ন এবং আন্তর্জাতিকভাবে কেন এটি শ্রেষ্ঠ প্রভৃতি বিষয় স্বাধীনতার পথকে প্রশস্ত করা নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা করা হয়নি। তাই এই প্রবন্ধে উক্ত বিষয়গুলো নিয়ে প্রবন্ধকার আলোচনার প্রয়াসী হয়েছেন।

### ৬. বঙ্গবন্ধু পরিচয়

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ রোজ মঙ্গলবার।[২] তাঁর পিতা শেখ লুৎফুর রহমান, মাতা-সায়েরা খাতুন। তিনি ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগতি ইউনিয়নের টুঙ্গীপাড়া গ্রামের শেখ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ৬ ভাই-বোনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন তৃতীয়। দাদা-শেখ আব্দুল হামিদ, নানা–শেখ আব্দুল মজিদ, স্ত্রী–শেখ ফজিলাতুন নেছা (রেনু), তাঁর ৩ ছেলে এবং ২ মেয়ে। তাকে মা-বাবা 'খোকা' নামে এবং গ্রামবাসী 'মিয়া ভাই' নামে ডাকতেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে চক্রান্তকারীদের প্রত্যক্ষ মদদে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক অফিসারের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।

বঙ্গবন্ধু পড়া-লেখা জীবন শুরু হয় ১৯২৭ সালে এম ই স্কুলে[৩] (বর্তমান নাম আব্দুর রশিদ এম. ই. স্কুল)। এই স্কুলে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন পরে তিনি ৪র্থ শ্রেণিতে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। ৭ম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন। পরে ১৯৩৬ সালে মাদারীপুর ইসলামিয়া হাইস্কুলে ভর্তি হন; সেখানে তিনি চোখের গ্লুকোমা রোগে আক্রান্ত হন। ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রাস (এস.এস.সি) পাশ করে এবং কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯৪৪ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। ১৯৪৭ সালে ইসলামিয়া কলেজ থেকে ইসলামের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে বিএ পাশ করেন। ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে অল্পবয়সে। ১৯৩৮ সালে ১৬ জানুয়ারিতে বাংলার প্রধানমন্ত্রী শের-ই-বাংলা এবং বাণিজ্য, পল্লিউন্নয়ন ও শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জে আসেন।[৪] সেখানেই সোহরাওয়ার্দীর সাথে পরিচয় ঘটে এবং সখ্য গড়ে উঠে। ১৯৩৯ সালে মুসলিম ছাত্রলীগে যোগদান করেন এবং গোপালগঞ্জ শাখার সম্পাদক হন। ১৯৪০ সাল নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। ১৯৪৩ সালে কট্টরপন্থী সংগঠন ছেড়ে উদারপন্থী ও প্রগতিশীল সংগঠন বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগদান করেন ১৯৪৫ সালে ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালে ৪ জানুয়ারিতে ফজলুল হক মুসলিম হলের অ্যাসেম্বলি কক্ষে 'পূর্ব পাকিস্থান মুসলিম ছাত্রলীগ' প্রতিষ্ঠা করেন।[৫] ১৯৪৯ সালে ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে তিনি যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৬] তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় বাংলা ভাষার দাবিতে ১৩ দিন অনশন করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রনট নির্বাচনে জয়ী হয়ে কৃষি, ঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী হন। ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের 'শিল্প বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড' মন্ত্রী হন। ১৯৬৬ সালে

বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণা, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়, পরবর্তী কালে ৭ই মার্চের ভাষণ ও ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে এই দেশকে স্বাধীন করেন।

## ৭. ৭ই মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপট

ইতিহাসের উজান বেয়ে এক রাজনৈতিক কর্মীর উত্তরণ ঘটে। এই বাঁকবদলের কালে নেতার পরীক্ষা নেয় ইতিহাস– সাহসে, ত্যাগে, প্রেমে ও প্রজ্ঞায়, পারবেন কি নেতা সময়োচিত কাজটি করতে? ৭ই মার্চে তেমন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। যে সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের ভাষণ প্রদান করেণ তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, বাঙালি-বিদ্বেষী রাষ্ট্রনীতি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শিখণ্ডী রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পূর্ববাংলার মানুষকে পাকিস্তান সরকারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন দিয়ে শুরু হয় বাঙালির পাকিস্তান ও পাকিস্তানবাদী রাজনীতি-সংস্কৃতিকে প্রত্যাখানের আনুষ্ঠানিকতা। লাহোর প্রস্তাব দিয়ে অনানুষ্ঠানিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয় পূর্ব বাংলার মানুষ। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হলে তাদের কথা-বার্তা, সরকারি অফিস-আদালত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বাঙালি বিদ্বেষ শুরু হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং পাকিস্তানের বিরোধিতায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীসভা ভেঙে যায় ৫৬ দিনের মাথায়। শেখ মুজিবুর রহমান তরুণ হিসেবে ইতিহাসের এই চড়াই-উতরাই কেবল পাড়ি দেননি, ক্রমশ এতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে সংগ্রামের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন, রূপ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিদের একত্রিত করেছেন।[৭]

বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ঘোষণার পূর্বেই বাঙালি জাতির স্বাধীনতার বীজটি রোপন করেছিলেন আমাদের রাজনীতিতে। এরপর ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ঘোষণা এবং ৬ দফার পক্ষে প্রচারণা এটিকে আরোও জোরালো করে তোলে। যার ফলে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ছাত্র-শিক্ষক, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে অংশগ্রহণ করেন। আর তা দেখে পাক-সরকারের চূড়ান্ত প্রতারণা, নিপীড়ন এবং দুরভিসন্ধি আমাদের অন্যান্য অনেক নেতাদের সাময়িকভাবে দমাতে পারলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ক্ষণকালের জন্যও দমিয়ে রাখতে পারেনি। ৬ দফার পর এটি আরোও জোরালো হয় পূর্ব বাংলার মানুষের মনে। ১৯৬৮ সালের আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ সালের গণভ্যুত্থান এবং সর্বশেষ ১৯৭০-এর নির্বাচনের প্রতারণা ও ছলচাতুরী কোন কিছুই শেখ মুজিবকে পিছু হটাতে পারেনি। স্বাধীনতা এমন একটি মন্ত্র যার কাছে রাজনীতির অন্য সব প্রত্যয় ও প্রপঞ্চ ম্লান হয়ে যায়। তাঁর সাহস, ত্যাগ ও আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে মানুষের কোন সন্দেহ ছিল না; তাঁর দায়িত্ব পালনের ক্ষমতায় মানুষ আস্থা পেয়েছিল; মানুষ ও দেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা যে খাঁটি তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না; আর তিনি যে সঠিক লক্ষ্যেই এগুচ্ছেন এ বিষয়েও কারো মনে কোন সংশয় ছিল না।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতির সতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ছিল ১৫১টি আসন। সেই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের ৩৮.৩%[৮] মানুষের সমর্থন

নিয়ে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনে জয়লাভ করে। অন্য দিকে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি ১৯.৫%[৯] ভোট পেয়ে ৮১টি আসনে জয়ী হয়।

জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও ইয়াহিয়া ভুট্টোর ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেন। তিনি ১লা মার্চে ঘোষণায় বলেন- "The position briefly is that the major party West Pakistan, namely, the Pakistan people's party as well as retain other political parties, have declared their intention not to attend the National Assembly Session on the third of march , 1971. In addition, the general situation of tension created by India has further complicated the whole position. I have, therefore, decided to postpone the summoning of the National Assembly to a later date."[১০]

স্বাধীনতার চেতনায় উদ্দীপ্ত বাঙালি জাতির জন্য ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের শৃঙ্খল ছিন্ন করে জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ত সংগ্রামের আহ্বান। ১৯৭০ এর নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সত্ত্বেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানি সামরিক জান্তারা বাঙালি জাতিকে নির্মূল করার ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। এর প্রতিবাদে একদিকে চলছিল বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারা বাংলায় সর্বাত্মক শান্তির্পূণ অসহযোগ আন্দোলন অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ ও হতাহতের ঘটনা।[১১] এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে ১৯ মিনিটের সংক্ষিপ্ত অথচ জগৎ বিখ্যাত ভাষণ দেন রেসকোর্স ময়দানে। যা আমাদের ইতিহাসে এবং বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লিখিত থাকবে স্বর্ণাক্ষরে।

## ৮. ৭ই মার্চের ভাষণের পূর্ব প্রস্তুতি ও ভাষণ

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যে কী হবে তা নিয়ে নানা পরামর্শ দিতে থাকেন বিভিন্ন মহল থেকে লিখিত এবং অলিখিতভাবে।[১২] আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরাও একটানা ৩৬ ঘণ্টা বৈঠকে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারায় তাঁরা বঙ্গবন্ধুর উপর দায়িত্ব তুলে দেন এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় যা বলা আবশ্যক তাই বলবেন।[১৩] এই পরিস্থিতিতে বেগম ফজিলাতুন নেছার বক্তব্যটি উল্লেখ্যযোগ্য: "...সমগ্র দেশের মানুষ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সবার ভাগ্য আজ তোমার ওপর নির্ভর করছে। ...অনেকে অনেক কথা বলতে বলেছে ...তুমি নিজে যেভাবে যা বলতে চাও নিজের থেকে বলবে। তুমি যা বলবে সেটিই ঠিক হবে।"[১৪] পরিবারের সাথে কথা বলার পর বঙ্গবন্ধু নির্দিষ্ট সময়ে রেসকোর্সের সভামঞ্চে এসে তিনি উপস্থিত হলেন। তাঁর পেছনে বাঙালির হাজার বছরের মুক্তির আন্দোলন, সংগ্রাম ও স্বপ্ন।[১৫] বাঙালির স্বপ্নপূরণ তথা স্বাধীনতা অর্জনে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানাতে তিনি মাত্র ১৯ মিনিটে মহামানবের মত অসাধারণ ভাষণটি প্রদান করেন। এই ভাষণ যেমনি সারগর্ভ, ওজস্বী ও যুক্তিযুক্ত তেমনি তির্যক, তীক্ষ্ণ ও দিঙ্‌নির্দেশনাপূর্ণ। অপূর্ব শব্দশৈলী, বাক্যবিন্যাস ও বাচনভঙ্গি একান্তই আপন ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তিনি শুরু করেছেন "ভাইয়েরা আমার" দিয়ে এবং শেষ করেছেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা" দিয়ে। এই ৭ই মার্চের ভাষণে মাত্র ১১০৫ শব্দ ছিল।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে পাকিস্তান আমলে ২৩ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস, আন্দোলন, সংগ্রাম ও বাঙালিদের অবস্থা ব্যাখ্যা করেন। বাঙালিদের দ্বন্দ্বের স্বরূপ তুলে ধরেন, অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার নির্দেশ দেন, শত্রুর মোকাবেলা করার কথা বলেন।[১৬] এভাবেই তিনি ভবিষ্যতের রূপরেখা অঙ্কন করেন এবং তা বাস্তবায়নের পথ দেখিয়ে যান এই বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে।

## ৯. ৭ই মাচের মার্চের ভাষণের সংক্ষিপ্তসার

মানুষকে জাগ্রত, উদ্দীপ্ত, তীব্র অধিকারসচেতন ও লড়াকু মানসিকতাসম্পন্ন করার জন্য বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে যে কৌশল অবলম্বন করেছেন তা বঙ্গবন্ধুকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছে। তিনি তাঁর ভাষণে পূর্ব বাংলার মানুষের বঞ্চনার ইতিহাস ও অধিকারহীনতার কথা স্মরণ তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা লাভের জন্য বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে কখনো আবেগ, কখনো যুক্তি কখনো প্রশ্ন বা ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু কথা বার বার পুনরাবৃত্তি করেছেন। নিচে ৭ই মার্চের ভাষণের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হলো:

তিনি শুরুতে "ভাইয়েরা আমার" সম্বোধনটি ব্যবহার করেছেন। তারপর এক এক করে তিনি মানুষের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার, জনগণের আকাঙ্ক্ষা আর পাকিস্তান সরকারের শোষণ-নির্যাতনের ইতিহাস, ইয়াহিয়া খানের ষড়যন্ত্রের কথা, ২৩ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসের বর্ণনা, বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে এদেশের মানুষকে হত্যা করার ইতিহাস ইত্যাদি তুলে ধরেন। তিনি গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করে উদারতা প্রদান করেন। দাবি আদায়ের জন্য তিনি প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে বলেন এবং প্রতিপক্ষকে শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ৭ কোটি মানুষের দাবি নিয়ে বলেন "আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবা না"। সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক ও অন্যান্য পেশার মানুষদের করণীয় সম্পর্কে দিঙ্নির্দেশনা প্রদান করেন। সুবিচার ও ন্যায়বিচারকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন– "এই বাংলায় হিন্দু-মুসলিম, বাঙালি, নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই"। মহান আল্লাহর উপর নির্ভরতা ব্যক্ত করে বলেন- "মনে রাখবা: রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব– এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ"। শত্রুর মোকাবিলা করার কৌশল এবং সবশেষে মুক্তি ও স্বাধীনতার কথা বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম– এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা"।

## ১০. মার্চের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র জীবনেই সুবক্তা হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্ব সম্পূরক ছিল অসাধারণ বাগ্মিতার পারদর্শিতা। তাঁর জন্মগত প্রতিভা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে ৭ই মার্চের বক্তৃতাকে রূপান্তরিত করেছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতায়। ৭ মার্চের ভাষণের দুটি ভাগ রয়েছে।

প্রথম ভাগে বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন এবং বর্তমান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সিদ্ধান্তটি ঘোষণা করেছেন। তিনি ইয়াহিয়ার রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স (RTC)-এ যোগ দেবেন না কারণ তিনি তাঁর ভাষণে বলেছেন "কিসের আরটিসি, কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব?"[১৭]

দ্বিতীয় ভাগে বঙ্গবন্ধু শাসকদের জন্য কিছু শর্ত দিয়েছেন এবং জাতির জন্য তাঁর সুচিন্তিত কিছু নির্দেশনা। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে ৪টি শর্ত ছিল সেগুলো হলো।

১. সামরিক আইন (মার্শাল 'ল) উইথড্র করতে হবে,

২. সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে,

৩. যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে এবং

৪. জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

এরপর তিনি বলেন "তারপর বিবেচনা করে দেখব, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারব না। আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমি এদেশের মানুষের অধিকার চাই।"[১৮]

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো দিঙ্‌নির্দেশনামূলক ও বৈপ্লবিক ভাষণ। দিঙ্‌নির্দেশনামূলক অংশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

১. আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।

২. রিকশা, গরুর গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ বলবে, শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গর্ভনমেন্ট দপ্তর ওয়াপদা কোনো কিছুই চলবে না।

৩. ২৮ তারিখের কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।

৪. এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে... তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল।

৫. ...জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।

৬. ...আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।

৭. যে সমস্ত লোক শহিদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ...যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন।

৮. সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এ দেশের মুক্তি না হচ্ছে ততদিন খাজনা, ট্যাঙ বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না।

৯. এই বাংলার হিন্দু-মুসলিম, বাঙালি-অবাঙালি যারা আছে, তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

১০. রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।

১১. দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে।

১২. টেলিফোন-টেলিগ্রাম আমাদের এ পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।

১৩. প্রত্যকে গ্রামে, প্রত্যক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ।

সর্বশেষে তিনি সেই তীব্র-তীক্ষ্ম বর্শাফলক ক্রমস্ফুটমান নাটকের ক্লাইমেক্স, এতক্ষণ ধরে তিনি যেসব নিদের্শনা দিয়েছেন তাঁর লক্ষ্যবিন্দু এবং সারমর্ম "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।" সকল কিছু পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন। বঙ্গবন্ধুর তার সবকিছু জানতেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন তাই এই সকল ভবিষৎ পরিকল্পনা ও দিঙ্‌নিদের্শনা প্রদান করেন। এই নির্দেশনাই দেশে উত্তরণের যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথ দিয়েই একটি স্বাধীন দেশ ও মানচিত্র অর্জিত হয়েছে।

## ১১. ৭ই মার্চের ভাষণের পূর্বে ও পরে পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন

১৯৭০ নির্বাচনের পর বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়ে পাকিস্তান সন্তুষ্ট না হয়ে তারা ষড়যন্ত্র শুরু করে। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১ মার্চ এক ভাষণে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য Constituent Assembly-এর অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে। এরই প্রতিবাদে ২ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এরপর থেকে বঙ্গবন্ধুর হয়ে ওঠেন কার্যত সরকার প্রধান। তাঁর নির্দেশে পূর্ব বাংলার সকল জনগণ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে থাকে। এই সময়ে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িটি পরিণত হয় ব্রিটেনের ১০নং ডাউনিং স্ট্রিট এর প্রধানমন্ত্রী বাসভবনের মত। দৈনিক Evening Standard পত্রিকায় প্রকাশিত খবর "Sheikh Mujibur Rahman now appears to be the real boss of East Pakistan with the complete support of the population… Rahman's home dhanmondi, already known as number 10 downing street in imitation of the British Prime Minister's residence has been besieged by bureaucrats, politicians, bankers, industrialists and people from all walks of life."[১৯] অসহযোগ আন্দোলনের সময় সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে নিরস্ত্র জনগণের উপর হামলা চালায় রাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনী। সকল স্তরের মানুষ রাস্তায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এমন পরিস্থিতিতে ৭ই মার্চে সম্মেলনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। তখন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় এই মর্মে খবর প্রকাশিত হয় যে বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন ৭ই মার্চ।[২০]

*The Daily Telegraph* পত্রিকার ঢাকা প্রতিনিধি David Loshak এর "E. Pakistan UDI (Unilateral Declaration of Independence) Expected" শিরোনামে পতিবেদনে বিশদ বিবরণে বলেন, "Sheikh Mujibur Rahman expected to declare independence tomorrow."[২১] Sunday Times পত্রিকার করাচি প্রতিনিধি Peter Hazel Hurst এর "East Pakistan leader could declare UDI" শিরোনামের প্রতিবেদনে দুই ধরনের সম্ভাবনার কথা বলেন: মুজিব একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন, নতুবা নিজেই Constituent Assembly এর অধিবেশন ডেকে উভয় অংশের প্রতিনিধিদের যোগদানের আহ্বান জানাবেন।[২২]

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা সম্ভাবনা দেখে ইয়াহিয়া ৬ মার্চ রাতে দেশবাসীর উদ্দেশ্য এক বেতার ভাষণে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত অধিবেশন ২৫শে মার্চ আহ্বান করেন।

পাশাপাশি দেশের অখণ্ডত্ব রক্ষায় প্রয়োজনে যেকোনো চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে সর্তক করে দেন। এই সকল নিউজ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে সেই সাথে বঙ্গবন্ধু সকল কিছুর বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে কাঙ্ক্ষিত কৌশলের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু এই ভাষণে নিজেকে একজন মহামানব ও বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন। এটি স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তিনি ভাষণে স্বাধীনতার কথা বলেছেন এমনভাবে যাতে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ না করতে পারে। তাঁর এই ভাষণ দেশ-বিদেশের অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশিত হয়। যেমন–

*The Daily Telegraph* পত্রিকার প্রতিনিধি David Loshak ঢাকা থেকে প্রেরিত “The end of the old Pakistan” শিরোনামে এক প্রতিবেদনে মন্তব্য করেন, “On sunday [March 7] sheikh Mujib came as near to declaring this [Independance] as he could without inviting immediate harsh reaction from army.”[২৩]

পাকিস্তানপন্থী The Morning News পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্পর্কে প্রতিবেতনের একটি অংশে বলা হয়েছে যে, “Sheikh Mujibur Rahman described the present struggle ‘as the struggle for emancipation (mukti) and sturggle for freedom (swadhinata)’. He referred to this point twice in his spreech.”[২৪] এই পত্রিকায় ‘মুক্তি’ শব্দের ইংরেজি ‘emancipation’ এর স্বাধীনতা শব্দের ইংরেজি “freedom” অনুবাদ করেছে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। তিনি সর্বদা চোখ-কান খোলা রেখে কথা বলেছেন। তাঁর সামনে নাইজেরিয়ার বিয়াফ্রা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন (১৯৫৭-১৯৭০) বৃহৎ শক্তির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় কাঠোর হাতে দমন করা হয়।[২৫] তাই তিনি কৌশল অবলম্বন করে মেজরিটি (বাঙালি) ও মাইনরিট (পশ্চিম পাকিস্তান) থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে মাইনরিটিই আক্রমনকারী এটাই প্রতিভাত বা দৃষ্ট হোক চেয়েছেন।[২৬]

আমেরিকার Newsweek ম্যাগাজিনে এই বিষয়ে মৎকার বর্ণনা দিয়েছেন: “A month ago, at a time when he was still publicly refrainging form proclaiming independence Mujib privately told Newsweeks Loren Jenkins that “There is no hope of salvaging the situation. The country as we know it is finished.” “But he waited for president Mohammad Yahya Khan to make the break. We are the majority so we cannot secede. They, the Westerners, are the minority and it is up to them to secede.”[২৭]

করাচি থেকে প্রকাশিত The Don প্রত্রিকাতে নবাব আকবর খান বুগতি-এর একটি সংবাদ সম্মেলনের প্রতিবেদন যা পত্রিকায় “Awami League to attend Naitonal Assembly Session if Four point demands accepted” শিরোনামে৮ মার্চ প্রকাশিত হয় । বুগতি বলেছেন, “যেখানে শেখ মুজিব সারাদেশ শাসন করতে পারেন, তিনি তা হলে অর্ধেক শাসন করে কেন সন্তুষ্ট হবেন? তিনি বললেন, শেখ মুজিবের চার দফার সবগুলোই গ্রহণ করা উচিত আর ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া নিয়ে যদি প্রশ্ন আসে তা যেকোনো সংবিধান এবং এমনকি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ভিত্তিতে তার সুরাহা করা সম্ভব হবে।[২৮]

এছাড়াও ১৯৭১ সালের ৮ মার্চ থেকে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও এর বিশ্লেষণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে যেমন– *দৈনিক পাকিস্তান*, *ইত্তেফাক*, *পাকিস্তান অবজার্ভার*, *দি পিপলস* প্রভৃতি পত্রিকাও একই ধরনের খবর ও রিপোর্ট প্রদান করে।

## ১২. ৭ই মার্চের ভাষণের প্রতিক্রিয়া

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণ সামরিক জান্তা তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল রেসকোর্স ময়দান থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সরাসরি সম্প্রচার বন্ধ করে দিয়ে। প্রতিবাদমুখর বেতার ও টেলিভিশনের কর্মচারী-কর্মকর্তারা সকল অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করে রাস্তায় নেমে এসেছিল।[২৯] বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণেও এই প্রতিবাদের কথাই বলেছেন।

### ১২.১ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণের পরপরই বাংলাদেশের ছোটবড় সকল রাজনৈতিক দলের নেতারা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার সংগ্রাম ও অসহযোগ কর্মসূচির প্রতি সমর্থন দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম নেতারা হলেন পিডিপি নেতা নুরুল আমিন, ন্যাপের পূর্বাঞ্চলীয় সভাপতি অধ্যাপক মোজ্জাফফর আহমদ, জাতীয় লীগের প্রধান আতাউর রহমান, বাংলা জাতীয় লীগের সভাপতি অলি আহাদ, কৃষক শ্রমিক পার্টির সহ-সভাপতি জয়নুল আবেদিন প্রমুখ। নুরুল আমিন ইয়াহিয়ার ১লা মার্চের ঘোষণাকে 'উস্কানিমূলক' বলেছেন এবং এই কারণে পূর্ব পাকিস্তানে স্বত:স্ফূর্তভাবে গণঅভ্যুত্থান ঘটে। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ৭ই মার্চের ঘোষণাকে সমর্থন দিয়ে বলেন, "আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান যে শর্তাবলি আরোপ করেছিলেন তা নিম্নতম ও ন্যায়সংগত।"[৩০] মাওলানা ভাসানী দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন 'স্বাধীনতার বিকল্প নেই'। তিনি ৯ মার্চ পল্টনে শেখ মুজিবের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন, "সাত কোটি বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না।" এছাড়াও মার্কসবাদী ও লেনিনবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ৯ই মার্চের একটি ঘোষণাপত্রে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কবল থেকে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করে "জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা" কায়েমের আহ্বান জানান।[৩১] পাকিস্তানের গণঐক্য আন্দোলনের নেতা বঙ্গবন্ধুর বিশেষ বন্ধু এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "পরিষদে যাওয়ার পূর্বে শেখ মুজিব অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে দাবি করেছেন এটি সময়োপযোগী ও যুক্তিসংগত।"[৩২] অন্যদিকে পাকিস্তানের পিপলস পার্টির প্রধান ভূট্টো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়েছিলেন ।

### ১২.২. ছাত্র সংগঠনের প্রতিক্রিয়া

৭ই মার্চের ভাষণের ছোট বড় সকল ছাত্র সংগঠন সমর্থন দিয়েছিলেন। ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার প্রতি সমর্থন দিয়ে তাঁরা বলেন, "বাংলা বর্তমান মুক্তি আন্দোলনকে 'স্বাধীনতা আন্দোলন' ঘোষণা করে স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক জনসভায় যে প্রত্যক্ষ কর্মসূচি দিয়েছেন আমরা এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বাংলার সংগ্রামী জনতার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি...।"[৩৩] এছাড়াও ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার আহ্বানকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং তারা বলেছেন, "সংকীর্ণ দলাদলি ভূলে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রতিটি দেশপ্রেমিক

ছাত্র-সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের জরুরি কর্তব্য...।" তখন থেকে এ দুটি ছাত্র সংগঠন সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যবস্থা করতে থাকে।

### ১২.৩. বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের প্রতিক্রিয়া

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর সকল স্তরের সরকারি-বেসরকারি পেশাজীবীদের সংগঠনসমূহ, কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যবৃন্দ, উচ্চ পর্যায়ের আমলা ও তাদের সংগঠন, শিক্ষক-শিল্পী, লেখকসহ বুদ্ধিজীবী মহল, নিম্ন ও উচ্চতর আদালতের বিচারকবৃন্দ শুধু বঙ্গবন্ধুর প্রতি নৈতিক সমর্থনই দেননি, তাঁরা দেশ পরিচালনায় আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন এবং সকল আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। প্রদেশের উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকী কর্তৃক নবনিযুক্ত গর্ভনর টিক্কা খানকে শপথ বাক্য পাঠ করাতে অস্বীকৃতি আন্তর্জাতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এর মাধ্যমে প্রমাণ মিলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সকল উৎস ছিল আওয়ামী লীগ পরিচালিত অঘোষিত সরকার। ১১ মার্চে অধ্যাপক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতির এক সভায় শিক্ষকবৃন্দ আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন। তৎকালীন উট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য এবং ইতিহাসবিদ ড. এ. আর. মল্লিক বলেন, আমি ৭ই মার্চের ভাষণ শোনার পরই ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রামে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেই।[৩৪] সুদক্ষ ব্যুরোক্র্যাট মুক্তিযোদ্ধা জনাব নুরুল কাদেরের মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের কারণ ছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঘোষণা: "...৭ই মার্চ শেখ মুজিব যে ঘোষণা দিয়েছেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তাতেই এই দিক-নির্দেশনা রয়েছে, আর বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনাও কাজ করেছে।"[৩৫]

### ১২.৪. সামরিক ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়া

তৎকালীন পাকিস্তানের ই. পি. আর ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে থাকা অধিকাংশ বাঙালি অফিসার ও সাধারণ সদস্যরা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও প্রস্তুতি গ্রহণের দিঙ্নির্দেশনা হিসেবেই গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিল। তারা দীর্ঘ ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর প্রধান তখনকার কর্ণেল (অব.) এম. এ. জি ওসমানী বলেন, "ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে এবং বাংলাদেশের মানুষের প্রতিরোধ সংগ্রামে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের বীর অফিসারে ও সৈনিকেরা (বাংলার বাঘেরা), সাবেক ইস্ট পাকিস্তান...রাইফেলসের সাহসী বীরেরা, দেশপ্রেমিক আনসার ও মুজাহিদেরা এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর বঙ্গবীরেরা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সংগ্রাম শুরু করে।... এ যুদ্ধ কোনো বিদ্রোহ ছিল না। এ যুদ্ধ জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই।"[৩৬] মেজর জিয়াউর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে বলেন, "৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হল। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে তা জানালাম না।"[৩৭] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঘোষণাকে স্বাধীনতার লড়ইয়ে নামার সবুজ সংকেত হিসেবে গ্রহণ করে মেজর জিয়া চট্টগ্রামে ২৫ শে মার্চের রাত্রে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহকর্মীদের সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। বীর মুক্তিযুদ্ধা ১নং সেক্টরের প্রধান মেজর রফিকুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্পর্কে বলেন, "সেদিন লাখো মানুষের কণ্ঠে সাগর গর্জনের ন্যায় ধ্বনিত হতে থাকলো 'জয় বাংলা'। ...শেখ মুজিবের এ ভাষণ বাঙালি জাতির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ

ভাষণ। গভীর আবেগে নির্ভুল যুক্তি এবং ভবিষ্যতের দিঙ্‌নির্দেশনাপূর্ণ এ ভাষণ অকুতোভয় শেখ মুজিব বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিল।

'...এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।"[৩৮] বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি সকল শ্রেণির মানুষ সাদরে গ্রহণ করে। তার কারণ বঙ্গবন্ধুর অনুসৃত এই ভাষণে যে ভবিষ্যৎ দিঙ্‌নির্দেশনা সংবলিত যে যুদ্ধ-কৌশল নিঃসন্দেহ সমর কৌশলীদেরও অবাক করার মত। রাজনৈতিক দিক থেকে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমতের সমর্থন এবং কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সহানুভূতি সফলতা লাভের পেছনে বঙ্গবন্ধুর এই কৌশলী অবস্থান খুবই সহায়ক হয়েছিল।

## ১৩. ৭ই মার্চের ভাষণের ভাষাগত সৌন্দর্য

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের বক্তৃতা ছিল পৃথিবীতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বক্তৃতা। তিনি সময়, প্রেক্ষাপট এবং শ্রোতার প্রকৃতি সামনে রেখে নির্ধারণ করেছেন ভাষণের বাচনভঙ্গি, কণ্ঠস্বরের আন্দোলিত ধ্বনি এবং উচ্চারিত কথামালা। ভাষার শক্তিতে, আবেগে স্ফুরণে এবং বক্তব্যের শানিত ক্ষুরধারে ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল অসাধারণ ও অদ্বিতীয়। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে বাংলার লৌকিক ভাষা এবং বাংলার লোকজীবনের মরমিয়া রসে সিক্ত ছিল। এই ভাষণে তিনি স্বকীয় সত্তা ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক চেতনার সাথে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশার ভাষা "ইনশাল্লাহ" পর্যন্ত অবলীলায় উচ্চারণ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞা, সমন্বয়বোধ, রুচি, উদারতা, অন্যকে শ্রদ্ধা ও স্নেহ করার অপার শক্তি এবং মানুষকে আপন করে নেওয়ার যে শক্তি তার প্রমাণ পাওয়া যায় ৭ মার্চের ভাষণে। বঙ্গবন্ধু ভাষণের শুরুতে সাবলীল ভাষায় "ভাইয়েরা আমার" দিয়ে শুরু করেন। ১০ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে তিনি সবাইকে ভাই বলে সম্বোধন করে মানুষের মনে জায়গা করে নেন। মাত্র ১৯ মিনিটের ভাষণে প্রথম বাক্যে বলেন সকলের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শব্দ 'আপনারা'। তারপর তিনি মানুষকে আরও আপন, অনানুষ্ঠানিক, বাঙালি চিরায়ত ভীষণ প্রিয় শব্দ 'তোমরা' বলে যার মধ্যে কোনো প্রভেদ, দূরত্ব বা আনুষ্ঠানিকতা থাকে না। থাকে শুধু আস্থা, বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং গভীর নৈকট্য। বঙ্গবন্ধু বললেন, "তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল: প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু– আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।[৩৯]

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে কোনো নাটকীতা বাকি রাখেননি, তিনি অবলিলায় 'আপনি' থেকে 'তুমি' শব্দ ব্যবহার করেছেন। দল-মত-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছেন। তাঁর এই দক্ষতা অর্জিত হয় বাংলার নানা প্রান্তে ঘুরে; দুঃখী মানুষের পাশে থেকে; কৃষক, শ্রমিক, মজুর, পেশাজীবী, ছাত্র, যুবক সকলকে কাছে রেখে; তাদের ব্যথা-বেদনা ও সুখের অংশীদার হয়ে। বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষকে একত্র করার জন্য এবং নিজ দক্ষতা অনুযায়ী তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দ্বায়িত্ব অভিভাবক হিসেবে নিজ কাঁধে নিয়ে "আমার" শব্দটির পুনঃপুন ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ: "আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে"; "আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে"; "আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আমার দেশের গরিব, দুঃখী, নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে"; "আমার গরিবের উপর"; "আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপরে গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে", প্রভৃতি।

বঙ্গবন্ধু ভাষণের মধ্যে কখনো কখনো শ্রোতাদের সঙ্গে প্রশ্ন করেছেন সত্যতা যাচাইয়ের জন্য। যেমন: "কী অন্যায় করেছিলাম?" "কী পেলাম আমরা?" "কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব?" এই সকল প্রশ্ন করে মানুষের বঞ্চনার কথা তুলে ধরেছেন।

বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে কিছু কৌশল অবলম্বন করেন যাতে করে মানুষ জাগ্রত, উদ্দীপ্ত এবং তীব্র অধিকার সচেতন ও লড়াকু মানসিকতাসম্পন্ন তৈরি হয়। তিনি সমগ্র ভাষণে মূল শব্দগুলো বারবার ব্যবহার করেছেন যাতে মানুষের মনে মূল কথাগুলো স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়। বঙ্গবন্ধু "মুক্তি" ও "মুক্ত" শব্দ দুটি বেশি গুরুত্বের সাথে বারবার ব্যবহার করেছেন তাঁর ভাষণে। তিনি তাঁর ভাষণে সাধারণ মানুষ দুস্থ ও দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায়। তাই তিনি বলেন, "আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়"; "এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।"; "যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে" এবং "এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।" বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণে "মুক্তির" কথা সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ তিনি সাধারণ মানুষ এবং নিজের মনের কথা প্রকাশ করেছেন এই "মুক্তি" শব্দটি দিয়ে। যেমন– "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"[৪০] বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলার স্বাধীনতা চাননি, বাঙালির মুক্তিও চেয়েছেন।[৪১]

বঙ্গবন্ধুর ভাষণে যুক্তি ও মানবিক আবেগের সমন্বয় ঘটেছে। তিনি বলেছেন "যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনও যদি সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।" রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের নিরাপত্তা রক্ষার কথা বলেছেন। ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে "জয় বাংলা" শ্লোগান জনপ্রিয় হয়। কারণ তিনি ভাষণ শেষ করেছেন জয় বাংলা বলে। পরবর্তী সময়ে সকল আন্দোলন-সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে মানুষের মাঝে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পায় 'জয় বাংলা' শ্লোগান। যা বর্তমানেও "জয় বাংলা" শ্লোগান বেশ জনপ্রিয়। "জয় বাংলা" শ্লোগানকে জাতীয় শ্লোগান হিসেবে নির্ধারণে হাইকোর্ট রায় দেয় ১০ মার্চ ২০২০ সালে।[৪২] "জয় বাংলা"কে বাংলাদেশের জাতীয় শ্লোগান ঘোষণা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মার্চ ২০২২ সালে।[৪৩]

### ১৪. বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও প্রথম রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, ইতিহাসে যার স্থান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে। তিনি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে স্বীকৃত। এই ভাষণটি স্বাধীনতার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ও আহ্বান সংবলিত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ। ২৫০০ বছর পূর্বের (৪৩১ খ্রিষ্টপূর্ব) গ্রিক নগররাষ্ট্র এথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিসের দেয়া Funeral oration[৪৪] আজও যেমন প্রাসঙ্গিক, কালোত্তীর্ণ এবং অনাগত সময়ের জন্য মূল্যবান, ঠিক তেমনি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চে ১০ লক্ষাধিক জনতার সামনে দাঁড়িয়ে দেয়া ভাষণ আজও ১৬ কোটি বাঙালি ও বিশ্ববাসীর জন্য প্রাসঙ্গিক, গুরুত্ববহ এবং দিঙ্‌-নির্দেশনাপূর্ণ। বিশ্ব ইতিহাসে প্রভাব বিস্তারকারী ৪১ জন সামরিক বেসামরিক জাতীয় বীরের বিখ্যাত ভাষণ নিয়ে ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ Ja cob F. Field Gi "We shall Fight on the Beaches: The Speeches that Inspired History" শিরোনামের গ্রন্থে "আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, জুনিয়াস সিজার, জর্জ ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট,

উইনস্টন চার্চিল, যোসেফ গ্যারিবোল্ডি, আব্রাহাম লিংকন, ভ্লাদিমির লেনিন, উইড্রো উইলসন, ফ্রাঙ্কালিন রুজভেল্ট, মাওসেতুং, হো চি মিন প্রমুখের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণও স্থান পেয়েছে।[৪৫]

যে সকল গুনাবলির কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষণের মর্যাদা লাভ করে সে সকল বিষয় নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

যেকোনো ভাষণের মূল্য লক্ষ্য উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে মানুষকে তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে আত্মত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত রাখা। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চে এই রকমই এক উদ্দীপনামূলক ভাষণ প্রদান করেছেন। বঙ্গবন্ধ তাঁর ভাষণে বলেন, "আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো।...আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। ...রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ।"[৪৬] বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের পর স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ৩০ লক্ষ লোক শহিদ হয়, কয়েক লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম হারান, যা বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা।

নেতৃত্বের সর্বোচ্চ দেশাত্মবোধ, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির ও লক্ষ্য অর্জনে স্পষ্ট দিঙ্‌নির্দেশনা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাষণের বৈশিষ্ট্য। বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণের মূল ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ-নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঙালির জাতীয় মুক্তি তথা স্বাধীনতা। তিনি বললেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির, সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"[৪৭] তিনি লক্ষ্য ঘোষণা করেই শান্ত ছিলেন না, তিনি স্বাধীনতার সে লক্ষ্য অর্জনে আসন্ন যুদ্ধের বিশেষ করে গেরিলা যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণে বাঙালিদের দিঙ্‌নির্দেশনাও দিয়েছেন। তিনি বললেন, "...ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। আমি যদি হুকুম দেবার না পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।"[৪৮]

শ্রেষ্ঠ ভাষণের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সময়ের পরিসীমায় সীমাবদ্ধ না থেকে তা হয় কালোত্তীর্ণ ও সকল সময়ের জন্য প্রেরণাদায়ী। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, "সাতকোটি মানুষ দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।"[৪৯]

কাব্যিকতা হচ্ছে ইতিহাসখ্যাত শ্রেষ্ঠ ভাষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যার শব্দশৈলী ও বাক্যবিন্যাসে তা হয়ে ওঠে গীতিময় ও শ্রবণে চতুর্দিকে অনুরণিত। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি ঠিক অনুরূপ, যে কারণে বঙ্গবন্ধুকে বলা হয় 'Poet of Politics'।[৫০] এ রকম আরো কয়েকজনের ভাষণেও লক্ষ করা যায়। যেমনঃ জুলিয়াস সিজার, অলিভার ক্রমওয়েল, আব্রাহাম লিংকন, মার্টিন লুথার কিং, চার্লস দ্য গল, উইনস্টন চার্চিল এদর ভাষণেও এই বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত।[৫১]

শ্রেষ্ট ভাষণে অন্যতম গুণ হচ্ছে বিদ্যমান পরিস্থিতি উত্থিত, সে কারণে তৎক্ষণিক, স্বত:স্ফুর্ত ও হৃদয়-উৎসারিত। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সম্পূর্ণটাই ছিল অলিখিত। ওয়াশিংটন ডিসি এর লিংকন মেমোরিয়াল চত্বরে মার্টিন লুথার কিং-এর ১৯৬৩ সালের কালজয়ী 'I have a dream' ভাষণটি প্রথমে লিখিত আকারে শুরু হলেও এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মর্মস্পর্শী শেষের অংশটি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।[৫২]

একটি ভাষণ এর আকার বা দীর্ঘ কিনা তার উপর নির্ভর করে ভাষণের শ্রেষ্ঠত্ব। আব্রাহাম লিংকনের Gettysburg address এর শব্দ সংখ্যা ২৭২টি, সময় ৩ মিনিটের কম। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের সময় ১৯ মিনিট, শব্দ ১১০৫টি। অন্যদিকে মার্টিন লুথার-কিং এর 'I have a dream address' এর সময় ১৭ মিনিট ও শব্দ ১৬৬৭টি।[৫৩]

৭ই মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধু এবং বাঙালি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ। এই ভাষণের মাধ্যমে তিনি ইতিহাসে মহামানব রূপে আবির্ভাব হয়েছেন। তাঁর এই অমর র না, বাঙালি মহাকাব্য। এ মহাকাব্য বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামের ধারা স্বাধীনতার লালিত স্বপ্ন থেকে উৎসারিত। একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই এ মহাকাব্য রচনা সম্ভব হয়েছিল। এ মহাকাব্যের জন্য বাঙালি জাতি পেয়েছে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ এবং একই সাথে তাঁর ভাষণটি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে চিরকাল থাকবে।

একজন রাজনীতিবিদের একটা বড় সম্পদ তাঁর 'ভাষণ'। মনোমুগ্ধকর ভাষণ দিয়ে জনগনকে সম্মোহিত, মন্ত্রমুগ্ধ এবং বশীভূত করাই একজন রাজনীতিবিদের অন্যতম সৌন্দর্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনে প্রত্যেকটি ভাষণই ছিল সম্মোহনী ও মন্ত্রমুগ্ধকর। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ এর ভাষণ। বঙ্গবন্ধু এই ভাষণের মাধ্যমে ৭ কোটি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন শুধুমাত্র তাঁর মন্ত্রমুগ্ধ এবং সম্মোহনী শব্দ চয়নের মধ্য দিয়ে। এই ভাষণটি ছিল বাঙ্গালি জাতির প্রেরণা, উদ্দীপনা এবং মুক্তির পথ নির্দেশিকা। তিনি তাঁর ভাষণে ১০ লক্ষ মানুষের সামনে এদেশের মানুষের মনের কথা এবং আশার কথা বলে মানুষকে উজ্জীবিত করেছিলেন। তাঁর এই ভাষণের সম্মোহনী ক্ষমতা পাল্টে দিয়েছে একটি দেশের মানচিত্র, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত। শুধু বাঙালি জাতির জন্যই নয়, বিশ্বমানবতার জন্যও অবিস্মরণীয়, অনুকরণীয় এক মহামূল্যবান দলিল এই ভাষণ। তাঁর এই ভাষণে উজ্জীবিত হয়ে বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন করে।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো (UNESCO) ৩০ শে অক্টোবর ২০১৭ সালে ৭ই মার্চের ভাষণকে 'বিশ্ব-ঐহিত্য সম্পদ' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সংস্থাটির 'International Memory of the World Register' এর অন্তর্ভুক্ত করেছে। এটি এর অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হলো জাতিসংঘের বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে (১০ই ডিসেম্বর ১৯৪৮) ঔপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, জাতি-নিপীড়ন ইত্যাদি থেকে পৃথিবীর সর্বত্র জাতি-জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি গৃহীত ও স্বীকৃত হয়।[৫৪] বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ পাকিস্তানি অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও জাতি-নিপীড়নের মধ্য থেকে মুক্তি ও নীতি আদর্শের সাথে জাতিসংঘের বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থার ঘোষণাপত্রের মিল থাকার কারণে এটি বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

## ১৫. গুরুত্ব ও তাৎপর্য

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরসীম। এই ভাষণটি বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০ (২) অনুসারে তফসিল ৫ এ অন্তর্ভূক্ত করা হয় সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন ২০১১ সালে। এই ভাষণটি ২০১৭ সালের ৩০ শে অক্টোবরে ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতির ফলে এখন আর তা শুধু বাঙালি জাতির জন্য

নয় বরং বিশ্ব মানবতার জন্য অবিস্মরণীয়, অনুকরণীয় মহামূল্যবান দলিল বা সম্পদ। বঙ্গবন্ধু এই ভাষণের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে মুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন, জাতিকে সু-সংগঠিত করেছেন, গণসচেতনার উন্মেষ সাধন, দুই অংশের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ, অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার পথনির্দেশনা একই সাথে সাম্প্রায়িকতা বজায় রাখার নির্দেশনাসহ শত্রু মোকাবেলার কৌশল প্রভৃতি প্রদান করেছেন। তাঁর ভাষণ গণতন্ত্র, উচ্চ মানবিকতা, ত্যাগ ও দেশপ্রেমের উজ্জ্বল আদর্শ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম, জাতিভেদ-বৈষম্য ও জাতি-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিশ্ব-মানবতার মুক্তির সংগ্রামে যুগে যুগে এ ভাষণ অনুপ্রেরণা যোগাবে। সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে নতুন প্রজন্ম, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, রাষ্ট্রনায়ক, সমরকুশলী সবার জন্য অনেক শিক্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ দিঙ্‌নির্দেশনা রয়েছে এই ভাষণে।

## উপসংহার

বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণটি ছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ। এই ভাষণটি ক্যালেন্ডারের একটি তারিখকে মহাকালের দেয়ালে 'সূর্য-চিহ্ন' একে দিয়ে অনন্ত কালের জন্য ভাস্বর করে রেখেছে। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটি ছিল একটি অগ্নিশলাকা যা প্রজ্জলিত করেছিল মুক্তিযুদ্ধের দাবানল– যার সামনে টিকতে পারেনি শক্তিশালী পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের এ দেশীয় সহযোগীরা। তাঁর এই ভাষণটি ৭ কোটি মানুষকে তৈরি করেছিল মুক্তির সংগ্রাম ও স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। এই কালজয়ী ভাষণে ২৩ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে বর্ণনা করেছেন, শোষণ-নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেছেন। পাকিস্তানের তৎকালীন ইয়াহিয়া সরকারকে শর্ত দিয়েছেন, দাবি আদায়ের রূপরেখা দিয়েছেন সাধারণ মানুষের কাছে। তাঁর এই পরিকল্পনার মাধ্যমে ৩০ লক্ষ্য শহীদের বিনিময়ে এবং লক্ষ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে এই দেশকে পাকিস্তানি শত্রুমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ একটি জাতি জনগোষ্ঠীর মুক্তির কালজয়ী সৃষ্টি, এক মহাকাব্য। বহুমাত্রিকতায় তা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ যে এক ও অবিচ্ছেদ্য, ইউনেস্কোর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে এটাই পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর এই ভাষণ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও শিল্পী রচনা করেছেন বিভিন্ন কবিতা, সাহিত্য ও গান– যা পৃথিবীর অন্যকোনো ভাষণকে ঘিরে রচিত হয়নি। তাই পরিশেষে বলতে পারি যে, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণ এবং শোষিত-নির্যাতিত জনগণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণামূলক ভাষণ, যা অনন্তকাল পর্যন্ত বিশ্বের মানবের বুকে আশার প্রতীক হয়ে টিকে থাকবে।

## তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. Jacob F. Field, "*We shall Fight on The Beaches: The Speeches That Inspired History*" (London: Micheal O' Mara Books Limited, 2013), pp. 201-205

২. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, জুন ২০১২), পৃ. ৮ ৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

৭. আবুল মোমেন, কালোত্তীর্ণ ভাষণটি বাঙালি জাতির অনন্ত প্রেরণা (প্রবন্ধ), শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১লা ফেব্রুয়ারী ২০১৮), পৃ. ৯৫

৮. 1970 General and Provisional Elections http://elections.com.pk/contents.php?i=7 #General Last accessed March 03, 2013

৯. *Op.cit*

১০. Yahya Khan, "Yahya puts off National Assembly Session", *History of Bangladesh War of Independence Documents* Vol. 2. Ed. Hasan Hafizur Rahman (Dhaka: Ministry of Information, Government of the People's Republic of Bangladesh, 1982), pp. 659-660

১১. হারুর-অর-রশিদ, *"৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ: বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ"* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২রা ফেব্রুয়ারি ২০১৮), পৃ. ৩০

১২. শেখ হাসিনা, "ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ: কিছু স্মৃতি" আবদুল ওয়াহান (সম্পাদিত), বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ: ইতিহাস ও তত্ত্ব (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪), পৃ. ৯১-৯২

১৩. "Speeches at Dhaka Race Course and Gettysburg", Mofizur Rahman in the Financial Express (Dhaka: 31 March 1995), p. 9

১৪. শেখ হাসিনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

১৫. ড. হারুর-অর-রশিদ, *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ১১-১৬

১৬. আবদুল ওয়াহান (সম্পাদিত), *বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ: ইতিহাস* ও *তত্ত্ব*, পরিশিষ্ট: গ, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪), পৃ. ৫২৪-৫২৭

১৭. *৭ই মার্চ ১৯৭১ সালের তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ*

১৮. *প্রাগুক্ত*

১৯. *Evening Standard*, (London: 12 March 1971), p. 10

২০. *The Guardian*, (London: 5 March 1971), p. 12; *The Sunday Times* (London, 7 March 1971), p. 1, 9; *The Observer* (Dhaka: 7 March 1971), p. 2

২১. *The Daily Telegraph* (London: 6 March 1971), p. 1

২২. *The Sunday Times* (London: 7 March 1971), p. 1, 9

২৩. *The Daily Telegraph* (London: 10 March 1971), p. 14

২৪. *The Morning News* (Dhaka: 8th March 1971), p. 1

২৫. ১৯৬০ সালে বৃটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই আফ্রিকার নাইজেরিয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্গে উত্তর অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জাতিগত সংঘাত-সংঘর্ষ দেখা দেয়। এরই এক পর্যায়ে ১৯৬৭ সালের ৩০শে মে সম্প্রদায়ভুক্ত দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলকে 'স্বাধীন সার্বভৌম বিয়াফ্রা প্রজাতন্ত্র' হিসেবে ঘোষণা দেন। শুরু হয় নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, যা ১৯৭০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বিয়াফ্রা'র স্বাধীনতা ঘোষণাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করে বৃটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন-সহ অনেক শক্তিধর রাষ্ট্র তা দমনে নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে। দ্রষ্টব্য হারুন-অর-রশিদ, "বাংলাদেশ বিপ্লব ১৯৭১: বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রতিক্রিয়া", বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ত্রয়দশ খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৫), পৃ. ৫২, নোট ২

২৬. *The Sunday Times* (London: 7 March 1971), p. 9

২৭. 'Poet of Politics', *Newsweek* (New York: 5 April 1971)

২৮. *The Don* (Karachi, 8 March 1971), অনুবাদঃ আন্দালিব রাশদী, *মুজিব শতবর্ষ এর বিশেষ আয়োজন*, (ঢাকা: দৈনিক আমাদের সময়, ১৭ মার্চ ২০২০), পৃ. ৭

২৯. অজয় রায়, "বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: আমার অনিয়ত ভাবনা" (প্রবন্ধ), শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চে ভাষণ: বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১লা ফেব্রুয়ারি ২০১৮), পৃ. ১৩-৩০

৩০. ইত্তেফাক, ঢাকা, ৯ মার্চ ১৯৭১

৩১. *প্রাগুক্ত*, ১০ মার্চ ১৯৭১

৩২. সংবাদ, ঢাকা, ৮ মার্চ ১৯৭১

৩৩. ইত্তেফাক, ঢাকা, ৯ মার্চ ১৯৭১

৩৪. এ. আর. মল্লিক, *আমার জীবন কথা ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫)

৩৫. মোহাম্মদ নুরুল কাদের, *আমার একাত্তর*, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯)

৩৬. এম. এ. জি. ওসমানী, *বাংলার বাণী* (ঢাকা: ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২)

৩৭. একটি জাতির জন্ম, *দৈনিক বাংলা*, ২৬শে মার্চ ১৯৭২; পুনর্মুদ্রিত সাপ্তাহিক বিচিত্রা, স্বাধীনতা সংখ্যা, ১৯৭৪

৩৮. রফিকুল ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে* (ঢাকা: মুক্তধারা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৯)

৩৯. *৭ই মার্চ ১৯৭১ সালের তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ*

৪০. *তদেব*

৪১. শামসুজ্জামান খান, "বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের *ঐতিহাসিক ভাষণ* একটি অনুপুঙ্খ *পাঠ*" সেমিনার পাঠ ৪ঠা মার্চ ২০০৪, শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১লা ফেব্রুয়ারী ২০১৮), পৃ. ১-১২

৪২. বাংলাদেশের হাইকোর্টের বিচারপতি নাজমুল আহাসান ও বিচারপতি কামরুল কাদেরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ ১০ মার্চ ২০২০ সালে "জয় বাংলা" কে বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান হিসেবে রায় দেন। জাতীয় দিবসগুলোতে উপযুক্ত ক্ষেত্রে সাংবিধানিক পদাধিকারী ও রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকর্তা সরকারি অনুষ্ঠানে বক্তব্য শেষে "জয় বাংলা" স্লোগান উচ্চারণ এবং সারাদেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাত্যহিক সমাবেশ শেষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ যাতে "জয় বাংলা" স্লোগান উচ্চারণ করেন সেই আদেশ প্রদান করা হয়।

৪৩. ২০২২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে "জয় বাংলা"কে জাতীয় স্লোগান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ২ মার্চ ২০২২ "জয় বাংলা" কে জাতীয় স্লোগান ঘোষণা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন জারি করে। স্মারক নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৪২৩.৯৯.০০১.১৯.১৭, তারিখ: ২ মার্চ ২০২২/১৭ ফাল্গুন ১৪২৮

৪৪. Jacob F. Field, *Ibid*, pp. 201-205

৪৫. *Ibid*

৪৬. ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালের তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

৪৭. তদেব

৪৮. তদেব

৪৯. তদেব

৫০. *Newsweek, 5 April 1971*

৫১. Jacob F. Field, *Ibid*, pp. 151-161

৫২. Drew Hansen, "*The Dream: Martin Luther King Jr. and The Speech that Inspired a Nation*", (New York: Herper Collins, 2005).

৫৩. Jacob F. Field, *Ibid*, pp. 201-205

৫৪. হারুন-অর-রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

---

জমা প্রদানের তারিখ : ১৪.০২.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ২২.০৫.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-১, জানুয়ারি–জুন ২০২২

# মধ্যযুগের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক সূত্রে বাংলার কর্মজীবী নারীর স্বরূপ সন্ধান

সুফিয়া খাতুন*

**Abstract**

Bengal, the agricultural country, was economically very prosperous from ancient times. During the medieval period, Bengal was well-known as a developed country in continuation of its past glory. The economy of Bengal became much advanced in the Sultanate period because of the evolution of urbanization, introduction and circulation of standard coins, and revival of international trade and commerce. The major parameters of economic development are the wide circulation of standard coins, prosperity in trade and commerce, and production of merchandise in industrial units. During the medieval period, the women of Bengal played a glorious role in the economic progress of this region with their labour and skill. They would participate in cottage industries side by side together with their male counterparts. The production and supply of raw materials for big industries were also made available with the combined toil of men and women. The women played their role indirectly in the activities like agricultural operations, production of handicrafts and manufacturing of exportable commodities. They actively took part in the production of agricultural goods together with male members of their families. They could engage themselves in different occupations since there was little fear for loss of dignity. Men and women were equal partners for earning money in order to fulfil the basic needs of their families. We notice the occupational class women like weavers, ferrymen, slaves, dancers, cooks, washerwomen, female gardeners, midwives, in medieval Bengal. These classes confined themselves in their ancestral occupations through generations. They achieved excellent skill in their occupation without any formal training due to their engagement in the same work for a long time. The self-taught women of medieval Bengal earned money from their occupational works and played a significant role in the maintenance of their families.

অর্থনীতি প্রতিটি দেশের মেরুদণ্ড এবং এই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সর্বশ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। কৃষক, কারিগর, শিল্পী, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে ও অন্যান্য পেশার লোক কোনো না কোনোভাবে অর্থনীতিকে সচল রাখতে সহায়তা করে। কৃষক ফসল উৎপাদন করে রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে। প্রতিটি গ্রামেই কৃষক পরিবারের কমবেশি নারী ফসল উৎপাদনের সাথে জড়িত। শিল্প কারাখানায় কাঁচামালের এক বড় অংশের উৎপাদক কৃষক। সেখানেও নারী শ্রমিক কাজ করে। বস্ত্র শিল্পের কাঁচামাল সুতা কাটা, তুঁতপোকা পালন এবং সেখান থেকে সুতা তৈরির কাজও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীরা করে। শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কর্মজীবী নারীর ভূমিকা অপরিসীম। বাংলার নারীরা গৃহস্থালির কাজ ছাড়াও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। গৃহের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে, অর্থ উপার্জনের জন্য স্বামীর সঙ্গে মাঠে, হাট-বাজার এবং শিল্পকারখানায়ও তারা কাজ করত। নিম্নশ্রেণির নারীরা সব কাজেই নিজেদের সম্পৃক্ত করত। মোটকথা প্রতিটি কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীর শ্রম বিনিয়োগ অপরিহার্য ছিল। প্রাচীন কালের চর্যাপদে পরিবারের বাইরেও নারীর কাজ করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

*সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

যেখানে ধর্ম, বর্ণ কোনো ভেদাভেদ ছিল না। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থসহ সমস্ত হিন্দু ও মুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেক পরিবারের প্রতিটি নারীর কাজ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। মধ্যযুগে[১] নারী শুধু গৃহিণীই ছিল না, তারা পারিবারিক জীবনে অনেক ক্ষেত্রে ছিল স্বামীর অর্থ উপার্জনের সহকর্মী। কৃষক পরিবারে কৃষিজ ফসল উৎপাদনের কাজে নারী স্বামীর সাথে ভূমিতে কাজ করত। কৃষিজ পণ্য বিক্রয়ের পর যে অর্থ কৃষকের হস্তগত হতো ঐ অর্থের অলিখিত সমান ভাগ ছিল নারীর। মধ্যযুগে বাংলার সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীরও ভূমিকা রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে মধ্যযুগে বাংলার বিভিন্ন পেশায় জড়িত কর্মজীবী নারীর কর্মকাণ্ড এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদেরও সমান অবদান রয়েছে– এই বাস্তব চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে।

**গবেষণা পদ্ধতি:** বাংলার অর্থনীতিতে কর্মজীবী নারী-সংশ্লিষ্ট মধ্যযুগের সমকালীন কাব্যগ্রন্থ, বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ ও সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থকে মৌলিক উৎস হিসেবে গণ্য করে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচিত। এছাড়া এই বিষয়ে পরবর্তী লেখক ও গবেষকগণের গবেষণামূলক গ্রন্থের তথ্যকে ঐতিহাসিক গবেষণামূলক পদ্ধতির আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:** মধ্যযুগের বাংলার কর্মজীবী নারী বিষয়ে স্বতন্ত্র কোনো আধুনিক গবেষণা নেই। এ বিষয়ে অনুসন্ধানের উদ্যোগ নিয়েছেন গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী। তিনি *'বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ'* সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। তাঁর গ্রন্থে পুরুষ পেশাজীবীর বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। নারীদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো বর্ণনা নেই। সেখানে তিনি সামাজিক মর্যাদার বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। জাহিদুর রহমানের *'বাংলাদেশের পেশাজীবী'* গ্রন্থে আধুনিক যুগের বিভিন্ন পেশাজীবীর বর্ণনা রয়েছে। যেখানে কোনোভাবেই কর্মজীবী নারী বিষয়ে কোনো তথ্য উপস্থাপিত হয়নি। মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতিতে কর্মজীবী নারীরও সমান অবদান রয়েছে সেই বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করাই আলোচ্য প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে মধ্যযুগের বাংলার সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির মাধ্যমে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮ খ্রি.) বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলকে একীভূত করে বাংলা সালতানাতকে (১৩৫২ খ্রি.) স্বাধীন সার্বভৌম সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার এই ঐতিহ্য সুরক্ষিত ছিল। অর্থাৎ ৩৭১ বছর ধরে বাংলা বিকশিত হয়েছে।[২]এ সময়ে (সুলতানি শাসনাধীনে) বাংলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বা পল্লিবাসীরা শাসনকর্তাদের অনুগত ছিলো।[৩] সেন আমলে বাংলায় মুদ্রার প্রচলন ছিল না,[৪] ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থবির ছিল। নতুন শাসকগণ প্রত্যক্ষভাবে সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং পরোক্ষভাবে ব্যবসায় বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের তাগিদেই আন্তর্জাতিক মানের মুদ্রার প্রচলন করেন। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুনরুজ্জীবত হয় এবং সময়ের পরিক্রমায় আমদানি রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া নগরায়ণের ফলে অভিবাসী লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ফলে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের প্রয়োজন দেখা দেয়। যার ফলশ্রুতিতে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়। নগরায়ণের ফলে নগরকেন্দ্রিক ও শহরকেন্দ্রিক অনেক পেশাজীবী শ্রেণি গড়ে ওঠে এবং এসব পেশাজীবীর মধ্যে একটি বড় অংশ ছিল নারী। গ্রাম, শহর ও নগরের অধিবাসীদের খাদ্য ও বস্ত্রের চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও শিল্পকারখানার কাঁচামালের জোগানদারদের অন্যতম ছিল বাংলার বিভিন্ন পেশারকর্মজীবী নারী। কৃষিপ্রধান বাংলার নারীরা সকল কাজেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করত।

মধ্যযুগে বাংলার নারীরা কোন কোন পেশায় নিয়োজিত ছিল সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হলো– পুরুষের সাহায্য ব্যতীত নারীরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। তৎকালীন বাংলার নিচু শ্রেণির নারীদের জন্য সমাজে কোনো বিধি নিষেধ ছিল না। সমাজে নারীদের অবস্থান ছিল নিম্নস্তরে। তাই সমাজে পতিত হবার ভয়ও তাদের ছিল না। নারীদের বিভিন্ন পেশার বর্ণনা দিয়ে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন যে, নারীরা বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত ছিল। বাঁশের তাঁত তৈরি, চাঙারি বোনা, তুলা ধুনা, হাতি পোষা, নৃত্যগীত, যাদু, সাপ খেলা ইত্যাদি পেশায় নারীরা যুক্ত ছিল।[৫] মধ্যযুগে বাংলার নারীরা গৃহিণী ও কৃষিজীবীই ছিল না, তারা ছিল বাংলার বড় উৎপাদক শ্রেণিও। তাঁত শিল্প ও কুটির শিল্পের সাথে জড়িত পেশাজীবীদের মধ্যে অধিকাংশ শ্রমিকই ছিল নারী। নারীরা অর্থ উপার্জন করে পারিবারিক ব্যয়ভার বহনে কখনো পিতা, কখনো স্বামীকে সহায়তা করেছে। তাই একথা বলা যায় যে, প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীরও সমান অবদান রয়েছে।

মধ্যযুগে বাংলার সুলতানগণ নতুন প্রযুক্তি আমদানি করায় শিল্পকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে পূর্বের তুলনায় শিল্প কারখানায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নারীর পেশা ছিল তাঁত বোনা, কাপড় তৈরি করা। তাঁতিদের মধ্যে বিভিন্ন রকম লোক ছিল; যেমন– এক শ্রেণির তাঁতি কাপড় বুনতো, সুতা কাটতো অন্য একটি শ্রেণি এবং তা রং করত অভিজ্ঞ কিন্তু ভিন্ন আরও এক শ্রেণির তাঁতি। এ শিল্পের সঙ্গে নারী, কিশোর, কিশোরীরা জড়িত ছিল। সাত থেকে চৌদ্দ বছরের মেয়েরা এ কাজে বেশি দক্ষ ছিল।[৬]বিজয়গুপ্ত *মনসামঙ্গল*-এ প্রথম তিন শত কারিগর এবং এগারো শত তাঁতির পরিচয় তুলে ধরেছেন। এসব তাঁতি পরিবারের নারীরা তাঁত শিল্পের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছিল। কালকেতুর গুজরাট নগরী স্থাপিত হলে এ নগরে শত শত তন্তুবায়ের আবির্ভাব ঘটে। মানিকরাম গাঙ্গুলি *ধর্মমঙ্গল কাব্যে* নয়জন তাঁতির কথা বলেছেন– যাদের পেশা ছিল পোশাকের জোগান দেয়া। ঘনরাম চক্রবর্তী এবং ভারতচন্দ্রের কাব্যেও তাঁতিদের সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭] মধ্যযুগের *মনসামঙ্গল* কাব্যে 'জোলার নগর' (জোলা ও তাঁতিদের শহর) নামক একটি গ্রামের উল্লেখ করেছেন। নারী তাঁতি কারিগরগণ খুব নিপুণ কাজ করতে পারত। *মনসামঙ্গলে* তার প্রমাণ রয়েছে।[৮]তারা অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র তৈরি করত এবং এই পেশায় তারা সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করেছিল। বাংলার বাজার ছাড়াও বৈদেশিক বাজারে এই দেশের তাঁতে বোনা উৎকৃষ্ট কাপড়ের অনেক চাহিদা ছিল। রপ্তানির বস্ত্র বয়নের অর্ধেক কাজ সম্পাদিত হতো নারীর হাতেই।

মধ্যযুগে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত হলে সুতি ও রেশমি বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় নারী তাঁতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাঁতের সাথে যেসকল নারী জড়িত ছিল তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। যেমন– যারা গুটি পোকা চাষ ও রক্ষা করত তাদের বলা হতো 'চসর'। যারা রেশম সুতা কাটত ও সরবরাহ করত তাদের বলা হতো 'নকদ'।[৯] হোয়ালিয়ারু নামের তাঁতিরা ছিল গরীব। তাঁতিদের কাজ না থাকলে দিন মজুর হিসেবে কাজ করত। তোগোতারু তাঁতিরা ছিল ঋণগ্রস্ত। তারা সব সময় মহাজনের কাছে ঋণের জালে বাধা ছিল। নাকুমি নামে তাঁতিরা মালিকের হুকুমে বাজারের চাহিদানুযায়ী স্বামী স্ত্রী মিলে সস্তায় বিক্রির জন্য মোটা কাপড় বুনত। অবসর সময়ে মহাজনের নিকট থেকে দাদন নিয়ে শর্তাধীনে ও মহাজনের নিয়ন্ত্রণেই কাপড় বুনত। এ সময়ে বাংলায় প্রথম চরকার ব্যাবহার শুরু হয়[১০] এবং ঘরে ঘরে চরকায় সূতা তৈরি হতো। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে বাংলায় চরকা ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। মূলত চরকায় নারী, শিশু, কিশোর-কিশোরীরা সুতা কাটত।

বাংলার বেশির ভাগ কর্মজীবী নারী তাঁতিরা তাঁতযন্ত্র, সুতা, রং এসব উপকরণের মালিক ছিল না। তারা ছিল স্বামীর সঙ্গী এবং মহাজনের মাইনে-করা শ্রমিক।পর্যটক বার্বোসার মতে গ্রামের তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত তাঁতিদেরকে তাদের স্ত্রীরা কোনো সাহায্য করত না।[১১] বারবোসার এ তথ্যকে ভুল প্রমাণ করেছেন বালথাজাড সলভিন্স তাঁর অঙ্কিত চিত্রের মাধ্যমে।

চিত্র-১, তাঁতশিল্পে কর্মরত কর্মজীবী নারী। Baltazard Solvyns, Les Hindoust, vol, 4, Paris

সলভিন্স দেখিয়েছেন সমগ্র ভারতের বস্ত্রবয়নের জন্য যে সুতা প্রস্তুত হতো তার প্রায় বেশিরভাগ কাজ করতেন নারীরা। উপরিউক্ত চিত্রে (চিত্র-১) ছয়জন কারিগরের মধ্যে চারজনই নারী। বস্ত্র বোনায় এক তৃতীয়াংশ কাজ করত নারীরা। বাংলার বস্ত্র শিল্পে ৪ প্রকার বস্ত্র তৈরি হতো। ক. মসলিন বস্ত্র খ. রেশম বস্ত্র, গ. সুতিবস্ত্র ও ঘ. পাটবস্ত্র। সবধরনের কাপড় বোনায় ভিন্ন ভিন্ন তাঁতি জড়িত ছিল। তার মধ্যে নারী তাঁতির সংখ্যা ছিল বেশি।

বাংলার বিভিন্ন নামের মসলিন বস্ত্র উৎপাদিত হতো। যেমন-আবরোঁয়া, শবনব, বাফতাহাওয়া, জঙ্গলখাসা, নয়নসুখ, নীলাম্বরী, তানজেব ইত্যাদি। মসলিন শাড়ি উৎপাদনের সাথে নানা শ্রেণি পেশার তাঁতি জড়িত ছিল। যেমন– ছেঁড়া মসলিন বস্ত্র রিপু করত চুনাই নামের এক শ্রেণির নারী তাঁতি। সুতা এলোমেলো হলে যারা ঠিক করে দিতো, তাদের বলা হতো নাদিয়া। এরাই মসলিন শাড়ি ভাঁজ করা ও রপ্তানির জন্য গাঁট বাঁধত। এই সব কাজ সম্পাদিত হতো নারীর হাতে। এছাড়া এক শ্রেণির অভিজ্ঞ নারীরা বড় শঙ্খ দিয়ে মসলিন বস্ত্র ঘষে মসৃণ করত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পেশার লোক ছিল রঞ্জনশিল্পী। তারা নীল, ফুল দিয়ে মসলিন বস্ত্র রং করত। সাধারণত লাল, নীল, বাসন্তী, হলুদ, সবুজ, কালো প্রভৃতি রঙে[১২] রং করা হতো মসলিন শাড়ি। এই কাজে নারীরা অত্যন্ত দক্ষ ছিল। সময়ের পরিক্রমায় বস্ত্রশিল্পের সাথে নানান পেশার লোক যুক্ত হয়। তুলা থেকে সুতা পেঁজা, সুতা কাটা, সুতার কুণ্ডলী পাকানো, কুণ্ডলী খুলে সুতাকে আবার কুণ্ডলীর আকার দেয়া। আবার সুতাগুলোকে বস্ত্রের আকার দিয়ে বিন্যস্ত করা প্রভৃতি স্বতন্ত্র পেশার লোক যুক্ত ছিল।[১৩]বাংলার সোনারগাঁও ও বারবকাবাদ অঞ্চলে উন্নতমানের মসলিন বস্ত্র তৈরি হতো।[১৪] মূলত প্রতিটি স্তরেই নারীরা কাজ করত।

বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন নামের রেশমি বস্ত্র তৈরি হতো। বিখ্যাত এসব বস্ত্রের মধ্যে ছিল– অগ্নিপাট, কাঞ্চাপাট, কালপাট, পাটের বুনি, নীলাদক্ষেমী, তসর প্রভৃতি। এই রেশম বস্ত্র তৈরির তিনটি ধাপ

ছিল- (ক) তুঁতগাছ ও রেশমগুটি উৎপাদন (খ) গুটি সংগ্রহ করে তা থেকে সুতা কাটা ও (গ) রেশম বস্ত্র বয়ন। এই তিনটি ধাপেই কাজ করত নারীরা। যারা রেশম শিল্পের সাথে যুক্ত ছিল তাদের একটি সম্প্রদায়কে বলা হতো বসুনিয়া।[১৫] তুঁতগাছ চাষ করত চাষী আর রেশম গুটি সংগ্রহ করত নারী। রেশম কাপড় বুনত তাঁতিরা এবং এসব বস্ত্র তৈরির সাথে যুক্ত ছিল গ্রামের অভিজ্ঞ নারী পেশাজীবীরা। বলাবাহুল্য এসব কাজে পুরুষের চেয়ে নারীরা বেশি শ্রম দিতো।

এসব বস্ত্র ছাড়াও গ্রামের সাধারণ মানুষের পরিধানেরজন্য সুতি শাড়ি, ধুতি, গামছা, লুঙ্গি প্রভৃতি তৈরি হতো। নিত্য দিনের ব্যবহারের এসব কাপড় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁতি পরিবারের মহিলারা নিজস্ব তাঁতেই বুনত। সুতা কাটা থেকে শুরু করে রঙ করা পর্যন্ত সব কাজপুরুষের সাহায্য ব্যতীত নারীরা নিজেরাই করত। *মৈমনসিংহ গীতিকায়* মলুয়াকে পরিবারের অভাব দূর করতে সুতা কাটতে দেখা যায়। তাঁতিরা বিভিন্ন রকম কাপড় বুনে তা হাটে বিক্রি করত। আহমেদ শরিফ এর বর্ণনায় সুতি বস্ত্র তৈরি ও বিক্রির প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৬] পর্যটক মাহুয়ান বাংলায় তৈরি ৬ প্রকার সূতিবস্ত্রের কথা বলেছেন। যথা- ১.পি-পো, ২.মান চে-টি, ৩.শা- না-পা-পা-ফু, ৪.কি-পায়-লি-টা- লি, ৫.শা-টা-ইউল ও ৬.মা-হি-মা-লি।[১৭] এসব কাপড় তৈরিতে নারী তাঁতিরাই ছিল অন্যতমগুরুত্বপূর্ণ কারিগর। তারা সব ধরনের কাপড় বুনতে পারত। ফলে তাঁতি পরিবারের বেশির ভাগ নারীই সাংসারিক কাজের পাশাপাশি কাপড় বুনতে বেশি সময় ব্যয় করত।

বাংলায় অনেক পাটের শাড়ি তৈরি হতো এবং গরীব পরিবারের নারীরা পাটের শাড়ি ব্যাবহার করত। এদেশে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এ শিল্পের সাথে ছয়গুণ লোক জড়িত হয়। এসব কারিগরদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল নারী কারিগর। তারাই পাট থেকে সুতা তৈরি পর্যন্ত যাবতীয় কাজ করত। বেশির ভাগ সময় নারীই পাটবস্ত্র বয়নের কাজটি সম্পন্ন করত। এ শিল্পের সাথে তাঁতি ছাড়াও সরাক সম্প্রদায় জড়িত ছিল। সরাকদের পেশা ছিল পাটের শাড়ি তৈরি করা। মুকুন্দরাম উল্লেখ করেন যে,

> পাইআ ইনাম বাড়ী বুনে নেত পাটশাড়ি
> দেখি বড় বীরের হরিস।[১৮]

কালকেতুর গুজরাটে বসতি স্থাপনের পর সরাকগণ অতি উন্নতমানের ‘পাটের শাড়ি’ তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করে। *মনসামঙ্গলে* চাঁদ সওদাগরের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় নারী সদস্যদেরকে পাটবস্ত্র ব্যাবহার করতে দেখা যায়।[১৯] *মৈমনসিংহ গীতিকায়* পাটশাড়ি বিবরণ রয়েছে। মলুয়ার বাবা হিরাধন চিন্তিত নিজের মেয়েকে দরিদ্র বিনোদনের সাথে বিয়ে দিলে পাটের শাড়ি পড়ে মেয়ে হয়ত সুখি হবে না–

> পাটের শাড়ি পিন্দ্যা সুখ নাহি পায়।
> হেন ঘরে কন্যা দিতে মন না জুরায়।[২০]

*পদ্মপূরাণে* পদ্মার বরপ্রাপ্ত জেলে নারীকে পাটবস্ত্র ব্যাবহার করতে দেখা যায়। মূলত পাটশাড়ির মূল্য কম থাকায় গ্রামে এর ব্যাবহার বেশি ছিল।

মধ্যযুগে নারীরা বড় কোনো ব্যবসায় জড়িত ছিল না। তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তেমনি অভ্যন্তরীণ বা স্থানীয় ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল গোয়ালা নারী (চিত্র-২)। নারীরা দল ধরে হাটে দধি বিক্রি করতে যেত। দুধ থেকে মিষ্টি, ঘি, মাখন ও মিষ্টান্ন জাতীয় বিভিন্ন খাবার তৈরি করা হতো। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে দেখা যায় যে, জীবিকার জন্য রাধা গোপা রমণীদের সাথে দধি ও

দুধের পশরা সাজিয়ে হাটে বিক্রি করতে যেত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দুধ দোহন ও পশরা সাজিয়ে বাজারে বিক্রি করা গোপ রমণীদের প্রধান পেশা ছিল। এ গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালনের জন্য বোঝা মাথায় নিয়ে রাধাকে প্রতিদিন মথুরা নগরে যেতে হতো। এসব গোপীগণ দধি বিক্রিরমাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে পরিবারের ব্যয় বহন করত। নিচু পরিবারের নারীরা মেয়ে হিসেবে, বউ হিসেবে সাংসারিক সব কাজের বাইরে মাঠে, হাটে-বাজারে পুরুষের পাশাপাশি নিজেরা সব কাজে অংশগ্রহণ করত। বিবাহিত নারীরা গৃহিণীর কাজ করত। এসব নারীদেরকে হাট-বাজারে ক্রয়-বিক্রয় শেষ করে খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করতে হতো এবং স্বামীকে খাবার দিতে হতো। প্রাচীন কাল থেকে বাংলার প্রতিটি নারী একই ধারায়, একই বৈশিষ্ট্যে জীবন অতিবাহিত করত।

চিত্র-২, সলভিন্স এর অঙ্কনে গোয়ালা নারী। Baltazard Solvyns, Les Hindoust, vol, 4, Paris

*চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে* মুকুন্দরাম ব্যবসায়ী নারী হিসেবে ফুল্লরা ও খুল্লানার পরিচয় তুলে ধরেছেন। ফুল্লরা হাটে হাটে ঘুরে শিকারের জিনিস বিক্রি করে। কালকেতু বনে ঘুরে ঘুরে শিকার করে আর তা বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করে তার স্ত্রী। ফুল্লরা হাটে বাজারে যে সব পণ্যদ্রব্য বিক্রি করত তার প্রমাণ পাওয়া যায় কবি কঙ্কনের বর্ণনায়-

চুবরি মুলাইয়া হাটে বেচয়ে ফুল্লরা
...
শৃঙ্গের পসরা দেয় ফুল্লরা বাজারে
...
ফুল্লরা বেচয়ে খড়ক দরে এক পন।
ব্রাহ্মণ সজ্জন নেয় করিতে তর্পন।।[২১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য বিক্রির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতা প্রয়োজন। গ্রামের প্রত্যেক হাটে সব ধরনের পণ্য বিক্রি হতো না। ফুল্লরা নিয়মিত নানা হাটে মাংস বিক্রি করত। এটাই তার পরিবারের অর্থ উপার্জনের একমাত্র উপায়। মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অর্থ উপার্জনে সে তাঁর স্বামীর সমান অংশীদার।[২২] ফুল্লরা শুধু স্বামীর বাড়ি নয় বাবার বাড়িতে মায়ের সাথে বাজারে যেতো। ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে মাকে সাহায্য করত–

হীরা নিদয়ার কাছে　　　　মাংশের পসার বেচে
ফুল্লরা বস্যাছে সন্নিধানে।[২৩]

এছাড়া শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার পর ফুল্লরার শাশুড়ি নিদয়া যে কাজ করত উত্তরাধিকারসূত্রে তার দায়িত্ব পরিবর্তন হয়ে ফুল্লরার ওপর অর্পিত হয়। নিদয়া হাটে বাজারে মাংস বিক্রি করত এবং সেই অর্থ দিয়ে সংসার চলত।

নিদয়া বইসে ঘাটে　　　　মাংস নিয়া গিয়া হাটে
অনুদিন বেচয়ে ফুল্লরা।
শ্বশুড়ি যেমন ভণে　　　　তেন মত বেচে কিনে
শিরে কাঁখে মাংসের পসরা।।
মাংস বেচি আনয়ে কড়ি　　　　কিনে চালু ডালি বড়ি
তৈল লোণ কেনয়ে বেসাতি।[২৪]

মূলত স্থানীয় হাট বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের কাজ অনেক পরিবারের নারীরাই করত। যার উদাহরণ নিদয়া ও ফুল্লরা। কাব্যগ্রন্থের উপরোক্ত তথ্য থেকে এটা লক্ষ করা যায় যে, বাংলার পল্লী ও নগরের দরিদ্র ঘরের মেয়েরা ঘরের সকল কাজ তো করতই মাঠে-ঘাটেও তাদেরই খাটতে হতো। সওদা বেচাকেনা করতে হতো, স্বামী সন্তানদের ও পরিজনদের পরিচর্যা করতে হতো। তারা কর্মজীবী হলেও বেশির ভাগ নারীরা ছিল এক বস্ত্র পরিহিতা। এরূপ কর্মজীবী নারীর একটি সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কবি শরণ তাঁর শ্লোকের মাধ্যমে। তাঁর শ্লোকের অনুবাদ করেছেন ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়–

এই যে হাটের কাজ শেষ করে ধাইয়া/ দ্রুত ছুটে চলছে পৌরাঙ্গনারা। তাদের দৃষ্টি অরুণবর্ণ (সন্ধ্যার সূর্যের মতো)। দ্রুত চলার জন্য তাদের কাঁধ থেকে বস্ত্র পড়ে যাচ্ছে বারবার আর সেই রমণী বারবার তুলে দিতে চাইছে। ঘরের চাষী সেই সকাল বেলা মাঠে কাজে বের হয়েছিল এখন তাঁর ঘরে ফিরে আসার সময় এই কথা ভেবে মেয়েরা লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে পথ সংক্ষেপ করে আনার চেষ্টা করছে। আর ব্যস্ত হয়ে হাটে বেচাকেনার দাম আঙুলে গুনছে।[২৫]

মধ্যযুগের কাব্যগ্রন্থে যে সকল কর্মজীবী নারী চরিত্র দেখা যায় তাদের মধ্যে অনেক পরিবারের সময় কাটে অনাহারে অর্ধাহারে। কারণ অনেক পরিশ্রম করলেও বিনিময়ে তারা কম পারিশ্রমিক পেত।

আলোচ্য সময়ে বাংলার কর্মজীবী নারীর মধ্যে 'ডোম্বী' অন্যতম। ডোম্বীদের জাতিগত বৃত্তি ছিল ছাতা তৈরি ও ঝুড়ি বোনা। মহিলারা এসব কাজে খুব পারদর্শী ছিল। *মনসামঙ্গল* কাব্যে ডোমনী খেয়া পার করত। বিজয়গুপ্তের *পদ্মপুরাণে*ও খেয়া পারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

গড় ভ্রূকুটি করে　　　　নওগুণ তুলিয়া পরে
পার হইয়া না দেয়ে খেওয়ার কড়ি।[২৬]

সুলতানি বাংলার নগরায়ণের ফলে নগরের জৌলুস ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। রাজধানী শহর ছাড়াও বিভিন্ন নগরে মালি পেশার লোকেরা সাধারণত বাগান পরিচর্যা করে। কিন্তু গ্রাম বাংলায় তাদের মালাকার বলা হয়। দৌলত কাজীর *সতীময়না লোরচন্দ্রানী* কাব্যে মালিনীর নাম রত্না। এছাড়া হীরাবতী ছিলেন মালিনী।

হীরাবতী নাম ধরি বাসে বঞ্চি একেশ্বরী
পতিপুত্র কন্যা কেহ নাই।
উদর উপর মূল রাজকন্যা লয় ফুল
যাতায়াত নিত্য সেই ঠাঁই।[২৭]

হিন্দু, মুসলিম সব ধর্মেরমানুষের বিয়ে, জন্মদিন, পূজা, বিবাহ বার্ষিকীতে ফুলের ব্যাবহার লক্ষ করা যায়। এসব অনুষ্ঠানে ফুলের যোগান দেয় মালিনী। মালির স্ত্রী মালিনী নামে পরিচিত। মুকুন্দরাম তাঁর *চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে* বলেন যে,

মালি বসে গুজরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে
মালা মউড় গড়ে ফুলে ঘর
ফুলের পুটলি বান্ধে সাজি দণ্ড করি কান্ধে
ফিরে তারা নগরে নগর।[২৮]

বিজয় গুপ্তের *মনসামঙ্গল*কাব্যে লখিন্দরের বিয়েতে নয়শত মালি বরযাত্রী গিয়েছিল।[২৯] কখনো কখনো ফুলমালিরা সপরিবারে একই মালিকের গৃহে বংশানুক্রমিকভাবে কাজ করে। ফুলমালি বাগান থেকে ফুল সংগ্রহ করে ধনী গৃহে বা বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে বা অনুষ্ঠানে ফুল বা ফুলের মালা সরবরাহ করে। অঞ্চল বিশেষে মালি সম্প্রদায়কে ফুলের পসরা সাজিয়ে হাটে-বাজারে বিক্রি করতেও দেখা যায়।

গ্রামপ্রধান বাংলার কর্মজীবী নারীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি পেশা ছিল পাটনী। পাটনী বলতে সাধারণত বোঝা যায়- ঝড়, বৃষ্টি, রোদ সবকিছু উপেক্ষা করে এক ক্লান্তিহীন, অনড় অটল মানুষ যিনি দিন-রাত ক্ষুধা যন্ত্রণার কথা ভুলে কেবল নৌকার হালের পাশে দাঁড়িয়ে পারাপারের কাজ করত। অর্থাৎ- নিতান্তই একজন খেটে খাওয়া মানুষ পাটনী। বাংলা কাব্যগ্রন্থে দেখা যায় ঈশ্বরীপাটনী দেবীকে খেয়া পার করে।[৩০] মাঝিরা মানুষ পারাপার করা ছাড়াও সব ধরনের মালামাল পরিবহণের কাজে নিয়োজিত থাকে। তবে কখনো তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতি হয়নি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন *চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যেও মাঝিদের কথা বলা হয়েছে। পাটনীদের কাজ শুধু খেয়া পারাপার করা–

পাটনী নগরে বৈসে রাত্রি দিন জলে ভাসে
পার করি লয় রাজ করে।[৩১]

মধ্যযুগের বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। স্থানীয় পর্যায়ে এক অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য অন্যঅঞ্চলে প্রেরিত হতো সাধারণত নৌপথেই। অর্থাৎ স্থানীয় হাট বাজারে যেসব মালামাল আনানেয়া করা হতো, পাটনীরাই সেসব পণ্যদ্রব্যাদি খেয়াঘাট পার করত।

মধ্যযুগের কর্মজীবী নারীর মধ্যে ধোপা একটি পরিচিত সম্প্রদায়। পুরুষ-নারী উভয়েই এ পেশায় নিয়োজিত থাকলেও নারীদেরকেই বেশি শ্রম দিতে হয়। *পদ্মপূরাণ* কাব্যের নেতা নামের ধোপানি এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি নগরেই ধোপারা বসবাস করে। ধোপা শুধু কাপড়ই ধোলাই করে না, কাপড়ের মধ্য থেকে ময়লা আর কঠিন দাগ পরিষ্কার করে ধুয়ে কাপড়কে ইস্ত্রি করে। ধোপাদের কাজ নগরের সকল অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকদের কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার ও পরিপাটি

করে দেয়া এর বিনিময়ে তারা পায় জীবনধারণের অর্থ। গ্রামের শতকরা ২% লোক ধোপা পেশার সাথে জড়িত ছিল। কারণ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তাদের দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করাত না। শুধুমাত্র ভূস্বামী, জোতদার ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই তাদের কাপড় ধোপাদের দিয়ে কাচাত। *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যে কোটাল, ধোপার প্রত্যক্ষ সাহায্যেই চোর ছদ্মবেশী সুন্দরকে ধরতে সমর্থ হয়। গ্রামে ধোপা পেশার লোক কম ছিল তবে নগর ও শহরে তাদের উপস্থিতি অনেক বেশি ছিল। বেহুলা স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে স্বর্গে যাওয়ার সময় ধোপানী পথ চিনিয়ে দেয়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বেহুলা তার কাপড় ধুতে সাহায্য করেছিল।

ধোপানী কাপড় কাচে ক্ষার আর খালে।
বেহুলা কাপড় কাচে শুধু গঙ্গা জলে।
...
বেহুল কাপড় কাচে সূর্য সমতুল।
...
বেহুলার বস্ত্রখানি উজ্জ্বল হইল।
...
বেহুলার সঙ্গে করি সুলপুরে গেলা।[৩২]

*ধর্মমঙ্গল কাব্যে* দেখা যায় নারীরা চিত্রাঙ্কন, আলপনা, সূচের বিভিন্ন রকম নকশা, নকশী কাঁথা, তোলকজি, টোপড় নির্মাণ করছে। *মঙ্গলকাব্যে* দেখা যায় রমণীরা চারু ও কারুশিল্পে পারদর্শী ছিল–

কাজলা আনিয়া সাধু তারে দিলা পান।
কাজলা মাল্যানি করে টোপর নির্মাণ।।
নানা চিত্র লিখে তাহে লিখে নানা ফুল।
সোনার টোপর রূপে জেন সমতুল।।[৩৩]

কুটিরশিল্পের বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে নারীরা তা বাজারে বিক্রি করে পরিবারের খরচ যোগাতে সাহায্য করত। অনেক নারীই এ কাজে জড়িত ছিল। পুরুষের চেয়ে বেশি সংখ্যক নারীরা এই কাজ করত।

রাধুনী হিসেবে নারীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের সদস্যদের জন্য রান্না করা ছাড়াও নারীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আধুনিক যুগের বার্বুচির ন্যায় কাজ করত। তারা দশ ব্যঞ্জন, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করত। মধ্যযুগের কাব্যগ্রন্থে এরূপ রাধুনী নারীর প্রমাণ পাওয়া যায়–

ফুল্লরা রন্ধন করে জ্বালে গোটা বাঁশ।
ঝোল রান্ধি দিল দইটা হরিণের মাশ।।
অম্বল খইয়া বীর জায়ায়ে জিজ্ঞাসে।
রন্ধন করেছ ভাল আর কিছু আছে।[৩৪]

প্রতিটি পরিবারের নারীরা পরিবারের সদস্যদের জন্য রান্না করত কিন্তু বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে অনেক মানুষের জন্য রান্না করতে হতো। এজন্য অনেক নারীই সেই কাজ করত। যার বিনিময়ে সে অর্থ ও খাবার পেত।

মধ্যযুগে অভিজাত শ্রেণির বিনোদনের জন্য এক শ্রেণির নারী ছিল যারা নৃত্য গীতের মাধ্যমে মানুষের মনোরঞ্জন করত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ভোজের নিমন্ত্রণে মেহমানদের বিনোদনের জন্য নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করতেন।[৩৫] ফিরিস্তার মতে, মালবরাজ সুলতান গিয়াসউদ্দিনের হারেমে (১৪৬৯-১৫০০ খ্রি.) পনেরো হাজার রমণী ছিল তাদের মধ্যে অনেক গায়িকা ও নর্তকী ছিল।[৩৬] নিম্নশ্রেণির মহিলাদের মধ্যে যারা রূপবতী তারা এটা পেশা হিসেবে গ্রহণ করত। বেহুলা স্বামীর ও ভাসুরদের প্রাণ ফিরিয়ে আনতে দেবতাদের মন খুশির জন্য নৃত্যগীত পরিবেশন করে এবং দেবতারা সন্তুষ্টি হয়ে তাদের সবার প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সমাজে এই নর্তকীদের কোনো সন্তোষজনক অবস্থান ছিল না। তারা নৃত্য পরিবেশন করে যে অর্থ বা উপহার পায় তা দিয়েই তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করত। সমাজে এই শ্রেণির কর্মজীবী নারীরা মানুষের মনোরঞ্জনের দ্বারা তাৎক্ষণিক অর্থ রোজগার করত।[৩৭] যদিও তাদের পেশাকে সম্মানজনক মনে করা হতো না।

কর্মজীবী নারীরা শুধু অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছলতা আনার জন্য সাংসারিক কাজ ও হাট-বাজারে জিনিস বিক্রি করত না তারা নিজেরা বাজারে পণ্য হিসেবে বিক্রি হতো। বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনীতে হাটে দাস দাসী বিক্রির বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয়। বতুতা বাংলার পণ্যসামগ্রির বাজার মূল্যেরপাশাপাশি দাস-দাসী হাটে বাজারে বিক্রি হতো সে বর্ণনাও করেছেন। তিনি নিজে মাত্র এক সোনার দিনারে আশুরা নামে অত্যন্ত সুন্দরী দাসী ক্রয় করেছিলেন। বতুতার সহযাত্রী অন্য ব্যক্তি লুলু নামে অল্প বয়স্ক সুন্দর বালককে ক্রয় করেছিলেন মাত্র দুই স্বর্ণ দিনারে।[৩৮]এসব দাসীর দুই ধরনের কাজ ছিল– ঘর কন্যার কাজ করা বা কায়িক পরিশ্রম করা এবং সঙ্গদান বা চিত্তবিনোদন করা। কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দাসী নির্বাচন করা হতো বলে জানা যায়।[৩৯]তারা মনিবের সব কাজ করত। দাসী বাজারে গিয়ে মনিবের বাজার করার প্রমাণ রয়েছে। দুর্বলা দাসী ছিল লহনার খুবই ঘনিষ্ঠ। সে হাটে গিয়ে বাজার করত এবং দৈনন্দিন দ্রব্য ক্রয় করে হিসেব মিলিয়ে ঘরে ফিরত। যেমন–

দুর্ব্বলা বাজারে যায়     পাছে দশ ভারী ধায়
কাহন পঞ্চাশ লয়ে কড়ি। ...
দুর্বলা হাটেতে যায় উভ মুখে লোক চায়
ঐ আইসে সাধু ঘরের ধাই। ...
ভাল বস্ত্র রাখিল লুকাই।।[৪০]

এসব দাসীকে মনিবের পরিবারের সব কাজ করার পাশাপাশি মনিবের উপপত্নীর দায়িত্ব পালন করতে হতো। যার প্রমাণ পাওয়া যায় সনকার বক্তব্য থেকে। নারায়নদেবের কাব্যগ্রন্থে দাস-দাসী বেচাকেনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৪১] মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারের দাসের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। কাজী হাসানের পরিবারের বিবিরা দাসীদের সেবার বর্ণনা দিয়েছেন।[৪২]উল্লেখ্য যে এসব দাসীর সেবায় মালিক খুশি ছিল কিন্তু দাসীর শ্রমের মূল্য কত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বণিক পরিবারে পিতা মাতা পুত্রকে শত দাসী রেখে দেওয়ার প্রস্তাব করে। শুধু বণিক পরিবারের জন্য নয়, আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য পরিবারে দাসী ছিল। *মঙ্গলকাব্য* থেকে এটা স্পষ্ট যে, কর্মজীবী নারীর তালিকায় সবচেয়ে অসহায় নারী হলো দাসীবৃত্তি। দাসীকে অনেক সময় যৌতুক হিসেবে দেয়া হতো। অভিজাত শ্রেণির মেয়ে বিয়েতে দাসী-বাঁদি দেয়ার রেওয়াজ ছিল। এ বাঁদিরা আমৃত্যু

থাকত মনিবের ঘরে। তাঁর ভাগ্য ছিল মনিবের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর। যেমন– রাজা দশরথের স্ত্রী কৈকেয়ির বিয়েতে বাবার বাড়ি থেকে মন্থরা বা কুব্জা দাসীকে পাঠানো হয়েছিল।

বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় ধাত্রী পেশার কর্মজীবী নারী ছিল। ইতঃপূর্বেও আমরা দেখেছি যে প্রাচীন কালেও এই পেশার নারী ছিল। তারা সমাজে খুবই সম্মানজনক কাজ করত। এ পেশার নারীকে খুশি হয়ে অর্থ ও ধন সম্পদ দেয়া হতো। এরা মূলত শাসক এবং বিত্তবান লোকদের পৃষ্ঠপোষকতায় জীবিকা নির্বাহ করত। এ পেশার নারীরা সমাজে সবার শ্রদ্ধার ও সম্মানের পাত্রী ছিল। রাজপরিবারের ধাত্রীরা অনেক বেশি সম্মানী পেত।

পুত্র হৈল সোম ঘোষ আনন্দিত মন।
ধাত্রীকে বিদায় করে দিয়া নানা ধন।[৪৩]

এখানে বোঝা যায়, ধাত্রীকে উপহার দেয়া হয়। মানুষের উপহার ও দান দিয়েই তারা জীবিকা নির্বাহ করত। উল্লেখ্য যে একই পেশার মুসলিম ধাত্রীদের বলা হতো দাঈ। তৃতীয় গোপালদেব ছোটবেলায় তাঁর ধাত্রীর কাছে মানুষ হয়েছেন। মদনপালের মনহলি লিপিতে এর প্রমাণ রয়েছে।

বাংলার মাটির তৈরি জিনিস বা মৃৎশিল্প খুব বিখ্যাত ছিল। এই শিল্পের নারী কারিগররা মাটির পুতুল, দেব-দেবীর মূর্তি, মাটির হাঁড়ি, পানির কলসি, পাতিল, কড়াই, পেয়ালা, থালাবাসন, চাল রাখার মটকা, কলিকা হুক্কা প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের জিনিস তৈরি করত। এসব জিনিস তৈরির জন্য মাটি সংগ্রহ থেকে তা সংরক্ষণ করা, উপকরণ তৈরির উপযোগী করা, রোদে শুকানো, আগুনে পোড়ানো, রং করা সব কাজেই নারীরা দক্ষ ছিল।[৪৪] কুমারের বাড়ির কমবেশি সবাই এই কাজের সাথে জড়িত ছিল।

গ্রাম প্রধান বাংলায় মিষ্টি তৈরি করত ময়রা নামের পেশাজীবীরা। ঘরে বসে এসব কাজে নারীরা বেশি সম্পৃক্ত ছিল। তারা মূলত চিনি ও মিষ্টিজাত জিনিস তৈরি করত। ময়রারা বিভিন্ন রকম মিষ্টি, দই, জিলাপি প্রভৃতি জিনিস তৈরি করত। এছাড়াও তারা জিলাপি, রসগোল্লা, নাড়ু, মুড়ির মোয়া নিয়ে ঘুরে ঘুরে শহরে, নগরে, গ্রাম গঞ্জে বিক্রি করত। অনেক সময় মৌসুমী ফসলের বিনিময়ে তারা এসব জিনিস বিক্রি করত। ময়রারা ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা মোদক নামেও পরিচিত ছিল। হিন্দুদের পুজায় দেবতার ভোগ নিবেদনে এবং বিভিন্ন উপলক্ষে মিষ্টির বিকল্প নেই। তাই গ্রামাঞ্চলেও এসব মিষ্টির খুব চাহিদা ছিল।

তাম্বুলি বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা। পান উৎপাদন করত বারুই আর পান বিক্রি করত তাম্বুলি। গ্রামে গঞ্জে পুরুষ ছাড়া অনেক নারী এই পেশার সাথে জড়িত ছিল। তারা নিয়মিত হাটে, গ্রামে, গঞ্জে গিয়ে পান বিক্রি করত। কালকেতুর গুজরাট নগরীতে তাম্বুলীদের ব্যবসার বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানীর বর্ণনায় দেখা যায় যে, রাজকীয় অতিথি আপ্যায়নে পান ব্যাবহার করা হয়েছে।[৪৫] ধনী গরিব সকলের নিকট পান জনপ্রিয় ও পছন্দের খাবার ছিল।

বেদে একটি যাযাবর সম্প্রদায়। প্রাচীন কাল থেকেই এদের অস্তিত্ব ছিল। সাধারণত গ্রাম গঞ্জে তারা বেশি চলাফেরা করত। এরা দল ধরে নৌকায় করে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। সাধারণত পুরুষরা নৌকায় অবস্থান করে আর বেদেনি ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজ, গাছ-গাছড়া, শিঙ্গা, মাছের দাত, গরুর সিং প্রভৃতি জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করে জীবনধারনের অর্থ উপার্জন

করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশলে ও ফন্দি করে গ্রামের নারীদের কাছ থেকে ধান, চাল ও ঋতু অনুসারে মৌসুমী ফসল আদায় করে নেয়। অনেক সময় বেদে বেদেনি মিলে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা করে, সাপের খেলা, বানর খেলা দেখায়। প্রায় শতভাগ পরিবারে বেদে নারীরাই জীবিকা উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন।

নদীবহুল বাংলায় প্রাচীন যুগ থেকেই মাছ ধরা শুধু পুরুষের পেশা ছিল না। অনেক জেলে পরিবারের মেয়েরাও (চিত্র-৩) মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত ছিল এবং সেই মাছ নিজেরাই হাটে বাজারে বিক্রি করত। তারা নগদ অর্থে অথবা ধান চালের বিনিময়ে মাছ বিক্রি করত। খাল-বিল, পুকুর, নদীতে মাছ ধরে বিক্রি করার পাশাপাশি তারা গ্রামের ধনী পরিবারে মৌসুমী ফসল নেওয়ার শর্তে মাছ দিতো। বিজয়গুপ্তের *পদ্মপুরাণ* এ চারশত কৈবর্তের পরিচয় পাওয়া যায়।

চিত্র-৩, মাছের ঝুড়ি নিয়ে জেলে নারী। Baltazard Solvyns, Les Hindoust, vol, 4, Paris

শীতকালে খেজুর গাছ থেকে যারা রস সংগ্রহ করে তাদের বলা হতো শিউলি বা গাছি। গাছ কেটে রস সংগ্রহ করে গাছি কিন্তু রস থেকে গুড় তৈরি করে সব শিউলি নারী। এসব নারীরা অত্যন্ত চমৎকারভাবে হরেক রকম গুড় তৈরি করে। উল্লেখ্য যে শিউলি নারীরা ছিল স্বজ্ঞানে অভিজ্ঞ এবং তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এই কাজ করত। গ্রামীণ হাট বাজারে নিজেরাই এসব গুড় বিক্রি করে যে অর্থ উপার্জন করত তা দিয়েই সংসারের অভাব পূরণ হতো।

প্রাচীন কাল থেকে কলুরা ঘানিতে সরিষা, তিল, তিসি, মশনা, নারিকেল প্রভৃতি থেকে তেল তৈরি করে আসছে। বাংলার গ্রামীণ সমাজে কলুপাড়ার একই চিত্র। প্রত্যেক ঘান ভাঙাতে[৪৬] নারী কাজ করছে। নারীদের এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে দেখা যায়। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে গবাদি পশু না

থাকলে কলুর স্ত্রী নিজেই হাতে জোয়াল তুলে নিয়ে গোরুর মতোই ঘুরতে থাকে। এক্ষেত্রে কলু নারীর সাহায্যেই তেল ভাঙানো সম্পন্ন করে। একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে আর্থিক দিক থেকে তারা অস্বচ্ছল থাকায় স্বামী স্ত্রী মিলেই ঘানিতে তেল ভাঙাত। নারী কলু ছাড়া কোনোভাবেই কলু তেল নিষ্কাষণ করতে পারত না। কারণ অন্য কোনো শ্রমিকের সাহায্য নেওয়ার সার্মথ্য তার ছিল না। উল্লেখ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নিচু শ্রেণির লোকেরা এই পেশায় যুক্ত ছিল এবং এদেরকেই তেলি বলা হতো।

কর্মজীবী নারীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র চুনারী। এরা গ্রাম গঞ্জের নদী, পুকুর, খাল-বিলে শামুক, ঝিনুক সংগ্রহ করে তা পুড়িয়ে চুন তৈরি করত। সাধারণত হিন্দু ধর্মীয় নারী পুরুষ এই পেশায় যুক্ত ছিল। গ্রামের হাট-বাজারে তাম্বুলদের মতো তাদেরও উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। চুনারী নারীরা ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। চুন তৈরি করত বলেই তারা চুনারী নামে পরিচিত ছিল। এই ব্যবসায় নারীরা খুব পারদর্শী ছিল।

প্রাচীন কাল থেকে বাংলার পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর লোক বসবাস করে। এদের প্রতিটি পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি নারী। নারীরা জুম চাষ করত। তারা পাহাড়ের পাদদেশে নানা রকম ফসল চাষ করে পরিবারের চাহিদা পূরণ করত এবং বাকিটা স্থানীয় হাট বাজরে বিক্রি করত।

বৈদ্য পেশার নারী গ্রাম বাংলায় অত্যন্ত পরিচিত। তারা বিভিন্ন গাছ-গাছাড়া দিয়ে চিকিৎসা করে। মহিলাদের বশিকরণ, ঝাড়-ফুঁক, গাছের শেকড় দেওয়ারবিনিময়ে তারা ধান চাল শস্যজাতীয় জিনিস সংগ্রহ করে জীবনযাপন করত। গ্রামের কম শিক্ষিত নারীরাই বৈদ্য নারীর কাছে ভিড় করে। গ্রামাঞ্চলে তারা খুব কম সম্মানী পেলেও রাজবৈদ্য এবং অভিজাত পরিবারের বৈদ্যরা অনেক বেশি সম্মানী পেত।

উপরিউক্ত কর্মজীবী নারী ছাড়াও আরো কিছু পেশাজীবী ছিল যাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ছিল না কিন্তু তারা অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে বিভিন্ন চিত্র ফুটিয়ে তুলত। যেমন– পটচিত্র (কৃষ্ণলীলা, বেহুলা লক্ষীন্দরের কাহিনি), মহররম চিত্র, গাজী কালু-চম্পাবতী প্রভৃতি উপাখ্যান চমৎকারভাবে নারীরা অঙ্কিত করতে পারত। এসব কর্মজীবীনারীরা ঘুরে ঘুরে পটচিত্র ও চিত্রাবলি বিক্রি করে যা আয় করত তা দিয়েই জীবন নির্বাহ করত।

মধ্যযুগের বর্ণিত কর্মজীবী নারী ছাড়াও অভিজাত পরিবারের নারীরা বিভিন্নভাবে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। যেমন– নিজ উদ্যোগে মসজিদ নির্মাণ করিয়েছেন বিনত বিবি এবং বিবি মালতি। তাদের তৈরি মসজিদগুলো বিনিত বিবির মসজিদ[৪৭] (পুরাণ ঢাকার নারিন্দায় অবস্থিত) ও বিবি মালতির মসজিদ নামে পরিচিত। এছাড়া অভিজাত পরিবারের মেয়েরা প্রয়োজনে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে তুলে যুদ্ধ করেছে। শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর *পাঁচসিকা* গ্রন্থে পাঁচজন মুসলিম নারীর তথ্য তুলে ধরেছেন।[৪৮]এরা কর্মজীবী না হলেও তৎকালীন বাংলার নারীরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিল তারই প্রমাণ মেলে।

যে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অবদান অপরিসীম। দরিদ্র ঘরের নারীদেরকে ঘরে বাইরে, হাটে-মাঠে-ক্ষেত-খামারে জীবিকার জন্য স্বামীর সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করতে হতো। যেমন– ফুল্লরার বাজারে পসরা নিয়ে যাওয়া, রাধার হাটে যাওয়া, ঈশ্বরীর খেয়া পারাপারের কাজ করতে হতো। তৎকালীন সমাজে নারীর কাজের কোনো মূল্য ছিল না এবং নিন্দাও ছিল না। বরং

স্বামীর কাজে সাহায্য না করলে শাস্তি ভোগ করতে হতো। বিজয়গুপ্ত উল্লেখ করেন যে, 'লাফ দিয়ে ধরিলেন সোনকার চুলে।'[৪৯] নারীর এ শারীরিক প্রহার অনেক পরিবারেই লক্ষ করা যায়। অন্যসব নারীর ক্ষেত্রে বিশেষ করে নিম্ন শ্রেণির পরিবারের নারীরা আরো বেশি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতো। আলোচ্য সময়ে নিম্নশ্রেণির বেশ কিছু হিন্দুনারী অভিজাত মুসলিম পরিবারে সম্মানিত হয়। ঐতিহাসিক রিচার্ড এম ইটন বলেন, প্রাক মুঘল যুগে মুসলিম শাসক শ্রেণি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অনেকেই বাঙালি হিন্দু রমণীদের বিয়ে করেন।[৫০] সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ গৌড়ের কাজীর কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন।[৫১]এভাবেই মুসলিম শাসনে নারীদেরকে সম্মান প্রদান করা হয়েছিল। তারা বিভিন্নভাবে তাদের স্বামীর কাজে সাহায্য করত।[৫২] প্রতিটি পেশার নারী নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে দক্ষ ছিল এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি তারাও সমান ভূমিকা পালন করেছে।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, মধ্যযুগে বাংলার নারীরা সব সময় ঘরেই আবদ্ধ ছিল না। তারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সমানভাবে ভূমিকা বেখেছে। সম্ভ্রান্ত নারীরা গৃহের কাজে নিজেকে আবদ্ধ রাখতেন। তবে সাধারণ নারীরা নিজেদের মৌলিক চহিদা পূরণের প্রয়োজনেই মাঠে ঘাটে, হাট বাজারে, শিল্প কারখানায় বিভিন্ন কাজে সংযুক্ত ছিল। অভিজাত পরিবারের নারীর সহযোগিতার জন্য দাসী বা বাঁদি রাখা হতো। তারা ছিল নিম্নশ্রেণির পরিবারের কিন্তু কর্মজীবী নারী। দাসীদের মধ্যে কেউ কেউ ক্রয়কৃত দাসী ছিল আবার কেউ নিত্য দিনের শ্রমিকের ন্যায় কাজ করত। এই শ্রমের বিনিময়ে তারা অর্থ অথবা শস্য ধান, চাল, যব, গম এবং ঋতু অনুযায়ী অন্যান্য ফসল নিত। যা দিয়ে তাদের দৈনিক আহারের যোগান হতো। তাঁতি,মালি, পাটনী, কুমার, জেলে, গোয়ালা প্রভৃতি পেশার নারীরা দৈনিক মজুরিতে কাজ করত। অনেকেই চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করেও অর্থ উপার্জন করত বলে জানা যায়। এসব কর্মজীবী নারীরা খুব বেশি স্বচ্ছল ছিল না। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে জিনিসপত্রের দাম তুলনামূলক সহজলভ্য ছিল, ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনে তেমন প্রভাব পড়েনি। পুরুষ-শাসিত সমাজে শুধু পুরুষরাই পরিবারের ব্যয়ভার বহন করত না, অভিজাত পরিবার ব্যতীত অন্যসব পরিবারেই নারীরা অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে পরিবারের ব্যয় বহন করত। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অনেক ক্ষেত্রে নারীরা তাদের পুরুষ পেশাজীবী সদস্যদের শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের বেশিরভাগ কাজ করত ঘরে বসে। যা আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি। মূলত নারীরা তৎকালীন পুরুষ পেশাজীবীর উপার্জনের সমান অংশীদার। এক কথায় বলা যায় যে, মধ্যযুগে বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও তাদের কাজের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তারা সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে সফলতার নিদর্শন দেখিয়েছে।

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. মধ্যযুগ: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলতে ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে বোঝানো হয়েছে।

২. Syed Ejaz Hussain, *The Bengal Sultanate: Political, Economy and Coins* (A D 1205-1576) ( Delhi: Monohar Publishing, 2003), pp. 71-77

৩. Ghulam Hussain Salim, *Riyazu-s-Salatin,* A History of Bengal, (Delhi, Idarah-I Adabiyat-I, 2009), P. 95

৪. Minhaj-i-Siraj, *Tabaqat-i-Nasiri,* Vol-1, eng tra. Major H.G.Raverty, (Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1881,) pp. 427, 555-556

৫. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস* আদিপর্ব (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ ১৩৫৯), পৃ. ২৫১

৬. মুস্তফা পান্না, *বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৫২-৫৩

৭. মুকুন্দরাম উল্লেখ করেন যে,

শত শত একবায় গুজরাটে তন্তুবায়
ভুনি খুনি ধুতি বোনে গড়া।

–সুকুমার সেন (সম্পাদিত) কবিকঙ্কন মুকুন্দ বিরচিত *চণ্ডীমঙ্গল* (নতুন দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৭৫), পৃ. ৮২

৮. *মনসামঙ্গলে* উল্লেখ রয়েছে যে,

জোলা ছিল বড় ধনী
বুনাইয়া দিতো লাল ধুতি,
পরিয়া বেড়াইতাম বাড়ী বাড়ী।
...
চিকন কাপড় তাঁতে বিকের বড় টান।

–বিজয়গুপ্ত, বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *পদ্মাপুরাণ* (বরিশাল: বাণী নিকেতন, তা. বি.) পৃ. ৫৬-৬১

৯. মুস্তফা পান্না, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৫০

১০. ঐতিহাসিক ইসামীর বর্ণনায় প্রথম চরকার ব্যবহারের তথ্য জানা যায়। তাঁর মতে চর্তুদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উত্তর ভারতে প্রথম সুতা তৈরির জন্য চরকার ব্যবহার শুরু হয় এবং পরবর্তী সময়ে বাংলায় চরকার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এসময়ে বাংলায় চরকার ব্যবহার শুরু হলে কাপড় উৎপাদনের প্রাচুর্য দেখা যায় এবং কাপড়ের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় ছয়গুন বেড়ে যায়। –মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগে বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ১৩

১১. Barbosa, *The Book of Duarte Barbosa,* trans. Mansel Longworth Dames, Vol- 1 (London: The Hakluyt Society, 1918), p.146

১২. James Taylor, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca* (Calcutta: G.H. Huttmann Military Orphan Press, 1840), pp. 172-175

১৩. মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

১৪. Abul Fazl, *Ain-i-Akbari,* eng. tra. vol, 1, Colonel H S Jarrett,(kalkata, The Asiatic Society, 2010), p.12

১৫. এইচ বেভারিজ, *বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস*, অনুবাদক গোলাম কিবরিয়া ভুঁইয়া, (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪) পৃ. ২৩৯

১৬. হাটে বস্ত্র বিক্রি হতো কড়ির বিনিময়ে–

সুতি তুমি যে বুনিবা ধুতি
হাটে নিলে বেচিলে হবে কড়ি।

–আহমেদ শরিফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ সংস্কৃতির রূপ* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০০) পৃ. ২২৭

১৭. Ma Huan, *Ying-Yai Sheng-Lan,* The overall Survey of the Oecans Shores, Translated from the Chinese text edited by Feng Ch'eng with introduction, notes and appendics by- J V G Mills (The Hakluyt Society at the University Press, Cambridge, 1970), pp. 162-163

১৮. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, ডি, সি, সেন ও অন্যান্য (কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৪ ও ১৯২৬), পৃ. ২২৭

১৯. ড. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারীচরিত্র* (কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯২), পৃ. ২২-২৩

২০. শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুর, *মৈমনসিংহ-গীতিকা* (ঢাকাঃ বুকস ফেয়ার, ২০১৩), পৃ. ৫৯

২১. মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত *কালকেতু উপাখ্যান* (ঢাকাঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, ২০১৭), পৃ. ২০

২২. ড. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ. ২৭-২৮

২৩. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *তদেব*,পৃ. ৪৫

২৪. মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০ (পরবর্তী কালে *কালকেতু উপাখ্যান* নামে উল্লেখিত হবে।)

২৫. নীহাররঞ্জন রায়, *তদেব*, পৃ. ৪৬২

২৬. বিজয় গুপ্ত, *পদ্মপুরান*, (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২), পৃ. ৩০

২৭. সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রামপ্রসাদ সেন গ্রন্থাবলী* (কলকাতাঃ মুমতী কার্যালয়, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৮

২৮. কবিকঙ্কণ, *চণ্ডীমঙ্গল.* পৃ. ৮২; *কালকেতুর উপাখ্যান*, পৃ. ১০০

২৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), দ্বিজ রামদেব বিরচিত *অভয়ামঙ্গল* (কলকাতা, ১৯৫৭), পৃ. ৭৮

৩০. মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), *তদেব*, পৃ. ১৫

৩১. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

৩২. ড. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮-১৯

৩৩. ড. মাহমুদা খাতুন, *মঙ্গলকাব্যে নারী* (ঢাকা: ইতিহাস একাডেমি, ২০১৯), পৃ. ৭১

৩৪. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), *কবিকঙ্কণচণ্ডী* (দিল্লী, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪০

৩৫. *Visva Bharati Annals*, vol. 1, P.C. Bagchi (ed.), The Visva Bharati Publishing Dept, pp. 96-134

৩৬. N N Law, *Promition of learning during the Muhammadan Rule by Muhammadan* (London, 1916), p. 20 উদ্বৃত, M A Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* vol. 1 (Karachi: Pakistan Historical Society, 1963), p. 201

৩৭. নর্তকীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

যত নৃত্য বেশ্যা আছে সুরূপ সুঠান।
সুললিত নৃত্যগীত কর সাবধান।
–আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬

৩৮. Ibn Battuta, *The Rehla of Ibn Battuta* (India, Maldive, Islands and Ceylon), Translated by Mahdi Husain, (Oriental Institute, Baroda, 1953), pp. 234-235

৩৯. দাসী ক্রয়ের ব্যাপারে মোগল ওমরাহ এর প্রস্তাব তুলে ধরেছেন ব্লকম্যান, ঘরের কাজের জন্য খোরাসানের মেয়ে ক্রয় করো, দক্ষ শিশু পরিচর্যাকারিণী হিসেবে হিন্দু রমণী ক্রয়যোগ্য, হাস্য লাস্যে এবং রহস্যে মাতিয়ে রাখার জন্য পারস্যবাসিনীর সঙ্গ চাই। আর অক্ষু নদীর ওপারের মেয়ে নগদ মূল্যে ঘরে এনো, যাতে তাকে বেত্রাঘাত করে অন্য তিনজনকে সাবধান করে দিতে পারো। উদ্বৃতি, Kunwar Muhammad Ashraf, *Life And Conditions Of The People of Hindustan*, (Munshiram Manoharlal, New Delhi 1970), p.104

৪০. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী,বিজিত কুমার দত্ত (সম্পাদিত) *কবিকঙ্কণচণ্ডী* (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১২৪-১২৫; ড. মাহমুদা খাতুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০-৭১

৪১. দাসী সম্পর্কে বলা হয়েছে–

পাঁচ কাহন কড়ি দিয়া দাসি কিনিবী জাইয়া
তাহারা গোধ ধোয়াবে আইসে।।
ঘরে আছে চাইর নারী দাসী করিয়া দিব তরি
জত ইতি কর্ম্ম করিবার।

–নারায়ণদেব, তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), *পদ্মপুরাণ* (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২), পৃ. ১১৯

৪২. *মনসামঙ্গলে* উল্লেখ রয়েছে–

'চাঁপা বিবি করে করুণা
প্রাণের অধিক মোর সাত বাঁদি ছিল ঘর
বিপাকে মরিল সর্বজনা।
...
হুলিহুলি বাঁদি কই বেশ বানাইত সেই
সদাই থাকিত মোর সনে
জাফরি সরিয়া গেল পান জোগাইত ভাল
নিবারিতে নারি আর মনে।

–বিজয়গুপ্ত, *মনসামঙ্গল*, বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত (তা. বি.), পৃ. ৭৭

৪৩. গোপিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, *বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ (পিএইচ. ডি অভিসন্দর্ভ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬), পৃ. ১০৬

৪৪. খয়ের ও লাল মাটি মিশিয়ে ছোট কাপড়ের টুকরা দিয়ে লাল রং করার কাজ করত নারী। এজাতীয় সব কাজ করত নারীরা।

৪৫. রাজকীয় অতিথিদের খাদ্য তালিকায় ময়দার রুটি, ছাগীর মাংস, কবুতর, টিকিয়া, বুরবান, শরবত ও পান সজ্জিত থাকত। –Ziauddin Barani, *Tarikh-i-Firoz Shahi,* An English Translation by Ishtiyaq Ahmed Zilli, (Primu Books, New Delhi, 2015), p. 71

৪৬. কৃষকের উৎপন্ন সরিষা তিল, তিসি, মশনা প্রভৃতি থেকে কাঠের তৈরি একরকম গর্তযুক্ত যন্ত্র দিয়ে বীজ থেকে তেল বের করা হয়। এক্ষেত্রে দণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে বাঁশের জোয়াল। এই জোয়ালের ব্যবহারে নারীরা বেশি কাজ করত বলে অনুমান করা যায়। –জাহিদুর রহমান, *বাংলাদেশের পেশাজীবী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ.২৬-২৭

৪৭. Ahmed Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan), p.193; এ কে এম শাহনাওয়াজ, *মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্যে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ সংস্কৃতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯) পৃ. ১২৮

৪৮. ময়মনসিংহ এর জঙ্গলবাড়ী অঞ্চলের বারো ভুঁইয়া ছিলেন ঈসা খান। তাঁর পুত্রবধূ সখিনা (ফিরোজ খানের স্ত্রী এবং ওমর খা এর কন্যা) মোগলদের বিরুদ্ধে স্বামীর পক্ষে দুই দিন যুদ্ধ করেন এবং সেই যুদ্ধে সখিনার পক্ষ বিজিত হয়েছিল। শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, *পাঁচসিকা* (কলকাতা: ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯৩৯), পৃ. ৩০-৩২

৪৯. মোছা: শামীম আরা, *বাংলা মঙ্গলকাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ*, (পিএইচ. ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২) পৃ. ৯৩

৫০. Richard M Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier* 1204-1760 A.D, (London: Oxford Universtiy Press, 1994), P. 207

৫১. Ghulam Hussain Salim, *Riyazu-S- Salatin,* Op. cit., p. 132

৫২. Sometimes married women helped their husbands by earning money of the poor Brahmins span cotton thread and presumably earned money by selling this. From literaty evidence it seems that the wives of small businssmen helped their husbands in selling goods, We have seen that women were also employed in the well–to-do families as servants (dasi) and nurses to care children. *Dombis* sometimes used to work as ferry women.

–মাহমুদা খাতুন. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

---

জমা প্রদানের তারিখ : ০৬.০২.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ২২.০৫.২০২২

**Jagannath University Journal of Arts**
**Volume 12, No 01, January-June 2022**

# Features of Medieval Muslim Education System Under the Mughals: An Analysis

Abdul Momen*
Mobarak Hossain**

**Abstract**

The Mughal emperors brought significant changes to the various aspects of Indian subcontinent. The construction of a strong central and provincial government, land and revenue arrangements, the revival of trade and commerce, the establishment of justice, and the growth and development of education all contributed to the medieval period being seen as a golden age. Although founded on the Islamic religion, general Muslim education and the development of art and music have made significant progress. Muslim education operated by Maktab, Madarsah and Pathshala system also continued for Hindu students. The teachers and students had a tight and friendly relationship. Students looked up to their teachers, and teachers were always looking for ways to improve themselves. People are usually religious, and the primary goal of education was to propagate and expand religion. Religious institutions provided education, with a strong emphasis on theology. They were usually associated with mosques. Education was free, and the regulations were strict. It was fashionable to use both rewards and punishments. Teachers were regarded in high regard by rulers, who generously funded to educational establishments. Oral instruction was used. Students memorized Qur'an verses without using grammar, and laws were taught. Arabic and Persian were the languages of learning. This study followed qualitative method that belonged to historical analysis and observation. The findings of this study demonstrate the several types of dimensions that contributed to develop Muslim education under Mughal rulers. Moreover, this study will contribute to the formation of a comprehensive understanding of the Mughal education as a clear framework.

## Introduction

The Mughal emperors placed a strong emphasis on education. During this time, agriculture was the main source of livelihood, and horticulture and seed treatment were widespread. At this time, individuals engaged in a broad variety of industrial pursuits. Cotton textile manufacturing was world's most important industry at the time. India participated in vigorous and large international trade with a range of Asian and European countries throughout the Mughal period. Vocational education has gotten a lot of press. This aided the expansion of handicrafts and other businesses.[1] A huge proportion of cottage industries and factories sprang up in suitable positions. During this time, art and architecture flourished, and calligraphy was a popular subject in schools. As a result, these advancements secured the progression of education during this time span. Individuals from all socio-economic classes were given free access to education. Loyalty to academics and admiration for intelligent people were still strong throughout this period, as they had been in prior

* Assistant Professor, Dept. of Islamic History & Culture, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh
**Associate Professor, Dept. of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh

periods. There were no changes to Hindu educational establishments. These facilitated them to study Sanskrit, literature, mathematics, and other subjects. Hindu educational centers included Varanasi, Mithila, and Mathura. Everywhere, Maktabs, Madrasahs, and Pathshalas were established for them. This writing examines the patronage of learning and expansion of Muslim education under Mughal rulers.

**Muslim Education under patronage of Mughal rulers**

Prior to the Mughals, the Subcontinent already had a huge number of higher education institutes. The builder of the Mughal Empire, Zahir Uddin Muhammad Babur (1526-1530), was a poet and writer who loved literature.[2] During his reign, the public works segment was entrusted with the advancement of Maktabs and Madrasas along with its other duties. Babur's prestige was enhanced by his submission of intellectual literary works in Persian, Turkish, and Arabic, and he is regarded as a meticulous analyst. Babur's life is remembered for the vibrant and very well autobiography renowned as *Baburnama*, which he left behind.[3] According to Lane-Poole, his autobiography, is one of those precious documents that exist for all time, and is worthy of comparison with St. Augustine's and Rousseau's confessions, as well as Gibbon's and Newton's memoirs. It is almost the only one in Asia.[4] Babur, the first Mughal emperor, was a man of literary sensibility and acquired great understanding of Persian, Arabic and Turkish. His autobiography is a masterpiece of immense literary value. He was passionate about education and helped to restore a number of academic institutions. In addition, he established a number of new educational establishments.[5] During his brief reign, Babur was fond of literature and natural surroundings, and he did not have time to explore other sorts of fine art. Emperor Humayun is generally credited with founding the Mughal school of painting.[6] Babur could not need much to education because his rule was barely four years long.

Under the administration of Humayun (1530-1540 and 1555-1556), New Madrasahs were established in Delhi, Agra, and other areas. The vicinity of the Tomb of Humayun was formerly a prominent educational establishment. He bolstered the confidence of those who were knowledgeable. A Madrasah, which was previously a prominent seminary, was established on top of Humayun's shrine where distinguished academics were hired to teach reading, writing, and lessons on arithmetic were imparted there well as history, theology, literature, poetry, geography, and astronomy.[7] Hamayun, as his father, was a brilliant academic. He was a patron of the arts and literature. Despite numerous political setbacks, he contributed significantly to the purposes of teaching. In Delhi, he founded a college and named Shaikh Hussain as its principal.[8] He gained the respect of intellectuals and priests and devoted most of his time to academic endeavors. He was also a book enthusiast who amassed a lovely collection. After his death, his mausoleum was entrusted to a Madrasa in honor of his dedication to the cause of education.[9]

The great Mughal emperor Akbar was far more interested in education. It is fair to argue that his tenure signaled the start of a new era in Muslim India's educational history. Although Akbar was not a particularly well-educated man, nevertheless, he had practical knowledge in some respects and had shown a strong affection to

intellectuals and education.[10] Akbar's lengthy career spanned half a century, and he spent it equally divided between fighting and cultural and spiritual pursuits.[11] Philosophy, history, literature, and the arts all advanced significantly under his rule. In educational institutions, he made various modifications to the established curriculum of studies. Studies comprised logic, arithmetic, astronomy, accountancy, and farming, among other subjects. It appears that the curriculum was revised during his reign. He said, "No one should be allowed to overlook those subjects which the present times need," As a consequence, it was determined that 'in addition to medicine, logic, and history, every man should study literature on morals, arithmetic, agriculture, menstruation, geometry, astronomy, physiognomy, home problems, and governance standards.'[12] This new curriculum placed less emphasis on religious teaching and theological issues, which was appealing. Badauni wrote, "Reading and learning Arabic was declared a crime, and Mohammadan law, Qur'nic exegesis, and tradition, as well as those who acquired them, were considered vile and worthy of contempt. Astronomy, philosophy, medicine, math, poetry, history, and literature were all promoted and valued." [13] This inevitably gave the educational system a secular bent, and Akbar devoted special attention to children's basic education.

Education was liberalized during Akbar's reign, and even Hindus were accepted to Muslim Muktabs and Madrasas. As a fact, several Hindu academics and historians learned Persian throughout the time and contributed significantly to the purposes of teaching.[14] Akbar's attention was drawn to the progress of the beautiful arts. Initially, the supremacy of Persian style dominated the art of painting, but Indian painters educated at Mir Syed Ali Tabrizi and Abdul Samad's Art Academy influenced the unification of Persian style with Indian heritage. In the illustrations of manuscripts like the Hamza Namah, Shahamah, Akbarnama, and the Ajaib-ul-Mukhluqat, including in album paintings, the Persian delicacy of precision and attractiveness is matched with the unique Indian palettes of vibrant green and other vivid natural colors.[15] Several Sanskrit texts were translated into Persian for the advantage of Muslims during Akbar's reign. At Agra, Fatehpur Sikri, and other locations, he founded a number of Maktabs and Madrasas.

Emperor Jahangir (1605-1627), Akbar's predecessor, was a voracious learner as well. He spoke Persian fluently and was also fluent in Turkish. He was a huge fan of literary and cultural figures and held them in great respect. Art and architecture were two of Jahangir's greatest passions.[16] Though Jahangir did not do enough to promote education, he did pay attention to the upkeep of current educational facilities. He had imposed standard procedures that anytime a wealthy person or visitor passed away without an heir, the state should take over his assets and use these to build and maintain academic institutions. According to legend, after his assumption of power, Jahangir renovated also those Madrasas that had been home to birds and beasts for 30 years and refilled them with students and instructors. Fine arts, particularly painting, were Jahangir's strength.

Emperor Shah Jahan (1627-1658) was a well-educated man who encouraged intellectuals and the dissemination of knowledge. He established a Madrasa near the Jama Masjid in Delhi. Dara Shikoh, his eldest son, was also a brilliant learner.

Scholars have characterized him as one of India's finest literary pearls, having learned languages such as Arabic, Persian, and Sanskrit.[17] He was a huge fan of music, painting, architecture, and other forms of art, but he didn't do much to foster and extend education. During his time in Delhi, a college was built near the city's main mosque, and another institute was repaired and re-established. Dara Shikoh was a knowledgeable researcher who knew a lot about Hindu philosophy. He translated various Sanskrit literature into Persian, along with the Upanishadas during his father’s reign. A French traveller named Bernier visited India around Shah Jahan's era.[18]

Aurangzeb, the last powerful Mughal emperor, was similarly well-educated and enthusiastic about learning. He provided generous rewards to disadvantaged children.[19] By creating higher education and granting subsidies to eligible students, he was following in the footsteps of his forefathers. 'He had painstakingly cultivated self-knowledge, self-reverence, and identity while maintaining focus on his language and emotions,' it was stated to appraise his character. He established a swarm of educational institutes. He was a hardworking person who followed a schedule and thought in a systematic and disciplined manner, and he had a moral personal life.[20] F.E. Keay writes, "Aurangzeb's role in this statement is all the more surprising because he was an orthodox Muslim, who himself had a solid grasp of Arabic and relished in reading and studying Muslim theological literature," [21]

Education was also a priority for the later Mughal emperors. Bahadur Shah I(1707-1712), Mohammad Shah, Shah Alam II (1760-1788, & 1788-1806), and Bahadur Shah II (1837-1857) were all major supporters of education and were well-versed in literature. During the period of later Mughals, majority of new Madrasas were established by private initiatives. Ghaziuddin Khan's Madrasa, Sharfud Daulah's Madrasa, Raushanud Daulah's Madrasa in Delhi, Husan Raza Khan's Madrasa in Farrukhabad, and similar Madrasa in Allahabad, Ahmedabad, Surat, Aurangabad, and Hyderabad, among others, were founded by aristocrats with a religious bent of view. These establishments contributed significantly to the growth of education.

Making a judgment on the Mughals' dedication to the purposes of teaching, S.M. Jaffar expresses his admiration that, despite the lack of an official Department of Public Instructions in the medieval administration, it could rightfully brag of having one (Department of Public Instructions) that presided over both religious and educational institutions. He also said: "Perhaps the hallowed purpose of education suffered to some measure only during the days of intense turmoil caused by external assaults or internal problems. With the exception of a few instances, education advanced dramatically during the Muslim period, to the point where Muslim institutions in Medieval India were packed with thousands of students, teachers, and often hundreds of readers." [22]

Exceptional progress was made in education, the arts, literature, philosophy, history, and other domains throughout this time. Akbar’s court hosted a number of learned intellectuals. By sponsoring religious experts of other faiths, he promoted the growth of knowledge and cultural harmony throughout society. He wanted to make a difference in the old education systems. For the development of the people, he also

brought about changes to the curricula of various institutions and courses. Abul Fazl said, "Everyone should be required to read literature on ethics, mathematics, the specific symbolism of arithmetic, agriculture, metrology, geography, astronomy, physiognomy, home affairs, rules of management, health, reasoning science, and history," [23]

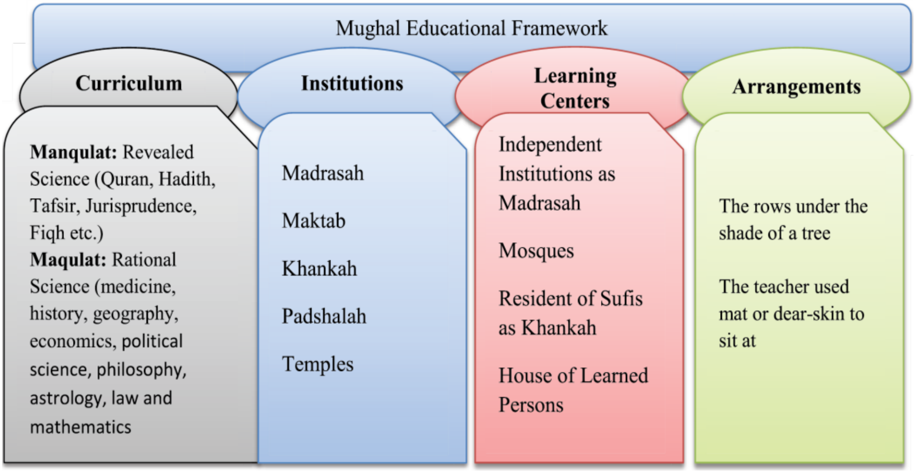


Figure 1: Mughal Educational Framework

**Vignette of Educational Framework under Mughal Rulers**

Educational institutions: during the Mughal emperors, the administration lavished a tremendous deal of support on education. The emperors built numerous Maktabs, Madrasahs, and libraries, among other things. During this time, education was provided in order to spread Islamic beliefs, law, and social norm. Education was based on religion as in Hindu and the Buddhist period, and the goal was to make a person religious. Every student was required to memorize verses from the holy Qur'an.[24]

Primary education was provided by 'Maktabs,' which were either affiliated to mosques or were separate from the Sufi's 'Khankahs,' which also acted as educational centers in some places. At their homes, a number of erudite men also attended classes. The majority of Maktabs at the period were either supported by emperors or had endowments. They were completely reliant on the generosity of philanthropists. The knowledgeable 'Maulavis' supervised the 'Maktabs.' They were meant to be evangelical Muslims.[25]

There were a number of village schools where pupils were required to pay for their lessons in kind rather than currency. The government established orphanages where students could obtain free education. These orphanages were endowed with huge sums of cash. The child was greeted with warm greetings. On this event, the holy Quran's verse 'Surah-i-Iqra' was delivered, and Muslim aristocrats and emperors hired instructors to learn their children at home. At least one 'Maktab' could be found in almost each village. In towns and cities, there were multiple 'Maktabs.'[26]

Technical education system: vocational, industrial, and professional educations were available at that time. The Indians' proficiency in the manufacturing of exquisite woven fabrics, color blending, metal and gem stone craftsmanship, and all sorts of technical arts was renowned across the globe. The magnificent fabrics, lovely blankets, painted products, and gold and silver jewelry of India are absolute evidence that procedures for artistic, vocational, and technical education existed. The existence of so many spectacular structures demonstrates that stone carving had achieved its pinnacle. In those days, having a regular manufacturing department was a privilege.[27]

A system of apprenticeships was used to impart technical education in handicrafts to the institution known as 'Karkhanas.' They were, in reality, production institutes where learners might examine and execute craftmanship under the supervision of a teacher with experience in the field. The 'Karakhanas' will not be charged any ordinary fees. The commencement of this practical schooling would be marked by a small gift to the workshop's operator or ore man, as well as a religious ceremony.[28]

Curriculum: although the curriculum differed from different places, the learning of the alphabet and the recital of the Quran were practically universal. Some passages of the Quran were memorized by the pupils since it was thought that this was necessary for performing religious functions. The majority of people were required to learn Arabic and Persian. In learning programs and Islamic institutions, Persian was the medium of education. It was necessary to study these languages in order to obtain prominent government positions.[29] Accomodations for studing Persian, the official language of the Mughal, were made in the Maktabs.

Learning materials: there were no printed materials for learners during this timeframe. Taktis (wooden books) were utilized. After learning the alphabets, children were instructed words from the Quran. Calligraphy was emphasized: beautiful and delicate handwriting was an integral part of the curriculum. Grammar was emphasized because it was thought to be particularly important in the learning of languages. The 'Maktabs' offered religious instruction from start to finish. 'Pahars': Students studied about 'Pahars' (multiple of numbers) as well. These were memorized by students while saying collectively in a loud voice. In general, the children sat in lines on the ground under the shade of trees, while the teacher sat on a mat or a dear-skin. While standing, he also addressed to the pupils.[30]

Education was broken down into two categories at the time, primary and higher. Maktabs and Padshala were the primary educational institutions, while Madrasah were the higher education institutions. The general features of these institutions are given below:

Maktabs: Maktabs were small children's basic schools. They were located next to households in mosques that were structured according to the local educational system. Children went to these institutions while they were younger and memorized Quran verses. Children from the broader public received primary education in a Maktab. They were instructed reading, writing, and arithmetic in addition to religious learning. They were also studied some Persian romantic literature, such as

Laila Majnu, Yusuf- Julekha, and others. Maktabs also provided general practical instruction. They studied letter writing, application writing, and accountancy.[31]

Madrasah: The Madrasah was an institution that provided higher education. They served as excellent educational centers. These centers attracted students from other Muslim regions. After finishing their education at a Maktab, they could continue their study in a Madrasah. Along with religious education, practical matters of life were also addressed at Madrasah. In this regard, Akbar made significant contributions and attempted, in an unprecedented way, to provide education a productive result. All pupils were required to learn about the Islamic religion. However, Akbar put an end to the practice.[32] He imparted Hindu religion and philosophy in a number of Madrasahs. Medicine, history, geography, economics, political science, philosophy, astrology, law, and mathematics were all provided by him. For Sanskrit students, he imposed Vedanta, Jurisprudence, and Patanjali mandatory. In his brilliant book Ain-e-Akbari, Abul Fazl describes the educational system instituted by Akbar.[33] Law was based on religious customs at the time. As a way, studying religious concepts was a form of legal education.

Khanqah: in addition to mosques, there are Khanqahs (residences and preaching of Sufi rituals) headed by preachers or guardians, which are often located in the countryside. Khanqah is an Islamic education center that was run well in that period. Sufis and saints used to come from all over the world and set up structured learning institutions in their khanqahs.[34] Logic, philosophy, tafsir, hadith, jurisprudence, history, and geography, among other subjects were taught by them. [35]

Pathsahala: Gurukul or Pathashala was an Indian educational system in which learners lived in the same residence as the Guru.[36] This system was still in use in India during the Middle Ages. During this time, the majority of primary schools were of the very general character. This school had two different types: (1) A Pathshala, which was the first step in Sanskritic studies, which required a formal type establishmen. (2) the general school, also known as a municipal Hindu school, which provided training in a variety of occupational arts like as accounting, carpentry, pottery, washermanship, barbering, medicine, and other similar occupations.

Others Arrangement: The school was formed naturally rather than artificially. It was a teacher's monastery in the midst of primeval setting bacon. Urban life's distractions operate in seclusion and stillness. Its geographical location, which was far from the center of population, provided its students with possibilities for regular contact with nature and solitude.[37]

Teacher-student relation and status of teachers: At these educational institutions, the teacher-student connection was fair and amicable. Students give teachers in high regard, and teachers, in turn, give students in high regard and loved them. They were proud of their children's skills and understanding. The teacher himself conducted the higher classes. According to Zaffar, education in Muslim India was marked by "unshakeable and perfect teacher integrity." They assumed a prominent standing in society, and despite their meager remuneration, they were respected and trusted by all."[38]

Mughal Educational Learning Centers

Agra: Agra rose to prominence as a dazzling center of Islamic culture and politics. Babar and Humayun introduced various Madrasahs in this city. But it was Akbar who turned Agra into a cultural and fine arts center as well as a center of teaching and education.

Bidar: In South India, it was a major center of Islamic learning. A large Madrasah housed over 3000 manuscripts on Religion, culture, philosophy, medical science, astronomy, history, and other subjects.[39]

Delhi: From 1638, Delhi served as the capital of the Mughal Empire, and is now regarded as the Old City or Old Delhi.[40]

Jaunpur: Jaunpur was formerly a thriving center of Muslim education. Hundreds of Madrasas and mosques strewn throughout, where instructors and scholars were given properties and donations so that they might spend their entire lives to education.

Malwa: Around the middle of the 15th century, Sultan Mahmud Khilji established it as a famous center of Muslim education. It was also known as a center of education throughout the Mughal period.

Lahore: Lahore, too, was an important domicile of literary talents at the period. The famous Tarikh-i-Alfi was composed here, as was the translation of the Mahabharata and the Rajtarangini into Persian. During the Mughal era, Lahore's cultural apex was attained, with hundreds of mosques, tombs, shrines, and urban infrastructure being built.[41]

Fathepur Sikri: Fathepur Sikri was also well-known for its cultural events. There were various schools and colleges there. This is where the well-known Ibadat Kbhana was located. It was the gathering place for academics from all over the world, as well as the home of a group of renowned scholars during the reign. It used to be a place where delegates from many schools of thought would debate simple issues about their religions. Harmony of all religions was proclaimed and fostered from this location. The Din-i-Illahi was developed here. Christians, Jews, Ulemas, and Pandits were all capable of expressing their ideologies and theological theories since of Akbar's cosmopolitan approach.[42]

The Maktabs' primary education systems were oral instruction and memorizing of the allotted material. Akbar urged people to write and attempted to improve the scripts. He desired a methodical approach to schooling. As a result, he advocated that the learner be taught the alphabets first, then words, and finally sentences. During this time, pupils were encouraged to work together to maintain discipline. Practical education was provided a lot of significance. Students were not required to take a partially or annual examination. However, the students were tested in real-life circumstances from time to time. During this time, military training, the growth of beautiful arts and crafts, and women's education were given high priority.

**Concise disposition of Mughal Education**

The chief characteristics of Muslim Education of the Subcontinent during the Muslim period in general and in Mughal period in particular are mentioned below.

Focus on Education: Education was viewed as a means of attaining contentment in this world as well as knowledge of Allah, the Almighty. Knowledge was thought to be the source of all religious issues' answers. "To seek knowledge is an obligation for every Muslim," the prophet Muhammad declared. "It is compulsory for each Muslim to pursue knowledge."[43] Education was seen to be a means of removing the obstacle between a person and Allah. As a way, education was seen as this concept during the Mughal Empire.

The predominant method of learning was through institutionalized education. Primary education was provided in 'Maktabs,' which were either attached to or separate from mosques, and secondary and higher education was provided in 'Madrasas' as mentioned earlier. 'Saints' 'Khanquahs' also acted as educational institutes in various regions. At their home, a number of erudite men also taught children. The emperors either promoted or endowed these organizations. They are reliant on the generosity of philanthropists. These were carried out under the supervision of the wise Maulavis. They were meant to be pious Muslims.

During the Mughal period (1526–1858), which lasted more than three centuries and covered an area the size of a continent, the number of Madrasahs expanded by orders of magnitude, This was primarily owing to the royal courts' unquestioning support, regardless of the ruler. Two other factors aided the expansion of academic institutions under the Mughals, particularly in the 16th century: first, political stability as a consequence of the accumulation of power at one core, resulting in a centralized government; and second, the increasing influence of the ulama as the dominant religious estimates in comparison to the Sufis. Madrasahs were generally well-liked and respected by both emperors and commoners.[44]

The Maktab ceremony, also known as Bismillah, was done at the age of 4 years, 4 months, and 4 days to mark the beginning of the child. This was thought to be an ideal time for initiating or beginning education. Tutors were hired by Muslim nobility and rulers to instruct their children at home.

For the most part, Arabic and Persian were required for memorizing procedures. These languages must be learned in order to get prominent government positions.

The main educational teaching systems were Manqulat (revealed or transmitted knowledge) and Maqulat (rational sciences). The Mughal period is marked by two characteristics, although within Madrasah education, the practice of manqulat (revealed/transmitted knowledge) was established over time at the expense of the tradition of maqulat (hidden knowledge) (rational sciences). Surprisingly, it was the learning of maqulat that became popular in the early days of the empire.[45] During this time, the Nizamiyah learning methods became popular. [46]

The Mughal rulers were the glorious aspects of this age, promoting education. The rulers had an important role in the spread of education. They established educational institutions such as academic institutions. They gave them the money as a gift. A

large landlord may also contribute financially to the expansion of education. The emperors favored education as a means of learning. The rulers did not assert power over educational institutions or meddle with their administration.

The religion-dominated education system was another prominent feature of Mughal education. Religious concepts pervaded the whole educational system, influencing the goal, subject of study, and even the daily lives of students. The student gained knowledge as a result of religious responsibilities. The learning of Alphabets and the reciting of the Holy Quran were nearly mandatory, however the curriculum varied considerably. The pupil memorized a portion of the Quran since it was thought necessary for religious functions.

A friendly atmosphere in the classroom was produced via personal contact between the teacher and the students. The teacher displayed a great deal of love and caring for the pupils, as well as a great deal of respect and admiration for the teacher. Individual learning attention was also essential. Because the amount of pupils under a teacher's supervision was relatively small, it was simple to devote personal attention to their optimal development and success.

Despite the emphasis on religious education, the educational system was designed in such a way that pupils were also equipped for vocational endeavors. Vocational, technical, and professional education were also considered. As evidenced by the line from the *Ain –i- Akbari*, Emperor Akbar was very interested in education. The passage is intriguing and contains useful information on the educational system, such as curriculum, teaching methods, and so on.

The provision of many teaching areas was a significant aspect of Mughal education. Though religion was the focus of education, it also encompassed the study of numerous intellectual pursuits such as mathematics, astronomy, grammar, and politics. Literature and art were also promoted.

The most successful utilization at the time was the Monitorial Framework. Even if a teacher did not have many students to educate, the teacher would enlist the assistance of senior students and encourage them to teach the younger or junior students. The punishment was harsh. Delinquents and truants were slapped in the face and beaten up on their palms. The children were made to hold their ears by taking their hands from behind their legs while sitting on their tiptoes, which was an unusual method of punishment.

During this time, a non-printing method of instruction was devised. There were no printed books for novices back then; instead, wooden books (Taktis) were also used. Children were instructed the Quran after learning the alphabet. The importance of calligraphy was emphasized - beautiful and delicate handwriting was taught separately. Grammar was taught because it was thought to be particularly important in the learning of languages. Other books were absorbed, including the Sadi's Gulistan and Bostan poetry. Kids were also taught paharas, or multiplication of figures. These were remembered by students while saying collective in a loud voice.

In addition to religious studies, the Madrasah curriculum includes general knowledge. Mathematics, agriculture, geometry, astronomy, physics, logic, natural philosophy, theology, history, and other subjects are covered in the class. India became a cultural hub in several sectors, including silk, science, philosophy, art, and others, due to Mughal leadership.[47]

The curriculum comprised a wide range of secular disciplines like as astronomy, agriculture, commerce, handicrafts, and medicine, among others.

The growth of historical documents was another notable characteristic of Mughal education. The emperors favored intellectuals who produced useful publications such as memoirs and biographies that shed information on daily life, including education. The 'Memoirs' were written by the emperors themselves.[48]

Free education was a topic of discussion at the time. Mostly, there was no charge for students to pay. There was also no charge for boarding or lodging. There were some village schools where pupils had to pay for their lessons in land rather than currency.

The importance of orphanage education could not be overstated. The authorities established orphanages where the youngsters enjoyed free education. These orphanages were endowed with large sums of money.

Teacher-student relationship: During the Muslim time, the teacher was held in high regard by all. 'They frequently lived together in continuous intellectual collaboration, and even when this was not the case, the students were in regular communication with their teachers.' Their bond was similar to that of a parent and son.'[49]

The teacher's enthusiasm for learning was evident everywhere. Teachers chose to instruct because they enjoy learning. They were well regarded. S.N. Mukerji states that "Learning was treasured for its own sake as a measure of the best human growth, and instruction was never hindered by examination requirements."[50]

Then there were the rules of conduct. The emphasis was placed on well-defined behavioral norms, cognitive patterns, and the development of the students' personalities and characteristics.

In this period, the following traits for obtaining knowledge are summarized:

- Conveying of knowledge
- Spreading and propagation of Muslim religion
- Character development
- Preparedness for the future
- The political and social system's composition
- Spiritual progress, as well as the protection and dissemination of Muslim culture

The British took over the territory of Bengal in 1757 and changed this glorious atmosphere for Muslims. During this British period, the Muslim community's values, identity, and status were under threat and in a vulnerable position because the British saw them as their opposition and competitors. The British introduced an education

system to tame India’s savage and brutish practices and eradicated superstitions and religious beliefs that were deemed barbaric. Their communal sensitivities, Divide and Rule policy, and an aggressive campaign of Christian missionaries were posing a threat to Islam in the region, and subsequently, western education, with the administration's patronage, had entirely ignored Islamic knowledge acquisition in their quest to Christianize the whole of the subcontinent.[51] The British education policy in India sought to create an English-educated society that was ethnically Indian but culturally European.

On the basis of the British policy, the Muslim communities were divided into four categories. One group of nobles sincerely considered friendship and alliance with the British; another group was so completely impressed by the British and their culture by on British lines; third group was loyal neither to the state nor to the British Government and followed a policy which, in its view, best suited its own personal and selfish interests; and fourth group which was totally opposed to British dominance and the British connection.[52] Actually, the main purposes of the British education policy was that ‘the Indians will be in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect’.[53]

## Conclusion

At the end we can conclude that the educational structure of Mughal period was not modern type system of education and educational institution was not constructively organized. But spread of learning and patronage of emperors are highly mentionable topic in medieval education history. It is certain that the Mughals, brought about a considerable development in education and culture. Babur was a literary character who was well-versed in Persia. He founded numerous new educational institutions. Humayun was a brilliant academic and educator. Akbar is supposed to be a much stronger than his father. Shahjahan was known for his distinctive flair. Aurongzeb was, undoubtedly, raised to be identity. At that period, the bulk of people engaged in agriculture, as well as a variety of other sectors, were involved. In educational progress, there were other emperors who paid attention to non-Muslims. During the Mughal Empire, Banaras, Mathura, Allahabad, Nadia, Ayodhya, Srinagar, and Mithila were prominent Hindu educational locations. The vast majority of the students were educated at home. Hindus were interested in religion, geography, pharmacology, languages, and mathematics, but religious education got little emphasis. At the age of five, students were sent to Pathshalas, which were linked with temples, and after completing their early education, they were registered in the Vidyapith for higher study. During this time, Lahore, Delhi, Ajmer, Sialkot, Multan, Ahmadabad, Allahabad, Lucknow, Murshidabad, Dacca, and other major learning centers were founded. These institutes attracted a large number of academics from Persia and Central Asia. A free education was provided to students. The royal endowment paid a specific amount of money to notable intellectuals. Because of developments in the fields of art and languages, culture, and religion, the period of the Mughals is significant in India's history. Other religions' influence on Indian culture was also visible throughout this time. The Muslim education system under

the Mughals thus marked a significant distinct feature because of the presence of several socio-economic and cultural factors during this period.

**Works Cited**

1. Gujjar, Bajwa and Shaheen, Mushtaq, "A historical review on the development of art and female education during the Muslim Regimes in India", *International Journal of Business and Social Science,* Vol. 2, No.16, 2011, pp. 181-187.
2. Rahman, Tariq, *From Hindi to Urdu : a social and political history,* Karachi, Oxford University Press, 2011. pp. 73–74.
3. *Tuzk-e Baburi* is the memoirs of Ẓahīr-ud-Dīn Muhammad Bābur (1483–1530). It was written in Turkish language. During the reign of Emperor Akbar, the work was translated as *Baburnama* into Persian, the usual literary language of the Mughal court, by a Mughal courtier, Abdul Rahim Khan-i-Khanan, in 1589. Later on, the work has been translated into various European languages.
4. Lane-Poole, Stanley, *Babar*, Oxfort, The Clarendon Press, 1899, pp. 12-13.
5. Dale, Stephen Frederic, *The garden of the eight paradises: Bābur and the culture of Empire in Central Asia, Afghanistan and India (1483–1530),* Brill, 2004, p. 216.
6. Ikram SM, *Muslim Civilization in India,* Part 2, Ainslie T Embree (ed). New York: Columbia University Press, 1964, pp. 224-226.
7. Kalpana Dasgupta, "How Learned Were the Mughals: Reflections on Muslim Libraries in India," *The Journal of Library History*, Vol. 10, no. 3, 1975, pp. 241-254.
8. Banerji, S. K., *Humayun Badshah,* Oxford University Press, 1938, p.97.
9. Holden, Edward S., *Mughal Emperors of Hindustan (1398–1707),* New Delhi, India: Asian Educational Service, 2004, pp. 123–127.
10. Richards, John F., *The Mughal Empire*, Cambridge University Press, 1996, p. 35.
11. B. A. Gokhale, *The Making of the Indian Nation*, Asia Publishing House, Bombay,1958, p. 67.
12. Abul Fazl Allami, *The Ain-i-Akbari*, Translated by H Blochmann and HS Jarrett, Volume I: Bibliotheca Indica, Calcutta, India, 1878, p. 289; K. A. Nizami, *Development of the Muslim educational system in medieval India,* Islamic Culture, 1996, 70(4), p. 32.
13. Abdul Qadir Badauni, *Muntakhab-ut-Tawarikh,* Translated by W.H. Lowe, Patna, Bibliotheca Indica, 1973, p. 316; K. A. Nizami, *Ibid.*
14. Sangari, Kumkum, "*Akbar: The Name of a Conjuncture". The State and Society in Medieval India,* Edited by Grewal, J.S., New Delhi: Oxford University Press, 2007, pp. 475–501.
15. Ahmad, *Iran and Pakistan*, Karachi, National Publishing House, 1971, p. XXIX.
16. Cleveland Beach, Milo, *Mughal and Rajput Painting*, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p. 90.
17. Asher, Catherine Ella Blanshard, *Architecture of Mughal India. The New Cambridge History of India.* Vol. I:4. [First published 1992]. Cambridge University Press, 2003, p.169.
18. François Bernier (1620 –1688) was a French physician and traveler. He was born in Joué Etiau in Anjou. He was briefly personal physician to Mughal prince Dara Shikoh (1615 – 1659). After Dara Shikoh's execution, was attached to the court of the Mughal emperor Aurangzeb (14 October 1618 – 20 February 1707), for around 12 years during his stay in India. Bernier, *Travels in the Mogul Empire AD 1656-1668*, Edited by A. Constable and revised by V. A. Smith, Delhi, 1983.

19. Pletcher, Kenneth, ed., *The History of India,* Britannica Educational Publishing, 2010, p. 183.
20. *The New Encyclopedia Britannica,* Vol.21, 15th Edition, Encyclopedia Britannica, INC, 2002, p. 73.
21. F.E. Keay, *Ancient Indian education: an inquiry into its origin, development, and ideals,* London ; New York : Oxford University Press, 2018, p.38.
22. Jaffar, S. M *The Mughal Empire, from Babar to Aurangzeb,* Ess Ess Publications, Delhi, 1974.
23. Abul Fazl Allami, *op. cit*., p. 280.
24. C. P. S. Chauhan, Modern Indian Education Policies, Progress and Problem, Kanishka Publisher, Distributors 4697/5-21A, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi, 2004, pp. 9-10.
25. Kulwinder Pal, Development of Education System, Education in India during medieval period: Islamic Education, USI PUBLICATIONS, New Delhi, 2012, pp. 12-13.
26. Ibid, p. 18.
27. J.C. Aggarwal, Development of Education System in India, New Delhi: Shipra Publications, 2010, pp. 1-5.
28. B.N. Dash, History of Education in India, Dominant Publishers & Distributors, New Delhi, 2003, p. 26.
29. Kulwinder Pal, op. cit., p. 14.
30. Ibid, p. 22.
31. Ram Nath Sharma and Rajendra Kumar Sharma, History of Education in India, Atlantic Publishers & Dist, 1996, pp. 66-67.
32. Ibid, p. 67.
33. The Ain-i-Akbari is the third volume of the Akbarnama containing information on Akbar's reign in the form of administrative reports, similar to a gazetteer. In Blochmann's explanation, "it contains the 'āīn' (i.e. mode of governing) of Emperor Akbar, and is in fact the administrative report and statistical return of his government as it was about 1590. The Ain-i-Akbari is divided into five books. The first book called manzil-abadi deals with the imperial household and its maintenance, and the second called sipah-abadi, with the servants of the emperor, military and civil services. The third deals with imperial administration, containing regulations for the judiciary and the executive. The fourth contains information on Hindu philosophy, science, social customs and literature. The fifth contains sayings of Akbar, along with an account of the ancestry and biography of the author. (H. Blochmann, (tr.) The Ain-I Akbari by Abu'l-Fazl Allami, Vol. I, first edition, Calcutta, The Asiatic Society, 1927, reprint 1993, preface.
34. Law NN, Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule, London: Longman’s Green, 1916, p.19.
35. Suyanta, S., & Ikhlas, S., “Islamic education at Mughal kingdom in India (1526-1857)”. Al-Ta Lim Journal, 2016, 23(2), p. 137.
36. Yin Cheong Cheng; Kwok Tung Tsui; King Wai Chow; Magdalena Mo Ching Mok, eds., Subject Teaching and Teacher Education in the New Century: Research and Innovation. Springer, 2002, p. 194.
37. Kulwinder Pal, op. cit., p. 25.
38. Jaffar, S. M. Education in Muslim India (1000-1800 A. C.). Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delhi, 2009, p. 60.

39. Sherwani, Haroon Khan, Cultural trends in medieval India: architecture, painting, literature & language. Asia Pub. House, 1969, pp. 14–16.
40. Spear, Percival, "Delhi: A Historical Sketch - The Mogul Empire". The Delhi Omnibus. New Delhi: Oxford University Press, 2012, p. 26.
41. Chandra, Satish, Medieval India: From Sultanat to the Mughals, Part – II. Har-Anand Publications, 2005, p. 30.
42. Andrew Petersen, Dictionary of Islamic Architecture. Routlegde. London & New York, 1996, p. 82.
43. Al-Tirmidhi, Hadith 74.
44. Ali Riaz, "Madrassah Education in Pre-colonial and Colonial South Asia", Journal of Asian and African Studies, 2010, 46(1) 69–86.
45. Ibid, pp. 69–86.
46. Dars-i-Nizami, first introduced by Mullah Nizamuddin Sihalvi (d. 1747) who was a scholar of some repute in Islamic jurisprudence and philosophy in Lucknow. The Dars-i-Nizami system originated from early eighteenth century India Nizamiyah system. It consists of about twenty subjects broadly divided into two categories: al-ulum an-naqliya (the transmitted sciences), and al-ulum al-aqliya (the rational sciences). The subject areas include grammar, rhetoric, prosody, logic, philosophy, Arabic literature, and dialectical theology, life of the Prophet, medicine, mathematics, polemics, Islamic law, jurisprudence, Hadith, and Tafsir (exegesis of the Quran). It is important to note that out of the twenty subjects; only eight can be considered as solely religious. The remaining subjects are otherwise secular and were included in Nizami curriculum both to equip the students for civil service jobs and as an aid to understanding religious texts.
47. Suyanta, S., & Ikhlas, S., "Islamic education at Mughal kingdom in India (1526-1857)". Al-Ta Lim Journal, 2016, 23(2), 138.
48. For example, Tuzuk-i-Baburi (Baburanamah) is the autobiography of Zahiruddin Muhammad Babur. Tuzuk-i-Jahangiri is the autobiographical account of the Mughal Emperor Jahangir (1605-1627 AD).
49. Jaffar, S. M. op. cit., p. 05.
50. S.N. Mukeiji, Education in India Today and Tomorrow, Acharya Book Depot, India, Baroda, 1964. p. 19.
51. L. Lyer, "Direct versus indirect colonial rule in India: long-term consequences", *the Review of Economics and Statistics,* 92(4), 2010, pp.693–713.
52. Mujeeb Ashraf, *Muslim Attitude towards British Rule and Western Culture,* Delhi, 1982, p. 85.
53. S. Evans, 'Macaulay's minute revisited: Colonial language policy in nineteenth-century India', *Journal of Multilingual and Multicultural Development,* 2002, Volume 23 (4), pp. 260–281.

Date of Submission : 15.02.2022
Date of Acceptance : 08.06.2022

**Jagannath University Journal of Arts**
**Volume 12, No 01, January-June 2022**

# British educational policy in colonial Bengal: A critical context

Afsana Ahmed*

**Abstract**

In colonial India, the British gradually created a complex and centralised education system. This essay assesses and analyses the British government's effort to reform Indian education. It focuses on the educational practices of the British East India Company from 1696 until World War II ended in 1944. The British colonial government and Christian missionaries worked hard to ensure that Indian elites could communicate effectively in English. For young Muslims, education was critical in order for them to properly understand Islam's precepts. Higher education was provided through the Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh and the University of the Punjab. In colonial India, education policy was a primary concern for the colonial authorities. Approval for a specific linguistic method in education was interpreted as favouring religious education. In political debates, the arguments over the establishment of the Mohammedan Anglo-Oriental College and Punjab University are reflected.

## Introduction

Critical inquiry and reform through education can help both the individual and the culture. India's colonial state followed Europe's lead, and the new 'modern state' was established as a government entity. The colonial government and Christian missionaries made every effort to educate Indian elites in English. According to Dirks, colonial knowledge was a result of the British approach to India. In colonial India, the British gradually created a complex and centralized education system.[1]

The colony was not exclusively inhabited by colonists and colonizers, as Albert Memmi points out, therefore discussions of these colonial relationships are complicated.[2]Fort William was established in Calcutta in 1696 for security reasons. In 1792, the President of the East India Company established a Sanskrit college in Benares. In 1784, Sir William Jones founded the Calcutta Asiatic Society to promote eastern studies. The Bengali alphabet printing letters were created by Charles Willkins. This history of the beginnings of the concepts of center and periphery relates to all aspects of inclusive growth. In the history of education, these notions have also been used. The ability to educate a nation's inhabitants and to become a national generator of scholarship and learning has become one of a significant power's most important resources.

The purpose of this research is to assess and analyses the British government's effort to reform Indian education. It focuses on the educational practices of the British East India Company from the commencement of their governance until World War II ended in 1944. The main body of the essay is divided into four parts. The opening

* Assistant Professor, Department of History, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh

section introduces the essay's purpose as well as the approach that was employed. The background of Bengal's socioeconomic educational situation will be discussed in the second section. The third segment focused on educational initiatives implemented by British authorities, as well as Indian reactions to these policies. The consequences of these measures were examined in the latter section of this discussion. Finally, the article will focus on how educational policies affect the functioning of the British administration and the inhabitants of the subcontinent throughout colonization.

## Objectives and methodology

The purpose of this study is to explore and evaluate British government efforts aimed at improving Indian education. To understand how educational institutions aided the development of colonial subjects in India, we would first study policies and processes, as well as how they were seen by colonial authorities on the ground in terms of imperial politics and ideals. In this essay, the historical context of two different types of documentary sources was examined using a critical research technique. Educational policy documents from both the British and Indian governments are included in the collection. Secondary sources of information include books, journals, and articles.

## Historical context

The British approach to India, which was informed by orthodox intellectual traditions in the West, had a great impact on colonial education.[3] The colonial government and Christian missionaries worked hard to guarantee that Indian elites could communicate effectively in English. In terms of education, there were no plans in place to meet the requirements of the poorest members of the lower castes.[4] For modernity in South Asia, Chakrabarty feels that European concepts are both required and insufficient.[5]

Purdah, or isolation, was a Muslim ritual that prohibited girls from associating outside of their families. Rokeya Sakhwat Hossain was denied access to formal schooling when she was born in 1880. For young Muslims, education was critical in order for them to properly understand Islam's precepts.[6]Prior to the British conquest in the nineteenth century, this was a vestige of the Mughal Empire's educational traditions.[7]On the subcontinent, the educational experiment could be considered as a unifying force. Education was a major consideration for India's Hindu population. The Arya Samaj and the Indian National Congress began pushing resurrected gurukuls as a tool to enlist Indian youngsters in the freedom movement.[8] The education of Hindu populations in Northern India was also influenced by the work of Christian missionaries throughout the region.[9]

## The educational policies of the British government in colonial Bengal

The history of colonial education in India has been characterised by themes of community and social inequity. According to William Talbot, major confrontations between Hindus and Muslims occurred throughout the colonial administration, and communal violence was entirely a British invention.[10]The British colonial

bureaucracy arrayed Muslim feudal elites against Hindu feudal elites. The Charter Act of 1813 established a system of education with the purpose of generating a small number of people who would be native Indians in shape and appearance but Englishmen in aesthetics and ideas after re-establishing some stability in company-ruled Bengal. However, the education system established by the Charter Act of 1813 could be regarded as the government's first step in spreading education in India. Consequently, despite its attempts to promote education, the corporation failed to recognise that it was the obligation of the government and society to provide it. The Charter Act has section 43. This section included a recommendation to allocate one lakh rupees to mass education. The Charter Act, on the other hand, included some smart innovations that made it difficult to spend even a single rupee on education before 1823.[11]

**Committee of the Public Instruction**

To govern Bengal province's educational activities, a ten-member 'General Committee of Public Instruction' was established in 1823.[12]The British established a Committee of Public Instruction, which was separated into two groups: Anglicists and Orientalists. The Anglicists campaigned for British education, while the Orientalists argued for indigenous education. The majority of the members of the committee were proponents of Arabic and Sanskrit.[13]The committee passed the following resolutions: The Benares Sanskrit College and the Calcutta Madrasa were reorganised. Two eastern institutions are being developed in Delhi and Agra. Appointing native pandits to translate English knowledge and science texts into oriental languages.[14]However, rather than receiving a positive response, the committee's decision was met with criticism from the Indian minority. Raja Ram Mohun Roy, the leader of the opposition party, complained to Viceroy Roy for overturning the resolution to build a Sanskrit college in Calcutta. Calcutta's Sanskrit College was founded in 1824. The senior members of the committee argued for a more Oriental educational system. Since both sides had an equal number of members, the conflict got intense, and the activity stagnated.[15]

Lord Macaulay was appointed as president of the Education Committee of Governor General Lord Bentinck's Council. He was a passionate Anglicist who despised Sanskrit and eastern education in India. He assumed that, although English educated Indians are Indians in terms of skin colour, they would have European tastes and mental aspirations. He predicted that British power in India would triumph.[16]

**Macaulay's Minute and Bentinck's Educational Resolution, 1835**

Macaulay's statement is regarded as the direction in the domain of English instruction in India. In an ordinance dated March 7, 1835, Lord Bentinck accepted the patronization and promotion of knowledge and science in India through the English medium as the government of India's educational plan. A huge number of state and government-funded schools and colleges were built in Bengal's district

capitals once the downward filtering theory was accepted. The Calcutta Medical College set the precedent for professional medical education in the western world. In 1835, Bentinck established the college with the purpose of training the country's youth in the Western way of medical study, irrespective of race or ethnicity.[17]

Though a class of people was created for the foreseeable future to agitate in favour of the British government after learning English, the establishment of the Downward Filtration Policy limited this new education to a class of opportunities. Dhaka College was established in 1841, Sils College in 1843, and six more colleges were created between 1843 and 1845 in Bengal. Lord Hardinge declared in 1845 that candidates for government service would be selected by the Council of Education through a competitive examination. As a result, there was a resurgence of interest in English, and speaking schools and institutions started appearing across Bengal.[18]

**The Educational Despatch of 1854**

In 1854, Sir Charles Wood, the President of the Board of Control at the time, issued his famous Education Despatch. It outlined the importance of education as part of the colonial plan for the British in India. The Despatch also called for the establishment of three new universities and an increase in primary education.[19] One of the final recommendations made in the Despatch was to promote female education.[20]Wood's Educational Despatch, which set out a detailed strategy for the subcontinent's future educational system, was a pivotal event in India's modern educational history. The government is particularly concerned about the importance of developing meaningful knowledge available to the mass's community.

The Despatch focuses strongly on providing western education in English while also encouraging oriental research. It was emphasized that English be used as the medium of instruction in western education. facilitated the establishment of a vocational qualification focused vernacular elementary school for the entire village. Female education, training of teachers, and ethnic education were all emphasized. Calcutta, Bombay, and Madras were all supposed to create universities designed after London's University. Each of the five provinces has its own department of education and the establishment of a grant-in-aid scheme. Teachers were recommended to enrol in a teacher education programme. Female education, as well as Muslim education, were encouraged.[21]

The government's intention was to make education more popular without increasing tuition fees, and it was mostly successful. The Department of Public Instruction, often known as the government education bureau, was founded in 1854. Under the grant-in-aid scheme, the government offered financial help to 79 English high Schools and 140 middle English schools in 1855. The development of non-governmental organizations was encouraged under this arrangement.[22]

**The University Act, 1857**

The establishment of Calcutta University was a watershed milestone in Bengal's modern history. Calcutta University was established on January 24, 1857, by the University Act of 1857, which was passed by the Governor-administration General's

administration (1856-1862). It began with four faculties, similar to the other two universities in Bombay and Madras: Arts and Science, Law, Medical, and Engineering. They lacked their own curriculum, and these conditions remained until the early twentieth century. As a result, the western-educated college students were able to maintain their reputation not just in Bengal but also throughout India.[23]

**The Indian Education (Hunter) Commission, 1882**

The Hunter Commission was designed to advise government and non-government educational policies in the Indian subcontinent. The main purpose of the committee was to research the nature and evolution of India's educational system. The group examined several issues in basic and secondary education, as well as parts of higher education, in 1883.[24]

Until 1890, the Hunter Commission was India's most important educational policy endeavor. Its ideas aimed to strengthen the educational system on the subcontinent and adapt it to the demands of the colony. The commission approved a basic and secondary education strategy for India. It also made proposals for female education as well as education for low-caste people. Bengal comprised half of the 3097 English high schools in the United Kingdom in 1901-02. On the other hand, the subcontinent experienced a vast growth in higher and secondary education as a result of the commission's proposal that non-government attempts at higher education be promoted.[25]

**University Reforms Act, 1904**

Viceroy Curzon sought to improve India's educational system. With only a minimal educational component, his primary motivation was political. According to Indian educated people, Curzon's activities were an attempt to strengthen imperialism. Curzon's University Reforms Act of 1904 was designed to remedy the challenges, although his political motivations were broader. He stated that an unregulated, low-cost, low-quality education system breeds anti-British feelings and should be avoided at all costs.[26]However, the efforts he made under the Indian University Act to prohibit it were insufficient to accomplish his purpose. It was unable to enhance academic standards, and education progress was not gradual; rather, education was Indianized in its organisation. He initially concentrated on the country's education, focusing on implementing the required procedures to ensure that education improved. As a result of the commission's report and recommendations, the Indian Universities Act was passed in 1904.[27]Nationalist politicians were vociferous in their opposition to the act. The nationalist movement has pushed the issue of mass education to the forefront. Gopal Krishna Gokhle, an Indian nationalist, demanded that the government recognise the principle of providing access to education. Although Curzon defended increased state control over education in the name of quality and efficiency, his true motivation was to restrict education and prepare educated minds to be government sympathizers. The act increased university supervision over private colleges by introducing stricter affiliation and periodic inspection requirements.[28]

## The Calcutta University (Sadler) Commission, 1917

In 1917, the Indian government established a commission to investigate it and report on the problems at Calcutta University. The panel is generally recognized as the Sadler University Commission, and its chairman is Dr. M.E. Sadler. He was the Vice-Chancellor of Leads University in England. The panel suggested that significant efforts be made to address deficiencies in university education. One of its objectives was to transform Calcutta University into a legitimate educational institution, as well as to expedite the establishment of a university in Dhaka. Many of the commission's recommendations were not adopted due to the government's and education authorities' lack of interest. Several of the commission's major resolutions, including the establishment of Dhaka University in 1921, were carried out. According to the commission, a board of secondary and intermediate education should be constituted. It was thought that advancing from high school to university education was a requirement for advancing to university education. Throughout this time, seven new universities were established: Mysore, Patna, Banaras, Aligarh, Dacca, Lucknow, and Osmania.[29]

## Diarchyand Education, 1921-1937

The Government of India Act was passed by the British parliament in 1919. It separated the provincial executive into two parts: councilors and ministers. The British councilors were in charge of reserved subjects, whereas the Indian ministers were in charge of transferable disciplines. Education, which had already been assigned to the Indian ministers, constituted their direct duty. As a result, ministers were unable to make significant improvements in education because English councilors failed to provide the necessary funds to Indian ministers. As a result, the Indians were displeased. Education, which faces major challenges, has expanded rapidly, largely due to charitable endeavors.[30]

## Hartog Committee

Education's continuous expansion resulted in a dramatic decrease in quality and the abolition of privileges. In India's educational system, there has been a lot of dissatisfaction. The Hartog Committee was constituted to investigate the situation. In the national context, the committee recognized the necessity of basic education. However, the concept of massive development was opposed. Secondary school curricula need to be broader, with a strong focus on business and industrial disciplines, because then students can prepare for practical professions, according to the group. The university's deficiencies as a source of lower-quality education were acknowledged by the panel.[31]

## Wardha Scheme of Basic Education

The Government of India Act was passed by the British parliament in 1935. The Congress party aimed to create a national policy for education. Mahatma Gandhi campaigned for the Wardha initiative, a basic education programme. The Zakir Hussain Committee polished out the flaws in the system, creating a detailed syllabus

for a variety of crafts and making recommendations on professional development, oversight, assessments, and administration. The project was stopped due to the onset of World War II in 1939 and the departure of Congress ministers. Due to the onset of World War II in 1939 and the departure of Congress ministers.[32]

**Sergant Plan of Education**

In 1944, the central advisory board of education published a report on post-war conditions. The approach is known as the Sergant plan, because Sir John Sergant was an advisor to the Indian government. It worked for the establishment of elementary and secondary schools, along with equal education and compulsory education for children aged 6 to 11. Academic and technical high schools were to be established. The Sergent plan might be considered as a method for reforming education all over the state.[33]

**Reactions to Education Policy**

At the end of the nineteenth century, colonial educational policy was the consequence of a prolonged and progressive evolution of ideas. Higher education was provided through the Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh and the University of the Punjab. Their communities revealed whether representatives of these two religious and ethnic groups regarded their own positions. The perspectives stated on educational policy mirrored the indifference of many newspaper editors, writers, and observers. In the 1860s, Lahore was home to numerous publications that maintained strongly opposing editorial positions.[34] The colonial press in India's North-Western Territories and Oudh, on the other hand, emphasised the value of education. The Indian people's unity was the most essential aspect to consider when assessing these initiatives. The establishment of the Dayanand Anglo-Vedic College in 1886 provided an opportunity for inter communal cooperation as well as educational opportunities for Indians.[35]

In colonial India, education policy was a primary concern for the colonial authorities. The Tribune's editors had seen the separation of Hindu and Muslim educational institutions as part of a wider strategy to separate and subjugate India. The arguments over the establishment of the Mohammedan Anglo-Oriental College and Punjab University are reflected in the political debates in the Aligarh Institute Gazette and The Tribune. Most of the other criticisms of colonial India's educational policies sprung from these concerns. The colonial higher education policy was branded an "eye-sore" by the Tribune in 1881.[36] Approval for a specific linguistic method in education was interpreted as favouring religious education policy because Hindi and Urdu are so directly allied with Hindu and Muslim groups. Proponents of Gottlieb Wilhelm Leitner, on the other hand, argued that literature from Northern India was written in Sanskrit and Persian.[37]

**Conclusion**

Education was viewed by the British as a means of observing and assessing the people of India to control their knowledge and power. The fundamental purpose of the British government was to make a profit, and British education policy was aimed

at separating Hindus and Muslims on the subcontinent. In India, the promise of education based on a Western paradigm was the split of dominant communities. The British wanted to amplify and exploit the distinctions that had emerged by the late 1800s. Only a small number of personnel needed to conduct the government's affairs were to be educated by the company. Finally, when colonising India, the British administration aimed to use education to preserve and extend their control over the country. However, when the British conquerors gradually took control of the subcontinent, the colonial education system that arose during the Raj consistently rejected this goal. English education, introduced by the English, failed to produce desirable results for the people living near native communities' land. Rather, it established a divide between classes in the realm of education, obstructing national unification. However, if current knowledge and science were taught in the native tongue, it would overcome the language barrier and enable widespread education. By gaining knowledge of history, philosophy, and science through this type of education, a class of logical and educated people was developed that were the forerunners of India's and Bengal’s Renaissances.

## Works cited

1. Nicholas B. Dirks, *Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001), 5.
2. Albert Memmi, *The Colonizer and the Colonized* (Boston, MA: Beacon Press, 1967), 7.
3. Nicholas B. Dirks, *Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001), 5.
4. Roberta Wollons, “Travelling for God and Adventure: Women Missionaries in the Late 19th Century,” *Asian Journal of Social Science* 31, no. 1 (2003), 55-71.
5. Chakrabarty, *Provincializing Europe*, 4.
6. Gail Minault, *Secluded Scholars: Women’s Education and Muslim Social Reform in Colonial India* (London, GBR: Oxford University Press, 1998), 64, 251-255.
7. Viswanathan, *Masks of Conquest*, 152.

8Francesca Orsini, *The Hindi Public Sphere, 1920-1940* (Unpublished PhD thesis, University of London, 1997), 113.

9. Gail Omvedt, *Cultural Revolt in a Colonial Society: The NonBrahman Movement in Western India, 1873-1930* (Bombay, IND: Scientific Socialist Education Trust, 1976), 115.
10. Cynthia Talbot, “Inscribing the Other, Inscribing the Self: Hindu-Muslim Identities in Pre- Colonial India,” *Comparative Studies in Society and History* 37, no. 4 (1995), 693.
11. Chaliha, A, Borah S, Neog S, Foundation Of Education, Bidya Bhavan, Jorhat, 2016, P.64
12. H. V Hampton, Biographical Studies in Modern Indian Education, London, 1947, p. 41.

13. Chopra, P. N., Puri, B. N., & Das, M. N. (2003). *A comprehensive history of India (Vol. 3).* New Delhi, India: Sterling Publishers Pvt. Ltd.

14. H. V Hampton, Biographical Studies in Modern Indian Education, London, 1947, p. 41.

15. Dermot Killingley, s.v. "Roy, Rammohun (1772?–1833), political and religious thinker," *Oxford Dictionary of National Biography*, Oxford University Press, 2004 [http://www.oxforddnb.com/view/article/47673, accessed 25 November 2015]

16. William Thomas, s.v. "Macaulay, Thomas Babington, Baron Macaulay (1800–1859), historian, essayist, and poet," *Oxford Dictionary of National Biography*, Oxford University Press, 2004 [http://www.oxforddnb.com/view/article/17349, accessed 15 December 2015]

17. William Bentinck, "Lord Bentinck's Resolution, 7th March 1835," in *A Source Book of Modern Indian Education: 1797 to 1902*, ed. M. R. Paranjpe (London, GBR: Macmillan and Company, Limited, 1938), 35.

18. K. A. Ballhatchet, "The Home Government and Bentinck's Educational Policy," *Cambridge Historical Journal* 10, no. 2 (1951): 224.

19. Board of Control of the East India Company, "Educational Despatch of 1854," in *A Source Book of Modern Indian Education: 1797 to 1902*, ed. M. R. Paranjpe (London, GBR: Macmillan and Company, Limited, 1938), 73.

20. Board of Control, "Educational Despatch of 1854," 105.

21. Grover,B.L., Mehta, A, A New Look at Modern Indian History, S. Chand Publication, 27th edition New Delhi,P.261.

22. *ibid*

23. T.C Dasgupta, Some Aspects of Society in Bengal, Calcutta,1935, p. 193.

24. William W. Hunter, "Education Commission of 1882," in *A Source Book of Modern Indian Education: 1797 to 1902*, ed. M. R. Paranjpe (London, GBR: Macmillan and Company, Limited, 1938), 169.

25. *Ibid*

26. Sengupta, Indra and Daud Ali, eds., *Knowledge Production, Pedagogy, and Institutions in Colonial India*. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2011.

27. Hundred Years of the University of Calcutta, Calcutta, 1957, p. 142.

28. Kochhar, S.K., Pivotal Issues in Indian Education, Sterling Publisher Pvt. Ltd., New Delhi, 2005, P.7

29. A.P Dasgupta, Asutosh Mukherjee, Calcutta, 2000, P. 48.

30. Allender, T., Learning abroad: the colonial educational experiment in India, 1813–1919 2009, P. 727-741. https://doi.org/10.1080/00309230903335645

31. Chutia, M., Growth and development of education in India during British Period in a Historical Perspective, International Journal of Management (IJM), Volume 11 (9), 2020, pp. 1464-1470. DOI: 10.34218/IJM.11.9.2020.141

32. *ibid*

33. *ibid*

34. Asima Ranjan Parhi, Indian English Through Newspapers, Concept Publishing Company, New Delhi, IND, 2008, p. 26.

35. Dayanand Anglo-Vedic College, "*The Tribune*, December 4, 1886, Lahore."

36. "High Education in India," *The Tribune*, May 14, 1881, Lahore.

37. "Education in the Panjab – III," *The Tribune*, February 16, 1881, Lahore.

Date of Submission : 02.02.2022
Date of Acceptance : 08.06.2022

**Jagannath University Journal of Arts**
**Volume 12, No 01, January-June 2022**

# Repatriation or Rehabilitation? Justification of Rohingya Refugee Through the Lens of Lifeboat Ethics

Farhad Ahmed*
Noorana**

**Abstract**

Over the year, the relationship of host communities and the refugees become topics of discussion by the development practitioners. The host community's livelihood is negatively impacted by the long-term stay of refugees where the government of host countries has to think about the repatriation or rehabilitation process. In the case of Bangladesh, since it has overpopulation, so in the lens of American ecologist Garrett James Hardin's theory of 'lifeboat ethics,' it has the justification of repatriation of Rohingya refugees in Myanmar. This study will find out the justification of the repatriation in the lenses of lifeboat ethics theory. This paper also focuses on the effects of Rohingya refugees on the people of Bangladesh as a host country. The study mainly used secondary sources of data including books, articles, working papers. Major findings of the paper are that, as a host country, there are many negative impacts on Bangladesh due to the long-term stay of Rohingya people including pollution, land degradation, deforestation, illegal drug business, scarcity of local commodities, bad impact on the economy. Considering the negative impacts and the theoretical justification, repatriation of Rohingya people is best suited rather than rehabilitation. The policymakers must take strong initiatives to fulfill the repatriation rather than rehabilitation of Rohingya in Bangladesh.

## Introduction

Strategically, Bangladesh and Myanmar's bilateral relationship are most important, because they have geographical, economic, religious, social, and cultural affinities. Among the two bordering countries, Bangladesh and Myanmar share a land border, river, and maritime boundary where 271 kilometers has a land border. Historically, from the First Anglo-Burmese War (1824- 1826) the bilateral relations began; when Arakan became the first territory of the old Burmese Kingdom and it come under British rule. It was the foundation of close economic and social

interaction between the old Chittagong Division of Bengal in British India and the Arakan region of Burma, which contributes strong conditions of the dynamics of Bangladesh-Burma relations. Officially Bangladesh-Myanmar relations began on 13 January 1972 (Rahman, 2015). Both countries try to maintain a good relationship but in 2017 huge infiltration creates a contradictory relationship (psychological conflict) between these two countries. Similarly, refugee people create a very non-traditional security threat for Bangladesh like-environmental hazards, resource scarcity, irregular migration, illegal drug business, and crime. Bangladesh must think about

*Assistant Professor, Department of Philosophy, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh
** Assistant Professor, Department of Political Science, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh

the issue of repatriation otherwise it can create a great challenge for Bangladesh. In this background, the core objective of this paper is to identify the effects of the Rohingya on Bangladesh. Similarly, this paper also shows the ethical justification of repatriation rather than rehabilitation. This paper will use secondary sources of data to explain the effects, especially on the non-traditional security of Bangladesh.

## Methodology

This paper follows the qualitative method. To describe the long-term effects of Rohingya refugees in Bangladesh, this paper will review the secondary sources of data like- already published research conducted by others, books, journals, and reports. Using American ecologist Garrett James Hardin's theory of 'lifeboat ethics,' it will show the justification of repatriation of Rohingya refugees in Myanmar rather than rehabilitation in Bangladesh.

## Aims and objectives

The main aim is to justify the push in the back of Rohingya refugees in the light of lifeboat ethics. Alongside, the research will explore and analyze the effects of Rohingya refugees on Bangladesh especially local communities on non-traditional security aspects. Finally, this paper shows the justification of repatriation rather than rehabilitation of the policymakers of Bangladesh.

## Importance and result

There are many kinds of literature on Rohingya people in Bangladesh are mainly focused on the impact on the economy by Rohingya people (Lewis, 2018; Dey, 2018), Japan's role in the repatriation process (Farzana, 2020), effects of Rohingya people on Bangladesh in different aspect and the bilateral relationship between Bangladesh and Myanmar (Banerjee, 2020; Rahman, 2015; Parnini, 2013), the security dilemmas of Bangladesh through Rohingya people (Rahman, 2010), repatriation challenges of Bangladesh (Khasru, and Avia, 2018), Rohingya refugee health risk (Islam, 2018), climate change or environmental degradation due to Rohingya refugees (Hassan, 2018), the pathways of solution of Rohingya people in Bangladesh (Gorlick, 2019). There has a literature gap of the justification of repatriation of Rohingya people based on theory; this paper will contribute here. Alongside, it will analyze the impacts of the long-term stay of Rohingya people on the lives and livelihoods of the people in Cox's Bazar in the non-traditional security sector like-national security issues, illegal drug business, environmental degradation, health issues, scarcity of local products. Considering the impacts of Rohingya this paper will find out the justification of repatriation as soon as possible in the light of lifeboat ethics. The present policy of transferring Rohingya people in Bhasan Char is one kind of rehabilitation but they can take the issue differently like- we have places to live in Bangladesh for a long time. However, the newborn baby of Rohingya can demand Bangladesh as their homeland. The government now had to change the budget, the political agenda had to change due to the long-term stay of the Rohingya people. Considering this sensitive issue, strong repatriation is now a time-bound issue and it has ethical justification. This paper is important to analyze the

justification of repatriation rather than rehabilitation based on lifeboat ethics because as an overpopulated country we have resource limitations, land limitations.

**Rohingya people in Bangladesh: the lenses of history**

As a neighboring country, the bilateral relations between Bangladesh and Myanmar can be identified as cordial after the independence of Bangladesh in 1971. There are two reasons for a cordial relationship-one is friendship foreign policy in the newly independent country another one is- recognition of Bangladesh by Myanmar immediately after victory day (1971, 16 December) in 1972. However, certain community of Bangladesh sometimes raises their voice for the pro-democratic struggle in Myanmar. Moreover, there are some issues by which the bilateral relations are considered as discord like- the Rohingya Issue, maritime boundary Issue, Land Border Management, Trade and Investment, Connectivity, and Energy & Natural Resources. Although, the longstanding maritime issue came to the solution after the International Tribunal for the Law of the Sea on 14 March 2012 (Bissinger, 2010).

Although the foundation for the close economic and social interaction between the old Chittagong Division and the Arakan region of Burma started from the First Anglo-Burmese War (1824-1826). Moreover, the formal relationship of Bangladesh-Myanmar began on 13 January 1972 when they have common membership inthe Bay of Bengal Initiatives for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) and Bangladesh-China-India-Myanmar Forum for Regional(BCIM). Myanmar is the potential gateway for an alternative land route opening towards China and South-East Asia other than the sea and such road links create a greater communication network between Bangladesh and South-East Asian countries (Rahman, 2015).

The Rohingyas are known asan ethnic group (Muslim) who live in the Buthidaung and Maungdaw townships of the northwestern part of the Arakan State, Burm (Smith 1991) where since 1974, they have not been recognized as a national minorityand they have been suffering from oppression under the Burmese Army (Tatmadaw) and the Burmese government. As a neighboring county and easy gateway, using the Naf River on the border, they fled masse to Bangladesh. In 1978, the number of Rohingya people was 200,000, in 1978 it was 250,000 and in 1991 it was more than 250,000. Before the huge inflation of Rohingya refugees in 2017, already about 200,000-400,000 were living in Bangladesh (Rahman, 2010: 235; Cookson,

2017a). The last major crackdown was in 2017 and the number was about 700,000 Rohingyas to Bangladesh and totally, it increased the number of Rohingya population around 885,000 in Bangladesh (Banerjee, 2020) and day by day it is increasing due to the birth of the newborn baby.

Rohingya refugees in Bangladesh, create an extra burden, security threat, and pressure on our political and social life and also destroy our cultural distinction, especially in the Chittagong Hill Tracts. At the beginning of refugee influxes, due to multi-party talk of governments of Bangladesh, Myanmar, and the UN the refugees were repatriated in Myanmar (Rahman, 2010), and later years most stayed in

Bangladesh. The Rohingya people also come for treatment and family gatherings. In 2011, there was a sign of improvement in bilateral relations between these two countries because Prime Minister Sheikh Hasina visited Myanmar, the president of Myanmar also expressed willingness to cooperate with Bangladesh to resolve the Rohingya issue and consent to take back registered Rohingya refugees. Previously, in January 2012, the Government of Myanmar was willing to take back 9,000 out of the 28,000 registered Rohingya refugees (Parnini et al, 2013: 141). Moreover, the current massive outflow of Rohingyas into Bangladesh looks set to be extremely tense for the foreseeable future (Idris, 2017); because, the Burmese military government has no intention to accept the Rohingya people as a national minority and instead classifies them as foreigners or illegal immigrants (Nemoto, 2005). To solve the durable solution to the Rohingya problems, bilateral negotiations between Bangladesh and Myanmar, local and international communities could be a pathway (Parnini, 2013); moreover, the repatriation processes continuously fail and without long-term solutions, it creates state and human security issues where the absence of statelessness can improve prospects for successful repatriation (Faulkner, & Schiffer, 2019).

**Rohingya Refugees: impacts on non-traditional security issues**

The Rohingya refugee creates a non-traditional security crisis for Bangladesh, although the Rohingya refugee is treated as human rights violators in Myanmar which have caused their forced migration in Bangladesh where this forced migration is contributing to a non-traditional security crisis in the bilateral relations between Myanmar and Bangladesh (Parnini, 2013). As a host county, Bangladesh faces several types of non-traditional security threats, in some cases, it will be impossible to recover the damages like environmental degradation. The several types of non-traditional security issues in Bangladesh created by Rohingya refugees namely impacts on the environment, scarcity of resources, an increase of crime, information insecurity, drug business, and health crisis.

## National Security Issues

As a host country, Bangladesh is now facing a direct and indirect threat for these refugee people due to their long-time presence in border areas where the situation is getting worse, mentionable in CHT. According to the report of the newspaper, a section of Rohingya has links militant groups both domestic and international. The local newspaper in Cox's Bazar like Chittagong-based Daily Purbokune, the daily Cox's Bazar News, published a series of news concerning this issue against the Rohingya. The people who are focused on the anti-Rohingya campaign assumed that Rohingya's long-term presence created an imbalance in the social-ecological sector in bordering areas (Haque, 2016).After four years of the last Rohingya influx in Bangladesh, it is not now a sample of humanitarian tragedy; rather a possible threat to Bangladesh's internal stability in the present time. Accordingly, it is also a source of tension between Burma and Bangladesh in the sense of interstate.

### Security issue and image of Bangladesh

The Rohingya issue creates a security concern for Bangladesh because undocumented Rohingyas are engaged in unlawful activities like arms trafficking,

drug trafficking, and smuggling. The conflicts between Rohingyas and Bangladeshis especially local people are threatening social cohesion in the region of Chittagong Hill Tracts. On the other hand, they are collecting Bangladeshi passports and going to the third country which is affecting the good image of Bangladesh. In the UNHCR's version, eight unregistered Rohingya refugees to every registered one where the ratio between listed and unlisted refugees stands at 15 to 1. As an overpopulated country, Bangladesh is suffering from severe security problems and unbalanced pressure on Bangladesh's scarce resources (Rahman, 2010).

## Impact on Environment

The unexpected influx of Rohingya refugees in Bangladesh is creating the ecologically fragile region in the southern part of Bangladesh on the brink of an environmental disaster. They are creating swift clearing of the forested hills, residing here and there, cutting the hills for their shelter and thus causing significant damage to the environment (Haque, 2016). Among the seven reserve forests, totaling about 5650 acres, have been damaged due to the erection of make shift shelters, fire wood burning, and anthropogenic activities relating to the subsistence needs of the refugees (Hassan, Smith, Walker, Rahman, & South worth, 2018). As a tourist area of Bangladesh, Chittagong Hill Tracts is facing the crisis of tourism alongside environmental disasters. Gradually, the refugee people are trying to mix up with locality and as a means of their livelihood, they are destroying the forest, the natural beauty, water pollution, air pollution and impacts on animals (especially domestic animal) which impacts on diversity.

## Illegal Drug business and Crime

Since Rohingya people are mostly unconscious and uneducated, unemployed, they are easily engaged in drugs and crime. On the other hand, Banerjee (2020) explains that the border of Myanmar is a significant entry point for illegal drugs which is identified by Bangladesh's Department of Narcotics Control. Several times, Bangladesh has made arrests and busted drug running networks were among those arrested have been several displaced Rohingyas. In the last two years (2017, 2018), Bangladesh has either killedor arrested more than 100 Rohingya drug traffickers as they were crossing the border. 'Yaba', which is called the 'madness drug', has become popular in the last few years and through these refugee people, it spread all over Bangladesh. The law enforcement agencies tried to arrest them in several places during the dealing time. Agents who are working in this illegal drug business are paid by the size of the Yaba consignments they bring in – 5,000 Yaba pills transported to Dhaka or any other urban center in Bangladesh can earn the trafficker 27 10,000 takas (around US$120). Sincethe Naf River runs between the two countries so it is easier for many Rohingyas to exit Myanmar, despite border security, using the river.

## Human Trafficking

Human trafficking becomes a burning issue for Rohingyas which is also growing fast because they are isolated and depressed people at the failed repatriation efforts

(easily they catch up in the trap of human trafficking). Recently Malaysia turned away a trawler-load of Rohingyas who was faced human trafficking, citing the COVID-19 scare as a reason, forcing them to return to Bangladesh (Banerjee,2020).On one side, these refugee people are a burden for Bangladesh, on the other side their crime, trafficking becomes a huge pressure for the Bangladesh government.

## Health issues and COVID-19

As an overpopulated and developing country, Bangladesh had to face a huge challenge to tackle the covid-19 situation. Rohingya people added a new tension for Bangladesh in the issue of repatriation during the covid-19 issue. Similarly, social distance, safe water, sanitation, and hygiene (WASH) services are reaching only 30% of the Rohingya people in need in which no other option than to fetch dirty water from muddy streams, 85% of the refugees still have no access to latrines. This factor increases the risk of communicable disease out breaks. Another disease like the Diphtheria outbreak has resulted in 38 deaths and more than 5800 suspected cases of diphtheria have been reported as of February 2018and skin diseases among the refugees who have arrived since 25$^{th}$ August-with 10 846 and 3422 cases, respectively. Another important health issue is mental health which impacts the forcibly displaced refugees. They are reported to suffer from the flashback of the massacre, anxiety, acute stress, recurring nightmares, sleep deprivation, eating, or even speaking disorders. Women are faced rape and girls and violent deaths of family members have compounded the mental health situation deterioration and theyalso reported facing sexual violence including gang rapes (which resulted in vaginal tears, infections, and posttraumatic disorders) but unavailability and low quality of post-rape care in Bangladesh hampered their mental health (Islam, & Nuzhath, 2018).

## Impacts on tourism industries

As a host country, Bangladesh's most important rising tourism industries which are centered on cox’s Bazar beach are facing threats where the tourist are not safe to visit the longest sea beach in the world. If the local area becomes unstable, then the tourism industries become vulnerable (Lewis, 2018).

## Impact on economy

The Bangladeshi economy is facing adverse effects as a host country to give shelter to the Rohingya. The negative impacts are including price hiking of local products, shortage of food, pressure on our natural resources, and reduction in tourism. The prices of rice have already risen in Chittagong due to the Rohingya problem. The experts say if the repatriation of Rohingya is not possible soon then the consequences would be the worst (Dey, 2018). The people who are relating to their livelihood, lose their job, unemployment problem will increase.

**Justification of repatriation: an analysis through lifeboat ethics**

The American ecologist Garrett James Hardin who was concerned about the danger of overpopulation; give the concept of 'Life Boat Ethics: The case Against helping the poor' where the world considers a lifeboat rather than a spaceship. In the spaceship, no person (or institution) has the right to destroy the fair share of its resources; moreover, Hardin considers the world as a lifeboat rather than a spaceship because the world is divided into rich (approximately one-third) and poor (approximately two-thirds) where the rich have ship and poor are struggling to survive in the to get on the boat (Mappes and Jane,1987,p.391). The ethical questions are- How do you pick who gets on the boat? The possible solution could be-firstly, the boat is overflow or swamped and everyone will go under water where a full justice ensure but it will lead complete catastrophe; secondly, the ship can take as peer capacity (first come first served) where another person could be faced injustice. Thirdly, survival of the fittest policy where the rich people will remain in the ship maintaining the safety (Mappes and Jane,1987, p.392). The issue is that if too many peoples are on the boat the limited resources might run out, they might suffer from diseases and finally, the lifeboat could sink where firstly, we must recognize the limited capacity of lifeboats (Hardin, 1974).

In this theoretical backup, then the first solution is not possible in the case of Rohingya because then the people of Bangladesh will face danger or suffering due to refugees. The third solution is also quite difficult because as a promising developing country Bangladesh is not as stable as a developed country so it could cope with the policy of "survival of the fittest". The second solution is suited for Bangladesh in the case of the solution of refugees. The capacity Bangladesh has should take the load on it. Since the Rohingya influx started a long time ago, so already fulfilled the capacity of sheltering them. Now, the only solution is repatriation where the state has to take a strong role to push back them into Myanmar.

**Figure:** how the 'lifeboat ethics' concept applies to the repatriation of Rohingya people in Myanmar.

| Life Boat Ethics | Rohingya Refugee |
|---|---|
| The world is a lifeboat, not a spaceship | Rohingya refugees categorized as poor, stateless, genocide experienced community |
| Resources are limited | Resources and land in Bangladesh is limited where Rohingya is an extra burden on Bangladesh |
| Overpopulation is a problem | Overpopulation is an existing problem in Bangladesh, where Rohingya created it as extra-burden |
| The extra burden of the population must be controlled | Previously mentioned that Bangladesh is considered overpopulated country where Rohingya people create an extra burden on this over population, so as peer the life boat ethics this Rohingya people should controlled where repatriation is the suitable way rather than rehabilitation. |
| If the extra burden is taken, the | Bangladesh has limited geographical and economic resources where staying Rohingya people for the long run created a huge crisis like security problems. For example |

| | |
|---|---|
| country's resources can run out, diseases can spread, even ships can sink | Rohingya people create crime, drug business, environmental degradation, daily commodities prices are high due to local resources shortage. |
| Three possible solutions-1. complete justice, complete catastrophe, 2. first come first served, 3. survival of the fittest. | For Bangladesh cases, ‘First come First served’ could be applied, and ethically repatriation is a strong solution rather than rehabilitation. |

**Sources:** Author’s compilation

Moreover, the issue of repatriation sometimes seems difficult due to continuing the ongoing genocide in Myanmar, morally we have to be careful about the violence against Rohingya again (Islam, 2020); which required both countries' consent. In cases of Rohingya Refugee, Myanmar did not recognize the refugee as a Burmese (considered sometimes as a minority community) so it is too hard of repatriation. On the other hand, Myanmar is mostly conducted by the military government so democratic or minority values are ignored. In this perspective, Bangladesh must face difficulties for repatriation. No progress since on this issue, although Bangladesh raised its voice in several international conferences about these refugee people. From a strategic point, China, the USA, and Russia are not cooperative about this issue.

It could be a solution to use the cheap labor of Rohingya people in the agricultural sectors in CHT because they already destroy the forest or local trees to build up shelters where the daily commodities prices are high. The challenges are that if the Rohingya people could understand they are becoming the main stream people in Bangladesh, then their mentality could be not to go to Myanmar again. However, on November 23, 2017, Bangladesh and Myanmar already signed a repatriation deal and updated it on January 15, 2018, whereby Myanmar agreed to accept 1,500 Rohingyas each week and complete the repatriation process by 2020. Although, practically they are not creating a conducive environment for repatriation which violates international law (Khasru & Avia 2018).

Although there have great opportunities to expand the bilateral relations with Myanmar because it is a potential market for our products, the economic and trade relations are being disrupted due to the Rohingya crisis. In these circumstances, ASEAN, the US, China, and Russia are the key players. They should think of the new doctrine that is called R2P (Responsibility to Protect) and need to put pressure on the Myanmar government to stop the atrocities (Rahman, 2015).On the other hand, both nations are members of the sub-regional grouping called BIMSTEC, as well as of China’s Belt and Road Initiative, and Bangladesh is also moving towards a closer formal relationship with the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) of which Myanmar is a member. It has joined the ASEAN Regional Forum (ARF) and is likely to enter a 37 Dialogue Partnership with ASEAN (Banerjee, 2020). Through this regional organization, pressure should be created to ensure a convenient atmosphere for the Rohingya people.

## Conclusion

From the late 1970s, the Rohingya refugee people have been disrupting the bilateral relations between Myanmar and Bangladesh. Although, Myanmar violates the human rights of Rohingya people which has caused their forced migration to neighboring countries like Bangladesh. This forced migration is creating a non-traditional security crisis for Bangladesh. The long-term problem of Rohingya people needs a long-term solution where Bilateral negotiations can be a stable way to repatriate them. Through the third-party mediator, regional organizations or the UN could play a strong role to force Myanmar to push back of Rohingya people. Since the repatriation process has ethical or theoretical justification, the policymaker should be concerned about it immediately before having a great negative impact from a long-term stay of Rohingya people.

## References


Banerjee, Sreeparna. *The Rohingya Crisis and Its Impact on Bangladesh-Myanmar Relations*. Observer Research Foundation, 2020.

Bissinger, Jared. "The maritime boundary dispute between Bangladesh and Myanmar: Motivations, potential solutions, and implications." *Asia Policy* 10.1 (2010): 103-142.

Cookson, F. "Impact of the Rohingya Crisis on Bangladesh (Part I)." *The Independent* 9 (2017). Available at:http://www.theindependentbd.com/post/117945

Dey, Sudip. "Adverse Rohingya impacts on Bangladeshi economy and its solutions." *American Journal of Trade and Policy* 5.2 (2018): 81-84.

Faulkner, Christopher, and Samuel Schiffer. "Unwelcomed? The effects of statelessness on involuntary refugee repatriation in Bangladesh and Myanmar." *The Round Table* 108.2 (2019): 145-158.

Gorlick, Brian. "The Rohingya refugee crisis: rethinking solutions and accountability." *Refugee Studies Centre, Working Paper Series* 131 (2019).

Haque, Md Mahbubul. "Protracted displaced and concern for security: The case of Rohingya." *Proceedings of the 4th International Conference on Magsaysay Awardees, Good Governance and Transformative leadership in Asia, College of Politics and Governance*. 2016.

Hardin, Garrett. Lifeboat Ethics: The Case Against Helping the Poor, *The Psychology Today*, September 1974, Access date: 1 February 2022, Available at:

https://rintintin.colorado.edu/~vancecd/phil1100/Hardin.pdf

Hassan, Mohammad Mehedy, et al. "Rohingya refugee crisis and forest cover change in Teknaf, Bangladesh." Remote Sensing 10.5 (2018): 689.

Islam, Mohammad Mainul, and TasmiahNuzhath. "Health risks of Rohingya refugee population in Bangladesh: a call for global attention." Journal of global health 8.2 (2018).

Islam, Nurul. "Rohingya: a people under endless Tyranny." Asian Affairs: An American Review 48.1 (2020): 14-40.

Khasru, Syed Munir, and Avia Nahreen. "Repatriation Challenges faced by Developing First Asylum Countries & the International Response Mechanism: The Case of Myanmar

Rohingyas in Bangladesh." Available at: https://www.g20-insights.org/wp- content/uploads /2018/07/repatriation-challenges-faced-by-developing-first-asylum-countries-the-international-response-mechanism-the-case-of-myanmar-rohingyas-in-bangladesh-1532527339.pdf, Access date: 30 January 2022

Lewis, David. "The view from Cox's Bazar: assessing the impact of the Rohingya crisis on Bangladesh." *South Asia@ LSE* (2018).

Mappes, Thomas A., and Jane S. Zembaty. "Social ethics: morality and social policy." (1987).

Nemoto, Kei. "The Rohingya issue: a thorny obstacle between Burma (Myanmar) and Bangladesh." *J Burma Stud* 5 (2005): 19.

Parnini, SyedaNaushin, Mohammad Redzuan Othman, and Amer Saifude Ghazali. "The Rohingya refugee crisis and Bangladesh-Myanmar relations." *Asian and Pacific Migration Journal* 22.1 (2013): 133-146.

Parnini, SyedaNaushin. "The crisis of the Rohingya as a Muslim minority in Myanmar and bilateral relations with Bangladesh." *Journal of Muslim minority affairs* 33.2 (2013): 281-297.

Rahman, Sonia Farhana. *Bangladesh-Myanmar bilateral relations and regional implications*. Diss. University of Dhaka, 2015.

Rahman, Utpala. "The Rohingya refugee: A security dilemma for Bangladesh." *Journal of Immigrant & Refugee Studies* 8.2 (2010): 233-239.

Kishan, Ram, and Michael True. "Smith, Martin. Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity. rev. ed. New York: Zed Books, 1999." (2001).

Farzana, Shamsi. "Role of Japan in Rohingya Repatriation: Economic Issue.", available at: http://www.ijmfe.com/wp-content/uploads/2020/03/ Role-of-Japan-in-Rohingya-Repatriation. pdf, Access date: 25th January 2022.

Date of Submission : 17.02.2022
Date of Acceptance : 22.05.2022

**Jagannath University Journal of Arts**
**Volume 12, No 01, January-June 2022**

# Pronunciation of the English Consonant Diagraphs by Bangladeshi EFL Learners: An Analysis

Jakir*

**Abstract**

This paper aims to investigate how the English consonant diagraphs are pronounced by the Bangladeshi EFL/ESL learners. For this purpose, language samples were collected from 40 EFL/ESL learners who are currently studying English as a compulsory subject at different schools located in Dhaka, the capital city of Bangladesh. The findings show that the English consonant diagraphs pose considerable pronunciation difficulties for the Bangladeshi EFL/ESL learners. On the basis of the findings, this paper offers some recommendations for the EFL/ESL teachers and learners so that they can improve the quality of the pronunciation of this English diagraphs.

**Keywords:** Diagraphs, pronunciation, EFL, ESL, recommendations.

## Introduction:

The English spelling system poses a lot of troubles and confusions for the non-native EFL/ESL learners when they are to pronounce English words because many English letters do not have any one-to-one correspondence to English sounds or English phonemes (Kenworthy 97). As a result, EFL/ESL learners are often confused regarding how they are to pronounce the sounds represented by the English letters.

The English consonant letter ‘s’ has many phonemic representations. For example, the letter ‘s’ in the words like *sugar*, *preside, sun,* and *measure, has* some four different phonemic representations /ʃ/, /z/, /s/ and /ʒ/ respectively. Likewise, the English vowel ‘a’ is also a multi-phonemic letter which is pronounced differently in different contexts. For example, the ‘a’ in the words *about, lad, male,* and *part,* has three different phonemic values /ə/, /æ/**,** /eɪ/ and /ɑː/. All other multi-phonemic letters also behave differently in different linguistic situations.

Like the multi-phonemic letters, English diagraphs, which are the combination of two letters, generally represent only one sound. For example, the diagraph ‘th’ in the word *they* represents only one sound, not two although this diagraph consists of two letters. Again, the same diagraph can have a different phonemic value in a different linguistic context. The ‘th’ in the word *bath* has a different phonemic representation /θ/. Such different phonemic representations of the consonant diagraphs in English cause much confusion among the English learners of the EFL/ESL countries.

So, the present study deals with the phenomenon of the diagraphic representations of English consonant sounds and the pronunciation difficulty that they pose for the EFL/ESL learners in Bangladeshi context.,

---

*Associate Professor, Department of English, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh

## 2. Theoretical Analysis:

Diagraphs are the combinations of two letters representing a single sound in a word. According to Kelly, such pairs of words having only one sound value are known as diagraphs (123). For examples, the pairs of English consonant letters 'th', 'ck', 'ph' 'wh', 'ch', 'sh', 'ng', 'gh' , etc. have a single phonemic representation or sound value. However, some diagraphs represent more that one sound depending on the contexts (Ibid). For example, the diagraph 'ch' can have three sounds: /k/ in *character*, /tʃ/ in *chip,* and /ʃ/ in *machine.*

A short analysis of English diagraphs and the sounds that they represent is presented below:

The diagraph 'gh' has three phonemic values, that is, it is pronounced in three different ways in different contexts. In the words *ghost, ghastly,* and *ghetto,* the 'gh' has the phonemic value of a voiced velar plosive /g/ (Kenworthy, 103).This diagraph is also pronounced like the labio-dental fricative /f/ in *fish (Ibid).* For example, in word final position, the 'gh' is pronounced /f/ as in the words *cough, enough, and tough.* And in some cases in word final positions, this diagraph is not pronounced but remain silent, that is, has zero phonemic value as in the words *tough*, and *ought* (Kelly, 149).

Likewise, the diagraph 'ch' has three phonemic representations. In the word initial and word medial positions, this diagraph has the sound value of a voiceless velar plosive /k/ as in the words *character* and *technical* (Kenworthy, 103). It also represents a voiceless palato-alveolar affricate sound /tʃ/ both in the word initial and final position as the words *chat* and *each (Ibid).* It can also have the phonemic value of a palato-alveolar fricative /ʃ/ as in the words *Chicago* and *machine.*

The diagraph 'th' also has two phonemic representations: the voiceless dental fricative /θ/ and the voiced dental fricative /ð/. The 'th' in the words *theme, thick,* and *heath,* represents the voiceless dental fricative /θ/, and the 'th' in the words *bathe, they and brother* represents the voiced dental fricative /ð/.

The diagraph 'wh' has two phonemic values: a voiced approximant /w/ and a voiced glottal fricative /h/. The 'wh' in the words *what, where,* and *when represents /*w/, and the 'wh' in the words *who* and *whole*, represents /h/.

Other pairs of consonants like 'sh', 'ng', 'qu', 'ck', 'ph' etc. have only one phonemic value. The diagraphs 'sh', 'ng', 'qu', 'ck', and 'ph' have the phonemic values /ʃ/, /ŋ/, /k/, /k/ and /f/ as in the words *share, bang, quite, check,* and phone respectively.

## 3. Objective of the Study:

The objective of this study is to investigate how the English consonant diagraphs are pronounced by .Bangladeshi EFL/ESL learners. However, as some diagraphs have only one sound value, they are not considered here because their pronunciation does not cause any confusion for the EFL/ESL learners. So, specifically, the study aims to find out:

a. How the diagraph ‘ch’ is pronounced by Bangladeshi EFL/ESL learners
b. How the diagraph ‘gh’ is pronounced by Bangladeshi EFL/ESL learners
c. How the diagraph ‘wh’ is pronounced by Bangladeshi EFL/ESL learners
d. How the diagraph ‘th’ is pronounced by Bangladeshi EFL/ESL learners

## 4. Methodology:

### 4.1. Research approach:

The study deals with the qualitative data, that is, the pronunciation of the English consonant diagraphs of the Bangladeshi learners.

### 4.2. Study Area:

The study was conducted at some eight educational institutions in Dhaka, the capital city of Bangladesh.

### 4.3. Study Population:

This study was conducted on a total of 40 (forty) EFL/ESL learners from some eight schools at the secondary level. From each of these institutions, five learners were selected through convenient sampling.

### 4.4. Data Collection:

As the study involves the pronunciation of English sounds, a list of 10 English words was developed. In this word list, the English consonant diagraphs ‘th’, ‘ch’, ‘wh’, and ‘gh’ occur twice or thrice in different positions. The table below shows the distribution of these diagraphs in different linguistic contexts:

Table 1: Consonant Diagraphs Used in the Study

| SL | Words | Diagraphs | Context | Phonemic Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chasm | ch | Initial position | /tʃ/ |
| 2 | machine | ch | Medial position | /tʃ/ |
| 3 | march | ch | Final Position | /tʃ/ |
| 4 | who | wh | Initial position | /h/ |
| 5 | what | wh | Initial position | /w/ |
| 6 | ghost | gh | Initial position | /g/ |
| 7 | though | gh | Final position | silent |
| 8 | enough | gh | Final Position | /f/ |
| 9 | health | th | Initial position | /θ/ |
| 10 | bathe | th | Initial position | /ð/ |

Source: Developed by the Researcher

The participants are asked to pronounce these words aloud and their pronunciation is recorded by the sound recorder of Samsung M 10 mobile set.

### 4.5. Data Analysis:

After collecting data from these learners, the recorded pronunciation of these words was transcribed with IPA. The transcribed pronunciation was then compared with that of *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Incorrect pronunciations of these diagraphs are identified through contrastive analysis.

## 5. Findings and Discussion:

The empirical data collected from the respondents show that the pronunciation of English consonant diagraphs causes considerable problems for the Bangladeshi EFL/ESL learners. Most of the pronunciations of the diagraphs in this study were found to be incorrect. The findings that emerged from the study are detailed below:

### 5.1. Pronunciation of the Diagraph 'ch' in the Study

The data in Table 2 indicate that 62.5% learners in the study pronounced the word initial 'ch' in the word *chasm* as the voiceless velar plosive /k/ while 37.5 % learners mispronounced this diagraph like the voiceless palato-alveolar affricate /tʃ/.On the other hand, 82.5 % learners pronounced the word final 'ch' in the word *march* like a voiceless palato-alveolar affricate /tʃ/ whereas 17.5% learners mispronounced this like the voiceless alveolar fricative/s/. Furthermore, the 'ch' in *machine* is pronounced like the voiceless palato-alveolar fricative /ʃ/ (57.5%); the voiceless alveolar fricative /s/ (30%) and the voiceless palato-alveolar affricate /tʃ/ (12.5 %).

**Table 2: Pronunciation of the Diagraph 'ch'**

| Words | Diagraph | Phonemic value | Context | Learners' Pronunciation (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | /k/ | /tʃ/ | /s/ | /ʃ/ |
| chasm | ch | /k/ | Initial Position | 62.5 | 37.5 | - | - |
| march | ch | /tʃ/ | Final Position | - | 82.5 | 17.5 | - |
| machine | ch | /ʃ/ | Medial Position | | 12.5 | 30 | 57.5 |

Source: Field Data (Recording of Learners 'Pronunciation)

### 5.2. Pronunciation ion of the Diagraph 'wh' in the Study

The data in Table 3 indicate that 100% learners in the study pronounced the word initial 'wh' in the word who and what as the voiced glottal stop /h/.

**Table 3: Pronunciation of the Diagraph 'wh'**

| Words | Diagraph | Phonemic value | Context | Learners' Pronunciation (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | /w/ | / h/ |
| what | wh | /w/ | Initial position | - | 100 |
| who | wh | /h/ | Initial position | 15.5 | 84.5 |

Source: Field Data (Recording of Learners 'Pronunciation)

### 5.3. Pronunciation of the Diagraph ‘gh’ in the Study

The data in Table 4 indicate that 87.5% learners in the study mispronounced the word initial ‘gh’ in the word *ghost* as the aspirated voiced velar plosive /$g^h$ / while 12.5 % learners pronounced this diagraph like the voiced velar plosive /g/. On the other hand, 100% learners mispronounced the ‘gh’ in the word *enough* as the aspirated bilabial aspirated plosive /$p^h$/. Hai and Ball (1961: 34) and Banu (2008:64) also claimed that Bangladeshi EFL learners replace the English /f/ by the voiceless aspirated alveolar plosive sound /$p^h$/ (34). On the other hand, 100 % learners kept the diagraph ‘gh’ silent in the word *though*.

**Table 4: Pronunciation of the Diagraph ‘gh’**

| Words | Diagraph | Phonemic value | Context | Learners’ Pronunciation (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | /g/ | /$g^h$/ | /$p^h$/ | silent |
| ghost | gh | /g/ | Initial Position | 12.5 | 87.5 | - | - |
| enough | gh | /f/ | Final Position | - | - | 100 | - |
| though | gh | silent | Final position | - | - | - | 100 |

Source: Field Data (Recording of Learners ‘Pronunciation)

### 5.4. Pronunciation of the Diagraph ‘th’ in the Study

The data in Table 5 indicate that 87.5% learners in the study mispronounced the initial ‘th’ in the word *theme* as the voiceless dental aspirated plosive /t̪$^h$/ Hai and Ball also claimed that Bangladeshi EFL learners replace the English /θ/ by the voiceless aspirated dental plosive sound (34).Furthermore another 12.5 % learners in this study also mispronounced this diagraph like the voiced unaspirated dental plosive /d̪/. On the other hand, 72.5% learners mispronounced the ‘th’ in *bathe* as the voiced unaspirated dental plosive /d̪/. Hai and ball also claimed that Bangladeshi EFL learners replace the English /ð/ by a voiced unaspirated dental plosive consonant sound (35). Moreover, another 27.5% learners in this study mispronounced this diagraph as the aspirated voiceless dental plosive /t̪$^h$/.

**Table 5: Pronunciation of the Diagraph ‘th’**

| Words | Diagraph | Phonemic value | Context | Learners’ Pronunciation (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | /ð/ | /θ/ | /t̪$^h$/ | /d̪/ |
| health | th | /θ/ | Final Position | - | - | 22.5 | 77.5 |
| bathe | th | /ð/ | Final Position | - | - | 72.5 | 27.5 |

Source: Field Data (Recording of Learners ‘Pronunciation)

### 5.5. Analysis of the Pronunciation Errors in the Study

The four diagraphs ‘gh’, ’ch’, ‘th’ and ‘wh’ occur 10 times in different linguistic contexts and are pronounced 120 (10x40) times by the 40 respondents. The data in Table 6 indicate that 56.95 % pronunciation of the learners in the study is found to be incorrect. However, the highest rate of errors (100) is found with the pronunciation of the diagraph ‘th’ ( health and bathe) and ‘gh’ (enough) while the lowest rate of errors is found with the diagraphs ‘gh’ (0%) in the word *though*, and ‘wh’ (0%) in the word *who* .

**Table 6: Pronunciation Errors in the Study**

| SL | Words | Diagraph | Context | Phonemic Value | Correct Pronunciation (%) | Incorrect Pronunciation (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chasm | ch | Initial position | /tʃ/ | 62.5 | 37.5 |
| 2 | machine | ch | Medial position | /tʃ/ | 57.5 | 42.5 |
| 3 | march | ch | Final Position | /tʃ/ | 82.5 | 17.5 |
| 4 | who | wh | Initial position | /h/ | 100 | 0 |
| 5 | what | wh | Initial position | /w/ | 15.5 | 84.5 |
| 6 | ghost | gh | Initial position | /g/ | 12.5 | 87.5 |
| 7 | though | gh | Final position | silent | 100 | 0 |
| 8 | enough | gh | Final Position | /f/ | 0 | 0 |
| 9 | health | th | Initial position | /θ/ | 0 | 0 |
| 10 | bathe | th | Initial position | /ð/ | 0 | 100 |
| Aggregate Percentage | | | | | 43.05 | 56.95 |

Source: Field Data (Recording of Learners ‘Pronunciation)

6. **Importance of the Study:**

English, as an international language, has become the number one medium of communication across this globe for different socio-cultural, geo-political, educational, economic, trade-commerce-sports related reasons. And for these reasons, communicative competence in this language is a must for all of us. In today’s global village, people need to be prepared with better communication skill at the national and international level. As a partner of global development, Bangladeshis also need to be prepared with a good command in English for communication both at the local as well as at the global level. Within the national boundary, we need to communicate with the foreigners from different countries of

the world with different foreign languages. We need to communicate to many native as well as non-native English speakers. For this, we need better communication skills in English. Again, when we travel to different English speaking countries, we need to make us intelligible to the people of those countries.

So, the study explores one of the areas of English pronunciation where our EFL/ESL learners encounter pronunciation difficulties. The findings of the study can help our future generations to be well- prepared with intelligible pronunciation skill by which they can communicate successfully at the national as well as at the international level.

**7. Recommendations and Conclusion:**

The findings show that the English consonant diagraphs pose huge difficulties for the EFL/ ESL learners of Bangladesh. The learners feel confused when they come across this diagraphs which have different phonemic values in different contexts. In this study, about 41.95 % pronunciation of the learners is found to be erroneous because they were misled and confused by the English spelling-sound complexities of these diagraphs. On the basis of the findings, this study recommends the following suggestions to overcome the pronunciation difficulties of the learners:

a. Recommendations for the EFL/ESL teachers
   - They should explain the differences between English letters and English sounds..
   - They should develop practice materials on English spelling and sound systems.
   - They should make the learners aware of the fact that consonant diagraphs .can be pronounced differently in different linguistic situations.
   - They should expose the learners to native English conversation.
   - They should arrange listening activities in the class.

b. Recommendations for the EFL/ESL learners:
   - They should have motivation for learning English pronunciation.
   - They should never feel sad or depressed if they mispronounce any sound.
   - They should learn that letters are not sounds.
   - They should know that consonant diagraphs can be pronounced differently in different positions. For example, in this study, the letter ‘gh’ can have at least three phonemic variations or values such as /g/, /f/, and sometimes it remains silent.
   - They should listen to native English conversation, songs, news, music, etc.
   - They should watch English movies, dramas, etc.
   - They should practice speaking among themselves, and with their teachers and friends.

Thus, it is expected that the learners will learn about how English consonant diagraphs and English sounds are related to each other and will be able to pronounce this multi-phonemic consonant diagraphs properly.

**Works Cited**


1. Banu, Rahela. "Bangladeshi English: A New Variety?" *Journal of the Institute of Modern Languages* (2008):53-67
2. Jones*, Daniel. The Pronunciation of English*. Cambridge: Cambridge University Press, 1966.
3. Kelly, Gerald. *How to Teach Pronunciation*. Edinburgh: Pearson Education Limited, 2000.
4. Kenworthy, Joanne. *Teaching English Pronunciation* .London and New York: Longman, 1987.
5. Hai, Muhammad Abdul and W.J. Ball. *The Sound Structures of English and Bengali*. Dacca: University of Dacca, 1966.



Date of Submission : 13.02.2022
Date of Acceptance : 08.06.2022

**Jagannath University Journal of Arts**
**Volume 12, No 01, January-June 2022**

# Reflective Teaching: EL Teachers' Perceptions and Practices

Md. Abdur Rouf*

**Abstract**

This study aims to investigate English language (EL) teachers' perceptions and practices of reflective teaching (RT). Reflective teaching helps teachers make their teaching more effective and develop professionally. Following a multiple case study approach, qualitative data were collected from six EL teachers teaching at different levels through semi-structured interviews. The main findings include teachers' positive attitude to RT, somewhat ambivalent ideas about RT and tools used for RT, facilitative relations between RT and professional development (PD), inherent cultural indifference to RT, marginal and unsystematic engagements in RT, no institutional initiatives, mentoring, and collaboration for RT, some challenges to RT, i.e., workload, lack of interest, motivation, training for RT, and isolation among teachers. This paper also discusses the implications of the key findings and proposes some recommendations for teachers and others take holders concerned.

**Keywords:** Reflective teaching, EL teachers, perceptions, and practices

## Introduction

Both in education and teaching English to speakers of other languages (TESOL), teacher reflection is being given increasing importance (T. S. C. Farrell "The Practices of Encouraging Tesol Teachers to Engage in Reflective Practice: An Appraisal of Recent Research Contributions" 224). Reflective teaching (RT) gained prominence when the appeal of method-centred approach began to decline, and teachers assumed a central position in post method pedagogy. It became evident that through RT teachers can align their teaching practices with contextual factors, meet the language needs of learners, and make informed decisions regarding classroom teaching, contents, and classroom management.

Reflection helps them combine different procedures and techniques from different methods for classroom teaching (Aliakbari and Adibpour 130; Fat'hi and Behzadpour 241).Teachers usually develop their own teaching style over the time, and they can manage the everyday demands of classroom teaching through that style. However, their routinized teaching style should not be a barrier to their professional development (PD), and they need to improvise their teaching and the overall efficacy as teachers through reflection (Richards 59).

Explaining what constitutes reflective practices is not very straightforward (Cornford 220).Reflection is not "the fleeting thought" that comes to teachers' mind immediately after the class. It requires teachers to reflect on their practices in a systematic way (T. S. C. Farrell "Tailoring Reflection to Individual Needs: A Tesol

*Associate Professor, Department of English, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh

Case Study" 36), and they need to develop "reflective disposition" (T Farrell, S. C. 9) for engagements in reflection. Teachers critically analyze their ideas and classroom procedures through RT (T. S. C. Farrell 1).Farrell claimed that reflective teaching is a process that encourages teachers to ask questions like what I did in the class, why I did that, what about the result, and what could be done for better outcomes (266). Again, reflection is a process in which teachers recall their past actions, evaluate them, and make future plans based on that evaluation, and it involves three stages: 1) a teaching event; 2) recalling of that event; and 3) evaluation or review of that event(Richards 59, 60). It is not a one-time job rather teachers should be involved in continual reflective practices. However, as more emphasis has been given on the past events in teacher reflection, the forward-looking aspects of reflection are usually ignored. Moreover, discussions on reflective practices also ignore teachers' personality (Akbari 192). For this paper, the term reflective teaching (RT) has been used as an umbrella term for referring to teachers' reflective practices both inside the classroom and beyond.

## Literature Review

This section reviews the existing literature on RT to show the relations between PD and RT, highlight some major tools for RT, and point out the gap for the present study.

### Teachers' Professional Development and Reflective Teaching

Reflective practices help teachers' professional development (PD). They can learn about their classroom practices and strategies through reflective practices. As different aspects of teaching change over time, teachers also need to modify their attitudes and practices using reflection. Reflective practices can be used as an important segment of teacher development programmes for TESOL teachers, as well (Bawaneh et al. 709). It is obvious that experiences help teachers develop professionally, but experiences along with critical analysis of teaching practices can expediate sustained PD of teachers (Richards 63; Yanuarti and Treagust 283).

### Tools for Reflective Teaching

There are different tools for teacher reflection. Classroom observation is one tool that helps teachers engage themselves in reflective practices and develop professionally (T. S. C. Farrell "'Keeping Score': Reflective Practice through Classroom Observations" 265). Another tool is peer coaching that can create a community of practitioners and improve teaching practices through reflection. It can also reduce the perceived isolation among the professionals working together through dialogue and relationship building (Sinkinson 9, 11). Then, through study groups, teachers can meet at regular interval and share their experiences with one another and design classroom tasks together with the help of a guide. For critical friendships to work as a reflective practice, the participants involved must have precise ideas about their respective roles and the allocated time. It helps all involved develop professionally when teachers are prepared for reflection, and there exists trust among them (T Farrell 368, 374).Teachers can also reflect on their teaching using online forums, chats, podcasts, journal writing, portfolios, action research, virtual focus group

discussion (VFGD), blogs, video analysis, and team teaching (T. S. C. Farrell "The Practices of Encouraging Tesol Teachers to Engage in Reflective Practice: An Appraisal of Recent Research Contributions" 235, 236, 237; Martínez 88; Nocetti et al. 340; Pineda et al. 7).

**Locating the Gap for the Present Study**

Some studies examined teachers' engagement in RT and ascertained its effectiveness. In a review of recent literature on reflective practices for TESOL teachers (T. S. C. Farrell "The Practices of Encouraging Tesol Teachers to Engage in Reflective Practice: An Appraisal of Recent Research Contributions" 241) claimed that both pre-service and in-service teachers would like to reflect on their teaching practices as it helps them improve their practices. In a cross-sectional study with forty-six elementary school teachers in the USA, Dexter and Wall (753)also found that those teachers who were more reflective deemed themselves as self-efficacious, and they could avoid being burnout. Moreover, Nocetti et al. (330) in Chile found that engagements in reflective practices developed trainee teachers' positive attitude to reflective teaching, and they became more critical of their classroom practices. Similarly, Tok and Dolapçıoğlu (265) in Turkey reported that teachers were reflective in ensuring student-centred teaching, reflective class environment, constructive criticism, self-assessment, problem solutions, and PD activities. Loan (561, 572)in Thailand highlighted the successes of reflective approaches in a teaching English writing course in changing the pre-service EL teachers' negative attitude towards learning and their mindset for embracing RT as they played an active role in the teaching-learning process. Nosratinia and Moradi (431, 437) in Iran ascertained that reflective practices could exert positive impact on EL teachers and their classrooms teaching.

Other studies examined the role of different tools in RT. Reflective journal writing helped pre-service and in-service EL teachers improve their teaching, develop nuanced ideas about methodologies and teaching practices, and influenced their PD positively (Gallego 108; Shavit and Moshe 560; Zulfikar and Mujiburrahman 1). Then, virtual focus group discussion and virtual learning community helped teachers critically analyze their teaching practices, understand their context better, change their traditional beliefs about teaching and their schools through reflective thinking(Miller et al. 362; Pineda et al. 7). Martínez (88, 100) reported that teacher educators and EL teachers working in Mexico could solve their common classroom difficulties and ensure PD thorough collaborative action research and reflective practices. Moreover, Fatemipour (86)found that teacher diary and peer observations were the most effective tools for reflection. Samaras and Fox (23-33) highlighted how Greek teachers reflected and learned about learner-centred, experiential, and interactive learning through blogs, critical friends, and online discussions through creating e-portfolios in a PD programme in the USA. Khan (1-18)also found that both trainee teachers and supervisors in Bangladesh gained positive experiences through reflective practices using a portfolio. Through the portfolio, the supervisors could trace the development of the trainees, see how they were trying to mix theories

and practices. The trainees, on their part, commented that they came to know their weak areas and learned many effective teaching skills.

Moreover, some studies investigated challenges to RT. Hubball et al. (57-81) reported that university teachers in a faculty development programme in Canada learned to reflect more on their classroom practices, but limited time, vague target for reflections, different cultural orientations to reflections were some of the obstacles to engagements in reflective practices. Yanuarti and Treagust (280-284) in Indonesia found that most of the participating teachers were not aware of reflective teaching practices. Similarly, in Jordan, Bawaneh et al. (695) found that the teachers did not use that many reflective practices. In Nigeria, student teachers claimed that they enjoyed reflective practices but teaching responsibilities, limited time, lack of materials, and absence of mentoring affected their reflective practices (Ogonor and Badmus 1, 9). Aliakbari and Adibpour (129-143) reported that Iranian high school EFL teachers did not attach much importance to RT, and mentioned different obstacles to RT related to teachers, learners, the system of education, politics, and parents.

**Research Objective and Significance of the Study**

The studies reviewed above examined different aspects of RT in various contexts. However, to the best of my knowledge, only a few studies were available on EL teachers' perceptions and practices of RT in Bangladesh. So, the present study was carried out based on the following research question (RQ):

RQ: What were the EL teachers' perceptions and practices of reflective teaching?

The findings of the study would help us know what the teachers think about reflective teaching, and how they make use of reflection in their day-to-day teaching. Teacher educators and other stakeholders concerned can also use the findings to formulate policies and establish a systematic process for teachers' engagement in RT.

**Research Design**

This section describes the research methodology used for conducting the study.

**Approach and Rigour of the Study**

This study was done following a qualitative multiple case study approach (Yazan 134). This approach helped me gain a deep understanding of EL teachers' perceptions and practices of reflective teaching. In qualitative studies, it is essential to ensure the rigour or trustworthiness of the study (Baškarada 2).A case study data base, self-reflection, and use of various data sources helped safeguard the rigour of this study (Baškarada 10; Berger 224).

**Participants**

Six practising EL teachers from the secondary (S),higher secondary (HS), and tertiary (T) levels were selected for interviews through purposive sampling for collecting data on their perceptions and practices of RT. Purposive sampling helped me select those teachers who could provide rich data on the examined issues. Each of

them was briefed about the objective of the study and formally requested to take part in the study. They were assured that necessary steps would be taken to safeguard their privacy, and their personal details will never be disclosed. Finally, they agreed to take part in this study on a voluntary basis. For ensuring their anonymity, alpha-numeric labels (T1S-T6T) have been used in this paper (Zein 297). Six cases were selected to carty out 'within' and 'cross-case' analysis. The demographic and other details on the six teachers are presented in Table 1.

**Table 1.** The Participating Teachers' Demographics and other Details

| Teachers | Gender | Age (Years) | Institution Type | Teaching Experiences (Years) | Institution Location |
|---|---|---|---|---|---|
| T1S | Male | 31-35 | Secondary | 06-10 | Urban |
| T2S | Male | 41-45 | Secondary | 11-15 | Urban |
| T3HS | Male | 26-30 | Higher Secondary | 01-05 | Rural |
| T4HS | Male | 31-35 | Higher Secondary | 06-10 | Urban |
| T5T | Male | 31-35 | Tertiary | 06-10 | Urban |
| T6T | Male | 36-40 | Tertiary | 11-15 | Urban |

**Research Instrument and Method**

A semi-structured interview checklist (see Table 2)was developed for conducting the interviews with the teachers. The checklist had fifteen items, and the items were finalized through a relevant literature review and a pilot case study. The pilot study was done with an EL teacher to ensure that the interview checklist could elicit relevant and adequate data to answer the RQ of the study. The data were collected by conducting phone interviews (Merriam 71-118)as it was not safe to arrange face-to-face interviews with the participants due to the prevailing COVID-19 pandemic. Individual schedule was developed for each of the teachers for the interviews.

**Table 2.** The Semi-Structured Interview Checklist

| SL | Interview Items |
|---|---|
| 1. | Ideas about reflective teaching/practices |
| 2. | Routine actions and reflective actions |
| 3. | Reflective teaching/practices and teachers' professional development (PD) |
| 4. | Attitude towards reflective teaching/practices |
| 5. | Tools for reflective teaching/practices; familiarity with observation, writing a diary or journal, exploring one's views of teaching, audio or |

| | |
|---|---|
| | video recording of lessons, portfolio, action research, discussion, learning communities, mentoring, reading books/journals, thinking about one's strengths and weaknesses as a teacher |
| 6. | Engagements in reflective teaching/practices and tools and areas; nature of reflection |
| 7. | Institutional initiatives for reflective teaching/practices |
| 8. | Reflective teaching/practices in training and other PD activities |
| 9. | Collaboration with colleagues/others on reflective teaching/practices |
| 10. | Mentoring reflective teaching/practices |
| 11. | The challenges to reflective teaching/practices |
| 12. | Reflective mindset/habit development; cultural orientations to RT |
| 13. | Importance of reflective teaching/practices |
| 14. | Future engagements in reflective teaching/practices |
| 15. | Any other comments on RT |

**Data Management and Analysis**

All the phone interviews were properly recorded, and the collected data were securely preserved using a cell phone, a personal computer, and a thumb drive. When the interviews were over, all data were transcribed verbatim for analysis. Thematic analysis as advocated by Braun and Clarke (77-101)was used for data analysis. The data set was analyzed in its entirety, and an iterative approach was followed during the whole data analysis phase to obtain an in-depth understanding of the targeted issues. The reliability of the findings was ensured through cross-case analysis, participants' verifications, and comparison to the findings of similar studies.

**Findings**

The key findings of the study, according to the RQ, are presented in this section supported by representative excerpts from the EL teachers.

**Positive Attitude to Reflective Teaching**

Teachers claimed that they were positive about RT. They argued that they needed RT for brining innovations in their teaching, and they believed that RT could work as a catalyst forupgrading teachers' performance and potentiality.

> *We need reflective teaching for making our teaching effective. (T3HS)*
>
> *Without proper knowledge of reflective teaching, it is very difficult to develop for anyone to the right direction. (T6T)*

They were also convinced of the significance of RT for effective teaching and PD. They were aware that the world was changing fast in the 21$^{st}$century, and

engagements in RT were essential for getting their learners ready for the emerging challenges.

> *If we want to develop our potentiality as teachers, I think this is a must for all of us.(T5T)*

> *If I cannot teach my class properly, cannot develop professionally, then I will not be an effective teacher.(T2S)*

## Teachers' Ambivalent Ideas about Reflective Teaching

The EL teachers explained their ideas about RT in different ways. They commented that RT relates to reflections on teachers' goal, current challenges faced by teachers, learners' results, the role and effective use of educational technology, responses to the contextual realities, new teaching techniques and process, and teaching quality enhancement. According to them, RT is learning from practical experiences and readjusting strategies while teaching. However, they claimed that many of the teachers were not familiar with RT. Most teachers were engaged only in routine actions, not in reflective actions. Interview data showed that some of the teachers were not sure of the meaning and scope of RT.

> *After teaching some classes, I look backward, and I try to analyze the classroom procedures and my actions in the classroom. (T6T)*

> *Whatever we learn from our classroom practices, that is important. (T5T)*

> *I need to find out accurately what challenges I am facing at present and solve those problems.(T1S)*

> *Many teachers do not know about reflective teaching and its effectiveness. (T3HS)*

Additionally, they pointed out that enhancing professional knowledge and skills through PD was indispensable for teachers. And they required to continuously analyze their shortcomings as teachers and know the latest developments in EL teaching and learning. Teachers could connect their past experiences, present practices, and plans for PD through RT. If teachers do not ensure their PD through RT, they will fail to serve their learners effectively as curricula change on a regular basis and post method pedagogy encourages teachers to apply teacher agency on a wider scale.

> *Without reflective teaching, there will be no professional development of teachers. (T1S)*

> *I think these two are very much interconnected. We should make a proper bridge between reflective teaching and professional development. (T5T)*

> *If teachers want to develop professionally, enhance teaching quality, then they need to be engaged in reflective teaching and address their shortcomings.(T4HS)*

Moreover, they knew about some of the tools for RT. However, some teachers did not have precise ideas about the tools. The tools they knew for RT were student feedback, classroom observation, thinking about learners' interaction and participation in classes, planning for classes, writing a dairy, learning communities, discussion with colleagues, recording the class, thinking about strengths and

weaknesses as a teacher, reading academic journals, and action research. They argued that the use of tools for RT depends on the context, time, and opportunities.

> *We can use classroom observations, class recording, and student feedback for reflection. (T4HS)*

Further, they claimed that cultural orientations towards to RT play a vital role, but RT was not practised substantially and given much importance in our culture; however, things were changing, and the younger teachers were getting more interested in RT. As for the senior teachers, they were happy to follow the traditional ways of teaching.

> *We do not get enough encouragement from the academia for reflective teaching.(T5T)*

> *The reflective teaching culture has not developed that much in our country. But things are changing because of the quality books, training, and available teaching aids.(T2S)*

Besides, they asserted that habit formation and positive mindset were essential for RT, and they were also aware of the fact that RT habit cannot be formed quickly; it takes time. And traditional ways of teaching were a serious barrier to the development of positive mindset and habit for RT. They commented that most teachers have not been able to develop a RT habit.

> *Reflective approach cannot be achieved overnight. It's a gradual process of habit formation. Being a teacher, we have to work on it gradually.(T5T)*

> *It will take time to develop teachers' mindset for reflective teaching. Teachers are not interested in investing their time on reflective teaching. They will not quickly shift to reflective teaching going beyond their comfort zone. (T3HS)*

> *We just go on teaching classes, completing the syllabus. Many of the senior teachers do not have the mindset for professional development.(T4HS)*

**Marginal and Unsystematic Engagements in Reflective Teaching**

The EL teachers were engaged in RT to a varying degree. They claimed that they reflected on their teaching by self-observing classroom teaching, observing and analyzing model classes, maintaining to-do lists, reading journals, novels, academic and grammar books, discussing different issues with colleagues, self-evaluating teaching, thinking about strengths and weaknesses as a teacher, soliciting student feedback, and using retrospections.

> *I mainly use self-observations and student feedback for my reflection. (T4HS)*

> *Coming to my home, actually, I reflect on the classroom procedures. Sometimes, I try to make self-introspections or meditate on the occurring in the classroom.(T6T)*

> *I take student feedback after every semester.(T1S)*

> *I self-evaluate my teaching - I ask myself where I can upgrade to ensure self-development. (T3HS)*

Using these tools, teachers mainly reflected on classroom management, content presentation, learner engagement, connections between classroom teaching and real life, classroom preparation, materials development, subject matter knowledge, teaching techniques, shortcomings, and development of professional competence. Reflection on classroom management was mentioned as a common area by the teachers.

> *I mostly reflect on classroom management. I think about my shortcomings and teaching quality enhancement. (T4HS)*

However, teachers were engaged predominantly in casual reflections on other own initiatives. So, their reflection was not systematic and done in a formal manner.

> *We are not getting any established system here for reflective teaching. Actually, doing it my myself. (T5T)*

> *I do not reflect systematically rather casually on my teaching. There is no established system for reflection here.(T1S)*

> *I do not engage myself in reflective teaching in a planned way, but some aspects of my teaching match with reflective teaching. (T3HS)*

Teachers then claimed that their respective institutions usually did not take any initiative or asked for RT. However, the head teacher at the secondary school of T2S asked teachers to be engaged in RT.

> *We did not get any direction from the department or university to work on reflective teaching.(T5T)*

> *My institution does not give any direction for reflective teaching. (T4HS)*

Though the teachers received training on different aspects of education and language teaching, but rarely they were told about and trained on RT in those training.

> *They did not focus on reflective teaching in training. (T1S)*
>
> *They tried to give us kind of inspiration that we should reflect on our professional competence.(T5T)*

Again, there was no formal collaboration among the teachers on RT. However, they informally discussed different class and career related issues with their colleagues.

> *Informally I discuss my problems- student behaviour- with my colleagues at a personal level, but we do not talk about reflective teaching. (T4HS)*

> *I have a senior English language colleague, but I do not discuss reflective teaching with him.(T3HS)*

> *We five English language teachers discuss how we can develop our subject knowledge.(T2S)*

Moreover, usually there existed no formal mentoring system for the EL teachers. None of the teachers was assigned a mentor for RT. Teachers opined that mentoring for RT could be very beneficial, especially for the novice teachers.

> *There is no formal system for mentoring on reflective teaching. (T4HS)*

> *If I face any problem related to teaching or others, I consult my colleague. He always encourages me.(T2S)*

## The Key Challenges to Reflective Teaching

The teachers, during the interviews, mentioned several challenges to RT. First, they claimed that they were loaded with too many classes and other responsibilities, so could not manage time for RT. Second, they argued that teachers lacked interest, motivation, and dedication for reflection on classroom practices and other issues. Third, many teachers, according to them, did not know about RT. Fourth, teachers required training and other related support from their respective institutions for RT. Fifth, teachers usually remained isolated from one another because of their shyness and conservatism. Sixth, there was no formal structure to discuss classroom issues with others and find out some solutions to those. Seventh, RT was seen more as a theoretical construct for academic discussion and research rather than a practical process for improvement.

> *You know just from our academic lessons, we learned about reflective teaching, but practically how this can function for us in a beneficial way, we never actually see this.(T6T)*

> *The workload is the basic challenge to reflective teaching…as a teacher we have to do plenty of work apart from teaching. (T5T)*

> *Suppose I have a problem, but I do not discuss that with my colleague for shyness. If I want to observe my colleagues' class, they may not feel comfortable. (T4HS)*

> *For reflective teaching, teachers must think about his teaching and invest time, but they lack both time and dedication. (T3HS)*

> *Every day I teach at least five classes; sometimes six a day.(T2S)*

## Envisioning a Better Future through Reflective Teaching

The teachers claimed that they would be more engaged in RT in the future using different tools, and thus improve their knowledge, skills, and teaching practices. Some planned to advance their technology skills and make broader use of educational technologies in their classrooms. Others asserted that using lesson plans for conducting the class would help them reach better standards and achieve greater impact.

> *I have to enrich my knowledge and skills. I have to be much more trained in terms of using technology.(T5T)*

> *I want to practise reflective teaching and expect positive results that would help me build my career. My learners would be benefitted. (T1S)*

> *I want to improve my teaching everyday through reflective teaching. I want to reach a standard level as a teacher in next six months or one year through reflective teaching. (T3HS)*

> *I want to self-evaluate/observe my class for quality enhancement. (T4HS)*

## Discussion

The participating EL teachers' positive attitude to RT aligned with the findings of previous studies (Nocetti et al. 330; Ogonor and Badmus 1, 9) and differed from the

findings of Aliakbari and Adibpour (129-143). Teacher educators need to exploit teachers' positive attitude to RT for ensuring their more and systematic engagements in RT. Some teachers' ambivalent ideas about RT and tools for RT could be explained by the fact that they conceptualized the whole edifice of RT basically as an academic construct rather than something that could be applied in everyday teaching and treated as an integral part of teachers' cumulative experiences. They emphatically pointed out the positive relations between RT and their PD as mentioned by many scholars(Richards 63; Yanuarti and Treagust 283).However, there existed a mismatch between teachers' stated beliefs and their practices as their participation in reflective practices for PD was marginal. Moreover, most EL teachers in Bangladesh did not regularly take part in PD activities beyond one or two sporadic off-site training in their whole teaching career (M. A. Rouf and A. R. Mohamed 5).

Additionally, it did not come as a surprise when teachers opined that RT was not practised substantially and given much importance in Bangladeshi culture. We have miserably failed to develop a culture of discussion and sharing in our academia. Moreover, as the whole society is exam-driven and focuses more on grades, numbers, certificates rather than quality education, knowledge, and skills, teachers and other stakeholders do not try to develop a culture of RT(M. A. Rouf and A. R. Mohamed 52).As commented by Ur (317), we are in the second group of teachers who repeat their one-year's teaching experience for twenty years without updating their knowledge base and skills. In this mode of teaching, it is natural that teachers will never apply the reflective practices. Then, one cannot agree more with the teachers that habit formation and positive mindset are essential for RT. The fact is that if teachers do not reflect on their practices in a conscious and structured way, only positive attitude and mindset will not make a big difference.

Moreover, the finding on teachers' marginal and casual engagements in RT was aligned with some other studies (Bawaneh et al. 695; Yanuarti and Treagust 280-284) and could be explained by different factors. As claimed by the participants, many of the teachers did not know about RT like the teachers in Iran (Aliakbari and Adibpour 129-143). Then, they were not told by their respective institutions or teacher educators to engage themselves in RT. The absence of a systematic approach to RT and support through collaboration and mentoring also badly affected teachers' engagement in RT (129-143). Undoubtedly, the concept of a systematic approach to RT and support for the teachers has not been given enough thoughts by the policy makers and teacher educators in Bangladesh. However, teachers' marginal and casual engagements in RT may prove costly for the country and its educational system. This also highlights the absence of 'thinking' teachers who sincerely care for their own PD, learners, and quality education. That said, one must appreciate the fact that some teachers were engaged in RT on their own initiatives.

Finally, some of the challenges to RT mentioned by the EL teachers were also highlighted in other studies in Iran, Canada, and Nigeria (Aliakbari and Adibpour 129-143; Hubball et al. 57-81; Ogonor and Badmus 1, 9).It is true that Bangladeshi teachers in general are overburdened with teaching and other responsibilities but that

cannot be an excuse for avoiding RT. Teachers remain so busy with their routine activities that they ignore reflective actions. As the concept of RT is not highlighted in teacher training, and teachers usually neglect PD activities, there are gaps in their knowledge about RT. Moreover, because of the inherent shyness and conservatism, teachers work in isolation. Teachers' low motivation could be a serious barrier to their engagement in RT, as well(129-143).Though teachers' intentions to be more engaged in RT in the future aligned with their overall positive attitude to RT, but one must be cautiously optimistic about this as their present engagement in RT was marginal and casual.

## Conclusion and Suggestions

The scope of the study was to explore the EL teachers' perceptions and practices of reflective teaching (RT) using interviews. The interview data showed that the participating teachers had positive attitudes to RT. However, they held somewhat ambivalent ideas about RT and tools used for RT. They highlighted the facilitative relations between RT and PD and the inherent cultural indifference to RT in Bangladesh. Their marginal and unsystematic engagement in RT was also obvious. Moreover, there were no institutional initiatives, mentoring, and collaboration for RT, and some challenges to RT included workload, lack of interest, motivation, training for RT, and isolation among teachers. On a different note, this case study did not aim to generalize its findings. So, it needs to be replicated with a large sample from all over the country. Based on the key findings of the study, the following recommendations are proposed for teachers and other stakeholders concerned:

a) RT practices should be introduced earlier in pre-service teacher education and in PD activities for in-service teachers to enhance their awareness of RT.

b) Teachers must be encouraged to engage themselves more in RT, and a formal system must be established to that end incorporating observation, collaboration, mentoring, diary writing, action research, and other tools.

c) Every educational institution must develop and nurture a RT culture for its teachers so that they can share their concerns with other colleagues, create knowledge together, and apply that knowledge for teaching and PD.

d) Allocating enough time for reflection in PD programmes, setting definite goals for teachers' reflective practices may bring positive results.

e) To facilitate teachers' engagement in RT, class load at the secondary level must be reduced.

## Works Cited

Akbari, R. . "Reflections on Reflection: A Critical Appraisal of Reflective Practices in L2 Teacher Education." *System*, vol. 35, no. 2, 2007, pp. 192-207, doi:https://doi.org/10.1016/j.system.2006.12.008.

Aliakbari, M. and M. Adibpour. "Reflective Efl Education in Iran: Existing Situation and Teachers' Perceived Fundamental Challenges." *Eurasian Journal of Educational Research*, vol. 18, no. 77, 2018, pp. 1-16, doi:10.14689/ejer.2018.77.7.

Baškarada, S. . "Qualitative Case Study Guidelines." *The Qualitative Report*, vol. 19, no. 40, 2014, pp. 1-18, https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol19/iss40/3.

Bawaneh, A. K. et al. "Gauging the Level of Reflective Teaching Practices among Science Teachers." *International Journal of Instruction*, vol. 13, no. 1, 2020, pp. 695-712, doi:10.29333/iji.2020.13145a.

Berger, R. "Now I See It, Now I Don't: Researcher's Position and Reflexivity in Qualitative Research." *Qualitative Research*, vol. 15, no. 2, 2013, pp. 219-234, doi:10.1177/1468794112468475.

Braun, V. and V. Clarke. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology*, vol. 3, no. 2, 2006, pp. 77-101, doi:10.1191/1478088706qp063oa.

Cornford, I. R. "Reflective Teaching: Empirical Research Findings and Some Implications for Teacher Education." *Journal of Vocational Education & Training*, vol. 54, no. 2, 2002, pp. 219-236, doi:10.1080/13636820200200196.

Dexter, C. A. and M. Wall. "Reflective Functioning and Teacher Burnout: The Mediating Role of Self-Efficacy." *Reflective Practice*, vol. 22, no. 6, 2021, pp. 753-765, doi:10.1080/14623943.2021.1968817.

Farrell, T "Critical Friendships: Colleagues Helping Each Other Develop." *ELT Journal*, vol. 55, no. 4, 2001, pp. 368-374.

Farrell, T, S. C. "'Teacher You Are Stupid!' - Cultivating a Reflective Disposition." *TESL---EJ*, vol. 18, no. 3, 2014, pp. 1-10.

Farrell, T. S. C. "'Keeping Score': Reflective Practice through Classroom Observations." *RELC Journal*, vol. 42, no. 3, 2011, pp. 265-272, doi:10.1177/0033688211419396.

---. "The Practices of Encouraging Tesol Teachers to Engage in Reflective Practice: An Appraisal of Recent Research Contributions." *Language Teaching Research*, vol. 20, no. 2, 2015, pp. 223-247, doi:10.1177/1362168815617335.

---. "Tailoring Reflection to Individual Needs: A Tesol Case Study." *Journal of Education for Teaching*, vol. 27, no. 1, 2010, pp. 23-38, doi:10.1080/02607470120042528.

Farrell, T. S. C. . "Teachers Talking About Teaching: Creating Conditions for Reflection." *TESL---EJ*, vol. 4, no. 2, 1999, pp. 1-18.

Fat'hi, J. and F Behzadpour. "Beyond Method: The Rise of Reflective Teaching." *International Journal of English Linguistics*, vol. 1, no. 2, 2011, pp. 242-251, doi:doi:10.5539/ijel.v1n2p241.

Fatemipour, H. "The Effectiveness of Reflective Teaching Tools in English Language Teaching." *The Journal of Modern Thoughts in Education*, vol. 4, no. 4, 2009, pp. 73-90.

Gallego, M. "Professional Development of Graduate Teaching Assistants in Faculty-Like Positions: Fostering Reflective Practices through Reflective Teaching Journals." *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, 2014, pp. 96-110, doi:10.14434/josotl.v14i2.4218.

Hubball, H et al. "Enhancing Reflective Teaching Practices: Implications for Faculty DevelopmentPrograms." *The Canadian Journal of Higher Education*, vol. 35, no. 3, 2005, pp. 57 - 81.

Khan, R. "Using the Reflective Approach in a Teaching Practicum." *The Malaysian Journal of ELT Research*, vol. 1, no. 1, 2005, pp. 1-18.

Loan, N. T. T. "Reflective Teaching in an Efl Writing Instruction Course for Thai Pre-Service Teachers." *The Journal of AsiaTEFL*, vol. 16, no. 2, 2019, pp. 561-575, doi:10.18823/asiatefl.2019.16.2.8.561.

Martínez, J. G. "Action Research and Collaborative Reflective Practice in English Language Teaching." *Reflective Practice*, vol. 23, no. 1, 2021, pp. 88-102, doi:10.1080/14623943.2021.1982688.

Merriam, S. B. *Qualitative Research and Case Study Applications in Education.* Jossey-Bass, 1998.

Miller, L. R. et al. "Exploring Critical Reflection in a Virtual Learning Community in Teacher Education." *Reflective Practice*, vol. 22, no. 3, 2021, pp. 363-380, doi:10.1080/14623943.2021.1893165.

Nocetti, A. et al. "Attitude Towards Reflection in Teachers in Training." *Reflective Practice*, vol. 21, no. 3, 2020, pp. 330-343, doi:10.1080/14623943.2020.1748879.

Nosratinia, M. and Z. Moradi. "Efl Teachers' Reflective Teaching, Use of Motivational Strategies, and Their Sense of Efficacy." *Journal of Language Teaching and Research*, vol. 8, no. 2, 2017, doi:10.17507/jltr.0802.28.

Ogonor, B. O. and M. Badmus. "Reflective Teaching Practice among Student Teachers: The Case in a Tertiary Institution in Nigeria." *Australian Journal of Teacher Education*, vol. 31, no. 2, 2006, pp. 1-11, doi:10.14221/ajte.2006v31n2.2.

Pineda, J. L. de L. et al. "Virtual Focus Group Discussions: The New Normal Way to Promote Reflective Practice." *Reflective Practice*, 2021, pp. 1-13, doi:10.1080/14623943.2021.2001322.

Richards, J. C. "Towards Reflective Teaching." *English Teachers Journal-Israel*, 1995, pp. 59-63.

Rouf, M. A. and A. R. Mohamed. "Teaching English at Secondary Level: Curricula Directions and Classroom Scenario." *Jagannath University Journal of Arts*, vol. 8, no. 2, 2018, pp. 39-56.

Rouf, M. A. and A. R. Mohamed. "Secondary El Teachers' Cpd: Present Practices and Perceived Needs." *Journal of NELTA*, vol. 22, no. 1-2, 2017, pp. 1-12, doi:doi.org/10.3126/nelta.v22i1-2.20036.

Samaras, A. P. and R. K. Fox. "Capturing the Process of Critical Reflective Teaching Practices through E-Portfolios." *Professional Development in Education*, vol. 39, no. 1, 2013, pp. 23-41, doi:10.1080/19415257.2012.682318.

Shavit, P. and A. Moshe. "The Contribution of Reflective Thinking to the Professional Development of Pre-Service Teachers." *Reflective Practice*, vol. 20, no. 4, 2019, pp. 548-561, doi:10.1080/14623943.2019.1642190.

Sinkinson, C. "An Assessment of Peer Coaching to Drive Professional Development and Reflective Teaching." *Communications in Information Literacy*, vol. 5, no. 1, 2011, pp. 9-20, doi:10.15760/comminfolit.2011.5.1.99.

Tok, Ş. and S. D. Dolapçıoğlu. "Reflective Teaching Practices in Turkish Primary School Teachers." *Teacher Development*, vol. 17, no. 2, 2013, pp. 265-287, doi:10.1080/13664530.2012.753940.

Ur, P. *A Course in Language Teaching.* Cambridge University Press, 1996.

Yanuarti, E. and D. F. Treagust. "Reflective Teaching Practice: Teachers' Perspectives in an Indonesia Context." *1st UPI International Conference on Sociology Education (UPI ICSE 2015)*, Atlantis Press, 2015, pp. 280-284.

Yazan, B. "Three Approaches to Case Study Methods in Education: Yin, Merriam, and Stake." *The Qualitative Report*, vol. 20, no. 2, 2015, pp. 134-152, http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol20/iss2/12.

Zein, S. "Professional Development Needs of Primary Efl Teachers: Perspectives of Teachers and Teacher Educators." *Professional Development in Education*, vol. 43, no. 2, 2017, pp. 293-313, doi:10.1080/19415257.2016.1156013.

Zulfikar, T. and Mujiburrahman. "Understanding Own Teaching: Becoming Reflective Teachers through Reflective Journals." *Reflective Practice*, vol. 19, no. 1, 2017, pp. 1-13, doi:10.1080/14623943.2017.1295933.

Date of Submission : 15.02.2022
Date of Acceptance : 08.06.2022

**Jagannath University Journal of Arts**
**Volume 12, No 01, January-June 2022**

# A Comparative Analysis of Walter Benjamin's Ideology with the Extinct Folk Art of Bangladesh.

Jannatul Royhana*

**Abstract**

This article discusses the causes and possible solutions for the extinction of the needle art of proverbs, one of the major branches of folk culture in Bangladesh. Basically, the lexical meaning of the word proverb is - conventional words, proverbs, rumors, call words, etc. In addition, a comparative analysis of the emotional essence of a Bangladeshi folklorist's memory is discussed with the main theme of the short essay "Unpacking My Library: Book Collection" by German author Walter Benjamin. Because the collector has a deep emotional connection with the preservation of folk Art. There has already been a lot of analysis on the conservation, importance, and necessity of folk Art. But this paper main aim to focus to address the reasons why many branches of folk art are slowly collapsing or why the artist himself is losing interest in creation.

**Key word:** Extinct Folk Arts, Bangladeshi Proverbs, needle art, Collector, Walter Benjamin.

## Introduction

Walter Benjamin wrote a book, Illuminations, in nineteen sixty nine. With a quote from the article "Unpacking My Library: Book Collection" in that book, I found a connection between the feelings of folk Art collectors in Bangladesh which helped me to research folk Art. In the article mentioned, Benjamin describes his library collection experience. Then introduces readers to long-closed books. Some things frustrate me when searching for folk Art. Because many artists whose collections carry lifelong memories are now awaiting extinction. But what is the reason for such silent extinction? Why aren't they stretched? This study found assimilation of the sensitive essence of the memory of a folk artist and collector. She aesthetically sews proverbs and rhymes associated with rural femininity and preserve them for many years in faith and love. The collector, like the author Benjamin, was inspired by the unveiling of his long-awaited collection. She said that apart from changing the lifestyle and flow of life of the people, there are also additions and subtractions in the culture. The words of the human heart that were once spoken by all the people of rural Bengal, in various festivals, in different cultural arenas, today no one remembers that proverb in the development of civilization. And talking to her, learned how she became a needle art collector. And what are the main reasons for the extinction of this art! A fear arose in my mind when I saw the old dust that had accumulated on the collector's artwork for many years. Because these proverbs are as important in the life of the individual-society-state as they are educational. Although there is a lot of discussion about this endangered resource, there is not enough

* Part-time Lecturer, Department of Fine Arts, Jahannath University, Dhaka, Bangladesh

research. The proverbial rhyme is very regional so it has existed in different regions in different forms. That is why even Bengali speakers often do not easily understand the meaning of proverbs. Surprisingly, the new generation does not currently find the source of this proverb. And art researchers are not worried about its extinction. If we want to carry the identity of national existence and nationalism, then it is very predominant to find such a new branch of folk Art. There is also a need for preservation, collection, and analysis but while many issues that need to be collected and preserved are discussed, research on exactly how to preserve them is insufficient. I think that if we can increase the teaching of this subject in government institutions as well as in universities or colleges, it will be possible to collect and preserve it scientifically. Those who collect, they do it out of a sense of responsibility, out of love. But it is not saved by emotion. Training is essential for scientific preservation If the heart and mind of the nation are expressed through folk Art, it will also arouse a response in the outside world. In this way, we hope that our folk art will play a special role in building a cordial relationship from country to country.

**An Analytical Discussion**

Walter Benjamin mentioned, "Every passion borders on the chaotic, but the collector's passion borders on the chorus of memories"[1].According to the above quote, I search for folk needle artists and collectors from different districts of Bangladesh. Then I noticed, The scope of the art cycle that develops from the beliefs of the people to the culture and from the culture is not one day. Of course, folk art is intimately involved with it. This folk philosophy instructs the people of the society in a few words about justice, injustice, customs, manners, feelings. Folk art once became the essence of the culture of ordinary people.

- What is this common man's art?
- How many types is it?
- What does 'General man' really mean?

Whether the art created by a particular group is considered folk art, there is much debate about that. In this regard, the Bengali lexicographer Subal Chandra Mitra has said, "Proverbs are short, simple, succulent, experience-oriented advice sentences"[2]The Spanish folklorist Cervantes Saavedragave the shortest and most meaningful definition, then - "A proverb is a short sentence based on long experience. "Looking back at ancient philosophy, Aristotle emphasizes the wisdom of the nation. According to him, the proverb is –Fragments of an elder wisdom.

> "In other words, the essence of the intellect of the old people of the society is a proverb. So far I have been talking about the theoretical definition of the proverb. In general, we can say, proverbs usually have the qualities of simplicity, brevity, realism, humor, humor, etc".[3]

Proverbs have been closely associated with the way of life, femininity, and rural heritage of the people of Bangladesh since time immemorial. The aesthetics and

convictions of simple life that are expressed through their embellishment are incomparable. The main part of the proverb is the rural area so the needs, desires, dreams, experiences of the rural people are used as various elements of this industry. In the same way, the mixed expression of common man's conduct, taste, happiness and sorrow, deep faith, sense of humor is usually observed in this art. In short, this proverb is a very valuable element of ballad folklore. There are a lot of proverbs and sayings in Bengali language. In the past, in almost every house, these inscriptions were sewn on colorful fabrics with neatly sewn threads in different flower-leaf designs, and hung on the walls of the house with extra dignity. And even a few years ago, with the aristocracy in many homes in the village, this wall- mate became the guides of life. There were always some proverbs in the mouths of people of all classes and professions. For example, the one who cooks also ties his hair. Husband is the adornment of a woman. If you don't understand before, the burden of youth, you have to cry in the back with tears in your eyes. Again, sometimes behind the colored thread, the letters start saying with a shy face, Go and tell the bird that he should not forget me. For whom the forest dweller, he hangs himself. A common proverb in Bengali is, the happiness of the family is due to the virtue of the woman, the woman is beautiful in maintaining chastity. This sentence expresses the life philosophy of the common man in a very fluent and beautiful language which is very much in conflict with the life philosophy of modern man. But most people in rural areas follow this belief as a part of life. At the time of the bride's wedding, the mother sews many such sentences with her own hands and sends them to the bride's new world. Then the proverbs are not limited to sentences or letters, they become a piece of faith. Folk art is created by people because it is needed in personal life, practical life, or in some aspects of daily life due to aesthetics. Similarly, the practical usefulness of proverbial rhymes is not so much observed as in the case of Alpana and wall painting, but their usefulness is no less in terms of thinking and affection. The expression of these proverbs changes with the language and culture of different regions of Bangladesh. For example, many proverbs served at the Topper Asar of the famous poet Ramgati Shil of East Mymensingh are still circulating in the public eye. In different parts of the Netrokona district, a class of poorly educated poets of the village is composing long poems in the form of lyric poems by expanding the world of their imagination by subverting a particular event or story. These were printed on special paper on the previous day and sold in the market. Many proverbs and sayings are found in these poems. Similarly, one of the proverbs quoted in the Mymensingh Gitika is- If a son dies while living abroad. Only mother knows before she knows in the country.

Also mentioned below are translations of some popular proverbs.

1. khalikolshibajebeshi
Vorakolshibajena
Rup nai tar sajonbesi
Rupermaiyasajena.

3.Jetomake kata dei
Taredaoful
Tahole tar vengejabe
Kata deuyarvul

1. There is more noise in an empty pitcher,
The filled pitcher does not sound.
Those who do not have appearance, they do more makeup.
Beautiful girls don't dress up.

3.That gives you thorns
Give her flowers.
Then it will be broken,
It is wrong to give thorns.

2.Meyeradekhtevalo
Mistimukherhasi
Premikerlagesundor
Bajayjohonbasi.

2. Girls look good
with sweet smiles.
Nice to see lover
When he plays the flute.

Momentous time with collector:

In this analytical discussion, to accurately illustrate my point, found a collector who collects the proverbial needle art of rural Bengal. In such delicate works, women express their inner thoughts in folk rhythms and language with utmost beauty. And with utmost devotion and faith, they used to hang them on the wall to enhance the beauty of the house. The collector herself is a hand embroiderer. Although there were numerous topics to be discussed at this stage, the collection, preservation, and lifelong creation of his work around this invaluable resource have been discussed. The name of this collector is Saira Khatun. She is a resident of West Bania Farm in Sher-e-Bangla Nagar, Khulna. Khulna is an ancient traditional division of Bangladesh. The collector married in her childhood and spent the rest of her life in a very conservative family. Raising five children and taking care of the abnormal mother-in-law's family, she chose this white cloth as a secret refuge to express her joys and sorrows. Where he has sewn the colorful thread of life's passion history. He is now Seventy-five years old. Standing at the end of his life, he was moved by the memory and said that it is a rhythm of his life which he has stored for fifty-six years. According to him, this collection evokes memories of life. This sewing started from her life after marriage and after a while, she started collecting sewing from her

acquaintances beside her work. In her time girls were strictly forbidden to go out. Whose overall effect is reflected in the proverbs. collector came to know about the chaotic memories of his personal emotions. She had to sew in hurricane or candlelight as there was no electric light in those days. At the end of the day's busyness, he would wake up night after night and weave the words of his mind into a thread. These are words of faith, devotion, respect which have been popular for a long time or are self-arranged. From that curiosity, I learned that most of the proverbial artists were between fifteen to thirty-five years of age. And the period of their sewing is from the beginning of marriage till the birth of a first or second child. Most of them used to do this embroidery to show the unspoken mind to a special person. And many times that special person would frame their work beautifully. While saying this, an extremely beautiful shy look in the eyes of the collector said that even if the beloved person is lost, the word remains. Another thing to focus on is the sewing of the same person but their handwriting is different. The search revealed that women at home or in the family did not know much about education at that time. Where the collector himself has studied till 5th class. So they had to look for educated people to sort their writing lines or letters. Looking at the above pictures, one thing is noticed that there is a combination of feelings of two types of people, Hindu and Muslim. But the style of expression and the main thing is the same. According to the collector, such industries were lost when many people were displaced during the liberation war in Bangladesh in nineteen seventy-one. When people close to her migrated to Kolkata, India, it became difficult to practice this art. Talking to the  educated men in the village would record such verses for them. In the past, people used to select these invaluable creations from wedding songs, regional rhymes, etc., to the desired line or rhythm that matches life. And they were preserved as gifts from generation to generation. These proverbs were sewn on various social occasions like marriage, new family, the birth of a child and were given as gifts to loved ones. Beyond the conventional information from the collector's statement I have found some simple features of this folk art, they are described below.

> “Folk rhymes of rural areas, proverbs and sayings, folk riddles and verses, wedding songs, feminine songs, jari songs, rain songs, ghatu songs, kite festival, kirtan, harvesting Songs, Baul-Murshidi, Marfati, Bhatiali, Bird hunting songs, Puthi Path, Regional songs, Kavigaan, Rakhali songs, Snake incantation, Bull fight, cock fight, folk-story based story, palagan, most of these proverbs take the form of rhyme at one time centering on the social life”.4

Simple sewing medium that makes the lines of the letters clear. “Geometric and natural designs can be noticed next to rhyme or words. Especially popular is the use of flower and leaf shapes.”[5] The nature and nature of women, women's life, manners, family, and husband were more prevalent.

Some examples of his collections are highlighted below:

Meaning: The wife's paradise under the feet of the husband.

Artist: Jayanti Rani, Time: 1984 (Approx.)
District: Jessore, Bangladesh.
Sewing type: filling medium

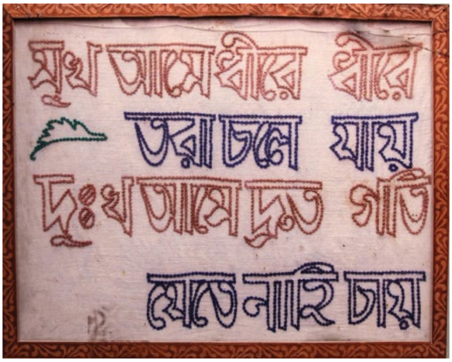


Meaning: Happiness comes slowly, Goes fast.
Sorrow comes fast, does not want to go.

Artist: RatnaKhatun.
Time: 1976 (estimated)
District: Dhaka, Bangladesh.
Sewing type: Chain and knot medium.

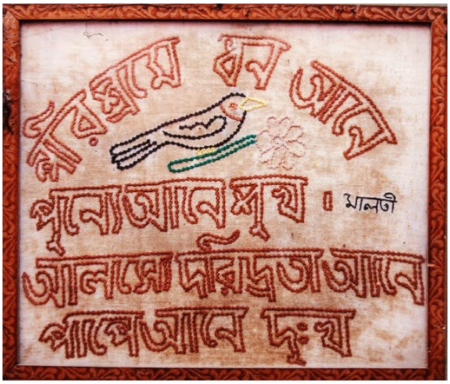


Meaning: Wealth comes with hard work. Happiness brings good deeds. Laziness brings poverty. Sins bring sorrow.

Artist: MalatiKundu, Time: 1970 (Approx.) District: Jessore, Bangladesh. Sewing Type: Git Medium.

Meaning: Life is on the first page of the river
I gave it to Alpana.My writing will speak
When I will not stay

Artist: HajeraBanu. Time: 1985 (approx.)
District: Rajshahi, Bangladesh.
Sewing type: filling medium.

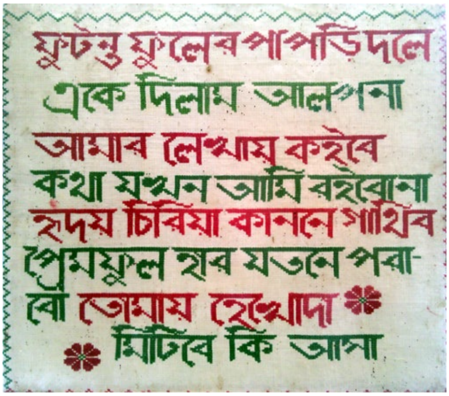


Meaning: In the petals of boiling flowers
I gave it to Alpana.
My writing will speak when I am not there.
I will build my heart in the garden
Flower jewelry with love.
Wife, will your hopes be fulfilled then?

Artist: Mrs. SairaKhatun, Time: 1983
District: Khulna, Bangladesh.
Sewing type: fill and cross medium.

Causes and remedies for the extinction of such folk art:

According to the data collected, the proverbs collected early in life were full of memories and aspirations. Although the accumulated art were nurtured or preserved in the beginning, the prestige of the art has been tarnished due to the shifting of family responsibilities to new people in middle life. These proverbs or biographies have been replaced by posters, colorful calendars, and other technological touches. At the same time, as a result of women's awakening, proverbs or such sayings are considered as a trap to keep women down in the masculine society and the practice of displaying and gifting them on the walls of the house has been suspended as they are obsolete or outdated. Proverbs are almost extinct today. After so many days of being trapped in the dust and being hit by insects, the body of the cloth seemed to be shrinking in pain. Then the seventy-five year-old collector's internal pain turned to tears. This reminds me of this feeling of Walter Benjamin, "I must ask you to join me in the disorder of crates that have been wrenched open, the air saturated with the dust of wood, the floor covered with torn paper, to join me among piles of volumes that are seeing daylight again after two years of darkness, so that you may be ready to share with me a bit of the mood"[6]Just like a mother gets lost in the misery of her child. Tears welled up in his eyes as he spoke of the future. The past haunted him as he spoke of a life lost in memory. Benjamin, in his remarks, simply explains the memory of the collector's mental turmoil. In my review ,to understand the author's

point of view more clearly, analyzed a subject where the chaos of emotion and the cloud of memory are fully revealed. However, the thing to think about is that today's social life is being ignored because the emotions are old, bad old-fashioned and they forget that their present birth is from those emotional memories of that day. After so many years of searching for the proverbs given as gifts in the marriage of the daughter with the utmost care of the collector, their neglected form was found. If an artist or a collector's family members have such a role in preserving or collecting art, then what can be expected from people outside the art world? Then, of course, there is a knock on the door of the mind, chaotic emotions in the memory.

I would like to highlight a few aspects of this type of embroidery as a cause of loss and preservation. It is true that in the modernity of industrialization we live in skyscrapers today. Much of the ancient folk art has evolved, become extinct, and refined today with the touch of modernity or the need of the hour. Our folk art is made up of daily necessities of life and livelihood. Today this art is more aesthetic and more artistic with the aesthetic touch of the hand with the native things. But are these hands only the hands of the workers? Is that it? Reality does not say that. They are selling modern showrooms at high prices by getting cheap work from the artists. So the artists are losing interest in creation because they are not getting a fair price. It is a matter of great frustration that the concerned ministries and agencies of the government have always been indifferent in protecting the country's heritage and archeological heritage. Due to their indifference for a long time, we have lost many of our traditions today. The government has to intervene directly in this matter. At present, due to modernization, the industrial revolution and the reign of plastic products, the folk art of Bengal is under threat. There are museums in Sonargaon where there are folk and handicraft foundations, there are limitations of preservation. Besides such museums, it is necessary to create many museums. The government departments and agencies responsible for the maintenance of archeological and archeological monuments need to be monitored to see if they are doing their job properly. Necessary punishment should be provided for negligence in work. Also, preserve old patterns, follow scientific methods, provide training, and take all necessary steps. Along with the role of government institutions, teaching on this subject should be increased at the university, college, and school levels. If it is possible to create a skilled workforce based on this subject, then it is possible to collect and preserve it scientifically and its analysis and application can be used for the welfare of the people. The Folk and Crafts Foundation was established in 1975 at Sonargaon in Narayanganj on the initiative of Shilpacharya Zainul Abedin in an effort to preserve, develop and promote the folk art of Bangladesh. The Folk and Crafts Museum of the Foundation preserves various traditional items of folk art of the country. At present, due to modernization, the industrial revolution and the reign of plastic products, the folk art of Bengal is under threat.. Training is essential if you want to preserve people and handicrafts scientifically And for this, it is necessary to acquire knowledge Students from our country who study folklore or folk art can go there and do this 'internship', do research. Then the folklore could be analyzed and used for the welfare of the country and the nation.

can go there and do this 'internship', do research. Then the folklore could be analyzed and used for the welfare of the country and the nation.

**Conclusion**

Bengali folk art has a history of worldwide glory. For example,

> “our Dhaka muslin sari once captured the hearts of people all over the world. Besides, Jamdani of Narayanganj, Nakshikantha made by rural women of Jessore, Shital Pati of Sylhet, Madur of Khulna, Bash-cane industry and terracotta industry are also highly valued. Recently, Shital Pati and Jamdani have been recognized by UNESCO as cultural heritage[7]”. “It is worth noting that in two thousand sixteen when UNESCO gives this recognition, their status is multiplied”.[8]

This embroidery can also be included in the cultural heritage of UNESCO, so we have to continue our efforts to preserve and expand folk art. There are thousands of men and women in different cities, suburbs, and villages of Bangladesh who want to work but are falling into poverty day by day due to lack of work. Paying attention to well-planned ways and preparation of elegant folk art will solve some of their problems.

All of us today have to look at our environment and situation not only with our eyes but also with our hearts. If the heart-mind is expressed through folk art, it will arouse a response in the hearts of foreigners. In this way, our folk art can also help in building heart relationships in the country. They will be interested and respectful of the folk art of the country and will work hard to preserve it. Then there will be no more worries about the subsequent ownership of the collector. It is clear from the writings of the author Benjamin that the mental characteristics of a common man and the mental characteristics of a collector have different effects. All of us today have to look at our environment and situation not only with our eyes but also with our hearts. If the heart-mind is expressed through folk art, it will arouse a response in the hearts of foreigners. In this way, our folk art can also help in building heart relationships in the country. They will be interested and respectful of the folk art of the country and will work hard to preserve it. Then there will be no more worries about the subsequent ownership of the collector. It is clear from the writings of the author Benjamin that the mental characteristics of a common man and the mental characteristics of a collector have different effects. Which contains his entire life and national historical history. So the boundaries of the collector's emotions act in a different part from the others. Based on that, I wanted to express this in my discussion, which at the same time brings the past and the future to the door of wonder. We all have a responsibility to preserve this folk art of our country. Through folk art, we can present our heritage to the world.

## Works Cited

1. Benjamin, Walter. *Illuminations, Unpacking My Library.* German, University of Texas at Austin, 1999.
2. Mitra, Subal Chandra. *Bangla Probad o Probochon.* Dhaka, Biddaprokash sonoskoron, 2017.
3. Khan Jahangir, Borhanuddin. *Bangladesher Lokosolpo.* Farmgate, Dhaka-1215., The University Press Limited (UPL), 2003.
4. Pal, Samar. *Probader Utsho Sondhan*. Shova Prokash., 2011
5. Interviewer- Momena Begum, Age- Seventy-nine (approximately), Occupation- Housewife, Address- Village, Jagannathpur, Thana- Sadar, District Jessore. Date of interview: 13 February 2020, time - 5 pm.
6. Benjamin, Walter op.cit., p.2
7 Mahmud Khan, Md. Wahid. "The traditional epic art of Bangladesh( International culture heritage of humanity)." *International Journal of Asian History Culture and Tradition,* vol. Vol 3, No.2, pp. 30–40, Aug. 2016, pp. 37–38.
8. UNESCO Culture Sector, The Daily Star*"Jamdani"* Wikipedia, 1 Dec. 2021.

## Research Field survey:

1. West Bania Farm, Sher-e-Bangla Nagar, District -Khulna. Date, 10 March, 2019
2. Rupdia, Sadar, Jessore. Date, 13 February, 2019.

## Collector Details:

Saira Khatun, Age- Seventy-five (approximately), Occupation- Housewife, Address- West Bania Farm, Sher-e-Bangla Nagar, District -Khulna. Date of interview: 05 March, 2019, time – 4.30 pm.

Date of Submission : 13.02.2022
Date of Acceptance : 08.06.2022

**Jagannath University Journal of Arts**
**Volume 12, No 01, January-June 2022**

# Poetry for Global Peace: Reading Lalon and Tagore in the 21st Century

Md. Momin Uddin*

**Abstract**

Fakir Lalon Shah (1772–1890), a Bengali mystic poet of spiritual development; and Rabindranath Tagore (1861–1941), a Bengali poet of peace and love, were near contemporaries writing in a time when people across the globe were experiencing violent humanitarian crises like racial conflicts, political unrest, gender discriminations, economic exploitations, forced slavery, etc. Both of them wrote advocating social peace and human development, and sang against those issues which were creating social unrest and injustice. This paper argues that reading the poetry of these two Bengali poets and realizing the truth embedded in them can keep people away from committing misdeeds harmful to people and society. The current world is witnessing violent conflicts and social unrest all around in many forms. Genocides, ethnic cleansings, religious persecutions are found occurring in many countries like Myanmar, Syria, Sudan, Congo prompting large-scale exodus of humans who are in a desperate search for safe accommodation. Miseries and sufferings are also caused in many places by such issues like racism, apartheids, political purges and repressions, forced labour and slavery, abuse of workers, etc. Even within the boundary of many a nation, social growth, peace, and security are disturbed by people’s dishonesty, misuse of public fund and property, riots and political conflicts between different groups, sexual violations, domestic violence, gender discriminations, etc. In such a backdrop, poetry of Lalon and Tagore can be a tool for fighting against these man-made ills that hinder social peace and progress across the world.

**Keywords:** Lalon Shah, Tagore, poetry, protest against social injustices, global peace

## Introduction

Lalon and Tagore were near contemporaries writing in a time when people across the globe were experiencing violent humanitarian crises like racial conflicts, political unrest, gender discriminations, economic exploitations, forced slavery, etc. During the time of Lalon, class distinctions and caste discriminations were the major obstacles on the way to ensuring social justice for all in India. People of lower classes were discriminated and exploited both economically and psychologically by the upper class people. Lalon urged these people through his songs to refrain from practicing injustice and holding discriminatory attitude towards others, and follow the path of truth and righteousness. Similarly, during Tagore, India was tormented with social and political problems. Class distinctions, gender discriminations, political unrest, and economic exploitations on the lower class by the upper class were common problems the people of greater India were facing. Tagore wrote against these social injustices and urged people of all classes to work towards

*Professor, Department of English, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh

establishing a human society free from all types of discriminations and injustices. What Lalon and Tagore sang for in their lyrics and poetry around one hundred years back are still relevant in the current social and political contexts since people of the present century, too, are witnessing the same humanitarian crises in different countries across the globe.

**Lalon Shaha (1772 – 1890):**

Lalon Shaha, popularly known as Lalon Fakir, a mystic bard of Bengal, was born and living in a time when racial conflicts between Hindus and Muslims were eroding the Bengal society in its core. The two groups of people lived and behaved as if they had been created by two different Gods hostile to one another. How severe the racial conflict between Hindus and Muslims was can be understood from the experiences Lalon himself had in his own life:

> He was probably married in his boyhood. Sometime in early years of his life, Lalon happened to be a victim of small pox while in a journey to visit the places of pilgrimage. His companions abandoned him on the way. A Muslim fakir (saint), Siraj Sanyi rescued him in a dying condition and got him recovered by nursing and medical treatment. After his recovery Lalon returned to his house, but was denounced by his wife and the relatives since he had been under the shelter and association of the Muslims. Disappointed and disheartened, Lalon returned to Siraj Sanyi, initiated with him in Baul doctrine and devoted himself in austere ascetic practice. ("Lalon Shah," Para II)

Puzzled and shocked by this racial conflict, Lalon questioned the validity of these religious identities that people thought important. Such identities as created divisions and discriminations among the people of a society were meaningless to him. He denounced caste distinctions and rebelled against it by saying:

> Everyone wonders, "What's Lalon's caste?"
> Lalon says, "I've never 'seen' the form
> of caste with these eyes of mine!"
> Circumcision makes a man Muslim,
> what then makes a woman Muslim?
> A Brahmin is recognized by the Holy thread he wears
> how can a Brahmin-woman be recognized?
> (Hossain 139. Vol. 2. Translation mine)

Another song of Lalon written protesting against caste reads like the following:

> Gone is the caste; gone is the caste,
> what a strange world this is!
> ----------------------------------
> Both the upper caste and lower caste-people
> are created from the same water.
> Yet people discriminate between them

although death will spare none of them.
If one goes to a prostitute in secret
what harm does he cause to his religion?
Lalon laments the fact that
people's illusion about caste is not gone.
(Hossain 142. Vol. 2. Translation mine)

Lalon composed about 2,000 to 10,000 songs (Rahman 179) many of which he wrote protesting social injustices and discriminations. These songs are popular to both Hindu and Muslim communities for their non-sectarian spirit. Lalon urged all through his songs to follow the path of truth as he sings, "Speak the truth and follow the path of righteousness, / Without knowing the truth and right path, / O mind mine, / one cannot reach man (Hossain 87. Vol. 3. Translation mine).

Throughout his life, Lalon, dreamed of a society where all religions and beliefs would be in harmony. His songs are still relevant to the contemporary society since social injustices are still found rampant here as they were in his life time. He preached tolerance and secularism through his songs. This great thinker wanted to liberate his society, which was then split along caste, creed and religion.

As an itinerant singer, Lalon moved through localities singing his self-composed songs which urged people to refrain from all evil practices that caused social injustices and sufferings to the poor and underprivileged. Many of his songs are found to have the power of changing the insular and myopic insight of partisan people. Lalon longed for a united society where people of all castes, creeds and religions would live with equal rights and equal social dignity. One such song is: "Will there be a society ever / where there will be no distinctions between Hindus, Muslims, Buddhists, and Christians" (Hossain 138. Vol. 2. Translation mine). Thus, the unity among human beings that Lalon advocated makes him a frontline humanist.

Lalon was a worshiper of man. He believed and preached through his songs that man and his values and virtues are everything; his religion and caste are meaningless on this earth. Therefore, a man's social position in this society should be determined by his virtues and deeds, not by his caste and religion. Lalon found castes and religions to be two serious obstacles on the way to establishing equality among men. His abhorrence and apathy towards castes and creeds are revealed profoundly in the song:

Since one can't reach God until they reject caste
what caste do we feel proud of
saying "Don't touch."?
Lalon says I would burn the caste in fire
if I got it in my hands.
(Hossain 375. Vol. 1. Translation mine)

Thus, Lalon loved all men irrespective of their castes and creeds. A mystic bard, Lalon even traced the Supreme Being in man that he believed to be the best of His creations, and preached to his followers that it is only through man that one can reach the supreme creator. The maxim “To love man is to love God” fits well in Lalon’s case as he sings:

If you worship every simple man with conscious mind,
you will get invaluable treasure just now.
If you prostrate to a man’s feet,
you will always get pure things.
(Hossain 212. Vol. 1. Translation mine)

**Tagore (1861 – 1941)**

Asia’s first Nobel Laurate, a prolific and ambidextrous author, Rabindranath Tagore emerged as the conscience of the whole world. He talked not only against the social injustices being practiced in his own country but also against the evil deeds, beliefs and practices of different bigger nations whose considerations of myopic self-interest led them to exploiting the weaker nations. Thus he appeared as a global activist for peace and humanity. He worked all his life for the creation of a syncretic and synergetic global human community that would shun individual self-interests, myopic religiosity, exclusivism, chauvinism, and dogmatism of all forms, inspired by the sense of being the best creatures of God. He travelled through the world lecturing on how to create a tranquil and peaceful world, banishing wars and weapons into the closed corners of museums. Like Victor Hugo, who once said, “the day will be coming soon when cannons, arms and ammunitions will be things of exhibit in museums. The viewers will be amazed thinking how barbarous people were at that time as we now do seeing the torturing instruments used in the past” (Majumder 9), Tagore used to dream of a world free from wars and malice. He realized that “until bigger nations, aided by their superiority and vast technological advancements, ceased their desire for territorial expansion and aggrandizement, exploiting the smaller and weaker nations, world peace can never be achieved” (Kundu 78). He identified three forces as the sources of the rampant violent humanitarian crises like genocides, ethnic cleansings, religious persecutions, racism, apartheids, political purges, political unrest, etc.: 1) “the unmediated materialism of modern society; 2) belligerent nationalism which often led to nationalist selfishness, chauvinism and self-aggrandizement; and 3) the machinery of organized religion which, he believed, ‘obstructs the free flow of inner life of the people and waylays and exploits it for the argumentation of its own power’” (Quayum 1). Tagore categorically lampooned these evil forces in his writings and urged people to work for the creation of a compassionate global community shuniing selfish materirialistic interests, bigoted nationalism and myopic religious perspectives. As he says in the poem No. 15 published in the collection titled *Homeland* (Swadesh):

Come, O Aryans, come, non-Aryans, Hindus and Mussulamns.
Come, come today, O Englishmen, come, Oh come, Christians.
Come, O Brahmin, cleansing your mind

Join hands with all –
Come, O Downtrodden, let the burden
Of every insult be forever dispelled.
Make haste and come to Mother's coronation, the vessel
Is yet to be fulfilled
With sacred water sanctified by the touch of all
By the sore of the sea of Bharat's great humanity.
(qtd. in Quayum, *Beyond Bounderies* 44)

Tagore believed that the world would be an abode of peace and prosperity and evolve into a global society connecting peoples of all lands and sharing its resources proportionaley with all when its dwellers would learn to respect and be guided by shared truth, knowledge and reason instead of unmediated materialism, chauvinistic community-interset, bigoted religious dogmatism, and racial orthodoxy. He asked his nation as well as international communities to rise over all tyeps of parochialism so that people can live everywhere without fear and fetters and with their heads held high in dignity. So he writes:

Where the mind is without fear and the head is held high;
Where knowledge is free;
Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls;
Where words come out from the depth of truth;
Where tireless striving stretches its arms towards perfection;
Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit;
Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.

(*Naibedya,* Poem 72. Tans. by the poet himself)

Tagore had been deadly against nationalism, even from his young age, since nationalism, according to him, limits the vision of a nation and makes it selfish and self-centred by generating in its members arrogant, billigerent and violent senses which dehumanize them and make them behave like animals. When a nation is led by xenophobia, self-aggradisement at the cost of anything and everything becomes its chief aim—a charateristic that fits only the denizens of animal kingdom. Tagore was horribly shocked in his late thirties when he witnessed such loathome aggradizement perpetraited by the British during the Boer War in South Africa (1899 – 1902) and by the Western missionaries in China during the Boxer uprising (1899 – 1901). He vehmently condemned this xenophobiac attitude of the British and other Western imperialists in many of his essays and poems. In his political essay, 'The Eastern and the Western Civilization,' he wrote:

If the national interest, which is the foundation of European civilization, is inflated exessively, and crosees all limits of righteousness, it will create a crevice of destruction through which the evil will make its way in.

> The nature of self interest is such that it always leads to hostility. This hostility is gradually becoming throny along the edges of European civilization. This attitude of the European nations signals in advance that they will quarrel and fight with each other for their share on the earth.
>
> It is also seen that the European nations are nakedly ignoring righteousness for gratifying their national interests. Now they are not feeling ashamed of adopting the principle: 'might is right.'
>
> (Majumder 11, Translation mine)

Tagore judged imperialism as a menace to the whole world. He believed that the Western imperialists colonized different parts of the world cleverly disguising their hidden motive of establishing their cultuarl and political superiority in the world and of making their countries economically more powerful than others by plundering the colonized nations. Driven by a false sense of superiority and national egoism, they actully expanded their horrision of imperial arrogance, swayed by a distorted logic of "the white man's burden" (Kipling, 1929). He argued that nationalism and imperialism were at the root of most of the wars and carnage the world had experienced as of then. In a poem tiltled "The Sunset of the Century," which he wrote on the last day of the 19th century, he depicted nationalism and imperialism as famished and mercilessly unquenchable human feelings which were bent upon tearing the world into pieces. He wrote:

> The last sun of the century sets amidst the blood-red clouds of the West
> and the whirlwind of hatred.
> The naked passion of self-love of Nations, in its drunken delirium of
> greed, is dancing to the clash of steel and the howling verses of
> vengeance.
>
> The hungry self of the Nation shall burst in a violence of fury from its own
> shameless feeding.
> For it has made the world its food,
> And licking it, crunching it and swallowing it in big morsels,
> It swells and swells
>
> Till in the midst of its unholy feast descends the sudden shaft of heaven
> piercing its heart of grossness. (*Nationalism,* 80)

In another poem, Tagore condemns the all-engulfing attitude of the stronger nations thus:

> Like an epidemic, the self-interest of the arrogant powerful
>
> Is engulfing the world fast at present,
>
> Burning the tranquil villages across the world.
>
> ------------------
>
> Today the mind is replaced by materialism,
>
> Satisfaction is replaced by pompousness, and
>
> Peace is replaced by the weapons of interests.
>
> (*Naibeya*, Poem 92. Translation mine)

Tagore was horrified when he realized that the rigid and rigorous calculations of loss and profit by the stronger nations and their unabated greed for gratifying national interests were actually pushing the world to a war which might spread over the whole world. Horrified and angered, just weeks before the World War I began, he wrote his famous poem 'The Destroyer' expressing his concerns:

> Is it the Destroyer who comes?
> For the boisterous sea of tears heaves
>     in the flood-tide of pain.
> The crimson clouds run wild in the wind lashed by lightning,
>     and the thundering laughter of the Mad is over the sky.
> Life sits in the chariot crowned by death.
> Bring out your tribute to him of all that you have. (Ray 215. Vol. 1)

Tagore had been anti-nationalist and anti-imperialist from his youth to the last day of his life. He vehemently attacked these sentiments in his writings whenever he saw people, driven by aggressive nationalism or by the distorted logic of protecting and civilizing the inferior 'others,' waging wars causing bloodshed and threats to humanity. In the wake of the World War II, his prophetic mind sensed that the bigger European nations, fomented by nationalist thoughts and expansionism, are leading the world to the door of another big war. In 1935, he was made a member, with Gandhi and some other leading Indian figures, of the Indian chapter of the World Peace Congress Committee formed in Paris, but the arrogant exhibit of militarism of different European and South East Asian nations disappointed the poet about the fate of the committee (Kundu 84). Noticing the violent and belligerent military attitude of different countries, he expressed his grief and anger in a poem that he wrote on the Christmas Day of 1937. The poem reads,

> She-serpents hiss everywhere, exhaling poison-breaths,
> Soft words of peace will sound like hollow jests.
> Before I take my leave
> let me invoke
> those who, in human homes, are preparing themselves
> to wage war against the monsters. (Dyson 232)

In another poem, he wrote:

> The poisonous breath of the serpents
> Is spreading all around. (qtd. in Mukherjee, 138)

Tagore again roared in thunder in 1938 when four major European nations—Germany, France, Britain and Italy—unlawfully legalized German's annexation of Czechoslovakia's Sudetenland through an agreement infamously known as Munich Pact which was signed in a conference held in Munich without the presence of Czechoslovakia. Tagore was so saddened and flabbergasted at this event that he sent a message to President Edward Benes of Czechoslovakia expressing his deepest sympathy on behalf of India and also wrote a poem a week later scathingly attacking the loathsome expansionist character of the unsympathetic superpowers:

Those crushed and trodden lives of the meek and the week
Which are sacrificed as food offerings to the mightiest
Those human flesh-eaters, snatching and scrambling,
tearing the gut
scattering everywhere pieces of flesh bitten in sharp teeth.
Stained the lap of the mother earth with muddy blood.
From the thrust of that fierce destruction
one day, peace will emerge in the end with a great power.
We will not fear,
Overcoming the distress, victory for us at the end.
("Praiyaschitya" qtd. in Kundu 85)

Tagore also reacted vehemently when he saw Africa being oppressed and plundered by the British colonizers who claimed themselves as culturally superior and civilized, and colonized African countries under a hypocritical plea of civilizing them. Sympathizing with the colonially oppressed African people, he wrote in utter pain:

The savage greed of the civilized stripped
naked its unashamed inhumanity.
You wept and your cry was smothered,
Your forest trails become muddy with tears and blood. (Das 377)

Tagore protested not only political carnage and political atrocities perpetrated by people across the globe driven by nationalist egoism or by the thoughts of territorial expansion, he was equally concerned with other forms of social and environmental degradations caused by people's egoistic notions of their racial, cultural, and religious superiority over others, and by people's greed for gaining power and money by running mechanized civilizational projects, destroying nature. He was opposed to the idea of creating machine-made civilization, destroying nature, in the name of rapid social and economic advancement, which, according to him, was actually a disguised mischievous and outrageous capitalist project for exploiting the weaker. When the exploitative capitalist nations in the name of creating advanced civilization were raising their heads everywhere, Tagore wrote two famous plays—*Mukta Dhara* (Free Flow) and *Raktakabari* (Red Oleanders), expressing his utter frustration over the made-made-environmental crises and disasters all over the world.

Seeing everywhere consistent threats and endless barbarity to humanity, and mindless injustices, hatred, carnage, killings, and bloodshed caused by man's unabated greed for power and money, and by egoistic feelings of racial, cultural, religious, and economic superiority over others, the anguished, fed up, and disappointed poet cried in utter despair, saying:

The world today is wild with the delirium of hatred,
The conflicts are cruel and unceasing in anguish
Crooked are its paths, tangled its bonds of greed. (Das 365)

Apart from political and environmental issues, Tagore also talked about the social and religious problems that had long been eroding the Bengal society. He was born and grew up in a time when the communal tension between Hindus and Muslims and the upper caste Hindus' hatred and oppression towards the lower caste Hindus were common affairs in that society. He himself fell a victim to the upper caste Hindus' hatred because of belonging to the inferior caste *Pirali Brahmans* who were considered polluted because of their social interactions with Muslims. His family faced ostracism as caste Hindus refused to enter into marital relationships with its members. Failing to get a bride from a Brahman family, Tagore had to marry a daughter of one of their clerks. Some other members of the family also had to suffer a lot in finding counterparts for marriage. Tagore considered caste-hierarchy a serious impediment to progress, and criticized it and its strict abiding in many of his essays, short stories, and poems. His dance drama *Chandalika* is a glaring protest against the then existing casteism. The custom of untouchability being practiced for long became a kind of a must-followed law in the caste ridden Hindu society. In *Chandalika*, the titular protagonist, a socially ostracized girl, is so indoctrinated in the long-followed belief that she believes herself to be untouchable and that's why she laments to the thirsty monk her inability to give him water. Tagore lampoons this custom and treads on it by making the monk drink water from the untouchable girl and thus upholds the fundamental spiritual unity of all human beings. Tagore believed that people of all castes and all religions are created by the same creator, and all are interdependent. He condemns the caste-based social system and its hateful and communal attitude towards the people of lower castes and Muslims in his poem 'Pure' (Shuchi), which embodies his belief that all, irrespective of caste, creed and religion, are same and of equal significance to God:

> Those whom you denied access
> To my temple that day
> Are created by me.
> ---------------------
> Your act of insulting them has hurt me.
> So, your offerings are impure today.
> -----------------------
> How dare you, in the name of protecting religion,
> Raise a fence against
> My right to those
> Who are created by me
> And who are invited to my temple! (Translation mine)

Tagore was opposed to religious fundamentalism and cultural separatism, and always talked about harmony among religions and respected the cultures of others. He once described his family as the product of "a confluence of three cultures: Hindu, Muslim, and British" (*Religion of Man*, 105). He believed that different peoples of the human society would have different religions and distinct cultures of their own, but there should not be any hostility among them. But he noticed peoples everywhere

living as though they had had separate gods who were in conflict with one another, and they were fighting for their gods on the earth. Criticizing this senseless and blind religiosity of the different religious groups in the world, he wrote, "While God waits for his temple to be built of love, men bring stones" (FF 40, Das 579).

Like Lalon, Tagore identifies God, his Jeevan Devta, in man, do s/he belong to the lower caste or the upper caste, or be s/he a Hindu or a Muslim. Therefore, discriminations against man are a sin against God. He discourages people from trying to find God in the closed corners of temples, and instructs them to find Him in the downtrodden:

> Whom are you worshipping quietly?
> Open your eyes and see
> Your god is not there.
> He is where the farmer is tilling the earth.
> He is where stones are being hewn
> To make a path.
> ………………………………
> Where will you get freedom?
> The lord himself is bound
> With all that he has created.
> ("Dhulamandir" qtd. in Mukherjee 137)

Tagore was a poet of man. Man and their dignity were his chief concerns in his writings. He has given the highest place to man, even higher than God. To him, man was "the creator of the creator" (Mukherjee 138). As he says:

> Being coloured with my awareness
> The emerald becomes green,
> The ruby becomes red.
> I opened my eyes to the sky
> Lighted up East and West
> I looked at the rose and said 'beautiful'
> It becomes beautiful. (qtd. in Mukherjee 138)

A sensitive poet with a heart full of love and compassion for all, Tagore thought of the human rights of women, too. He thought it cowardly of the patriarchal society to dominate over women, treating them as inferior and depriving them of their human rights. He believed that the truly perfect advancement of human society was not possible until the other half of the society—the women—would be allowed opportunities to develop their personality. For his belief that society's efforts to silence the voice of women would be cataclysmic for both, he acknowledged the power, spirit, assertiveness, and intellect of women in his dramatic poetry *Red*

*Oleanders* (*Raktakarabi*) as well as in many of his lyrical poems. In his poem "The Able" (Sabala), the narrator woman questions,

O God,
Why do you deprive women of their rights
to conquer their fate?
Why should we keep awake everywhere
with our head held down?
-------------------------
Are we only to keep looking up in the air?
Why will we not know by ourselves
the way to success?
We are determined to ride unruly horses
through rough ways to the cave of riches
and pluck them. (Translation mine)

Tagore was a believer although he was against all forms of institutionalized religion as institutionalized religions in most cases, instead of generating love in human hearts for others and establishing peace in the society, divide people into groups hostile to one another and lead one group against another in a vile completion to prove one's racial and religious superiority over others. He believed in the benevolence of the Divine Power and sought His help in his mission of creating universal love in human hearts for all. He prayed,

All creatures are crying for a new birth of thine.
Oh, thou of boundless life,
Save them, rouse thine eternal voice of hope,
let Love's lotus with its inexhaustible treasure of honey,
open its petals in thine light.
O Serene, O Free,
in thine immeasurable mercy and goodness
wipe away all dark stains from the heart of this earth.
Thou giver of immortal gifts
give us the power of renunciation
and claim from us our pride.
In the splendor of a new sunrise of wisdom
let the blind gain their sight
and let life come to the souls that are dead. (Das 365)

In search of peace, Tagore even took refuge to Lord Buddha as he said:

Let thy great awakening under the bodhi tree be fulfilled
sweeping away the veil of unreason
and let, at the end of an oblivious night,
freshly blossom out in India thy resemblance!

Bring life to the mind that is inert,
thou illimitable Light and Life!
Let the air become vital with thy inspiration!
Let open the doors that are barred,
and the resounding couch shell
proclaim thy arrival at Bharat's gate.
Let through innumerable voices,
the gospel of immeasurable love announce thy call. (Ray 368. Vol. 2)

## Conclusion

Lalon and Tagore were the poets of peace and humanity. All their life, they were vocal against all that threatened social peace and humanity, and dreamed and worked for a world that would be an abode of pece, free from all malices and hatred catalysmic to humanity. Both of them identified man's false sense of superiority over others as well as man's greed for power and material comfort as the main reasons behind the violent and inhuman activities like relgious extremism, racial conflicts, religious persecutions, economic exploitations, grabbing others' wealth, mindless killings, and so on. People of the present time are also facing the same crises across the globe. Therefore, Lalon and Tagore are still highly relevant in the current contexts of corruption, crises and social degradation rampant all over the world since their songs and poetry celebrate humanity and urge people to forget differences among themselves, shunning all that jeopardize humans and humanity.

## Works Cited

1. Das, Sisir Kumar, (ed). *English Writing of Rabindranath Tagore*. Vol.-1. Shahitya Akademi, 1994.
2. Dyson, Ketaki Kushari, Translator. *I Won't Let You Go: Selected Poems*. Penguin Books, 2011.
3. Hossain, Anwar Fakir (ed.). *Lalon Sangeet*. Lalon Majar O Seba Sadan Committee, 2005. Vol. 1.
4. *Lalon Sangeet*. Lalon Majar O Seba Sadan Committee, 2006. Vo. II.
5. *Lalon Sangeet*. Lalon Majar O Seba Sadan Committee, 2006. Vol. III.
6. Kipling, Rudyard. "The White Man's Burden: The United States & The Philippine Islands." *Rudyard Kipling's Verse*. Doubleday, 1929.
7. Kunda, Kalyan. "Rabindranath Tagore and World Peace." *Asiatic* 4.1 (2010): 77 - 86. Web. 18 August 2021. <https://journals.iium.edu.my/asiatic/index.php/ajell/article/view/416>.
8. "Lalon Shah." Banglapedia. https://en.banglapedia.org/index.php/Lalon_Shah. Accessed 02 October 2021.
9. Majumder, Nepal. *Rabindranath: Koekti Rajnitik Prasanga*. Cirayata Prakashan, 1987.

10. Mukherjee, Bharati. *Tagore's Poetry: Ballad of Humanism*. Accessed 20 August 2021. <http://www.totetu.org/assets/media/paper/j018_132.pdf>.

11. Quayum, Mohammad A. "War, Violence and Rabinadranath Tagore's Quest for World Peace." *Transnational Literature* 9.2 (2017): 1 -14.

12. Ray, Mohit Kumar (ed.). *The English Writings of Rabindranath Tagore*. Vol.-2 Poems. Atlantic Publishers & Dist. 2007.

13. *The English Writings of Rabindranath Tagore*. Vol.-1 Poems. Atlantic Publishers & Dist. 2007.

14. Rahman, Sydur. Historical Dictionary of Bangladesh (4th Edition). The Scarecrow Press, Inc., 2010.

15. Tagore, Rabindranath. "The Sunset of the Century." *Nationalism*. General Press, 1919.

16. "Praiyaschitya." *Rabindra Rachanabali.* Visva-Bharati University, 1977.

17. *Naibedya*. Visva-Bharati University, 1901.

18. "Sabala (The Able)." *Mohuya*. Visva-Bharati University, 1929.

19. "Shuchi (Pure)." *Punascha*. Visva-Bharati University, 1932.

20. *The Religion of Man*. 1931. Unwin, 1961.

Date of Submission : 06.02.2022
Date of Acceptance : 08.06.2022

**Jagannath University Journal of Arts**
**Volume 12, No 01, January-June 2022**

# Stigma, Exclusion, Discrimination and Access of Dalit Children to Education in Bangladesh

Mohammad Sajjad Hossain*

**Abstract**

This paper seeks to address the reasons behind dalit children's lack of access to education in Bangladesh. Employing a qualitative approach and using the case-study method the study shows that stigma arising out of their caste and occupation excludes them socially and leads to a life full of discrimination and a combination of all these factors limits dalit children's access to education. Drawing evidence from both primary and secondary sources, this paper firstly explains how dalits have been stigmatized, secondly how stigma excludes dalits socially; thirdly it identifies major fields of discrimination they face and finally how all these factors together limit dalit children's access to education. Findings show that caste identity as well as the menial jobs that dalits are involved in are the basic sources of their stigma. Stigma excludes them from wider society, confined them to fixed forms of occupation and distinctive residential arrangements, and bars their social relations and networks. Stigma as well as social exclusion causes discrimination like restriction on labour market, income poverty, inappropriate home environment, limited access to basic facilities which hinder their education in many ways while adverse school environment makes dalit children's schooling experience hurtful. Thus, this paper argues that caste and occupation-based stigma and its effects on social and economic life limit dalit children's access to school. Therefore, this paper recommends that appropriate policies are to be adopted to ensure dalit children's access to education.

## Introduction

Ensuring primary education for all is a constitutional obligation (Article 17) of Bangladesh. Accordingly, it has been a priority of the government since the independence of Bangladesh in 1971. In 1973, a good number of primary schools were nationalized and in 1974 a new legal instrument was adopted to bring all primary schools under one administration. Different initiatives were also taken in the first Five Year Plan 1973-78 by the then government to increase the enrolment rate (Rabbi n.d.). Under the Two-Year Plan (1978-80), the government established National Academy for Primary Education and reconstructed many Primary Teachers Training Institutions (Two Year Plan 1978, 230) and took Universal Primary Education (UPE) as a goal of education (Sattar 1982, 117). The Second Five-Year Plan 1980-85 initiated the prospective plan for UPE and set a plan to ensure 91% of the primary age (6 to 19 years) children's enrolment by 2000 (Primary Education in Bangladesh 2003, 7). However, later on in the World Conference on Education for All (EFA) 1990, Bangladesh set a new goal of ensuring primary education accessible to all children by 2000 (Islam, Amin and Hossain 2015, 19). To that end, the government of Bangladesh enacted *the Primary Education Act, 1990* (Emran 2012, 193). However, by 2000, Bangladesh could not reach the target of EFA. Later on, the

*Associate Professor, Department of Social Work, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh

government adopted Dakar Framework for Action in 2000 and committed to ensure basic education for all by 2015 (Islam et al. 2015, 17). Bangladesh failed again to keep her commitment to achieving EFA by 2015. However, Bangladesh made much headway by this time and ensured 97.7 percent national primary enrolment (BANBEIS 2016, 46). Despite the government requires to ensure basic education for all its citizen (Article 17) irrespective of caste, race, sex and religion (Article 28.2) (Ministry of Law and Parliamentary Affairs 8), evidence shows a significant difference in educational development between dalit and non-dalit children (Islam et al. 2015, 1).

A study shows that 28.5 percent of the school-age dalit children remained out of school in 2014 (Islam et al. 2015, 12) when national enrolment has reached 97.7 % (BANBEIS, 2016, 46). Findings also show that a large number of the enrolled students dropped out of school after attending class 2 and class 3 (Islam et al. 2015, 12). Caste and occupation-based stigma in association with lack of social relations and networks and lack of educational qualification limit their access to labour market. As a result, dalit communities have been trapped in poverty and living a life of humiliation for generations. The government of Bangladesh is all set to achieve Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030 and one of the main thrust of it is to mainstream disadvantaged people. Goal 4 of SDGs is to ensure quality education for all. SDGs not only emphasizes on ensuring quality education for all it further emphasize on lifelong learning. It has also taken education as a key to the achievement of many other sustainable development goals (United Nations n.d., 1). Therefore, to uplift their social and economic position as well as to ensure SDGs in timely manner, it is imperative to ensure equal access of each child to education.

Although dalit children have been facing huge hurdles in accessing education, the issue has always been out of focus from academics and political arena. Therefore, there is huge gap in knowledge about dalit children's access to education in Bangladesh. This study is an endeavour to bridge this gap so that effective policy could be adopted to ensure EFA. This paper portrays the reasons behind dalit children lag in access to education. It firstly analyses how dalits' stigma is produced and reproduced, secondly, how stigma segregates and excludes dalits from wider society; thirdly, how stigma and social exclusion lead to a life full of discrimination and finally how all these factors limit dalit children's access to education.

**Dalit discourse and Bangladesh**

The discourse of dalits has to be discussed in relation to the Hindu caste system of South Asian region. Caste system, popularly known as *Varna* (colour) system, stratifies Hindu communities into four hierarchical sects (with numerous sub sects) and place *Brahman* at the top, followed by *Kashtriya*, *Vaisya* and *Sudra* respectively (Quigley 1993, 27). However, there are many other communities who do not fall in this framework. These people, known as *Ati-sudra* or *Avarna* (colourless), are considered impure and untouchable by the caste Hindu (Charsley and Karanth 1998, 128). These people, traditionally involved in different menial jobs, are historically discriminated against in their every sphere of life and are most disadvantaged section of the society. These people have been known by the degraded occupations they are

traditionally involved in for generations. However, from 1870s, people of these communities were started to be termed as ‘depressed classes’ (Charsley and Karanth 1998, 128). In 1931, Mahatma Ghandi gave these classes of people a euphemistic name ‘Harijan’ which means ‘man of God’ (Shah 2001, 21) with a view to change social outlook towards them and eliminates their untouchability. Dalits initially believed that this new name will change their fate as it came from Mahatma Ghandi and as they have been termed as the ‘Man of God’. Many of them subsequently started to introduce themselves in this new name with a hope in mind that it would change their stigma of untouchability (Shah 2001, 21). But their new name has measurably failed to bring any change in the mind-set of caste Hindu rather this name has become a matter of joke for them. In *the Government of India Act 1935,* these people were listed by their caste to establish some social benefits and the list were annexed to the act as a schedule (Charsley and Karanth 1998, 19). Soon they were started to be identified as ‘scheduled caste (SC)’. By this way, all of the out-caste came under one umbrella in one identity, scheduled caste. Their new identity helped them imagine themselves “a single community with a common experience and interest” (Jodhka and Shah 2010, 105). From 1960s, dalit scholars started using the term ‘dalit’ as a self-chosen political identity in their literary works to refer the most disadvantaged section of Indian population. This helped them unite them for the struggle of their rights. At the beginning, the term was confined to SCs Hindu communities only but soon it has been started to take the colour of a wider connotation which includes all of the oppressed and exploited social groups. It has become a symbolic name for the rights movement the most disadvantaged class of Indian population (Shah 2001, 22).

‘Dalit’ is not a native Bengali word. It has recently been adopted in the development discourse of Bangladesh (Islam et al. 2015, 10). The term has no religious connotation and is used to refer lower caste section of the society irrespective of their religious identity Muslim, Hindu, and Christian identified by the menial jobs they are doing in Bangladesh (Chowdhury 2009, 19; Islam and Parvez 2013, 13; Jodhka and Shah 2010, 22). There are two types of dalits in Bangladesh - lower caste Bangladeshi origin dalits and non-Bengali (Indian origin) dalits (Islam et al. 2015, 9; Banglapedia online). Indian dalits were first taken here from India (mainly from Madras, Telegana, Tamil Nadu, etc.). They were first brought here in 1620’s to remove the dead bodies from different cities following a massacre by the Burmese pirates that took place between 1624 to 1926 AD. However, the large number of dalit were fetched to Bangladesh to do odd jobs that were undesirable to the local people during the British rule around 1864 when Dhaka was turned to a municipality (ASB, as cited in Islam and Uddin 2008, 12).

In 2013, the government of Bangladesh adopted a policy to uplift the socially and economically disadvantaged communities and categorized them into three categories- dalit, *harijan* and *bede* (water gipsy) (Department of Social Service 2013, 2). However, existing literature refers ‘dalit’ as a socially, economically and politically marginalized people of which *harijan* and *bede* are parts.

## Educational development of dalit communities: Bangladesh Context

Although numerous researches have been undertaken on dalit education in India and Nepal, a few studies have been done on the issue in Bangladesh. Irrespective of the contexts, studies on dalit education present gloomy pictures. Nambissan (1996, 1011) finds that despite encouragement and support from their families, dalit children in India face a significant level of hostile behaviour by their teachers and school administration. Balagopalan and Subrahmanian (2003, 43) studied newly included dalit and Adivasi students' experience in the educational institutions where their access was denied previously and found that dalit children experienced widespread verbal abuse by their non-dalit teachers in primary schools in India. Ramachandran and Naorem (2013, 44) found the schooling experience of marginalized children in India upsetting and a higher dropout rate among them. Studying challenges to inclusive education in Nepal, Khanal (2015, 710) argues that a number of intertwined school and community factors affect dalit children's access to school.

Chowdhury (2009) studied caste-based discrimination in Bangladesh and argued that both Hindu and Muslim dalit children faced widespread discrimination in different spheres of their school life which adversely affect their access to education. The study found that dalit children face considerable discrimination in the admission process, selection for scholarships, participating in sports and games, seating arrangement and even in the assessment process. In addition, they are discriminated against in using common utilities (ibid). Islam et al. (2015, 1-15) argued that factors like- economic hardship, lack of awareness, discrimination in the school environment, labour market exclusion, etc. are the main causes behind dalit children's poor access to education. Sultana and Subedi (2016, 19) found that dalit children are denied mainstream education which the state is providing for its citizen.

A survey conducted in 2008 by Chowdhury found that the enrolment (primary) rate among dalit children was 10 percent and 95 percent of the enrolled dalit children dropped out before they complete the primary level (5$^{th}$ grade) (Islam and Parvez 2013, 20). Islam et al. (2015, 12) studies different dalit communities in 2014 and found that 28.5 percent dalit children remained out of school when national net enrolment reached 97.7 % (BANBEIS 2016, 46). Findings further reveal that a large number of students left school after completing 1 or 2 year of schooling and the dropout rate among dalit children is 63 percent (Islam et al. 2015, 12). Only an insignificant number of dalit children continue to a certain level of education that could create value for the labour market. Chowdhury (2009, 23) found only 2 percent of the Hindu dalit to have completed secondary level of education (10$^{th}$ grade), the first formal degree to qualify for very low official posts.

## Methodology

This paper aims to investigate dalit children's lack of access to education. A qualitative approach was applied to ensure the access of the researcher to the complex world of individuals' life and to get more promising avenues to understand the stigma, exclusion an discrimination that dalits face and inaccessibility of dalit children in the face of their right to education. The researcher intended to employ extreme case selection strategy and was searching for the most disadvantaged dalit

community. So, a preliminary investigation was done on different dalit communities which led the researcher to the sweeper community of Telegu/Madrasi sweeper colony, located at Doyagonj, Dhaka as people residing there are one of the most disadvantaged groups in terms of educational development. Diverse case selection technique was applied so that a full range evidence related to the access of dalit children to school could be captured (Gerring 2017, 88). Through preliminary observation, potential participants were categorized into several categories keeping in mind the objective of the study. For the purpose of this study, potential participants were classified into 3 main groups- children of school ages, working or work seeking educated youths and parents of all of these groups. In all these main groups participants of the both sexes were incorporated. Then a category-wise list of the potential participants was developed with the help of Panchayet leaders. Finally, cases were selected randomly from each category. A total of 32 cases of different ages, sexes, educational backgrounds and different job statuses (employed, unemployed, employed in different sectors) were studied.

Field work of this study was conducted in 2019. Primary data was collected through face to face interviews using a semi-structured interview schedule, developed in Bengali. Interviews were conducted in Bangla- the participants' native language and the typical length of an interview was an hour. All interviews were audio-recorded with interviewees' prior consent. Interviews were first transcribed in Bangla then translated into English. Recorded interviews were subsequently transcribed and translated. This process helped the researchers understand the data saturation level.

## Data Analysis

This paper used the thematic analysis approach developed by Braun and Clarke (2006) as an analytical tool. The reason was that the researcher wanted to be truthful about the authenticity of the findings. In every possible way, the researcher wanted to show that the themes that were being used emerged from the data and was validated by the respondents' direct quotes. In order to follow the thematic process, initially the researcher read and reread the entire transcripts to find out the general essence of the data. This process helped the researcher develop initial codes and conceptualize the meaning of the data. Then the entire transcripts were coded openly and the researcher found thousands of significant words and put their name as code. Once initial coding was done, the analysis progressed into a second level, e.g. category. At this stage, codes were merged into categories. Frequently mentioned categories were considered for the next level and were further reduced to bring forth major themes of the findings. Through this exercise, the researcher found 'producing and reproducing of stigma', 'social exclusion the dalits', 'discriminations against dalits' and 'the connection of social stigma, exclusion and discrimination to the access of dalit children to school' as major themes in this research that is being analysed in the findings section. In order to validate the themes, the researcher went back to the respondents (which is called member check) and read out the findings to them and have their consent that their opinions were being truly reflected in the theme. A constant comparative method (Glaser & Strauss, 1967) was applied in this process to develop ideas about emerging themes. Pseudo names have been used in reporting the findings.

## Theoretical Perspective: The Interaction Stigma, Social Exclusion and Discrimination

Stigma is "an attribute that serves to discredit a person or persons in the eyes of others" (Goffman as cited in Mason, Carlisle, Watkins and Whitehead 2001, 2). However, *stigma* as a term would use in ancient Greek to refer to a mark made with a piercing instrument to signify a lower social and/or moral status. In early Christian times, it (stigma) would signify 'a mark of disgrace' used ', and in recent times it refers to 'disqualification from social acceptance, either for physical or social reasons' (Goffman 1963, 1-3). However, Goffman (1963, 3) defines stigma as "an attribute that is deeply discrediting" that separates the tainted (stigmatized) person or group "from a whole and usual person." He goes on explaining that by identifying "others" negatively, an individual or group confirms their own "normalcy" and legitimizes the discrediting persons' devaluation. Phelan and Link expanded Goffman's idea of stigma and identify it as a dynamic process of four distinct steps occurring within the context of power. The first three steps divide the 'tainted people' from the whole or 'usual' people by identifying and labelling the differences; associating negative attributes linked to those differences; and separating "us" from "them". These steps end up in the fourth step— loss of status and discrimination against the stigmatized. Therefore, stigmatized persons or groups often accept the norms and values that label them as having negative differences (Goffman 1963, 3). As a result, the stigmatized usually accept that they "deserve" to be treated unequally or differently and are excluded socially.

Crocker et al (1998, 505) indicate that "stigmatized individuals possess (or are believed to possess) some attribute, or characteristic, that conveys a social identity that is devalued in a particular social context". Thus, the ultimate effect of stigma, as noted by Goffman, is the reduction of the life chances of the stigmatized through discriminatory actions. Thus, it can be said that discrimination is the end result of the process of stigma.

## Findings

### Producing and reproducing of stigma

There are at least three areas where stigma is produced and reproduced. Firstly, their caste identity (i.e. being outcaste), secondly, the job they are associated with and thirdly, their accommodation. Dalits especially migrated ones are of outcaste sect of people and known as 'impure' and 'polluting'. They are born with this stigma. The main reason this stigma tends to continue is their unavoidable forms of profession. In the context of Bangladesh, dalits are predominantly known by the jobs they are engaged in. These jobs are look down upon by the mainstream people as these jobs are considered dirty and filthy. It is worth mentioning that migrated dalits were brought here from different parts of undivided India during the Mughal period and of British rule. They were brought here to do jobs as these were undesirable to local people (segued of dead bodies from urban areas and cremation of the same). Consequently, their identity was constructed as 'alien' to the wider society and was stigmatized as 'dirty' and 'polluting'. These identities differentiated 'them' [dalits] from 'us' [locals]. They have been labelled as *jaat* sweepers (sweeper by born) and

have been confined to such menial and dirty jobs and are excluded from white colour jobs. The government has been maintaining a hereditary form of employment for them and their jobs pass on through generations. Consequently, they perceive their status as 'inferior' in relation to wider society and show a tendency of avoiding interaction with mainstream people. The stigma is so strong that they themselves are also accustomed to introduce themselves as *jaat* sweepers and hunker for sweeping and cleaning jobs instead of looking for white colour one. Their accommodation also helps produce and reproduce stigma where they have been living for generations.

The segregated residential arrangement not only keeps their stigma intact, rather helps reproduce the stigma as the accommodation itself has been a symbol of stigma. Firstly, for its location and name- these colonies are known as sweeper colonies or some other names that clearly indicate that they are home to people who deal with dirty things. Secondly, due to their isolated residence they cannot mix up with local people rather they have continued practising their own mother tongue which has a different accent and is easily identifiable. The third source that reproduces their stigma is their accent and language. Although they live in the heart of the cities and are surrounded by hundreds of thousands of mainstream Bengali people, as they are confined to a place, they practice their own mother tongue. As a result, their accent is different from mainstream people and they are easily identifiable and looked down upon.

**Excluding them socially**

Because of the stigma that they bear, they lack social relationships with the dominant Bengali society. The wider society looks down upon them and considers them dirty and stinky. They work at the lower ladder of the job hierarchy. Their jobs are to clear the toilet, floor etc. They deal with the dirty things. So, most of the people don't want them to come close or even touch their belongings. No collegial relationship is built with people other than their own peers. Therefore, no social relationship is built up with mainstream society. Their stigma, menial jobs they are involved in and wider society's outlook towards them make them perceive an inferior social position. Because of this 'inferior' status they perceive, they tend to avoid interacting with mainstream people. As one of the participants described,

We usually don't send our children to government primary school as it requires our people to talk to the teachers and administration. Bangal people look down upon us and usually don't talk with respect.

For being 'alien' or 'other', they have never been able to slake the social distance from the native or mainstream people. Their stigma has been continuing inter-generationally as their occupation to their progeny. Therefore, from their arrival to Bangladesh they have been considered untouchable. They have been excluded socially as the practice of untouchability prohibits the 'social and relational interaction' with wider society (Kurian 2014). The segregated residential arrangement has also contributed to maintaining social distance from wider society. Working in the lowest ladder of job hierarchy and living in the separated, degraded and stigmatized accommodation away from mainstream people has been a great cause of not slaking the social distance between dalits and wider society.

**Discriminations against dalits**

Dalits face a considerable level of discrimination in every sphere of their life. Many of these discriminations have a direct negative impact on their children's education and limit their [children's] scope for education. They are devoid of mainstream housing facilities and are living in ghetto type housing which lacks basic civic amenities. These residences are densely populated and compactly constructed. In most cases, a single room serves as their living room, dining room, reading room for the children and bedroom for three to four generations. The total space of their residence is barely enough for all family members to sleep. Therefore, dalit children hardly get their home environment suitable for study. One of the participants was describing the situation:

We have no scope for study in our homes. Our homes are so tiny that we barely have enough space for sleep let alone setting up a table and chair for study. All of our family members live in this small single room house. …In the evening when it is time for study, the sound of the television from neighbouring *ghars* disturbs us making the colony chaotic place.

They face considerable resistance to entering public places and recreational facilities. Lack of social relationships with wider society and restrictions on entering public places encourage all their recreational activities within their colony. As a result, after returning from jobs some sing, some play football or cricket, some celebrate their occasions. However, watching television and listening to songs are a very common forms of recreation after work. These recreational activities in a compact residential arrangement with excessive crowd make the place so chaotic that a child can hardly study and take preparation for his/her class or examination the next morning. Lack of civic amenities increases the burden of household chores and parents have to depend on their children which hinders their schooling and study at home.

Dalits have little or no access to white collar labour market. Although some of them have the deserving educational qualifications, dalits' access to white collar job has not yet been opened. Lakhan (31), a dalit graduate, shared his job market experience.

After my graduation, my mother took to his boss and requested him to provide me with a job. He offered me to join as a sweeper or peon.… May be he looked at my caste, not my qualification… Being a graduate how can I join in such a low position? I would have joined even if he would offer me the post of clerk. Is this what I struggled for my whole life?.. This is why our parents and fellow juniors get frustrated. Because they know whatever their educational qualifications are, they will not be appointed to a good position.

Income poverty is another vital area of discrimination which creates many other discriminations for dalits including spending on their children's educational expenditures. Many of the dalit children have to leave school after their primary education due to their parents' inability to pay for tuition and educational expenses.

Adverse peer relationship is among the top areas of discrimination a dalit child usually faces at the school. They are teased and maltreated by their fellow non-dalit

classmates on the ground of their (dalits) parents' profession and their residence (sweeper colony). Rinku Das, a nine (09) years old dalit child shared his experience in the government primary school where he once studied.

I changed my school (primary) as Bengal (mainstream) students used to humiliate me. They used to pass bad comments about my parents' professions (sweeping and cleaning) and call me a *child of the sweeper* and also used other bad words. So, I stop going to school. Bengal students don't mix with us. They look down upon us and humiliate us because we are from the sweeper colony and my parents do sweeping and cleaning work.

Due to government policy, dalit children are not explicitly discriminated in the admission process. However, sending children to a mainstream school at the elementary level is rare as guardians feel discomfort interacting with the school administration and the teachers. Besides, they are not welcomed and are discriminated against by the teachers on the ground of their identity. This discrimination starts from seating arrangements to evaluation to participating in different activities of the school.

**Connecting stigma, exclusion and discrimination to access of dalit children to school**

Dalits' caste identity was built on the ground of their traditional occupation. As a result, their identity forces them to undesirable menial jobs. This caste identity itself is a stigma meaning that they are untouchable. Menial jobs in which they are confined to further reinforce their stigma.

Stigma makes them 'others' or 'aliens' to the wider society and excludes them socially. Stigma leads to social exclusion and both create room for discrimination in different aspects of the life of the dalit community. They lack access to labour market and left with no choice to do menial jobs. Unfitting home environment, fixed and stigmatized job, income poverty, rupture of social relationships and network from one hand and adverse school environment from the other has a profound negative impact on dalit children's access to education. Unfitting home environment leaves very little or no scope for their study at the home and bars them from preparing for school and makes education difficult for them. Deprivation from adequate income limits dalit parents' capacity to spend on their children's education and affects their decision of sending their children to school. Even if a child is sent to school, failure of providing him with necessary educational materials and arranging private tuition ends up in dropping out of the school. Lack of access to the labour market discourages a father to invest his money and a child his effort and time in education. As educated dalits are left no option but join lower jobs which they could have joined with a lower educational qualification, dalit children don't want to educate themselves. Neither do their parents want to invest in their children's education.

Stigma and social exclusion further make the school environment difficult for a dalit child. Adverse peer relationships, covert discrimination by the teachers and language constraints are the main factors affecting dalit children's education in the school

environment. Due to such adverse peer relationship, dalit children feel insecure and vulnerable which lead them to feel inferior and they don't mix up with children other than dalit. Because of this insecurity and inferiority complex, they usually join the school in a group. Humiliation on the ground of caste identity in association with the fear of physical insecurity bars them from going to school alone. So, they usually drop out when they fall alone in the class.

**Discussion and policy implication**

Stigma arising out of dalit people's caste and occupation segregates them socially and this process has been continuing for generations. This stigma and social exclusion bar their access to many basic amenities including education and the labour market. It is like a cycle. Stigma and social exclusion bar their access to education and the labour market and compel them to do menial jobs. These jobs give them meagre income barely enough for survival. Income poverty in association with unfitting home environment and adverse school environment are other factors that impact dalit children's access to education.

Dalits are mainly identified by the menial jobs they are involved in. Their occupations reinforce their stigma, cause social exclusion and discrimination in the school and exclude them from the labour market. Exclusion from the labour market forces them into these stigmatized (traditional) occupations, causes income poverty and bars their integration into wider society. Traditional occupations with poor income lead to an economic vulnerability which limits their capacity to invest in education. Poor income that comes from their menial jobs and social exclusion compel them to live in an unfitting environment limiting their children's scope for education. Thus, they remain uneducated. It is like a vicious cycle which goes on barring them from breaking the barrier of poverty and social exclusion.

Studying stigma attached to mental illness, Sayce (1988) argues that stigma excludes mentally ill people and they face unfair treatment (discrimination) from others. Reidpath, Chan, Sandra, and Allotey (2005) also argue that stigma excludes stigmatized social groups and creates room for discrimination.

Becker (1964) and Mincer (1958) argue that investment in education is made with an expectation of future return. Dalit parents find no prospect for their children's future in the labour market and end up with the decision that they should not send their children to school. Studying the social content of the labour market in Dhaka city, Opel (2000) argues that access to employment is highly dependent on one's position in social network and kinship relations. Dalit lack of access to the labour market can also be explained by Max Weber's (1968) theory on 'Economy and Society' in which Weber explained how social closure reduces inferior groups' access to the economy. He also argued that status groups "seek to monopolize values of economic opportunities" (as cited in Thorat and Attewell 2007, 4142).

Hossain (2016) argues that education for dalit children is costlier as there is none in the home to help a child in his/her study and dalit children are highly dependent on private tuition.

Therefore, it would make sense for social policies to be directed towards mainstreaming of dalits for sustainable development. Specific areas of policy interventions should be inclusive education, humanization of menial jobs, social integration, special stipend/scholarships for dalit children, community schooling in their mother tongues, labour market inclusions and quality housing for dalits.

## Conclusion

Thus, the paper shows that stigma arising out of dalit people's caste identity and the jobs they are involved in degrade their social position and exclude them from wider society. Moreover, stigma and social exclusion create room for discrimination in every aspect of their life. All these factors have a negative impact on dalit children's access to education. Due to their stigma and social exclusion, they have limited livelihood choices and are compelled to do menial jobs become they have no access to the labour market. Their menial jobs give them meagre income barely enough for maintaining their day to day life let alone their children educational expenses. Their unfitting home environment bars them from preparing for their class and examination and make studying difficult for them. Adverse peer relations and discrimination against them in the school make their schooling experience traumatic. All these factors impact their schooling and education negatively and limit their access to education. Bangladesh is determined to attain Sustainable Development Goals in a timely manner. Keeping these people behind, attaining SDGs is not possible. Therefore, taking proper steps is imperative. Government should take appropriate policies to mainstream these communities. Appropriate steps are to be taken to integrate them with the wider society. Menial jobs are required to be modernized so that stigma arising out of these jobs could be alleviated. Special allotments in the form of stipends or scholarships would encourage parents to send their children to school. The door to the labour market is to be opened for dalit as per their qualification.

## Works Cited

Ali, K. S. "Bangladesh Post 2015: Addressing Social Exclusion." *European Union*, 2014.

Balagopalan S. and R. Subrahmanian (2003) '*Dalit* and *Adivasi* Children in Schools: Some Preliminary Research Themes and Findings', *IDS Bulletin* 34(1): 43-54.

BANBEIS. *Bangladesh Education Statistics 2015*. Dhaka: Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, 2016.

*Banglapedia-National Encyclopedia of Bangladesh* (2015) 'Dalit Community'. Accessed 20 October 2016 < http://en.banglapedia.org/index.php?title=Dalit_Community >.

Becker, Gary S. "Investment in human capital: A theoretical analysis." *Journal of political economy* 70, no. 5, Part 2 (1962): 9-49.

Braun, Virginia, and Victoria Clarke. "Using thematic analysis in psychology." *Qualitative research in psychology* 3, no. 2 (2006): 77-101.

Charsley, Simon R., and G. K. Karanth. "Dalits and State Action: The 'SCs'." *Challenging Untouchability: Dalit Initiative and Experience from Karnataka. New Delhi: Sage*

*Publications India*, 1998.

Chowdhury, Iftekhar Uddin. *Caste based discrimination in South Asia: A study of Bangladesh*. Center for Social Research [University of Chittagong], 2009.

Crocker, J.; Major, B.; and Steele, C. Social stigma. In: Gilbert, D.T.; Fiske, S.T.; and Lindzey, G., eds. *The Handbook of Social Psychology.* Boston, MA: McGraw Hill, 1998.

Department of Social Service. *Dalit, harijan and bede jonogostir jibonman unnoyan karzokrom bastobayan nitimala* (Policy for Dalit, harijon and bede communities' life-standard improvement activities and implementation). Dhaka: Ministry of Social Welfare, 2013.

Emran, Md. "Essays on co-residing decision, public education expenditure, income inequality, and education policies." PhD diss., University of Birmingham (2012).

Franzoi, Stephen L. *Social psychology*. London: Brown & Benchmark, 1996.

Gerring, John. *Case study research: Principles and practices*. Cambridge university press, 2007.

Goffman, Erving. *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. New York: A Touchstone Book Published by Simon & Schuster Inc., 1963.

Hossain, Mohammad Sajjad. *Multiple Deprivations: Schooling Experience of Dalit Children in Bangladesh.* MA Thesis, International Institute of Social Studies, the Hague, 2016.

Islam, M., A. Amin, and Z. Hossain. *Equity Watch 2014 Challenges and Prospects for Dalits Securing Their Right to Education in Bangladesh.* Dhaka: Nagorik Uddyog & Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement, 2015.

Islam, Mazharul, and Altaf Parvez. "Dalit initiatives in Bangladesh." *Dhaka: Nagorik Uddyog & Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement* (2013).

Islam, Farzana, and M. N. Uddin. "Intricate tale of social exclusion: Dalit women's experience of caste, class, citizenship and gender in Dhaka City." *The Jahangirnagar Review, Part II* (2008): 5-32.

Jodhka, Surinder S., and Ghanshyam Shah. "Comparative contexts of discrimination: Caste and untouchability in South Asia." *Economic and Political Weekly* (2010): 99-106.

Khanal, Damodar. "Children from the Dalit community in rural Nepal: a challenge to inclusive education." *International Journal of Inclusive Education* 19, no. 7 (2015): 710-720.

Kurian, Rachel. "One step forward, two back? Dalit women's rights under economic globalisation", *openDemocarcy*, 2014. Accessed May 10, 2016.https://www.opendemocracy.net/openglobalrights-blog/rachel-kurian/one-step-forward-two-back-Dalitwomen%E2%80%99s-rights-under-economic-gl

Mason, Tom, Caroline Carlisle, Caroline Watkins, and Elizabeth Whitehead eds. *Stigma and social exclusion in healthcare.* Psychology Press, 2001.

Mincer, Jacob. "Investment in human capital and personal income distribution." *Journal of political economy* 66, no. 4 (1958): 281-302.

Ministry of Law and Parliamentary Affairs. *The Constitution of Bangladesh*. Dhaka: BG Press, 2008.

Nambissan, Geetha B. "Equity in education? Schooling of Dalit children in India." *Economic and Political Weekly* (1996): 1011-1024.

Opel, Aftab EA. "The social content of labour markets in Dhaka slums." *Journal of International Development: The Journal of the Development Studies Association* 12, no. 5 (2000): 735-750.

*Primary Education in Bangladesh, 2003.* Directorate of Primary Education, Ministry of Primary and Mass Education, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, 2003.

Quigley, Declan. "Is a theory of caste still possible?." *The Sociological Review* 41, no. S1 (1993): 25-48.

Rabbi, A F M Fazle "Primary Education in Bangladesh: Viability of Achieving Millennium Development Goals, BIGD, BRAC University, n.d. Accessed May 10, 2022.

<https://www.academia.edu/35812710/Primary_Education_in_Bangladesh_Viability_of_Achieving_Millennium_Development_Goals>

Rasheed, Parveen. *Trapped in poverty: Caste-based discrimination and employment*. Dhaka: Christian Aid, 2014.

Ramachandran, Vimala, and Taramani Naorem. "What it means to be a Dalit or tribal child in our schools: A synthesis of a six-state qualitative study." *Economic and Political weekly* (2013): 43-52.

Reidpath, Daniel D., Kit Y. Chan, Sandra M. Gifford, and Pascale Allotey. "'He hath the French pox': stigma, social value and social exclusion." *Sociology of health & illness* 27, no. 4 (2005): 468-489.

Sattar, Ellen. *Universal primary education in Bangladesh*. University Press, Dhaka (1982).

Sayce, Liz. "Stigma, discrimination and social exclusion: What's in a word?." *Journal of mental health* 7, no. 4 (1998): 331-343.

Shah, Ghanshyam. "Introduction: Dalit Politics", in G. Shah (eds) *Dalit identity and politics, Cultural subordination and the Dalit challenge; vol. 2*, pp. 17-43. New Delhi: Sage Publications, 2001.

Sultana, Habiba, and Dambaru B. Subedi. "Caste system and resistance: the case of untouchable hindu sweepers in Bangladesh." *International Journal of Politics, Culture, and Society* 29, no. 1 (2016): 19-32.

*The Two Year Plan 1978-1980.* The Government of the People's Republic of Bangladesh, 1978.

Thorat, Sukhadeo, and Paul Attewell. "The legacy of social exclusion: A correspondence study of job discrimination in India." *Economic and political weekly* (2007): 4141-4145.

United Nations n.d. "Quality Education: Why it matters." Accessed February 22, 2022. https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-4.pdf

Weiss, Mitchell G., Jayashree Ramakrishna, and Daryl Somma. "Health-related stigma: rethinking concepts and interventions." *Psychology, health & medicine* 11, no. 3 (2006): 277-287.

Date of Submission : 27.02.2022
Date of Acceptance : 22.05.2022

**Jagannath University Journal of Arts**
**Volume 12, No 01, January-June 2022**

# Land Acquisition Legislation of Bangladesh and FIG Recommendations: From "Acquisition only" to "Addressing the Needs of those Affected"

Nasrin Akter*

**Abstract**

Every modern government possesses the power of eminent domain, which allows them to acquire privately owned property for public use or public interest while compensating the owners. Contemporary perspectives, on the other hand, hold that simply compensating affected parties is inadequate; rather states have greater responsibility towards the affected parties. Countries, including Bangladesh, regulate their land acquisition legislation according to their own preferences because there are no legally binding international agreements on the subject. In 2010, the International Federation of Surveyors (in French, Fédération Internationale des Géomètres which commonly known as FIG) developed recommendations to better understanding the underlying principles that govern land acquisition legislation and the way to deal with land acquisition in a fair as well as equitable way based on legal requirements, and human rights standard. The majority of Bangladesh's previous legislations on land acquisition, including the present one, did not effectively safeguard affected parties. This article examines existing legislation to see how far land acquisition laws protect affected parties' rights and concerns, and where additional legislative action is required. In doing so, the article compares the contents of Bangladesh's land acquisition law to the FIG's recommendations, since FIG provides a comprehensive guideline on compulsory acquisition for best practices. Finally, it makes some recommendations to policymakers in order to assist them prepare better acquisition policies.

**Keywords:** Land Acquisition of Bangladesh, International Federation of Surveyors, FIG Recommendations, affected parties, human rights based approach

## Introduction

Every modern country's government wields the power of overriding interest in land tenure in some form or another (Food and Agriculture Organization [FAO] 3). Government of Bangladesh (GoB) has also been granted authority for compulsory acquisition by the supreme law of the country (the Constitution of the People's Republic of Bangladesh). Article 42 (1) of the Constitution of Bangladesh ensures both the protection of private property rights and government's power to acquire property without the willing consent of the landowner. The Constitution further stipulates that a law be enacted to allow for the acquisition, nationalization, or requisition of property with compensation, to set the amount of compensation, or to explain the principles on which as well as how compensation would be evaluated and awarded (art 42). However, what constitutes adequate and equitable compensation remained entirely in the hands of the state (Shamim par. 3). Furthermore, the Constitution expressly states that any acquisition legislation that provides

* Lecturer, Department of Land Management and Law, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh.

'inadequate compensation' cannot be called into question before any court of law (art 42.2).Until date, the Government of Bangladesh has amended and modified its land acquisition and compensation policies through a range of acts (Atahar 308).The Acquisition and Requisition of Immovable Property Act (ARIPA), 2017 is the current principal legal framework governing land acquisition and requisition in Bangladesh. Aside from the Constitution and ARIPA, 2017, a number of legislative documents govern land acquisition in Bangladesh. Most crucially, all other legislations are being implemented within the framework of the ARIPA, 2017.

The ARIPA was enacted in the year 2017 purportedly replacing the previous legislation named the Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance (ARIPO) 1982. The provisions of the ARIPO, 1982 were insufficient to deal with the adverse impacts of land acquisition and resettlement and they did not completely meet the criteria of available international standards (Atahar 310).Unfortunately, the Act of 2017 failed to emphasis on project-affected persons, replicating the very same past issues in a new shell, overtly prejudiced against landowners and other impacted people, especially lacking any mention of resettlement requirements, income and livelihood support (Zaman par. 3).Furthermore, land acquisition legislation, like most other land rules in Bangladesh, is constructed in a restrictive manner, making it nearly hard for those who have been impacted to seek adequate compensation, treatment, or rehabilitation (Billah par. 4).As a result, the issue arises: does ARIPA 2017 focus solely on acquisition in the name of public interest or in the public purpose without addressing the needs of individuals affected, thus exacerbating the adverse impact of land acquisition on the affected people?

There are several international standards regarding land acquisition in the international arena, including the World Bank Involuntary Resettlement Policy, the International Finance Corporation (IFC) Performance Standard 5 Land Acquisition and Involuntary Resettlement, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Performance Requirement 5 Land Acquisition, Involuntary Resettlement, and Economic Displacement, Asian Development Bank, and Inter American Development Bank standards, excluding any legally binding international agreements or treaties in this subject. In 2010, International Federation of Surveyors (FIG) developed recommendations to understand the fundamental factors that shape land acquisition law and how to deal with land acquisition in a fair as well as equitable manner, based on legal requirements and recognition of human rights (FIG r, 4).

### Objectives of the Study

To that end, the followings are the objectives of this research:

i. The main aim of the article is to examine Bangladesh's land acquisition policy through the lens of FIG recommendations.
ii. This research tries to critically examine and compare Bangladesh's acquisition laws with FIG recommendations in order to identify how effectively Bangladesh has managed to strike an adequate balance in the wording of the legislation between the right of the government to exercise eminent domain power and the protection of the affected parties.

iii. The study highlights the lessons that could be drawn from the FIG recommendation by Bangladesh in developing its present legislative framework on land acquisition.

**Methodology of the Study**

In order to investigate the dimension mentioned above, legislation and policy analysis approach is used. The FIG Recommendation and land acquisition laws of Bangladesh are delineated, with a focus on acquisition basis and procedure, land valuation, compensation, state's responsibility, regulatory authority, restitution of acquired property, rights of the affected people, responsibilities of the requiring persons, and settlement of disputes. These clauses are taken into consideration since they are the most relevant substantive provisions found in acquisition legislation. There has been a lot of study on a comprehensive review of Bangladesh's land acquisition policy, but none of it included any comparisons to the FIG recommendations (Islam 282; Atahar 306; Zaman par. 8).

**Necessity of the Study**

Bangladesh is becoming the fastest growing economy and it will ultimately require infrastructure. Infrastructure development necessitates a large amount of land. During the 2017- 2018 fiscal year, the government of Bangladesh approved the acquisition of 11602.7835 acres of land for various development projects. However, with a population that is disproportionate to its land resources, Bangladesh cannot afford to exploit land irresponsibly in the name of development while ignoring the afflicted people. After years of disregarding land issues, in 2020, the government of Bangladesh has taken initiative to enact a comprehensive land legislation for the country. Given the preceding two developments, the land acquisition issue requires more profound examination. It is high time to examine how well our current land acquisition legislation and practices function and whether the existing methods and procedures have become ineffective or unfair. Hence the need to analyze existing land acquisition legislation in light of available international developments on this subject. This research intends to fill the existing knowledge gap.

**Scope and Limitation of the Study**

The scope of this study is limited to acquisition of immovable property only, excluding land requisition. It is worth noting here that, this research is not a thorough review of all available international standard guidelines on compulsory acquisition. Not all international standards and guidelines are reviewed and examined in this paper; only International Federation of Surveyors (FIG)'s Compulsory Purchase and Compensation Recommendations for Good Practice 2010has been revisited.

**Structure of the Study**

This article is structured in five sections: (1) Introduction, (2) Legal Framework of Land Acquisition in Bangladesh,(3) International Federation of Surveyors (FIG) and Its Compulsory Purchase Recommendations, (4) Comparative Analysis of Land Acquisition Legislation of Bangladesh and FIG Recommendations, (5) Conclusion by way of Suggestions. Following the introduction, section 2 of the paper delves into

Bangladesh's current legislative framework of land acquisition, while section 3 introduces International Federation of Surveyors (FIG) as well as its compulsory acquisition recommendations. Section 4 compares and analyzes how acquisition laws are incorporated in both instruments. Finally, section 5, based on the findings, proposed several suggestions to be implemented into Bangladesh's Acquisition Laws, and concluded the paper by calling for legislative amendment of Bangladesh's land acquisition laws to protect the rights of impacted parties and to ensure that their needs are met.

**Legal Framework of Land Acquisition in Bangladesh**

This section provides a brief overview of Bangladesh's land acquisition legal framework, covering the basis for acquisition, land valuation, compensation amount, dispute settlement, and restitution of acquired property.

The earliest legislation for land acquisition was enacted for the present territory of Bangladesh in 1824 and the most recent one is the ARIPA 2017. The present act allows both permanent and temporary acquisition of immovable property for public interest or public purpose. ‘Acquisition’ is defined by the ARIPA 2017 as ‘acquiring ownership and possession of any immovable property for any requiring person or organization in exchange for compensation or rehabilitation, or both’(s 2.1). The Go Bhas steadily increased its land acquisition for various objectives throughout the years. However, the term "public purpose" is not defined in the legislation. The specific concept of public interest or public purpose is determined solely by government officials, reducing the involvement of affected landowners. Additionally, legal provisions are made available to ensure speedy acquisition proceedings in case of nationally important projects (NIP). The Act does not specify what types of projects are deemed to be NIPs; the sole criterion for designation as an NIP is the government's declaration of any projects as such (s 2.4).

The Ministry of Land administers land acquisition legislation through the officers of Commissioners at divisional level and Deputy Commissioners at district level. The Deputy Commissioner (DC) exercises exclusive authority regarding acquisition of immovable property under the ARIPA 2017. When it seems to the DC that a property is required or likely to be required for a public purpose or in the public interest, he has exclusive authority to acquire it (s 4. 1). If any property is being acquired for any individual or non-governmental body, government authorization is required before the acquisition process can begin, regardless of the amount of land being acquired (s 4.2). Unlike the previous legislation, religious places, crematoriums or graves could also be acquired for public use or in the public interest under the present Act by moving and reconstructing them with the funds of the requiring people or organizations (s 4.13). Any interested party has 15 days after the publication of the preliminary notice of acquisition to file an objection against the acquisition proceeding to the DC under section 5 of the Act. If the property surpasses 50 standard bighas of land, the government makes the ultimate decision but final decision is taken by the Divisional Commissioner in cases where the property does not surpass 50 standard bighas of land (s 5).

The Act protects landowners and anybody else lawfully in possession of the property as well as ensures the payment of fair compensation for the acquisition of property. Furthermore, it guaranteed bargadar's reimbursement for the harvests. According to section 12 of the ARIPA, if the acquired land contains standing crops cultivated by bargadar, the Deputy Commissioner has the sole authority to determine how much compensation should be paid to the bargadar.

Only after payment of compensation, the Deputy Commissioner has the right to take possession of the land to be acquired. The Act stipulated that the DC would assess compensation based on the market value of the property as of the date of publication of the preliminary notification of acquisition of land (s 9). In determining such market value, the DC considers the average value of properties of comparable description and with similar advantages in the area during the twelve months before the date of publication of the preliminary notice. If the government acquires land, those who are interested persons will be compensated at 200 percent of the market price (s 9.2). However, if the government obtains the land for a non-government individual, the compensation will be 300 percent (s 9.2).Additional 100 percent compensation will be paid in cases of harm to standing crops, severance of property, loss of earnings or harm to other property and relocation of home or place of business (s 9.3). Furthermore, Section 15 of the Act permits for the acquisition of complete houses/buildings if their owners request the acquisition of the complete house or building against partial acquisition. If the people who are entitled to compensation refuse to accept it, if there is no qualified recipient to accept it, or if there is a disagreement over who is entitled to it or how it should be distributed, the money will be deposited in the Republic's Public Account by the Deputy Commissioner (s 11.2).

The ARIPA 2017 also establishes a legal mechanism for resolving disputes related to the compensation award of the acquired property through arbitration. The government appoints an Arbitrator for any given area who is a judicial officer with at least the rank of Joint District Judge (s 29). If any interested party who does not accept any award made by the Deputy Commissioner, he can apply to the Arbitrator for revision of the compensation award within forty-five days of receiving notice of the award (s 30). Section 39 of the Act vests an Arbitrator with the same powers as "a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 for the purpose of,

a. summoning and enforcing the attendance of any person, and examining him on oath,
b. compelling the production of any document or record,
c. reception of evidence on affidavit,
d. issuing commission for examination of witnesses,
e. requisitioning any public record from any court or office" (ARIPA s 39).

While deciding disputes, the Arbitrator adheres to judicial principles but does not undertake a judicial duty in course of investigation or inquiry into the compensation amount (Begum Lutfunnessa vs N Ahmed 232). In deciding the amount of compensation award for any property acquired, the arbitrator is guided by the standards set out in sections 9 and 10 of the ARIPA. However, the compensation

determined by the Arbitrator in respect of each owner would never increase by more than 10% of the sum specified in the Deputy Commissioner's award. Furthermore, if the amount of compensation determined by an Arbitrator happens to be higher than the amount mentioned in the DC's award, an additional compensation of 10% per annum on such additional amount would be payable until that amount is paid subject to the final decision of Arbitration Appellate Tribunal(s 34.2).

Any aggrieved party has the option to file an appeal with the Arbitration Appellate Tribunal against an arbitrator's award. The Arbitration Appellate Tribunal is comprised of one member who is appointed by the government from among individuals who are or have previously served as District Judges (s 36.3). The compensation determined by the Arbitration Appellate Tribunal in respect of each landowner never increases the amount indicated in the compensation award of the Arbitrator by more than ten per centum (s 36.5). The decision of the Arbitration Appellate Tribunal is final (s 36.4). The ARIPA 2017 expressly barred court jurisdiction. As section 47 provides that, "no Court shall entertain any suit or application against any order passed or any action taken under this Act, and no injunction shall be granted by any Court in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act"(ARIPA s 47).

The Act places several obligations on the requiring person or organization. The requiring persons or organizations are not only prohibited from using the property for any purpose other than the one for which it was acquired without the prior approval of the Ministry of Land, but they are also prohibited from transferring the property via lease, gift, or in any other way (s 19). In the event of a violation, the requiring person or organization would be forced to hand over the property to the Deputy Commissioner (s 19.2). The acquisition process, however, gets abated only if the estimated amount of the compensation award is not submitted by the requiring person for the land acquisition within the fixed time period (s 14). In case of abolishment of acquisition proceeding, the Deputy Commissioner ensures that the affected persons are compensated any harm as well as any justifiable expenditures incurred throughout the course of the proceedings (s 14.3).

**International Federation of Surveyors (FIG) and its Compulsory Purchase Recommendations**

The International Surveyors Federation (FIG) is an international non-governmental organization whose mission is to encourage international collaboration in survey and land application. It was established in Paris on 18 July 1878 and currently represents over 120 countries worldwide. The organization's purpose is to ensure that surveys and professionals who practice them meet the demands of markets and communities they serve (FIG par. 2). FIG has been cooperating closely with the UN, the World Bank and its sister groups and is widely recognized as a major international NGO on geographic data and information, land management, marine and environmental protection (FIG par. 2).

FIG urges that the compulsory purchase must ensure that property is acquired for appropriate development prospects for the greater good of the public, while ensuring the absolute respect of each country's individual land rights and social sustainability

(FIG r 4). In the period 2007–2010, FIG Commission 9 (Valuation and Real Estate Management) concentrated on compulsory purchase and land acquisition compensation to ascertain how effectively the legislations and practices function as well as whether past processes and procedures were proved unpopular or inefficient. Consequently in 2010, the FIG Commission 9 produced FIG policy statement "Compulsory Purchase and Compensation Recommendation for Good Practice" i.e. the FIG Recommendations. It identifies the most critical aspects and provides recommendations for a fair, efficient, and successful acquisition and compensation awarding process. FIG outlines in five parts the framework of recommendations in respect of compulsory purchase as well as compensation namely general principles (Article 1-8), compulsory purchase basis (Article 9-13), proceeding of demarcation and registration (Article 14-18), proceeding for determining compensations (Article 19-36) and finally, restitution (Article 37).

**Comparative Analysis of Land Acquisition Legislation of Bangladesh and FIG Recommendations**

By establishing a fair, effective acquisition method and awarding compensation, international standard guidelines could assist in resolving national acquisition concerns such as how much the legal provision ensures and where further legal attention is required. Bangladesh's land acquisition legislation, looking through the FIG recommendation lens, yield several significant findings, which are discussed in the following sections.

**Methods to Acquire Land**

Since compulsory land acquisition includes infringement of the rights of the individual concerned, alternative methods such as voluntary agreement, land exchange or compulsory purchase of partial rights should also be used whenever possible (FIG Recommendation 1.1). However, depending on the scale of the project or the complexity of the ownership structure, alternate acquisition methods must be explored(FIG recommendation 1.2).FIG Recommendation 1 specifically states that compulsory acquisition should not be the preferable method of acquiring property if other arrangements can be made. In contrast, only one mechanism of acquiring land is being followed in Bangladesh, which is land acquisition. The Acquisition and Requisition of Immovable Property Act provides no other alternative accessible. However, if the government acquires land for a body other than a government authority, whether or not the project can be implemented on the requiring person/organization's own land is considered while evaluating the application (Acquisition Instructions, r 29.2.a).

**Compulsory Acquisition Basis**

The FIG recommendation as well as the ARIPA 2017, clarified that compulsory acquisition could only be utilized in the public interest or for public purposes. FIG recommendation defines "public interest" as actions of any government, organ or agency of government recognized by statutory law that provide services or development and produce an outcome in which the public as a whole has a vested interest and gain considerable benefit (FIG r 9). FIG recommended that legislation

should explicitly outline the key purposes for which compulsory acquisition is permissible as well as the methods for identifying such purposes as being of "public interest" (FIG r10). The ARIPA neither defines the term “public purpose or public interest” nor specified the principal purposes for which compulsory acquisition can be authorized as well as developed any method for determining such purposes to be of "public purpose or public interest." In Bangladesh, most of the people's property were acquired in the name of development and were put under the cloak of "public purpose". However, in recent decades, governments have been utilizing the eminent domain power to acquire property for private enterprise by broadening the scope of "public purpose" to include development and industrialization (Mahmood par. 7). The ARIPA 2017 grants the government unrestricted authority to acquire land for any "public purpose," whereas the courts have mostly remained hands-off, allowing every types of land acquisitions for private enterprises.

Furthermore, FIG recommendation strongly supports that compulsory acquisition should not only be utilized for public interest, but it should also be based on the principle of weighing of interest. It should be utilized only if the societal benefits outweigh the difficulty and damage inflicted to affected parties who are disadvantaged by the acquisition process as well as subsequent development (FIG r 9). The principle of weighing interest, on the other hand, was not taken into account by either the previous or present land acquisition law in Bangladesh.

**Rights of the Affected Parties**

FIG recommends that compulsory purchase be carried out with particular attention to the rights of affected parties, including human rights of the impacted parties during the compulsory acquisition procedure. These rights also include the right and opportunity to participate effectively in the acquisition process. According to FIG recommendation 11, the extent of compulsory acquisition must be set in such a way that it creates the least damage to impacted parties in order to limit violation of their property rights and other forms of harm while carrying out the project properly. FIG recommendation 2 also mentioned several other critical elements that compulsory purchase law should cover, including legal counsel, support, capacity development for impacted parties, effective involvement of women, the disadvantaged, and youths in the acquisition process, and their ability to voice their views in decision-making, as well as the right to information. Such provisions remained absent in ARIPA.

Only three groups of people are listed as impacted parties in the Act: landowners, lawfully occupying parties, and bargadars. Everyone else who is dependent on the land, such as laborer, impacted craftsman, tenant, or so on, is completely neglected and has no legal recourse under the current legislation. In a society where men hold the vast bulk of land, women and people with disabilities are completely neglected. The Act overlooks the wider problem of land acquisition's social and economic implications on women and persons with disabilities, and makes no remedies for them.

**Payment of Compensation**

Compensation, whether in monetary form or as replacement of land or structures, is at the heart of compulsory acquisition. People lose their houses, their land and often

their means of subsistence as a result of land acquisition. Thus, compensation should be founded on the principles of equity and equivalence in order to reimburse them for their losses. According to the FIG recommendation, the compensation must guarantee that the economic position of the affected party is not worsened (FIG r 19). The financial situation of the affected party, both before and after the compulsory purchase procedure, is a critical factor in deciding the basis as well as amount of compensation. The legislation should allow for equitable compensation and guarantee that any losses incurred as a result of the acquisition process are compensable. The FIG recommendation proposed compensation for the object acquired, compensation for mandatorily obtained rights, compensation for severing the property and harm, damages, or disruption, reimbursement for all surveyors and legal fees, and compensation for people whose land was not acquired but just declined in value (FIG r 22). Furthermore, if there are losses, which are unknown, improbable, or difficult to estimate at the time of the proceedings, there should be a fair timetable for compensation if these losses materialize later (FIG r 25).

In Bangladesh, the ARIPA specifies which factors would be considered (s9.1) and which would not be considered in determining compensation awards (s10) and there are no provisions for additional compensation if any valuation error occurs. Acquisition results in the loss of more than simply a plot of land; it also results in the loss of cultural roots, communal relationships, and much more (Desai 95). The ARIPA does not take these into account at all while determining compensation. Table 1 provides a list of the factors that are taken into consideration as well as those that are disregarded in the process of determining compensation.

**Table 1:** Factors Considered and Disregarded in Determining Compensation

| List of Factors Considered in Determining Compensation | List of Factors not Considered in Determining Compensation |
|---|---|
| a. The property's market value at the time of the publication of preliminary noticeof acquisition.<br>b. Damage suffered because of the removal of any trees or standing crops.<br>c. Damage sustained due to the property being separated from other property.<br>d. Loss suffered as a result of the acquisition adversely impacting other moveable or immovable property, or earnings.<br>e. The reasonable expenditures and incidental expenditures if the person interested is forced to relocate his place of business or residence. | a. The degree of urgency prompting the acquisition.<br>b. Any reluctance of the interested person to part with the acquired property.<br>c. Any injury suffered if inflicted by a private individual, which would not make that person responsible to a lawsuit.<br>d. Any expected harm to the property caused by or because of the use to which it would be placed after the publication of preliminary notice.<br>e. Any increase to the value of the property after the preliminary noticeto persons interested.<br>f. Any change, improvement, or dispose of the property made or executed after the publication of the preliminary notice without the permission of the DC. |

## Tax Neutrality

Government of Bangladesh is empowered to acquire any privately owned property if needed for any public purposes. Unfortunately, the persons who are affected by such compulsory acquisition are not within the ambit of the tax exemption. The country's main tax legislation, the Income Tax Ordinance 1984 as well as the ARIPA 2017 are both mute on this issue. Needless to say, this adds to the financial strain on the afflicted individuals, who have already lost their homes, belongings, and, in some cases, their sole source of income.

Unlike ARIPA, the FIG requires that the effect of taxes on the impacted parties be taken into consideration when assessing the impact of the land acquisition on the affected party's financial situation. Recommendation 24 stipulates that compensation must be calculated in such a manner that the impacted party's financial condition does not endure a loss because of taxes. This particular recommendation seeks to ensure tax neutrality, which means that the financial condition of the affected party is not weakened regardless of the taxation rules applied. FIG proposed two distinct options to ensure tax neutrality. The first one is to make compensation tax-free on the basis of legislation, and secondly, to increase the amount of compensation by the amount of tax to be paid (FIG r 24).

## Profit Sharing Principles

Under the ARIPA 2017, any person or organization other than government authority can also submit proposal for land acquisition. Following a thorough examination of the relevant legal provisions applicable to the requiring person/organization other than government authority, it is found that no greater obligation has been bestowed upon the requiring person/organization than ensuring timely payment of compensation. FIG, on the other hand, strongly recommended that profit-sharing norms should be established by legislation and executed by the appropriate authorities, especially in the event of compulsory purchase for public purposes by a non-public institution. The profit-sharing principle, as defined by FIG, is that "a compulsory purchase for public purposes undertaken by other than a public body may require an increased level of compensation in order to reflect the profit-driven nature of the expropriator" (FIG r 27 Discussion). When calculating compensation, not only are the damages to the impacted party should be considered, but also the value of the acquired land to the requiring person/organization i.e. share of the profit. Despite the fact that Section 9 (2) of the ARIPA states that if the government acquires land for a non-government individual, the compensation should be 300 centum, however, this provision for higher compensation is in generic nature, and does not take into consideration the value of the land for each project to the requiring person/organization. Nonetheless, it is arguable that the same principle might be beneficial in dealing with the affected people' post-acquisition difficult situations in Bangladesh.

## Restitution of Acquired Property

FIG Recommendation 37 urges the national law to set the time period during which the obligation of restitution of acquired property would be in force and suggests three instances to introduce the obligation for restitution of acquired property,

a. if the purpose of compulsory purchase is cancelled or
b. it is no longer pursued, or
c. if rights are lost due to the expiration of a time limit.

The FIG Recommendation 37.2 further states that the original property owner should have the right of first chance to buy if the acquired land is to be resold in the open market. Even if the property has been altered legally or physically, the original landowner retains the right to purchase. An original owner must in all instances pay open market value for the land and it is to be calculated from the day when the authority returns the property.

The ARIPA allows the GoB to acquire other's property by simply paying compensation either for the permanent or temporary basis. The government is not obligated to return it if it is taken over permanently but not used or even used for any purposes other than the one for which it was initially obtained. The ARIPA states that no restitution is possible once a property is permanently acquired. Restitution of acquired property is only possible if property is requisitioned (s 26).

ARIPA fails to adopt a resettlement policy for the affected persons or substantial restoration of their living. Externally funded projects, such as by International Financial Institutions (IFIs) i.e. the European Investment Bank, Asian Development Bank, Japan International Cooperation Agency and the World Bank, ensured project-specific ad-hoc measures to resettlement in Bangladesh; however, domestically funded projects by the GoB simply provide compensation with no alternative housing or resettlement arrangements (Zaman par. 5).Although the aim of land acquisition law is to ensure just and fair compensation in acquisition coupled with the provision of rehabilitation of the impacted persons, the ARIPA ends up simply empowering the acquiring authority to acquire land for a public purpose, which frequently results in state coercion, intimidation, and human rights breaches. The present law has followed more of a casual approach rather than human rights based approach towards the protection of the rights of the affected persons both in its wordings and in application. While much of the emphasis on the government's power of acquisition has centered primarily, the issue of the rights of the affected people has got little to no prominence. Together, these shortcomings set the stage for the following discussion in this article: what precisely should the land acquisition legislation provide to ensure the protection of the rights of those affected?

## Conclusion by way of Suggestions

To answer that question, this paper suggests the following:

i. The ARIPA 2017 reiterates that the government has the authority to acquire any property for public use or in the public interest. The word "public interest" is not defined in the legislation. To prevent abuse, the legislation should provide a precise definition or set of criteria to justify the public purpose.

ii. The legislation should include provisions for compensating anyone whose economic status has been affected as a result of land acquisition. Not only those who have legally recognized rights to the property acquired must be

compensated; all others who do not possess any formal legal rights to land but still have a claim to land that is acknowledged or recognizable by Bangladeshi law must be compensated.

iii. Section 9 of the ARIPA 2017 specifies the matters to be considered in determining compensation and no other losses or damages can be compensated. In this regard, section 9 should be amended to allow for compensation for any losses that occur naturally and fairly as a result of the acquisition and development process. Furthermore, compensation should be calculated taking into account the affected party's financial condition both before and after the land acquisition procedure including tax exemption and profit-sharing principles.

iv. A standard resettlement strategy is still missing from the land acquisition policy. For this reason, a human rights-based approach should be implemented in post-acquisition resettlement of impacted parties.

v. Women, minors, and the disabled should be given special treatment. All affected individuals should be provided with adequate assistance throughout the compulsory acquisition process. They should be given assistance to advocate for their rights. The cost of resolving the dispute should be borne by the requiring person/agency.

vi. If the land acquisition purpose is canceled, abandoned, or the acquired property is utilized for any cause other than the purpose for which it was acquired, the legislation should ensure that the acquired property is subject to restitution obligations. Section 19 of the ARIPA 2017 should be amended to provide a provision for restitution of acquired property to the original owner or his/her successor in interest.

The eminent domain power, which allows the government to take privately owned property for public purpose or in the public interest, comes with a set of responsibilities that include ensuring procedural justice, transparency, clarity as well as most importantly, protection of the rights of the affected people and restoration of their lives to a substantial level. Land acquisition legislation, if implemented improperly, could result into widespread violation of human rights and result in mass displacement and adding more to the existent impacts. Thus it should assure the protection of affected people' rights and concerns, followed by proper implementation of legislative provisions to mitigate the effects of land acquisition in advance. Existing legal flaws in Bangladesh's land acquisition legislation could be addressed by amending the law to safeguard the rights and concerns of impacted people.

## Works Cited

1. Throughout the course of the study, several abbreviations have been used in place of their full names. For example, the term "Government of Bangladesh" is abbreviated as "GOB", “Fédération Internationale des Géomètres (in English, the International Federation of Surveyors)”is abbreviated as “FIG”, "Food and Agriculture Organization" is abbreviated as "FAO", "Nationally Important Project" is abbreviated as "NIP", "Deputy Commissioner" is abbreviated as "DC", "the Acquisition and Requisition of Immovable

Property Act" is abbreviated as "ARIPA" and "the Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance" is abbreviated as "ARIPO".

2. The term "bighas" refers to the units used to measure land, and about three bighas is approximately equivalent to one acre.
3. The term "bargadar" means a person who cultivates the land of another person with the agreement that they would provide a portion of the produce grown on that land to the owner of the land.


4. Atahar, Syed Al. " Development Project, Land Acquisition and Resettlement in Bangladesh; A Quest for Well Formulated National Resettlement and Rehabilitation Policy." *International Journal of Humanities and Social Science* vol. 3, No. 7, April 2013.
5. Billah, S. M. Masum. "Land law reform." *The Daily Star*,29 October 2011, https://www.thedailystar.net/law/2011/10/05/index.htm.
6. Desai, Mihir. "Land Acquisition Law and the Proposed Changes." *Economic and Political Weekly*, vol.46, No. 26/27, June 25-July 8, 2011. Pp. 95-100. https://www.jstor.org/stable/23018639.
7. Fédération Internationale des Géomètres (in English, the International Federation of Surveyors) (FIG). 'FIG IN BRIEF.' https://www.fig.net/about/index.asp.
8. Fédération Internationale des Géomètres (in English, the International Federation of Surveyors) (FIG). *"Compulsory Purchase and Compensation Recommendations for Good Practice."* FIG: 2010.
9. Food and Agriculture Organization (FAO). *Land Tenure and Rural Development* (*Land tenure Studies 03)*. FAO: 2002.
10. Islam, Mohammad Towhidul. *Land Law text, Cases and Materials,* Centre for Human Rights and Legal Research, 2018.
11. Mahmood, K. Shamsuddin. "Eminent domain: Has the doctrine become futile?." *The Daily Star*, 17 January 2017, https://www.thedailystar.net/law-our-rights/eminent-domain-has-the-doctrine-become-futile-1346263.
12. Shamim, Shakhawat Hossain. "Right to land: Is a fundamental right!." *The Daily Star,* 4 Mar 2014, https://www.thedailystar.net/right-to-land-is-a-fundamental-right-13906.
13. Zaman, Mohammad. "Land acquisition & resettlement: Ending double standards." *The Financial Express,* 15 November 2017, https://thefinancialexpress.com.bd/views/land-acquisition-resettlement-ending-double-standards-1510753443.

Enactments Acquisition and Requisition of Immovable Property Act 2017.
Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance 1982.
Acquisition Instructions, Rule 29 (2a), pp. 260.
The Constitution of the People's Republic of Bangladesh 1972

Cases Begum Lutfunnessa vs N Ahmed 40 DLR 232.


Date of Submission : 27.02.2022
Date of Acceptance : 22.05.2022

**Jagannath University Journal of Arts**
**Volume 12, No 01, January-June 2022**

# English Language Teaching Practices in Bangladesh and South Korea: A Comparative Study between Jagannath University and Chung Ang University

Protiva Rani Karmaker*

## Abstract

The current study seeks to understand the strategies in practice for English language teaching in Bangladesh and South Korea. It focuses on a comparative study of English education at Jagannath University and Chung-Ang University. It adopted the mixed methodology comprising interview survey method on the sample population which consisted of 80 students (46 males and 34 females) and 10 teachers from various departments of Jagannath University of Bangladesh, and 40 students (30 males and 10 females) and 5 teachers from disparate departments of Chung-Ang University of South Korea. The study utilized semi-structured questionnaire containing both close-ended and open-ended questions regarding the ELT strategies in practice in both of the universities, their advantages, drawbacks and feasible suggestions. The findings show that both of the universities, as per their countries' economic status, technological assimilation, educational arrangement and demographical parameters, apply mostly dissimilar strategies to effectuate ELT, and they have their respective pros and cons. Accordingly, the study offers some implementable suggestions for effective ELT at the tertiary level in the two countries.

**Key Words:** English Language Teaching, Strategies, Comparative Study, Bangladesh, South Korea, Jagannath University, Chung-Ang University

## Introduction

Today's advanced knowledge in science, technology and medicine is available in English (Gupta 131). In every aspect of life, be it in the field of education, especially higher education, English has a far-reaching effect. English language enjoys so special a status in the global economic market place that even literate persons are deprived if they lack in the proficiency in English language (Phillipson 2). Chaudhury has elaborated why countries like Bangladesh emphasizes learning English,

Keen to participate in the global economy, Bangladesh, a nation struggling against poverty and illiteracy has opened up to the rest of the world. English is part of Bangladesh's colonial heritage; the language of the educated elite and not commonly used in daily interaction, yet the contemporary labor market particularly the corporate world needs a work force competent in English. (60)

Chaudhury (60) also points out that within the country, job opportunities in any organization seek prospective employees proficient in English, entry into government jobs entails one to be selected through a competitive examination where

*Professor, Institute of Modern Language, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh

English is a must. English language is regarded contributory to nations' joining the global economy (Hamid 289). Especially for developing countries, English is considered a necessity for developing human capital to contribute to their economic development (Hamid 290).

With the unprecedented spread, rapid growth and development of globalization, English has received the repute of being a widely used language for communication around the globe. Like other developing countries, in Bangladesh, English as a second language or a foreign language enjoys a high esteem for a wide range of purposes including further study home and abroad, learning about world literature, increasing employment opportunities both locally and globally, communicating with foreigners for various purposes, utilizing the technological boon, and travelling to other countries. Therefore, at present, the role and status of English in this country are seen more increasing than ever. But, it is really sad to see that in Bangladesh, students learning English language for almost twelve years as a compulsory course from primary level to higher secondary level and even having been graduated hardly have a very good command over the language. On the other hand, Korea specially South Korea, as a developed country is inclined to acquire higher skills in English to integrate them into value-added services and workforce globally. English is taught mainly as a foreign language in Korea whereas both a Second language and a foreign language in Bangladesh. This study aims to explore the current practices of English Language Teaching (ELT) at the undergraduate level between Bangladesh & Korea with a special focus on two reputed universities of Bangladesh and South Korea where many undergraduate students are learning English. I have chosen Jagannath University of Bangladesh and Chung-Ang University of South Korea to represent the two countries respectively in terms of the target query. I have chosen Jagannath University since it is one of the renowned public universities of Bangladesh, and it does play a crucial role in English Language Teaching at the tertiary level of the education system of the country. Likewise, the reason of my choosing Chung-Ang University of South Korea is that it is one of the significant private universities, which paves substantial ways for English Language Teaching in South Korea, one of the developed countries of Asia having a strong field and practice of teaching and learning English.

### 1.1 English Language Teaching in Bangladesh

English language was brought to America by the colonialists from England who settled along the Atlantic seaboard in the seventeenth century (Baugh & Cable 341). Gradually, this language spreads all over Europe and in some parts of Asian countries. Bangladesh is one of the developing countries of South Asia. Teaching & learning English in Bangladesh is closely related with its history. Bangladesh has a long historical attachment with ELT since English as a language arrived here in the early $17^{th}$ century when it was politically attached to India. During that time, English was taught not as the only foreign language, there were other foreign languages like Portuguese, Farsi etc. With the establishment of East India Company on the $31^{st}$ of December in 1600, the natives started working as messengers and interpreters. This is the way how English entered here first. In 1947 at the time of the British rulers'

departure, the education system remained firmly geared to English. However, in Bengal, the medium for the matriculation examination for most students took place in Bangla. Just after the independence, the demand for the adoption of national languages (in both wings of Pakistan i.e., East & West) both in administration and education became popular.

However, for implementing a holistic approach to ELT to ensure the acquisition of the four skills of the language concurrently, Bangladesh, during the 1990s reformed the traditional Grammar Translation method and introduced the Communicative Language Teaching (CLT) strategy to English language teaching (Das et al., 326). English language promoting agencies like English in Action (EIA) started working for developing communicative English language learning and teaching in Bangladesh through a range of interventions involving school students, teachers and young adults (Kirkwood 203).

**1.2 Teaching of English at Jagannath University**

Jagannath University (www.jnu.ac.bd, email: registrar@ jnu.ac.bd) was established on 20 October, 2005. It was first established as Jagannath school at Saturia in Manikganj district of Dhaka by the then Zaminder of Baliati. Later on, for expanding the periphery of education, the then British Government transformed 'Jagannath School' into Jagannath College. It became a Government college in 1968. To keep pace with the wave of outside world of higher education, modernization and digitalization, Bangladesh Parliament announced Jagannath College as Jagannath University as per The Act of Jagannath University, 2005 (According to Legislative Act 28). It was 20 October, 2005 from when the university started its formal activities as a university. English is taught at the first year as the compulsory course almost in all departments including the Department of English of the university. BA (Honours) in English and BA (Honours) in English Language, MA in Applied Linguistics and ELT are offered by the Department of English, and the Institute of Modern Languages offers BA (Honours) in English language for undergraduate students.

**1.3 English Language Teaching in Korea**

South Korea introduced English as a compulsory subject in primary school in 1997 (Garton 201). During the last few years, Korea has gone through radical changes in its public English education. In recent years, among many stakeholders in South Korea, there prevails the trend of belief that native English-speaking teachers are more qualified and legitimized in teaching English only in English in the EFL context. Thereby, there is the prevalence of the English-only policy into contemporary EFL classrooms which are ideologically driven in the country (Yang and Jang 1). However, research results suggest that the Korean teachers' everyday exercise of the English-only policy is an intricate procedure of negotiating interlocked principles and characteristics allied to native-speakerism, gendered nationalism, and professionalism. And, for such a one-way pathway, both the native and non-native English teachers require to have local and ethnographic understanding of the language policy and its professional implications (Yang and Jang 1). In South Korea, traditionally, native speaker models had been effective in

the field of English language teaching, and they have become outdated now (Jane Ra 1; Choi 201). Korea has been known as a linguistically and ethnologically uniform nation all through its history although its present sociolinguistic circumstances offer a different story (Jane Ra 1; Choi 201). Since Korea, like the countries of the world, experiences a swift surge of global migration, homogenous linguistic pattern is not functioning aptly here anymore, and its people are enjoying a widespread passion for English language learning which is receiving a substantial emphasis in both individual and nationwide levels (Jane Ra 1; Choi 201). In recent years, South Korea has been trying to redefine the role of English in reaction to globalization. And, accordingly, the effect of this on English language teaching in Korean society more generally has been well documented (Choi 202).

### 1.4 Teaching of English at Chung-Ang University

The history of Chung-Ang University began with the establishment of Chung-Ang Kindergarten as an annex to Chung-Ang Methodist Church at Insa-Dong, Seoul in April 1918. Since its establishment as a University in 1918 it has undergone the painful course of Korea's modern history, upholding its ideal of "Truth and Justice". So from then, CAU has taken a leading role in nurturing intellectuals of the nation. The postgraduate programmes in Chung-Ang University are categorised into General Graduate School, Professional Schools and Specialized Graduate Schools. The international student population in Chung-Ang University reaches approximately 2,000. Approximately 200 exchange students are admitted into Chung-Ang University per year. The Anseong Campus is located in Daedeok-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do. The secondary campus was established in 1979, subsequent to the recognition of Chung-Ang as a university in 1948. Seoul campus has the main administrative building. The existing faculty-based system has been replaced by a functional vice president system in 2014 and each college is operated by the dean of each college. As of 2014, there are 12 colleges and 49 departments. The Department of English Language and Literature offers high quality lectures taught by native professors and language ability trainings focused on speaking and writing to produce experts with a comprehensive understanding of English and American society and a cosmopolitan mindset. It is under college of humanities. The main campus is in Seoul but English as a language course is also being taught in Anseong Campus. English department is one of the most motivating and student focused departments of this university. Since the establishment of this Department in 1963 it has been providing both undergraduate and graduate courses to the students of English language & literature. There are foundation courses taught to the students of other Departments. The Department has expanded its programs to encompass English education for doctoral degree since 2005. English education offers courses in teaching methods, material development and language acquisition, principles of English education, evaluation and intercultural communication. There are 14 faculty of Department of English. There are other teachers appointed from colleges to teach English Course to the Undergraduate students. It is a Private University not a Public or Government University like Jagannath University of Bangladesh.

## Literature Review

In course of language teaching through the ages, many methods have evolved. Most methods "still continue to exist in some form or other" (Theo Van Els et al. 146). A thorough knowledge of all the methods is essential for a language teacher. Here lies the importance of knowing Contemporary and Traditional Theories and Methods. Grammar Translation Method has dominated the arena of ELT classes for many years. The usage of grammatical rules and translation in classroom as the principles and techniques of teaching of the language teacher is called the Grammar-Translation Method (GT Method). In this method, language learning is treated as the process of memorization of grammatical rules and application of these rules through translation from the students' native language into the target language. Since the method is dominated by the rules of grammar, students usually learn more about the grammar than the language itself. This is why W.H.D, Rouse says that the objective of the method was "to know everything about something rather than the thing itself" (cited in Richards and Rodgers 2). A close study of the history of the language teaching reflects that the study of grammar had already been there when Greek and Latin were learned through oral communication without any assistance of grammar. At that time, the study of grammar sprang from a separate discipline. "Both Romans and Greeks were skilled grammarians and the study of grammar was highly valued by the upper classes" (Krashen and Terrell 8). As for level of education, Howatt (131) says, "It was devised and developed for use in secondary schools".

Nevertheless, things have changed of late. Given the crucial demands for English, Communicative Language Teaching (CLT) approach was introduced in ELT. The primary purpose of CLT was to fulfill the need of enhancing communicative ability among foreign language learners. "The CLT approach appealed to the imagination of teachers for a long time" (Howatt 192). The foremost supporting ground of this method is that it allows freedom and flexibility in the teaching techniques.

Developing nations' entrance into the pace of globalization requires them to devise policies including the instructional ones related to International language learning (Hamid 289). As for English language teaching and learning management, Bangladesh demonstrates the dynamics of the intricate interfaces between aspiring ELT policies, lofty policy expectations with low resource investment (Hamid 290). Bangladesh has had a very outmoded approach to EL teaching, putting emphasis on teaching about the language rather than how to use it effectively (Power et al. 503). Anxieties have been articulated about the incapacity of students and adults to communicate efficiently in English (Chowdhury and Ha 2008; Hamid and Baldauf 2008; Hamid, Sussex, and Khan 2009; cited in Power et al 503). The Bangladesh Ministry of Education and the British Council conjointly launched Communicative Language Teaching (CLT) in secondary education in the early 1990s to improve the communicative competence of the students in English language (National Curriculum, 2012; cited in Ali and Hamid 1). Nevertheless, at the present context, it is argued that communicative English and learner-oriented pedagogy cannot be seen, to a required extent, in real classroom practices, thus obstructing L2 teaching aims in Bangladesh (Hamid and Honan 140).

On the other hand, English has been the major foreign language in Korea for the past several decades. The role of English in Korean society has been sturdily allied to cultural capital (Jane 2) and social position (Jane 2). This is due to the fact that English aptitude has served as a doorkeeper in white-collar jobs and university admissions (Jane 2). Koreans have begun to appreciate the importance of the English language when they joined the globalization process through hosting the 1986 Asian Games and the 1988 Summer Olympics (Jane 2). South Korea, in recent years, has introduced a number of novel policies for improving students' ability to use English or to raise students' communicative competence, and one of these policies is Teaching English in English (TEE) to use English as the Medium of Instruction (MOI) for teaching English from 2001 (Choi 203). This TEE policy was introduced along with some other related innovations on different issues of English language education, for example, policies on pre-service teacher education, teacher recruitment, in-service teacher training, and changes to the national curriculum and school-level assessments which focused on re-establishing the development of students' communicative competence in English as the goal of English education (Choi 203).

**Objectives of the Research**

The objectives of the study are to know the ELT strategies currently in function at Undergraduate levels at Jagannath University of Bangladesh and Chung-Ang University of South Korea, and to make a comparative analysis to discern the benefits as well as the disadvantages of the existing ELT approaches in both of the countries, and, thus, to reach feasible suggestions for promoting English language teaching and learning to a more effective standard.

**Research Questions**

The questions that the current study aims to explore are as follows:

1. What are the existing strategies for English language teaching at undergraduate levels at Jagannath University of Bangladesh and Chung-Ang University of South Korea?
2. In what way are ELT approaches similar or disparate in these two settings?
3. What advantages and disadvantages do the teachers and students face while implementing the prevailing ELT strategies in the respective setting?
4. How can the benefits of the current ELT strategies be more exploited, and better innovations be introduced?

**Hypotheses of the Study**

In light of the purpose and question of the study the following specific hypotheses have been formulated.

1. There are more differences than similarities in English Language teaching contexts between Jagannath University of Bangladesh and Chung-Ang University of South Korea.
2. There are significant differences in the needs for learning English between the two countries.

3. There are variables which affect the problem of teaching & learning English between the two countries.
4. Korean students and teachers of Chung-Ang University enjoy more modern amenities for their English class than Bangladeshi teachers & students.
5. Socio-linguistic factors are hindering effective teaching of English in Korea & also in Bangladesh.
6. Like South Korea, Bangladesh needs to effectuate more technology-affiliated language teaching strategies like flipped classroom and blended learning in the current era of digitalized world.

## 2. Research Methodology

The study utilized the mixed-method research methodology comprising both qualitative and quantitative approaches through which qualitative primary data were collected from the selected population. The qualitative data, subsequently, were translated into numerical and percentile figures through unitizing, categorizing and coding. The study applied the mixed-method research strategy; for it offers the advantages of combining quantitative and qualitative analysis scrutinizing the research questions from wider angles to address different facets of this issue (Hammond 239). Mixed-method approach, nowadays, denotes a fast-emerging field of social science methodology, and serves two-fold purposes: it can work for the reciprocal authentication of data and findings as well as for the creation of a more comprehensible and complete picture of the inspected sphere than the mono-method research can produce (Kelle 293).

### 2.1 Population of the Research

The population of the study consisted of a total of 135 participants who included 80 undergraduate students (46 males and 34 females) and 10 teachers of Jagannath University, and 40 (Forty) students studying English language at Chung-Ang University and 05 (Five) teachers of the same university. Of the 80 students of Jagannath University, there were 16 students (09 Males, 07 Females) of English Department, 16 students (10 Males, 06 Females) of Institute of Modern Languages, 16 students (08 Males, 08 Females) of Psychology Department, 16 (12 Males, 04 Females) of Department of Biochemistry and Molecular Biology, 10 (08 Males, 02 Females) students of Bangla, 02 students (01 Male, 01 Female) from Computer Science & Engineering Department, and 04 students (04 Males, 0 Female) of Philosophy Department. Among the 10 teachers of Jagannath University, 07 were from the Department of English and 03 were from the Institute of Modern Languages. Of the 40 students of Chung-Ang University, 30 were males and 10 were femaley and of them, there were 10 students (09 Males, 01 Female) of English Department, 10 students (05 Males, 05 Females) of Life-Science Department, 10 students (08 Males, 03 Females) of Music Department, 10 (08 Males, 01 Female) from Business Faculty. Data were also collected from 05 teachers who are teaching both undergraduate and graduate students as a permanent faculty at Chung-Ang University.

### 2.2 Data Collection

Questionnaires were used as a means of data collection. The item format for part -1 questions (questions 1 (a-k) and 2(a, b) drew on students on Likert scale which asks individuals to respond to a series of statements by indicating whether they 'agree' or 'disagree' or 'neither agree nor disagree'. There were MCQ type questions in question 3(a-f) to know about the appropriate option regarding the role of language teacher in reducing the feeling of anxiety in English class, and their suggestion on how to improve it, why they are poor in English and what method they do prefer for teaching English to them. On the other hand, in case of the variable of classroom language teaching methodology, the four-point scale that comprised the descriptive terms as 'always, often, sometimes, never were for questions 4. In addition to these, there were open-ended questions (5-10).

### 2.3 Data Analysis

The collected data of this study were analyzed in both qualitative and quantitative manners. As for analyzing the qualitative data, thematic content analysis was performed, which represents the most common data analysis approach for qualitative tasks (Burnard 429). The data received from the Likert Scale survey and MCQs were analyzed in a quantitative form presenting numerical comparison and contrasts of the variables in both male and female parameters. Simultaneously, these data were also shown in graphs with percentile representations. The study also had qualitative data from the open-ended questionnaire, which it analyzed through unitizing, categorizing and coding (CARUS 893).

### 2.4 Research Tools

Among the tools used in this study were mostly questionnaires, Likert scale questionnaires, MCQs and open-ended ones. In addition, while at the Chung-Ang University in South Korea, the researcher used a smartphone to video the ELT classes and interview the population there.

## 3. Findings

### 3.1 Jagannath University Students' level of general performance in English skills

**Table: 2** *General Performance Level in English Skill - Category A*

| Skills | Excellent | Good | Moderate | Little |
|---|---|---|---|---|
| *Male (n = 46)* | | | | |
| Listening & Comprehension | 2 | 18 | 16 | 10 |
| Speaking Ability | 1 | 22 | 15 | 8 |
| Reading Skill | 8 | 27 | 6 | 5 |
| Writing Skill | 7 | 28 | 7 | 4 |
| *Female (n = 34)* | | | | |
| Listening & Comprehension | 4 | 16 | 11 | 3 |
| Speaking Ability | 2 | 13 | 16 | 3 |
| Reading Skill | 6 | 18 | 6 | 4 |
| Writing Skill | 6 | 16 | 7 | 5 |

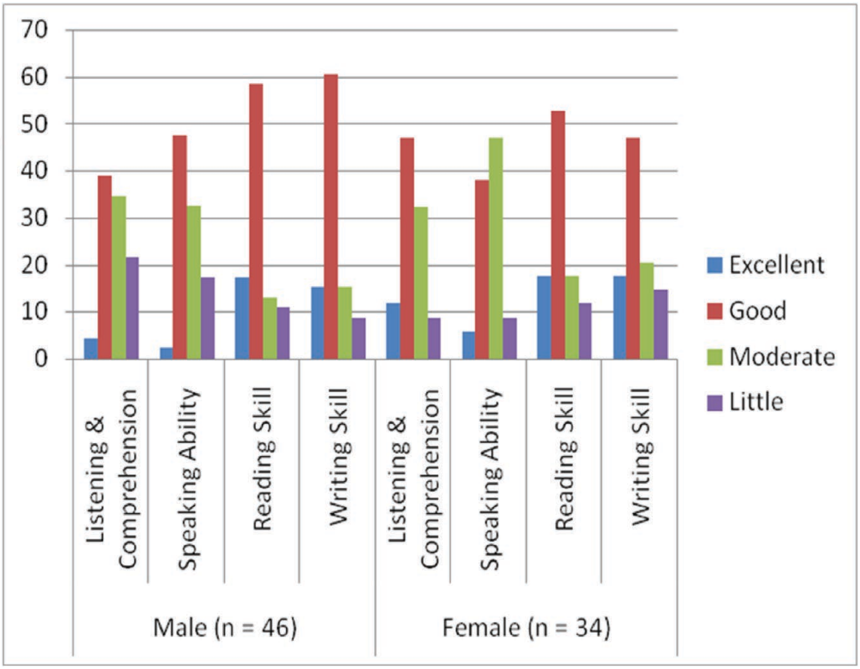


**Figure 2:** General Performance Level in English Skill - Category A.

**Result and Discussion of the Research - *Category A:*** To know the present level of competence in English in four skills as listening, speaking, reading and writing, the students were given options to choose from. The findings show that they are better in reading & writing in comparison to speaking & listening. Since the examination system focuses on reading & writing skills more than the other two, they practice more on the two skills. The poor proficiency score of listening & speaking skill may be due to the fact of poor ICTs at classroom and less English speaking practice at home. Male students are found better in speaking & listening skill in comparison to female students.

*Category B:* The question was set to know their preference of medium of instruction at different levels of their study. Total number of participants was 80 in category B, among them preference of Bangla medium was expressed by 20 male and 13 female and English medium by 26 male and 21 female.

**Table 3 :** *Medium of Instruction [ n = 80 (Male & Female)]*

| | Medium of Instruction | |
|---|---|---|
| | Bangla | English |
| Male | 20 | 26 |
| Female | 13 | 21 |

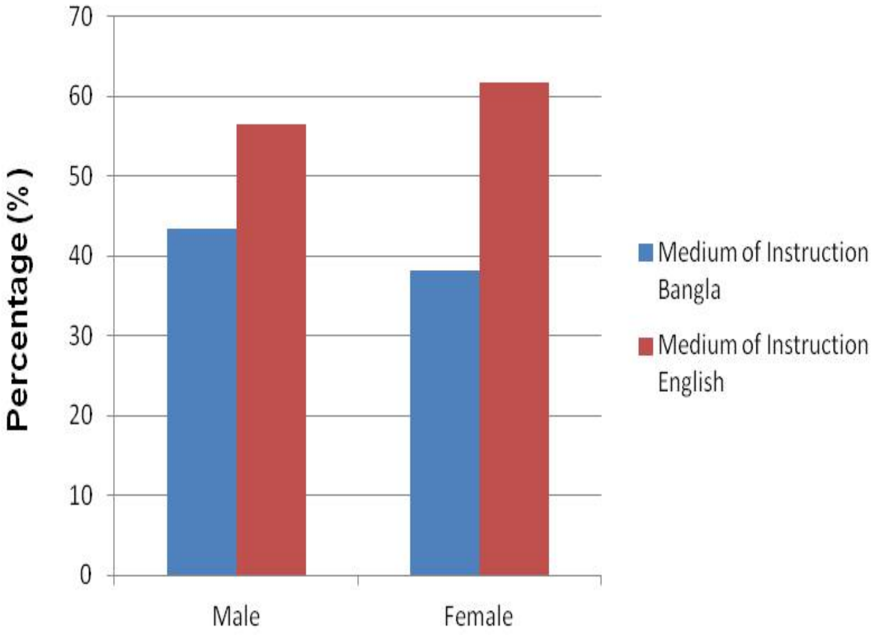


***Figure 3:*** Preferences of Medium of Instruction- Category B.

Therefore, from the students' response it is clear that there is almost the same preference by the students to the medium of instruction that they feel comfortable if a teacher uses both Bangla & English languages simultaneously in a single class keeping special focus on English. Regarding strictness, some students have suggested not to remain strict in one point.

*Category C:* There were eleven questions in questionnaire 1 (a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, and k) which were set to know the different status of English language teaching & learning.

**Table 4 :** *Response of Students on Different Aspects of ELT*

*Male and Female Students – Category C (Male = 46, Female = 34)*

| Questions | Agree (%) | | Neither Agree nor Disagree (%) | | Disagree (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Male | Female | Male | Female | Male | Female |
| English is very essential for them | 100 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| English language teaching is not satisfactory at undergraduate level | 87 | 100 | 13 | 0.0 | 0 | 0 |
| Use of Bengali in English Class is helpful for University level | 84.8 | 88.2 | 2.2 | 5.9 | 13 | 5.9 |
| Flipped class is essential to be introduced at Undergraduate level | 91.3 | 94.1 | 8.7 | 5.9 | 0 | 0 |
| Studying English for getting good marks and job, not for going abroad | 21.7 | 73.5 | 13 | 14.7 | 65.2 | 11.8 |
| Studying English for going abroad or for facing IELTS | 87 | 23.5 | 0 | 17.6 | 13 | 58.8 |
| New English Textbook is not essential for passing Exam at their level | 13 | 5.9 | 8.7 | 8.8 | 78.3 | 85.3 |
| Memorization of notes and guide is enough for passing examination | 30.4 | 29.4 | 4.3 | 11.8 | 65.2 | 58.8 |
| You are facing problem in large classes | 91.3 | 88.2 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 11.8 |
| English teachers lack competence | 76.1 | 88.2 | 8.7 | 5.9 | 15.2 | 5.9 |
| You can practice speaking English at home or outside classroom | 58.7 | 20.6 | 15.2 | 5.9 | 26.1 | 73.5 |

From the above mentioned data, it is evident that all the students are more aware about the necessity of learning and mastering English language.

*Category D:* The question number 2 (a, b) of the questionnaire was to know about the anxiety level of the students. There were only two questions and the following is the response of the male students -

Total Number of Informants: 46 Male and 34 Female.

**Table 5 :** *Response on Anxiety Level and Assessment System*

*Male and Female Students – Category D (Male = 46, Female = 34)*

| Questions | Agree | | Neither Agree nor Disagree | | Disagree | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Male | Female | Male | Female | Male | Female |
| You remain anxious in English class more than other subjects | 73.91% | 79.41% | 8.7% | 0% | 17.39% | 20.59 % |
| You are happy with the present assessment system | 86.96% | 88.24% | 0% | 0% | 13.04% | 11.76 % |

From the data mentioned above, I have found that most of the male students are anxious in English class but they are happy with present assessment system.

### 3.2 Student's Response in Open Questions and Discussion

In answering the question on 'how their language teacher can play role in reducing their feeling of anxiety, 87.5% of the participating students replied 'If the teacher is friendly all the time', the rest 12.5% gave opinion as 'If the teacher instructs all the time'. While answering the question regarding their suggestion to overcome English related anxiety, the greater portion i.e. out of 80 (Eighty) students 87.5% suggested friendly classroom environment. As a method of language teaching, most of them have preferred Communicative Language Teaching approach and Audio-Visual Method. In answering the open questions the students have expressed that the serious problems that the undergraduate students of Jagannath University encounter are unsatisfactory English teaching, lack of modern amenities, large classroom, lack of sound system etc. In reading class few students fail to comprehend the theme of the lecture of the teacher. In speaking class they rarely get the chance to participate actively in speaking and get feedback from class. Similarly in writing class they rarely get the chance to check their weak points of writing. In listening class most of the students sitting behind cannot hear the lecture appropriately because of external barriers like sounds from roads or processions.

### 3.3 Teacher's Response and Discussion

All out of the 10 teachers of English language teach students of Upper Intermediate level. Out of 10 teachers, cent percent supported CLT as a method of teaching English at Undergraduate level. They think that it is the most effective approach as students can learn best from them through it. Sometimes they experiment with new or different teaching techniques but not always. As the most available technological support they have suggested included none of the options amongst the electronic board, computer, mobile etc. They get less or no ICT support for teaching whereas Korean teachers have affluence of these.

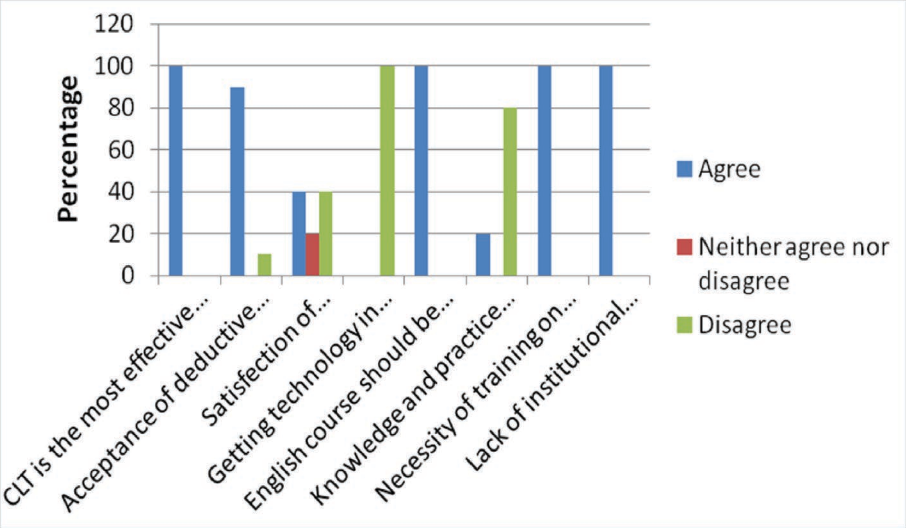


**Figure 4:** Response from Teachers on Different Aspects of ELT.

As approaches which they generally use in teaching, 90% percent of the participating teachers suggested both deductive & inductive approaches. They have also told that they sum up or review the previous lesson that they have taught and gone into the grammatical points which they are about to teach. Few of them (40%) are satisfied with present curriculum & syllabus of English, which clearly signifies the imperativeness of modifying the existing syllabus. They all believe that it is important to make English course compulsory to all disciplines at undergraduate level. They should also devise as well as effectuate those approaches and methods that the students are so far familiar with and feel comfortable about. Relating to the problems that they face while teaching English, all of the responding teachers answered in the affirmative. They get very little access to use ICT tools in making their ELT class more interesting. Regarding all these problems their suggestions are –

a. Technological supports need to be ensured in the ELT classrooms of Bangladesh.
b. More international seminar & workshop on Teaching should be arranged by the university, and participated by the teachers on regular basis.
c. Healthy classroom environment with less students & more space needs to be ensured.
d. Positive feedback from students, guardians and authority has to be conveyed to the teachers to inspire them to remain dedicated to the profession.
e. Training on Teaching needs to be arranged and implemented regularly.
f. Teaching materials have to be improved.

### 3.4 Chung-Ang University Students' General Performance Level in English Skills

*Category A:* To know the present level of competence in the four skills of English language i.e. listening skill, speaking ability, reading skill, writing skill, the students

were given options. The findings show that they are better in listening & reading skill in comparison to speaking & writing skills.

**Table 6 :** *General Performance Level in English Skill – Category A (Male = 30, Female = 10)*

| Skills | Excellent | Good | Moderate | Little |
|---|---|---|---|---|
| *Male (n =30)* | | | | |
| Listening & Comprehension | 3 | 10 | 13 | 4 |
| Speaking Ability | 0 | 5 | 12 | 13 |
| Reading Skill | 8 | 15 | 6 | 1 |
| Writing Skill | 0 | 6 | 10 | 14 |
| ***Female (n =10)*** | | | | |
| Listening & Comprehension | 0 | 2 | 6 | 2 |
| Speaking Ability | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Reading Skill | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Writing Skill | 0 | 3 | 4 | 3 |

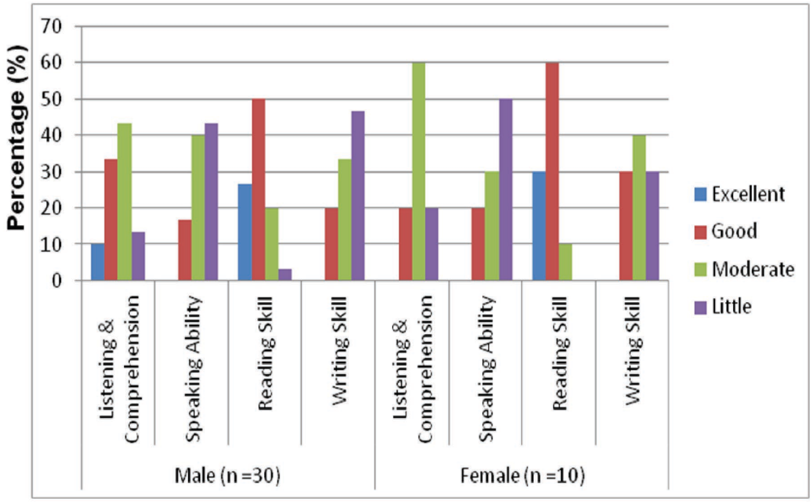


**Figure 5:** General Performance Level in English Skill – Category A.

So from the response of both female & male students, we can comprehend that their confidence in reading is higher than other skills. The following graph shows the percentage of their responses.

*Category B:* The question was set to know their preference of medium of instruction at different level of their study. Amongst Korean & English as medium of instruction at Undergraduate level, the students' preferences were as follows.

**Table 7:** *Medium of Instruction (n = 40)*

| | Medium of Instruction | |
|---|---|---|
| | Korean | English |
| Male | 25 | 05 |
| Female | 08 | 02 |

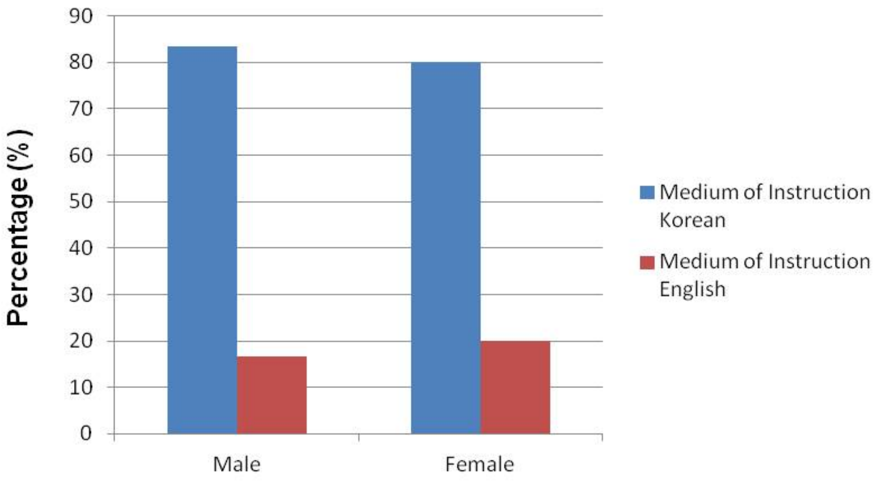


**Figure 6:** Medium of Instruction from Primary to Graduate Level.

In case of medium of instruction there is similarity between male & female towards their preferences that is maximum number of students prefer their instruction of English class in native Korean language.

*Category C:* There were eleven questions to know their purposes, problems and opinions with regard to studying English. The responses came from both male and female students.

**Table 8 :** *Purposes, Problems and Opinions With Regard to Studying English*

| Questions | Agree (%) | | Neither Agree nor Disagree (%) | | Disagree (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Male | Female | Male | Female | Male | Female |
| English is very essential for them | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| English language teaching is not satisfactory at undergraduate level | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Use of Korean in English Class is helpful for University level | 90 | 90 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Flipped class is essential to be introduced at Undergraduate level | 98 | 98 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Studying English for getting good marks and job not for going abroad | 0 | 0 | 2 | 2 | 98 | 98 |
| Studying English for going abroad or for facing IELTS | 98 | 98 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| New English Textbook is not essential for passing Exam at their level | 13 | 5.9 | 8.7 | 8.8 | 78.3 | 85.3 |
| Memorization of notes and guide is enough for passing examination | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| You are facing problem in large classes | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100 | 100 |
| English teachers lack competence | 0 | 0 | 2 | 2 | 98 | 98 |
| You can practice speaking English at home or outside classroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

There is mixed opinion about the necessity of learning English. To them English is merely a foreign language which they learn as a process or system. Almost all the students voted for flipped classrooms at the tertiary level. The reason for which they are learning English is to get a good job. The data shows that most of the students preferred the use of Korean language over English at University level class and voted for introducing flipped classroom at undergraduate level. Besides, they shared that they were studying English for going abroad, not for getting jobs or good marks. On the contrary, they shared an average view whether memorization of notes and guide is enough for passing examination. However, all students disagreed that they were facing problem in large classes and practicing speaking English at home or outside classroom.

*Category D:* The question number 2 (a, b) of the questionnaire were to know their anxiety level. There were only two questions and the following is the response of our male students.

**Table 9:** *Male and Female Students – Category D (Male = 30, Female = 10)*

| Questions | Agree | | Neither Agree nor Disagree | | Disagree | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Male | Female | Male | Female | Male | Female |
| You remain anxious in English class more than other subjects | 80% | 80% | 13.33% | 10% | 6.67% | 10% |
| You are happy with the present assessment system | 80% | 90% | 6.67% | 0% | 13.33% | 10% |

Korean students do not face problem in teaching English due to effective teaching and enough ICTs. Teacher can check their scripts of writing as they have small class. Their English class is held at silent environment. So listening is not a major problem to them. The only problem that is major to them is speaking. There are socio-linguistic causes behind it.

**3.5 Students' Response in Open Questions and Discussion**

In answering the question on 'how their language teacher can play role in reducing their feeling of anxiety, all the 40 students replied 'if the teacher is friendly all the time'. While answering the question regarding their suggestion to overcome English related anxiety, 100% students suggested happy & interactive classroom environment. While leaving their comment on the reason of grammar related weakness, they called the English teachers' teaching responsible. As a method of language teaching, most of them have preferred Flipped Classroom and Communicative Language Teaching Approach.

**3.6 Teachers' Response and Discussion**

Out of the 05 teachers of English language, all teach the students of upper Intermediate level and receive training on teaching after joining in teaching. 100% of them supported both CLT & Flipped Classroom as a method of teaching English at the undergraduate level. Regarding the entrance of flipped classroom in teaching, many teachers responded in the affirmative. As approach what they normally use in teaching, out of 05 teachers, 4 suggested both Deductive & Inductive approaches.

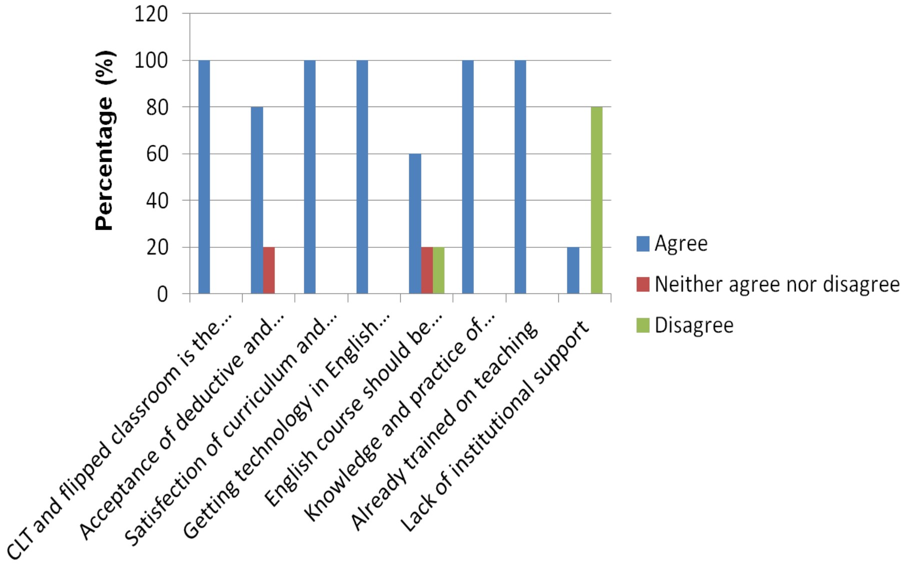


**Figure 7:** Teachers' responses on different ELT questions.

## 4. Comparative Study and Critical Reflection

### 4.1 Comparison between ELT Strategies

Bangladesh is a developing country whereas Korea especially South Korea is a developed one. While in Bangladesh the researcher got few classroom materials and the least accessibility of techno-based classrooms and decorum for undergraduate students at Jagannath University, there were all entrances of enriched techno-based materials in South Korea. In order to improve the English proficiency of local graduates or to test the ability of the foreign students studying at Chung-Ang University; compulsory and non-compulsory English courses as well as many short English language courses are offered by the university.

In the ELT classrooms of Bangladesh, there are students from disparate social and economic backgrounds, which create an uneven scope for practicing as well as assimilating the target language. In contrast, in Korean classroom, students have more or less same social background. English is a foreign language to most of the learners. English language classes are conducted in round tables. The sitting arrangement of English class is very fruitful. Classroom decoration is also very helpful.

For successful integration of CLT both teachers & students need to come closure to each other. In such classroom settings of Korean class, students come close to each other. And teachers can easily monitor individual progress. Since the number of Undergraduate English learning students is lesser in Korea than Bangladesh, it becomes possible to arrange such classrooms. At Jagannath University, nearly all teachers teach English through English. Teachers use English in explaining textbook

materials such as a word, a sentence, a grammar rules. So learners miss learning friendly classroom whereas in Korea, at Chung-Ang University, learners experience a very learning friendly classroom of Korean to English translation. Every difficult word is translated in Korean language. Moreover, Korean teaching style is friendlier and less instructive than Bangladeshi one. Moreover, in Bangladesh, classes are more teacher-centered and less learner-centered.

## Limitations

The Researcher's main goal was to explore a comparative study of the existing ELT practices in Bangladesh and South Korea with reference to Jagannath University, Bangladesh and Chung Ang University of South Korea. However, the path of the researcher was not easy, since the researcher faced different kinds of obstacles while carrying her research endeavor in two different countries having different economic, linguistic and socio-cultural status. One of the major obstacles was that there were a very few number of enthusiastic participants from Chung-Ang University in this ELT research. Some participants from Bangladesh also did not realize the importance of doing such comparative study in the field of ELT and they also could not realize how a comparative study in ELT strategies can bring a significant change in the system of teaching and learning English language through mutual sharing. There was a lack of proper lab facilities in Bangladesh to draw a comparative study of the speaking skill of students from Jagannath University and Chung-Ang University.

## Recommendations

ELT Researchers' main goal is to facilitate the teaching and learning system of English language. However, to bring a significant change in the system of teaching and learning English language, there should be more Face-to-Face interactions between teachers and learners, learners and learners, and teachers and teachers of different countries. In addition, more learner-centered classroom has to be arranged. Bangladesh requires more language learning amenities, logistic support and infrastructural development. Updated training for ELT teachers and classroom facilities aided with technological features are required for more effective English language teaching and learning at Jagannath University.

## Conclusion

We are living in a time of internationalization and globalization in almost all the aspects of social life. Now, a comparative study offers us a lot of materials for various considerations, if it is in the field of science, scientific discoveries, linguistics, psychology or many others (Chumakova et al, n. pag.). The present study delineating the comparisons and contrasts between English Language Teaching strategies at Jagannath University representing Bangladesh and Chung Ang University representing South Korea unearths mentionable differences in the field. The findings of the research will be commendably helpful for the further development of ELT in Bangladesh, if not for South Korea. Many of the strategies, especially the flipped and bended ones, can be put into practice in Bangladesh. And, accordingly, Bangladesh needs to have the latest innovations and refurbishments in ELT.

## Works Cited


1. Ali, Md. Maksud and M. Obaidul Hamid. "Teaching English to the Test: Why Does
2. Negative Washback Exist within Secondary Education in Bangladesh?". *Language Assessment Quarterly*, 2020, pp. 1–18. doi:10.1080/15434303.2020.1717495
3. Baugh, Albert C. and Thomas Cable, editors. *A History of the English Language*.
4. London. Routledge. 1993.
5. Burnard, P. et al. "Analysing and presenting qualitative data". *Br Dent J*, Vol. 204, 2008, pp. 429–432. https://doi.org/10.1038/sj.bdj.2008.292
6. Carus, A. W., and SHEILAGH OGILVIE. "Turning Qualitative into Quantitative
7. Evidence: A Well-Used Method Made Explicit." *The Economic History Review*, vol. 62, no. 4, 2009, pp. 893–925, http://www.jstor.org/stable/27771526.
8. Chaudhury, T. A. "Identifying the English Language Needs of Humanities Students at Dhaka University". *The Dhaka University Journal of Linguistics*, Vol. 2, No. 4, 2009, pp. 59-91.
9. Chawdhury, S.I. "The Language Movement: Its Political and Cultural Significance".
10. *Essays on EKUSHEY The Language Movement 1952*, edited by Syed Manzoorul Islam. Dhaka: Bangla Academy. 1994.
11. Choi, Tae-Hee. "The impact of the 'Teaching English through English' policy on
12. teachers and teaching in South Korea". *Current Issues in Language Planning*, Vol. 16, No. 3, 2015, pp. 201–220. doi:10.1080/14664208.2015.970727
13. Chumakova, G. et al. "THE IMPORTANCE OF COMPARATIVE ANALYSIS OF
14. LINGUISTIC SYSTEMS IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE". 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma. IATED. 2019.
15. Das, Sharmistha et al. "Policy versus ground reality: secondary English language
16. assessment system in Bangladesh". *The Curriculum Journal*, Vol. 25, No. 3, 2014, pp. 326–343. doi:10.1080/09585176.2014.909323
17. Garton, Sue. "Unresolved issues and new challenges in teaching English to young
18. learners: the case of South Korea". *Current Issues in Language Planning*, Vol. 15, No. 2, 2014, pp. 201–219. doi:10.1080/14664208.2014.858657
19. Gupta, R.S. "Globalization and the Need for English: Focus on South Asia". Paper
20. presented at ELTIP Conference at British Council, Dhaka. 1999.
21. Gupta, D. "Teaching English to Engineering Students in India". *Journal of Education and Practice*, Vol. 4, No. 11, 2013, pp. 131-137.
22. Hamid, M. Obaidul and Eileen Honan. "Communicative English in the primary
23. classroom: implications for English-in-education policy and practice in Bangladesh". *Language, Culture and Curriculum*, Vol. 25, No. 2, 2012, pp. 139–156. doi:10.1080/07908318.2012.678854

24. Hamid, M. Obaidul. “Globalisation, English for everyone and English teacher capacity:

25. language policy discourses and realities in Bangladesh*”. Current Issues in Language Planning*, Vol. 11, No. 4, 2010, pp. 289–310. doi:10.1080/14664208.2011.532621

26. Hammond, Cathie. “The Wider Benefits of Adult Learning: An Illustration of the

27. Advantages of Multi-method Research”. *International Journal of Social Research Methodology*, Vol. 8, No. 3, 2005, pp. 239–255. doi:10.1080/13645570500155037

28. Howatt, A.P.R. *A History of English Language Teaching*. Oxford: OUP. 1984.

29. Jane Ra, Jaewon. “Exploring the spread of English language learning in South Korea and

30. reflections of the diversifying sociolinguistic context for future English language teaching practices”. *Asian Englishes*, 2019, pp. 1–15. doi:10.1080/13488678.2019.1581713

31. Kang, N. “Developing the model of English teaching and learning using a mobile device in a blended learning environment” (Unpublished doctoral dissertation).

32. *English Language Teaching*, Vol. 19, No. 1, 2007, pp. 113- 134.

33. Kang, N., and J. Y. Kim. “Mobile contents for teaching and learning English listening skills and vocabulary using TV drama”.2007.

34. Kang, Namhee. “The Comparison between Regular and Flipped Classrooms for EFL Korean Adult Learners”. *Multimedia-Assisted Language Learning*, Vol. 18, No. 3,2015, pp. 41-73.

35. Kelle, Udo. “Combining qualitative and quantitative methods in research practice:

36. purposes and advantages”. *Qualitative Research in Psychology*, Vol. 3, No. 4, 2006, pp. 293-311. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1478088706070839

37. Kim, M. K., et al. “The experience of three flipped classrooms in an urban university: An exploration of design principles”. *Internet and Higher Education*, Vol. 22, 2014, pp. 37-50.

38. Kirkwood, Adrian Terence et al. “A framework for evaluating qualitative changes in learners' experience and engagement: developing communicative English teaching and learning in *Bangladesh”. Evaluation & Research in Education*, Vol. 24, No. 3, 2011, pp. 203–216. doi:10.1080/09500790.2011.610504

39. Krashen S. D. and T.D. Terrell. *The Natural Approach: Language acquisition in the classroom*. Oxford: Pergamon, 1983.

40. LARSEN-FREEMAN, D. *Techniques and Principles in Language Teaching*. Oxford: OUP. 1984.

41. LARSEN-FREEMAN, D. *Techniques and Principles in Language Teaching*. Oxford: OUP. 1986.

42. LARSEN-FREEMAN, D. *Techniques and Principles in Language Teaching*. Oxford: OUP. 1986.

43. Lee, Icy. “Preparing pre-service English teachers for reflective practice”. *ELT Journal*, Vol. 61, No. 4, 2007, p.321-329.

44. Phillipson, R. *Linguistic Imperialism*. Oxford: Oxford University Press. 1992.

45. Power, Tom et al. “English in action: school based teacher development in Bangladesh”.
46. *Curriculum Journal*, Vol. 23, No. 4, 2012, pp. 503–529. doi:10.1080/09585176.2012.737539
47. Richards, Jack C. and Theodore S. Rodgers. *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge. Cambridge University Press. 1986.
48. Theo Van Els et al. *Applied Linguistics and the Learning and Teaching of Foreign Languages*. London, Edward Arnold Publishers. 1984.
49. Yang, Jinsuk and In Chull, Jang. “The everyday politics of English-only policy in an EFL
50. language school: practices, ideologies, and identities of Korean bilingual teachers”. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 2020, pp. 1–13. doi:10.1080/13670050.2020.1740165

Date of Submission : 27.02.2022
Date of Acceptance : 22.05.2022

**Jagannath University Journal of Arts**
**Volume 12, No 01, January-June 2022**

# Queering Cognitive-Sociolinguistics

Sankhadeep Ghosh*

**Abstract**

While Sociolinguistics talks about the ways in which variation in language use reflects various social factors and agencies, Cognitive linguistics see linguistic ability as any other cognitive abilities of human beings. Cognitive Sociolinguistics is an intersectional space where both of these disciplines extend themselves to prove or base their theories and experiments in each other's strongest part. Queer linguistics, on the other hand, is a field in sociolinguistic studies, which mainly discusses the dynamic interaction between gender-sexuality-desire and language use. One stream of queer linguistic research can be regarded as cognitive-sociolinguistics which deals with the perception of sexuality through speech signals. These studies try to understand objectively what cues in the physical sounds convey sexuality. Though no study could give a satisfactory answer so far. The present study questions the research designs of the prevalent methodologies in these experiments and suggests inclusion of queer theoretic stances (thus 'Queering' the discipline) to avoid heteronormativity in the research designs itself.

## Sociolinguistics and Cognitive Linguistics: A very brief overview

In sociolinguistics, great importance has been given to linguistic variations of different sorts and the task under sociolinguistics is to unearth the sociological reasons or societal factors that manifested in or caused these variations. On the other hand, Cognitive linguistics is batting against the notion of 'language is an (innate) autonomous faculty' held mainly by generative grammarians. Although, they don't deny the fact that there are significant innate components to general human cognitive abilities and some of those innate properties give rise to human linguistic abilities that are not there in other species. Cognitive linguists just don't believe that human linguistic ability is independent of other cognitive abilities altogether. They also opposed the truth-conditional semantics which evaluate the truth and falsity of the world by using a semantic meta-language. Cognitive linguistics also opposed the reductionist tendencies in both generative grammar and truth-conditional semantics as they maximally abstract the general representation of grammatical form and meaning which in turn push many grammatical and semantic phenomena in the 'periphery'[1].

Linguistics, as a discipline, has come across a long path though. In its various stages it molds itself according to the changing need of the hour. Asiatic Society in Calcutta, established by William Jones in 1784, which was supposed to teach young British administrators to rule India more adequately by knowing the cultures and languages of the colony. After the lecture given by Jones himself in the annual conference of the Society in 1786 on structural similarities among some classical languages like Sanskrit, German, Latin, Greek to prove they are descended from a same mother-language. It initiated a serious study called Comparative Philology. Without diminishing its academic contribution, we cannot set aside the fact that how

*M.Phil Research Scholar, Jadavpur University, Kolkata, India

it had been used by the colonizers as a justification to rule India. Their claim was that as Aryans, who came India and who were the proponents of Sanskrit language, the texts written in this language and builder of this great heritage, already did invade India once and conquered it and rule over the land and make the land what it was then, so it was justified for English to rule that country again as they themselves were Aryans too.

Anyway, forgetting the political history for a moment, Comparative Philology gave rise to seeing structures of the languages and seeing how phonological variations occurred from language to language as they shifted demographically, and we got some rules also. From that traditional approach, we got Neogrammarian School who thought phonological change is blind to contexts. If a certain phonological change occurs in a language in a certain phonological environment, then with the same phonological environment, the same sound in another language will change the same way as it did in the case of the former language. From this variational part, we got Saussurian approach to language where he talked about the shared features of languages all over the world. Like any word in any language of the world is actually a 'sign' which consists of two parts: 'signifier' and 'signified'. And the connection between these two parts is arbitrary. He also talked about langue-parole i.e., the shared knowledge of language use by a speech community and individual performance with that knowledge respectively[2]. Then, by the middle of the last century, Chomsky came up with his revolutionary idea that language is something that human beings are endowed with as a species in the process of evolution. He gave the notion of competence-performance. Competence is that biological species-specific endowment of Language learning and production of an infinite number of utterances using finite means, while performance is actual language use by the people. His target is to understand the structure of one language properly which can in turn provide explanations for the differently structured languages. In this way he was trying to build a model-theoretic understanding of the language itself. Later, in his minimalist approach, he was trying to erase all apparent different language specific structural and functional heads and tried to minimize the model itself which can capture the basic necessities of all language to be formed to be used. But, the problem with this approach is, this approach takes language as a homogeneous community. But, if we look at the actual language use, we will see language is full of variations at different levels. These variations are not only structural but also functional i.e., ideological from the speaker's part. As society is not homogeneous, nor the language used by those heterogeneous groups or even individuals. The reflection of the ideological difference, whatever it is and from whatever level it belongs to, is the direct imprint of cognition processes itself. Here 'ideology' refers to that individual and collective cognition of perception and production of the language itself. How can this cognition process and socially-ideologically variational language use be captured?

### Cognitive-sociolinguistics

Cognitive-sociolinguistics is an intersectional space where it adapts the theoretical approaches and methodologies from both the fields under an interdisciplinary rubric.

But it is not just a random choice to club these two fields together. It is a deliberate choice as the cognitive linguists turn their attention towards variational and interactionist linguistics to place or test their cognitive theories into empirical ground (as *usage-based* and *non-modularity* are the key concepts in this field), while sociolinguists also found the necessity to base their argument in somewhat hard science i.e., getting themselves out from the subjective explanations of the variation concerns or placing their subjective interpretations itself as the part of the cognition process.

In both the disciplines i.e., Sociolinguistics and Cognitive linguistics, substantial importance has been given to actual use of the linguistic system and the knowledge possessed by the speaker about this system. Cognitive linguistics has given immense importance to the usage-based approach of language use. Such usage-based approach "grounded in the assumption that language does not only constitute a repository of form-meaning units to be employed in everyday use, but it is also itself the product of that everyday language use and grounded in the experience of language users."[3]. More cognitive linguists, Grandelaers, Geeraerts, Speelman, Gries to name a few, moving their methodological orientation from relatively qualitative to rather quantitative research. As a book called 'Method in Cognitive Linguistics' mentioned "there is a growing awareness that linguistic theory should be grounded in the observation of language usage, in experimental tests of its validity, and in general knowledge of cognitive function"[4].

Although both sociolinguistics and cognitive linguistics pose importance to the usage-based approach of language use, their investigation of the type of usage-event has considerable difference. While sociolinguists collect their data from pre-defined speech communities in the form of elicitation experiment or interview or data gathered from large ethnographic observation, cognitive linguists rely heavily on non-elicited corpora to generalize the meaning and variation. So, sociolinguistics clearly places speakers i.e the user of language and the immediate community and cultural social setting at the center of the research design, cognitive linguists make usage-based speculations without looking at the actual users of language in social interaction.

As cognitive linguistics does not always consider user of the language or the immediate social or ideological setting that influence their language use, it'll certainly be the limitation for a theory of language which claim to be experiential, perspectival to the nature of meaning and to see embodiment of grammar as the foundational notion to explain language structure and use. This is also problematic for a theory which argues that the variation and change of meaning is motivated by the pragmatic strengthening of inferences made by speakers-hearers when these speakers-hearers are rarely at the center of research design[5].

So, to get a more comprehensive understanding of language use by the speaker-hearer at the individual level and in the community level with all its social, stylistic and cultural influences cognitive linguistics has to give importance to the central notion of meaning, its categorization and its reflexivity as materialize in everyday language use. It has been noted by many of the scholars that cultural models and socially-situated cognition also has to be incorporated into the cognitive linguistics paradigm to get an understanding of ideologically influenced usage-event based

language use. Thus cognitive-sociolinguistics incorporated every methodology that was lacking in the cognitive linguistics core. On the other hand, sociolinguists like Hudson noted the need to include cognitive issues in sociolinguistics. He argued:

> "CL (Cognitive Linguistics) has the potential for making a serious contribution to some important areas of sociolinguistics. Conversely, this means that areas of sociolinguistics also belong within CL and should influence CL thought and practice"[6].

## Queer Theory

Queer Theory is theoretical discipline that mainly challenges 'norms'. Norms are one kind of belief system meaning while discussing anything in society we took them as postulates, as parameters to be evaluated against, as self evident truths. Our perception of these norms makes anything normal who are aligned with them and declared 'others' abnormal, thus can be marginalized. These norms are used as the means of exploitation by power positions, formally known as patriarchy, to erase any potential threat to them. The nature of selecting these 'others' depends on the threat the power position has in a given time and Social setting. Here, 'Social' with capital 'S' will be used as a superordinate term which includes social, political, economic, religious, racial etc. factors on which Society works.

Queer theory emerged as a challenge to the Social narratives based on these default normal and presents an alternative narrative by incorporating 'others' in the Social discourse. It also challenges the ways in which normative Social narratives have been built. Traditional Social narratives see the Society, including nature, through a given cultural notion of morality and select those who are acceptable under it as normal and discard others as abnormal, unnatural and thus (under state machinery) illegal. The logical and scientific approach would be the other way around, meaning we should first see Society as a part of nature and create our understanding and arrangement of the Social system based on that.

Traditional Social system is based on our understanding of gendered body as binary in nature (male and female) and a reproductive sexuality, called heterosexuality. As every normative Social narrative is based on this postulation of gendered body and sexuality, we call them heteronormative. Moreover, in this heteronormative society, gendered bodies are not only binary but also hierarchical in a sense that males are always superior. That is why, we call the power positions, working in this heteronormative society, patriarchal. Queer Theory also came up as an alternative narrative to feminist theories, which is traditionally known to fight againtst patriarchy. Now, question can be asked why we needed an alternative narrative of the existing feminist theory in the first place! One of the main proponents Queer Theory, Judith Butler, in the 1999 preface of their book 'Gender Trouble' noted[7]:

> "to counter those views that made presumptions about the limits and propriety of gender and restricted the meaning of gender to received notions of masculinity and femininity. It was and remains my view that any feminist theory that restricts the meaning of gender in the presuppositions of its own practice sets up exclusionary gender norms within feminism, often with homophobic consequences. It seemed to me, and continues to seem, that feminism ought to be careful not to idealize certain

> expressions of gender that, in turn, produce new forms of hierarchy and exclusion. In particular, I opposed those regimes of truth that stipulated that certain kinds of gendered expressions were found to be false or derivative, and others, true and original."

But now Queer Theory is much more than a theory of sexual minorities and alternative gender expressions. It now encompasses every possible phenomena in the society which is the victim of heteronormative Social norms and which some sectors of feminists have prejudice about and therefore, are subject to exploitation, bully, marginalization from both the sectors. Queer Theory doesn't restrict itself just to gendered aspects of society but to political, racial, religious and most importantly economic aspects of the same as well. 'Queer' does not refer to anything specific, as claimed by a radical pamphlet distributed in the 1990 New York Pride. It refers to everything that is standing opposite to the norms, which are normal, expected, supposed on the virtue of traditional beliefs. They gave an analogy that queer could mean 'gays loving lesbians' or 'lesbians loving being queer'. It also questions the tag 'gay' 'lesbian' etc. According to Queer Theory, gays are those who think themselves 'gay'[8].

Practitioners of queer theory also concerned in making this theory to be a discipline itself. As it poses itself against every norm, it should maintain this strand and it was onto the practitioners to keep it alert and dynamic. As it opposes heteronormativity, it opposes homonormativity as well. Moreover, to Queer Theory, creating a binary opposite means also normalizing certain relations and thus erasing all other so called non-binary entities, which cannot be placed at the extreme opposite of a spectrum. Now, after so many countries have legalizes gay marriage, capitalist economy is trying their best to uphold this notion of homonormativity vis-à-vis heteronormativity thorough promoting 'gay travel agencies' 'gay tourist destinations' 'gay honeymoon packages' etc. and thus eliminating all other sexual minorities[9].

And the significance of the term 'Queer' vis-à-vis 'gay' is that, gay only restricted to 'male homosexuals' while 'Queer' does not refer to any specific gender or sexual orientation or anything as such. As the pamphlet in the New York Pride announced[10]:

> "Well, yes, "gay" is great. It has its place. But when a lot of lesbians and gay men wake up in the morning we feel angry and disgusted, not gay. So we've chosen to call ourselves queer. Using "queer" is a way of reminding us how we are perceived by the rest of the world. It's a way of telling ourselves we don't have to be witty and charming people who keep our lives discreet and marginalized in the straight world…And when spoken to other gays and lesbians it's a way of suggesting we close ranks, and forget (temporarily) our individual differences because we face a more insidious common enemy. Yeah, **queer** can be a rough word but it is also a sly and ironic weapon we can steal from the homophobe's hands and use against him".

### Queerlinguistics: Experiments on perception of Sexulaity and their limitations

Queer linguistics, which started with the name Lavender linguistics, now encompass a vast range of topics under its rubric, as we mentioned in the last section. At the beginning, linguists thought gay and lesbian people have different language as they

use lots of in-group terms. Therefore, initially primary focus was given to enlist those words with their possible etymology and meaning. Focusing on individual words, out of context, didn't bring for a very long time, any theoretical basis to this field of study. It was also because people within academia have prejudice about this topic and related discussions. Kulick mentioned another reason, which is 'it could be because work on this topic has no real disciplinary home.'[11]. Kulick is an anthropologist. So, his article is a fascinating anthropological review of what kind of research has been done so far till 2000. The presumption that gay and lesbian people communicate in a different language, which has been proven wrong scientifically. It is true, however, that they use in-group terms for safety, for expressing solidarity and group cohesion, for exchanging messages that cannot be done in a public place, to signal their identity to those from the community etc. But later, focus has been shifted to many directions incorporating many different arenas of the lives of these people, starting with their public-toilet-graffiti to heteroglossic way of talking, their using of slangs to their ways of dressing and make-up, from their tone of voice to their body politics and much more. It is much more than sexuality now. It is gradually giving more importance to the notion of 'desire' than to sexuality. Desire itself is a cognitive process that cannot be manifested in our act sometimes or most of the times. But somehow, the driving force of our everyday work, speech, acts are the manifestation of desire. Desire obviously includes sexual desire but it is more than that. As Madhavi Menon pointed out, the power of Desire is so irresistible, historically proven, that it transcends every social boundary of race, class, caste, religion etc[12].

Here, I'll talk about one kind of queerlinguistic research which concerns how people's sexuality can be predicted from the way they talk, mostly, from the speech signals. Much work has been done to understand how people perceive people's sexuality quite successfully[13]. But it is not yet clear which part/pattern or combination of parts/patterns of the speech signals are responsible for this successful guessing of other's sexuality just by hearing the concerned voice samples. It seemed unscientific to claim that we are endowed with a special power of *telling-people's-sexuality-just-by-hearing-their-voices*. Then the question is how do they do it? Here, 'they' also includes us, as we are all potential judges. We do judge people even outside a research design to evaluate them. Question is how do we evaluate them? Is there any pattern(s) that act as a parameter of evaluation? If there are parameters, what are they? Are these parameters biological or cultural? If it is biological then what are the proofs we have? If it is cultural, then is it universal or partial? If universal, then how can it be linked to the shared struggle of human beings as a species on this earth? If partial, then why is it not universal i.e., what is/are the nature of other partial(s)?

Many researches have proven that the variation in language that we perceive triggers evaluative judgments about the speaker. And "the independence of these judgments from the percept of language variation is usually taken for granted"[14]. Strand noted that 'socially constructed belief or expectations (i.e., stereotypes)' of how one person should sound on the basis of their physical appearance has an effective impact on people's perception of a speech sound. So, retrieving the acoustic information

through a bottom-up processing “interact directly with the higher level information related to people’s socially constructed stereotype about gender”[15]. It is also true that we have considerable acoustic differences in inter-speaker scenarios. Many researchers who are trying to understand which are the properties in the speech signal responsible for the correct guessing of one’s sexuality, have tried to see in many ways, pointing out to some potential cues in the voices[16], yet to conclude effectively, in which level the signaling is working. So, intuitively, the variation in acoustic property of a speech should be small or even negligible, and in different levels to have so many speech varieties. Although, Shadle (1991) talked about acoustic production of fricatives but (I think) it’ll be helpful in understanding speech signals in general, which is[17]:

> “differences too small to affect the area function significantly, that had no effect on the constriction, flow rate, or pressure drop, nevertheless could have a substantial effect on the radiated sound ... minute abrupt discontinuities [cause] significant acoustic differences”.

Now the question is, even with so many varieties, which is audible, how we can we categorize them into groups according to their, in this case, sexual orientation? Here, the notion of ‘speech normalization’ comes. It has been said that ‘listeners normalize speech through reference to experience-based-expectations regarding speaker-to-speaker variation’[18].Now the thing to notice is that, even within these categorized groups the voices do not sound similar. They have intra-group variation too. That is to say, normalization happened in terms of a scale rather than discrete points. They have an idea of ‘range’ to segregate voices into groups. How do they develop this range? Maybe the notion of ‘experience-based-expectation’ will play a role in that.

What if the experience was different? Because experience is an historical phenomenon which can be achieved in a single lifetime or could be inherited from the previous generation. That is to say the notion of gender, gender as we perceive it today, is nothing but an European concept which had been transmitted to all over the world through the historical process of colonization. So is sexuality. Beside many aspects of society, colonialism had brought destructive changes on the cultures of the acquired lands. It had affected the original people of the land in many ways. These also included the gender roles and sexual cultures of the lands themselves. The notion of Victorian morality was imposed on these colonies led to normalizing only heteronormative gender roles and discarding the prevalent others. While this long process of colonialism had proven destructive to the original cultures of those lands, the coming of European cultures in these lands with all their enlightened thinking had also penetrated in the intellectual sphere over the generations. It is true that, later, this western intellectual tradition helped them to see their past on their own, but a constraint remained there as a baggage of their Victorian past, which was the notion of ‘morality’. What is normal/abnormal or acceptable/unacceptable and thus legal/illegal (or even natural/unnatural) often or most of the time determined by this sense of morality. So, somehow our experience of today is shaped by the experiences that we inherited historically. Often the sense of nationalism, nationalist history and heritage vis-à-vis colonialism, constructed on the basis of these historical colonial experiences. Bajaha has noted how it happened in the many states of Africa.

Although, the term ‘homosexual’ was suddenly not there in Africa before the colonial period but the act was not unknown. But after the colonial period, many African leaders just to show their position against the colonial period and the west, they started opposing every progressive act and initiatives of western world as forms of colonialism and thus outrightly opposed them. In this process, they opposed the western openness and acceptance of homosexuality in the name of resisting western neocolonialism and try to form African culture and heritage as homosexuality-free and Africa as heterosexual continent[19]. Same can be said for India. The first Prime Minister of India, Jawaharlal Neheru noted in his book ‘Discovery of India’ (1946)[20]:

> “It is clear from Greek literature that homosexual relationships were not looked upon with disfavour. Indeed there was a romantic approval of them. Possibly this was due to the segregation of sexes in youth. A similar attitude is found in Iran, and Persian literature is full of such references. It appears to have become an established literary form and convention to represent the beloved as a male companion. There is no such thing in Sanskrit literature, and homosexuality was evidently not approved nor at all common in India” (p. 146)

But, Pandit Neheru’s presumption of Indian culture and Indian History was certainly prejudiced[21]. It seems that the sense of ‘Nationalism’ in the colonial and early post-colonial era was under a strong influence of Victorian morality. And their nationalism was inspired by the urge to prove the ‘purity’ and ‘sanctity’ of their nation and national history to their colonial masters.

That means, the cognition of belief systems or expectations based on these inherited experiences is not objective but acquired. Then, needless to say, being in particular geographical location, within a given cultural setting, with different norms and different (historical) experiences and expectation based on these experiences, our understanding of gender and sexual roles would be different. And in turn, our categorization of perception of speech signals would be different as well.

Now, as the title of this paper suggests, here our effort is to Queering i.e to incorporate Queer theory in cognitive-sociolinguistics. Now what does it mean to incorporate Queer Theory in another discipline and why it is necessary? That will be discussed in the next section but before that let us see what is the main pattern of these speech-perception studies.

Most of the researches, which is based on this speech signal perception and guessing of sexual orientation, has a pattern. Levon (2006) has rightly pointed out that it’s a two-way methodology. One is to collect speech samples from two groups of people: one is self-identified ‘gay’ people and others are self-identified ‘straight’s. These taken samples then undergo a process of hearing by a selected group of people, collecting through advertisement in (university) newspapers. Most of time the sexual orientation of the hearing group is not taken into account. Then, these hearer group was asked to mark those voice samples on certain scales like ‘homosexual/heterosexual’ ‘masculine/effeminate’ ‘introvert/extrovert’ etc[22]. All most in all these experiments, hearer group become successful in guessing the sexual orientation of the people whose voice samples they were hearing. But, in all these experiments, researchers also tried to identify what are the physical features of those

voice samples that actually help the hearer guess people's sexuality correctly. Nothing came as concluding but some researchers are referring to mean frequency ($F_0$). But it has been noted that the $F_0$ of gay men are not very different from $F_0$ of the so-called straight people most of the time. It does not support the adjectives that uses to refer to gay men voices like 'women-like' 'swoopy' 'over-dramatic' etc. Many researchers have tried other aspects into account to explain this, like vowel-length, sibilant duration etc. But again, nothing came out as concluding[23].

## Queering Cognitive-sociolinguistics

Queering a discipline means to question the normative way of culturing that discipline i.e seeing, reading, perceiving and interpreting the same. The need of this endeavor is to evaluate the postulates of that discipline and see if they anyway create hindrance in understanding of the discipline itself. It is mentioned above that the effort to find out the cues of sexuality markers in an individual's voice could not come up with any definite or satisfactory answer. But it is also true that in those studies hearers were successful in guessing people's sexuality quite correctly just by hearing the voice samples of the latter. It seemed to me that maybe the research design under which we are trying to predict the reasons for these successful guessing has limitations. Earlier studies have also given some insights about the nature of those probable limitations. For example, previously gay speech wereadjectified with words like 'women like'. But there are no such superficial identity between gay speech and women speech. That is to say there are many such things that we have taken for granted (or in experiments, taken as postulates) out of sheer belief or morals, which do not match with the existing objective reality. The effort here thus is to question our basic premises that we took for granted in the previous experimental studies. Questing the basic premises or postulates or norms is one of the most funamental tactics of Queer Theory. Therefore, queering cognitive-sociolinguistics means to include fundamentals of Queer Theory into the methodology of cognitive-sociolinguistics.

What are the fundamentals of Queer Theory? One, is to challenge the norm. Anything that has been taken for granted, questioning that. Two, is to challenge the power position. Power positions or power centers exert their force into the society by implementing the norms, facilitating normal, thus pushing the prevalent 'others' in the margins, declaring them as 'abnormal'. Normalcy is expected and abnormality is undesirable, sometimes punishable. Those who do not attest this 'prescribed' or 'acquired' normalcy are often exploited, mentally or physically, bullied and compelled to think themselves less, unwanted and even not worthy of living. Queer Theory, by challenging this power position try to ensure the fundamental rights of people with dissent, in opinion, in appearance and in desire, and to ensure their living just by virtue of being Homo Sapiens. Moreover, it questions and shows the futility and illogic of some prevalent beliefs in the society, which has been taken as default of logic, belief or tradition and anything that is not in line with this perceived and believed 'default', 'normal' or 'true' has been discarded and discouraged visually, socially, legally, religiously, economically and medically. Queer Nation Manifesto noted[24]:

> "I hate the f---ing Pope, and I hate John f---ing Cardinal O'Connor, and I hate the whole f---ing Catholic Church. The same goes for the Military, and especially for Amerika's Law Enforcement Officials - the cops - state sanctioned sadists who brutalize street transvestites, prostitutes and queer prisoners. I also hate the medical and mental health establishments, particularly the psychiatrist who convinced me not to have sex with men for three years until we (meaning *he*) could make me bisexual rather than queer. I also hate the education profession, for its share in driving thousands of queer teens to suicide every year. I hate the "respectable" art world; and the entertainment industry, and the mainstream media, especially *The New York Times*. In fact, I hate every sector of the straight establishment in this country - the worst of whom actively want all queers dead, the best of whom never stick their necks out to keep us alive.
>
> I hate straight people who think they have anything intelligent to say about "outing." I hate straight people who think stories about themselves are "universal" but stories about us are only about homosexuality."

Queer is a political term, so is Queer Movement and Queer Theory. So, it is a political persuasion to not be sorry for who we are. Whenever power positions, be it in society or in academia, will try to eliminate us or pretend that we don't exist, we'll voice and convey our existence.

How can we implement these notions into cognitive-sociolinguistics? Let me answer this in a different way. We segregate people with dissent in terms of norms. Like, to us, many gay people are effeminate i.e., more inclined to 'feminine' gender. But this is nothing but a blunt generalization. By virtue of being a potential judge ourselves and as a member of this community, we know there are gay who are not effeminate at all. Moreover, the 'effeminacy' is sometimes emergent and partial[25] as the effeminacy only comes in their behavior when they are in queer friendly social setting. They are not even bisexual that we can lamely say that their heterosexual side of desire retain their masculinity. It's a baseless argument firstly by judging Bi-people by separating their sexuality into homo and hetero spheres and secondly, we do also have so-called 'effeminate' bisexuals etc. Moreover, gender is a scaler function and there are more than two genders in world (male, female, agender, bigender, trigender, gender-fluid, non-binary, transgender male, transgender female etc.). So, if theoretically, bisexual people are supposed to be attracted to two genders, that two-member can be of any combination of the mentioned gender identities above.

Now, as a practical task, take any three or four males from your surrounding who are self-identified as straight. Now, examine whether their expression of masculinity is the same? Obviously, it'll not be the same. That means, masculinity is not a discreet point. So is femininity. That's why it is better to think of gender as a scale and we, as individuals, are somewhere on it. Someone can ask, what is wrong in referring to that 'point' by comparing it to either extreme of this scale? Problem is two-fold. Firstly, we don't know what the manifestation of these extreme points of this scale will look like. For example, we use the terms like 'hyper-masculine' 'alpha-masculine' etc. to denote points towards this extreme masculinity but we don't know how an extreme masculine figure will look like, or how he'll behave to exert his 'extreme' gendered

activity. Secondly, this scale is a European scale where only two reference points have been taken into account. In many native American tribes 'two-spirits' concept of gender-identification was considered. Even in other tribes more than five or six, even ten variants of gender have been considered[26]. Although, the mentioned gendered categories like agender, trigender, gender-fluid, non-binary etc. can be produced theoretically by different semantic permutation and combination and negation of binary notion of gender, Picq and Tikuna gathered some linguistic terms denoting gender identity and sexuality in different cultures[27] which cannot be even theorized using binary gender identity or the gender scale that we are hypothesizing on the basis of binary gender points. That means scale itself is apparent.

Philosophically we can say in this world everything is apparent, so what is the need to tell all these. The need to tell all these is to show that there are fallacies in our stereotype constructions. Moreover, on the basis of these futile conceptions, people in power-centers had and still exploiting people who do not confirm to their notion of 'normalcy', 'tradition' or 'culture', often with a pinch of 'religious morality', snatched their rights to love the person they desire, to dress as they want, to talk as they prefer and to live as they want. We have a problem with that. Pulling an analogy with Communist movement, what are they fighting for? They are fighting for the economic inequality that leaves certain people to die in poverty, that deny them the basic rights of getting food, getting their deserved share of natural resources to live a life of comfort. They address this inequality as a historical process and justify their movement in a commitment to end this inequality by ensuring them, who have been deprived historically, their fundamental right of food, cloth and shelter. Queer movement is trying to end inequalities on the basis of some other fundamental rights to love and to live. Queer movement is committed to cry war against those means, by which one can be deprived of their fundamental rights mentioned above.

So, what needs to be done? It is impossible to tell or rather predict in advance, what methodology one would take to question and break these stereotypes or norms. But it seems important that we change the way in which we construct our hypothesis or research design or the interpretation of the results to point out the fallacy of these norms or stereotypes themselves and the futility in our perception of them. If we can question the perception of these norms then it'll be easier for us to emphasize the perception of language use based on these norms. For example, if we take two groups of self-identified gay and straight people respectively, and asked hearer group to mark them on some binary scales like heterosexual/homosexual, masculine/effeminate, introvert/extrovert and so on so forth, obviously the findings will revolve around those heteronormative binary reference points and never go beyond that. If the research design itself wants its result to be this binarily categorical then how come it is possible to break the normative perception and its (re)production (say in movies, advertisements etc.)? Is not it, in turn, strengthening the normative perception of sexulaity?

B. Munson in his response to Van Borsel et al. (2009), pointed out some limitations in the interpretation of the experimental data and the findings. Van Borsel et al. interpreted the higher peak frequency of gay men's /s/ in Munson, McDonald,

DeBoe, & White (2006)and Linville (1998) as indicating a more-anterior constriction for that sound segment, thus, something closer to a frontally 'misarticulated' /s/. B. Munson questioned the notion of 'misarticulation' and argued, referring to Stuart-Smith's (2007) finding of the study of the strong relation between variation of /s/ pronunciation and sex, age and social class of the speakers of Glaswegian English, "the strong social stratification suggests that these sounds are likely not to arise because of the mechanisms that underlie /r/ misarticulation in children with speech delays, but reflect instead talkers' tacit or overt social-indexing"[28] and cannot be regarded as misarticulation. By analogy, he also argued, with such a limited sample size, we cannot claim that gay people lisp and lisping is the characteristics of gay speech, but what we can only say is that listeners somehow link lisping with gayness. That, lisping can be referred to as the perceived stereotype of gay speech[29]. As has been noted earlier in this article, B. Munson also questioned the negligence of the previous studies towards the sexual orientation of the hearer group.

By involving ourselves into this binary construction, there is no way we can question the stereotype euphemism used for LGBTQ+ people. So, 'Queering' will be to break this binary construction, to make room for the (possibility of) existence of other identities in research design, hypothesis formation and interpretation of the data or research findings. The interpretation part can possibly be the most important aspect of 'Queering' cognitive-sociolinguistic research, as it is proven in the case of other disciplines like literary theories, sexuality studies, history, anthropology etc. For example, Van Borsel et al. (2009) concluded that 40% of gays in their sample size pronounces more-anterior /s/, what according to them is mispronunciation and this 'developmental misarticulations' never normalize. Munson, pointing to this observation in their paper, argued that this conclusion might be misinterpreted in the media and by the scholars of other disciplines as 40% of the homosexual people are articulatorily impaired w.r.t heterosexual people and which is not true. Other studies, such as Munson, McDonald et al. showed that distinctive variants of /s/ was reflection of clear speech styles, rather than a cue for sexual orientation. Works of Podesva (2006, 2007) also suggested, as mentioned by Munson, clear speech style itself can signify very different meanings in different social settings such as 'erudite' 'prissy' or 'competent'[30].

## Conclusion

This article is written as a proposal to the larger academic community to give it a serious thought. Antropological and Cross-cultural studies suggest that the perception of gendered body and sexual habitat in different native societies is very different and diverse. For example, in Hawaii with the word 'mahu' they connote both male and female, while in Mexican Juchitan culture, the word 'muxes' connotes neither male nor female[31]. In ancient Indian tradition, sexuality terms comes in terms of temporary sexual role and position in a sexual act or by sexual fantacies one has[32]. Moreover, in many African countries homosexual act was performed but didn't have a word like 'homosexuality' to refer to it; to them the notion of being a lifelong homosexual or exclusive homosexuality was exotic and unintelligible[33]. What we regard as alternative is/was not perceived as alternative at all in those cultures but

treated within the mainstream culture. So, our socio-cognitive ability to discriminate, which is based on the notion of 'other' in our culture and which is the base of our social judgements like appropriate/inappropriate, natural/unnatural, acceptable/ unacceptable, legal/illegal etc. is not absolute. From Munson and Munson et al. it is evident that the intra-culture scenario also is not very homogeneous[34]. Given this relativism, it seems that the perception of gender and sexuality is more of a local phenomenoni.e evaluated locally, meaning people evaluated them vis-a-vis some locally present parameter rather against any universal set of parameters.

By queering cognitive-sociolinguistics we can evaluate this relative perception and compare it in cross-cultural scenarios (which I think is possible in this age of migration) to point out the non-absolutism of the stereotypes. It is important because historicity of these stereotypes was the means of exploitation for a very long time. LGBTQ+ movement, although changed the perceptual judgment to some extent, establishes the stereotypes more firmly. On the other hand, Queer Theory claims gender and sexuality to be more fluid than categorical, which is also attested by cross-cultural studies. So, it is important to show the fallacy of these categories objectively and subjectively. Objectively it can be done as it is done by Munson while commenting on Van Borsel et al. (2009) about a particular way of pronouncing /s/[35]. And I believe it can be done subjectively if we give the hearer group a more categorized or scaler set of identities to evaluate the speech sample against rather than giving them a binary evaluative category. The assumption is : If the hearer group is presented with gradient or diverse set of the evaluative identity categories, they will either respond like before i.e evaluate the speech sample on easy binary points and not attend the diverse set/gradient identity terms or they will give arbitrary response with respect to the given set.

## Works Cited

1. Croft, Willam and D Alan Cruse. *Cognitive Linguistics*. Cambridge University Press, 2004.

2. Saussure , Ferdinand De. *Course in General Linguistics*. Ed. Charles Bally, Albert Sechehayeand Albert Reidlinger. Trans. Wade Baskin (Translated From French to English). New York: Philosophical Library, 1959.

3. Bybee, 2007, 2010; Langacker,1987, 2000: as mentioned in Pütz, Martin, Justyna A. Robinson and Monika Reif, *Cognitive Sociolinguistics: social and cultural variation in cognition and language use*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014.

4. Gonzalez-Marquez, Mittelberg,Coulson, & Spivey, 2007, p. xxii, in Pütz, Martin, Justyna A. Robinson and Monika Reif, *Cognitive Sociolinguistics: social and cultural variation in cognition and language use*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014

5. Pütz, Martin, Justyna A. Robinson and Monika Reif, *Cognitive Sociolinguistics: social and cultural variation in cognition and language use*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014

6. Hudson, 2000 in Pütz, Martin, Justyna A. Robinson and Monika Reif, *Cognitive Sociolinguistics: social and cultural variation in cognition and language use*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014

7. Butler, Judith. *Gender trouble: Feminism and Subversion of Identity*. 1997. New York: Routledge, 1990.

8. Anonymous. *The Queer Nation Manifesto*. 1990. <https://www.historyisaweapon.com/defcon1/queernation.html>.

9. Bakshi, Kaustav and Rohit K. Dasgupta. *Queer Studies: Texts, Contexts, Praxis*. 1. Orient BlackSwan, 2019.

10. Anonymous. *The Queer Nation Manifesto*. 1990. <https://www.historyisaweapon.com/defcon1/queernation.html>.

11. Kulick, Don. "Gay And Lesbian Language." *Annual Review Of Anthropology* 29 (2000): 243-285.

12. Menon, Madhavi. *Infinite Variety: A History of Desire in India*. 1. Speaking Tiger Books, 2018.

13. McConnell-Ginet, Sally. "Intonation in Man's World." *Signs* 3.3 (1978): 541-559; Munson, Benjamin and Molly Babel. "Loose Lips and Silver Tongues, or, Projecting Sexual Orientation Through Speech." *Language and Linguistic Compass* 1.5 (2007): 416-449; Munson, Benjamin. "Lavender lessons learned; or, What sexuality can teach us about phonetic variation." *American Speech* 86.1 (2011): 14-31; Munson, Benjamin, et al. "The acoustic and perceptual bases of judgments of women and men's sexual orientation from read speech." *Journal of Phonetics* 34 (2006): 202-240; Munson, Benjamin. "Variation, implied pathology, social meaning, and the 'gay lisp': A response to Van Borsel et al. (2009)." *Journal of Communication Disorders* 43 (2010): 1-5

14. Strand, Elizabeth A. "Uncovering the role of Gender Stereotypes in Speech Perception." *Journal of Language and Social Psychology* 18.1 (1999): 86-99.

15. ibid

16. See (13)

17. Shadle, 1991; p. 423 in Strand, Elizabeth A. "Uncovering the role of Gender Stereotypes in Speech Perception." *Journal of Language and Social Psychology* 18.1 (1999): 88.

18. ibid, p. 89

19. Bajaha, Binta. "Post-colonial Amnesia: The Construction of Homosexuality as 'un-African'." *GI422 Conference*. Department of Gender Studies, London School of Economics, 2020.

20. Thandani, Giti. *Sakhiyani: Lesbian Desire in Ancient and Modern India*. 2016. London, NY: Cassell(1996) and Bloomsbury (2016), 1996; p. 5

21. Vanita, Ruth. ""Wedding of Two Souls": Same-Sex Marriage and Hindu Traditions." *Journal of Feminist Studies in Religion* 20.2 (2004): 119-135; Vanita, Ruth and Saleem Kidwai. *Same-Sex Love in India:Reading From Literature And History*. Ed. Ruth Vanita and Saleem Kidwai. Sept. 2001. Palgrave, 2000; Vanita, Ruth. *Gender, Sex, and the City: Urdu Rekhtī Poetry in India, 1780–1870*. New York : PALGRAVE MACMILLAN, 2012; Vanita, Ruth. "Lesbian Studies and Activism in India." *Journal of Lesbian Studies* 11.3-4 (2007): 244-253; Vanita, Ruth."The Self Is Not Gendered: Sulabha's Debate with King Janaka." *NWSA journal* 15.2 (2003): 76-93.Das Wilhelm,

Amara. *Vedic Third-Gender Types and Terms*. 2014.https://www.galva108.org/single-post/2014/05/11/Vedic-Third-Gender-Types-and-Terms

22. Levon, Erez. "Hearing "Gay":Prosody, Interpretation,and the Affective Judgments of Men's Speech." *American Speech* 81.1 (2006): 56-78.

23. See 13

24. See 10

25. Bucholtz, Mary and Kira Hall. "Locating Identity in Language." *Language and Identities*. Ed. Carmen Llamas. Edinburgh University Press, 2009. 18-28; also see Bucholtz, Mary and Kira Hall. "Theorizing Identity in language and Sexuality Research." *Language in Society* 33.4 (2004): 469-515.

26. Metzger, Logan. *Native American two-spirit identity mixes gender roles* . 6 Nov 2019. <https://www.iowastatedaily.com/news/iowa-state-ames-national-native-american-heritage-month-two-spirit-gender-expression-identity-roles-in-society-lgbtqia-community-history-culture/article_e2d907c4-00c7-11ea-bda7-17ac5edeae60.html>; Powell, Savannah. Dawn. "Quuer in the age of the Queen: Gender and Sexuality of MId Modern Period in Victorian England and North America." 2019. *Historic Denver.* Molly Brown House Museum. <https://mollybrown.org/queer-in-the-age-of-the-queen-gender-and-sexuality-of-the-mid-modern-period-in-victorian-england-and-north-america/>.

27. Picq, Manuela L. and JosiTikuna. "Indigenous Sexualities: Resisting Conquest and Translation." *Sexuality and Translation in World Politics*. Ed. Caroline Cottet and Manuela LavinasPicq. Bristol: E-international Relations Publishing, 2019. 57-71.

28. Munson, Benjamin. "Variation, implied pathology, social meaning, and the 'gay lisp': A response to Van Borsel et al. (2009)." *Journal of Communication Disorders* 43 (2010): 1-5

29. ibid

30. ibid

31. See 27

32. See 20, 21 and Das Wilhelm, Amara. *Vedic Third-Gender Types and Terms*. 2014.https://www.galva108.org/single-post/2014/05/11/Vedic-Third-Gender-Types-and-Terms

33. Herdt, Gilbert. *Same Sex, Different Cultures: Exploring Gay and Lesbian Lives*. Westview Press, 1997.

34. Munson, Benjamin. "Lavender lessons learned; or, What sexuality can teach us about phonetic variation." *American Speech* 86.1 (2011): 14-31; Munson, Benjamin, et al. "The acoustic and perceptual bases of judgments of women and men's sexual orientation from read speech." *Journal of Phonetics* 34 (2006): 202-240; Munson, Benjamin. "Variation, implied pathology, social meaning, and the 'gay lisp': A response to Van Borsel et al. (2009)." *Journal of Communication Disorders* 43 (2010): 1-5 35. See 28

---

Date of Submission : 27.02.2022
Date of Acceptance : 22.05.2022

**Jagannath University Journal of Arts**
**Volume 12, No 01, January-June 2022**

# The Status of English in Language Policy in Bangladesh: Problems and Recommendations

Suvash Chandra*

**Abstract**

English has a long history of contact and constant use in Bangladesh for its colonial legacy and global lingua franca status. But the status of English is reflected neither in the Constitution nor in national policies of Bangladesh. The objective of this research paper is to explore the status of English in national policies of Bangladesh since independence in the backdrop of the 21st century perspectives. The study is descriptive in nature and it is based on a content analysis of a range of policy documents of Bangladesh. Moreover this study will cover official, educational and general language policies with a focus on status planning from a sociolinguistic point of view; and critical interpretive analysis is applied to find out existing language problems and make recommendations regarding the status of English language in Bangladesh. The article is planned to address policy implications about the status of English in Bangladesh in the context of socio-historical, geo-political and sociolinguistic framework.

**Keywords:** Language Policy, Status of English in Bangladesh, Problems and Recommendations

## 1. Introduction

The Constitution of Bangladesh recognizes the status of Bangla as "the state language of the Republic" with the sense of Bengali ethnic homogeneity, the spirit of Language Movement and the flavour of Liberation War (Constitution of Bangladesh, Article 3). But the status of English language remains 'undefined' in the constitution of Bangladesh (Musa 239). As a result, English language policy in Bangladesh has witnessed the perpetuation of controversy exclusively dominated by colonial pasts, state policy, nationalistic feelings, national priorities, development initiatives and interaction of individuals' language usage. However, English has still continued to be in constant use parallel to Bangla in Bangladesh in spite of national policy directions favouring Bangla and there is renewed support for English in major formal domains of Bangladeshi life and culture: administration, education, law and the media, and obviously then in commerce (Banu and Sussex 122). This article based on content analysis and critical interpretive analysis of policy documents of Bangladesh endeavours to explore the status of English, find out existing problems and make recommendations regarding policy dynamics of English language in Bangladesh.

## 2. Language Policy and Bangladesh Perspective

The concept of language policy is relatively a new arena all over the world including Bangladesh and the concept 'language policy' comes after the term 'language-planning' in sociolinguistics. The seminal book *International Communication: A*

* M. Phil Fellow, Institute of Bangladesh Studies (IBS), Rajshahi University, Rajshahi, Bangladesh

*Symposium on the Language Problem* (1931) focused on language problems, language-situation, and constructed language; and American linguist Edward Sapir discussed the necessity of smooth international communication and the function of an international auxiliary language (Sapir 65-95). These thoughts and actions used in the fifties of the twentieth century can be considered an initiative to the concept of language policy. Individuals such as Uriel Weinreich, Einar Haugen, Joshua A. Fishman, Charles A. Ferguson, Bjorn H. Jernudd, Joan M. Rubin, J.V. Neustupny, Jyotirindra Das Gupta, Takdir S. Alisjahbana etc. were particularly important in setting new directions and professionalizing the study of language policy. The decade leading up to the turn of the millennium brought a resurgence of interest in the field of language policy fueled in large part by the imperious spread of English and other global languages and, reciprocally, the alarming loss and endangerment of indigenous and small language communities worldwide (Hornberger 24). The independence of former colonial states and the emerging language problem between indigenous and imperial languages eventually paved the concept of language policy after World War II.

'Language Policy' is used to mean the whole range of the operational dynamics involved in language choice as the combination of official decisions and prevailing public practices related to language education and use (Mc Groarty 1). It is, in effect, an explicit or implicit expression of a people's desires and aspirations shaped by the polity's socio-historical, political, cultural and economic contexts and realities. It is considered an ideological process by official bodies including a body of ideas, laws, regulations, rules and practices intended to achieve the planned language change in societies, groups or systems. Its geo-political and socio-economic goals are to solve the language problem of a country, to reform a language or to change the linguistic behaviour of a speech community. As Spolsky points out, language policy is to be seen as the broader framework comprising within its fold the three components of "Language practices or Ecology", "Language beliefs or Ideology" and ''Language management or Planning" (Spolsky 1-15). Language policy is, therefore, adopted as a result of language planning and then language planning is to be implemented after language policy is adopted as a law or convention of a language.

Language policy usually covers three types of principles for selection and implementation of a language or a variety of a language within a country or a speech community: Official Language Policy, Educational Language Policy and General Language Policy (Noss 25-32).

i. Official Language Policy: The government of a country decides which language or which variety of a language to be used as a state language or a national language or an official language within a country or a speech community.

ii. Educational Language Policy: The government of a country determines the medium of instruction in education and decides which language will be used as the first language, second language, foreign language, classical language, group language or ethnic language etc. within a speech community.

iii. General Language Policy: The government of a country decides which language or which variety of a language to be used for general communication in a country or within a speech community. General language policy determines how languages are to be used in public contexts in multilingual societies to solve communication problems.

Bangla originated from the ancient Indo-Aryan language about a thousand years ago and has become a standard language through a long tradition of adaptation, assimilation and acculturation. Bangla had to compete with Sanskrit, Pali, Persian, Urdu and English for its status and state recognition. Bangla enjoyed royal recognition during the reign of Shamsuddin Ilyas Shah in 1352. It got the constitutional recognition as one of the state languages in the 1956 constitution of Pakistan. Later the 1962 constitution of Pakistan recognized Bangla as one of the national languages in Pakistan, but English was retained as the interim official language for an initial period of twenty years for all sorts of official uses. So Bangla has never got the optimum status of state language in the distant past before the emergence of Bangladesh as an independent country. Sanskrit was once the official language and then Persian became the official language. The introduction of English in this subcontinent can be traced back to 31 December 1600, when Queen Elizabeth granted a charter to a group of merchants in London, giving them a monopoly of trade with India (Kachru 19). When the British imperialist power occupied the subcontinent in the eighteenth century, a diverse language situation prevailed throughout the subcontinent. But when Bengal fell under the British imperialist power, the English language added a new dimension resulting in a radical change in the language situation of Bengal. Bangla was never accepted as the state language of British-India; rather the British government declared English as the medium of instruction in 1835, the official language in 1838 and the language of employment in 1844. The foundation of English in the colony was not just the presence of a language; rather it was associated with colonial authority or 'hegemony'. The partition of Bengal worsened the language situation and Bangla fell prey to the hegemony of Hindi and Urdu in India and Pakistan respectively along with English. The consequences of the changed language situation during the British rule still exist.

The erroneous policy of 'One State, One Language' threatened the status of Bangla after the partition of 1947. Aligarh University Vice-Chancellor Ziauddin Ahmed expressed his opinion in favour of making Urdu the state language of Pakistan in imitation of the recommendation to make Hindi the state language of India in July 1947 (Umar 19). The Bengali intellectuals protested against the recommendation; and Muhammad Shahidullah published an article in the Daily Azad on the futility of the recommendation. He expressed the view that there was no reason to accept Urdu in lieu of Bangla as the state language of Pakistan. Then he published an article on "The Language Problem of Education in East Pakistan" in the fortnightly magazine Takbir in 1948, and discussed what the policy of East Pakistan regarding Bangla, Arabic, Urdu and English languages should be. Muhammad Shahidullah raised his voice in protest whenever Bangla language and Bengali culture were attacked and he expressed his reflection on language to uphold the dignity of Bangla language.

Similarly Muhammad Abdul Hai, one of the leading theorists in the early stages of establishing language policy in Bangladesh, had no hesitation in his mind about the status of Bangla language. The main mantra of his language planning was that Bangla should, without alternative, be the language of education, the language of offices and courts and the language of communication in East Pakistan. He attended an international conference on language policy and planning held in Hawaii, USA from April 8 to 10, 1969, in which he read an article entitled "The Development of Bengali since the Establishment of Pakistan." He praised the superiority of the Bangla language and called for the recognition of 'Bangla' and 'Urdu' as the state languages of Pakistan in the 1956 constitution of Pakistan and hoped Bengali language would be able to replace the English language in official work (Hai 179-182). However, he sincerely understood the importance of English as an academic language and so he arranged English courses for the students of Bangla department in University of Dhaka. Abdul Hai's reflection on language policy and planning in the context of Pakistan in the late sixties was useful, but the purpose and meaning of language policy and planning in Bangladesh has changed with the emergence of Bangladesh as a sovereign country (Moniruzzaman 1).

The first seminar on Bangla language in post-independent Bangladesh was held at Jahangirnagar University in February 1973 and the university published a compiled book entitled *Uccashikshay Ebang Byabaharik Jibane Bangla Bhashar Prayog* [Application of Bengali Language in Higher Education and Practical Life] edited by Mustafa Nur-Ul Islam in 1976. The key research articles were "Bengali in Practical Life and Higher Education"; "English Education and We" and "Higher Education and Bangla Language." The compiled book discusses the application of Bangla or English language in higher education, but there is no discussion about the status of English in the context of language policy and planning of Bangladesh. Then a seminar was organized by Bangladesh Asiatic Society entitled "Bangalir Bangla Bhasha Cinta" [Thoughts of Bengalis' on Bangla Language] on 29 and 30 April 1993 in Dhaka. The seminar reviews the history of Bangla language and tries to reveal Bengalis' notions of national and international identity on the basis of their reflection on language; but the English language context is avoided in the seminar.

The first international seminar on language policy and planning in post-independent Bangladesh was organized at the Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi on the occasion of its 40th anniversary on 21 and 22 November 2014. The seminar was entitled "Bangladesher Bhashaniti O Bhasha-Parikalpana" [Language Policy and Language Planning of Bangladesh]. The speakers in the seminar recommended an integrated language action plan to ensure the use of Bangla language at all levels and to increase the status of Bangla internationally. The speakers in the seminar also requested the government to formulate a language policy and to form a language-commission in view of the Constitution of Bangladesh with clear provisions for Bangla, English and languages of ethnic minorities.

**Table 1:** Status and Use of English in Bangladesh at Different Historical Periods

| Period | Status of English | Use | Users |
|---|---|---|---|
| British Period | As a foreign but royal, prestigious and dominant language | Administrative, educational and commercial works, job communication between rulers and their representatives | Rulers, their local representatives, official servants, educated people, businessmen, elites. |
| Pakistani Period | As a foreign but government, prestigious and dominant language | Official, administrative and business works, countrywide communication, international communication and academic | Rulers, government officers, educated people, professionals, businessmen and elites. |
| Bangladeshi Period | As a foreign and international but essential language of modem life | Partially official/government works, international business and communication higher education, research works, job in foreign companies | Services holders of higher or foreign offices, educated people and elites. |

## 3. Language Policy in Bangladesh and Status of English

Bangladesh is a language-based nation state and is often portrayed as a monolingual country from a sociolinguistic point of view. The spirit of Bangla language and Bengali nationalism worked behind the emergence of Bangladesh. Bangla was given official recognition as the state language as well as the national language in the nation's first constitution in 1972. Article 3 recognizes the status of Bangla with the declaration "The state language of the Republic is Bangla". The constitution also defines Bengali nationalism as "the unity and solidarity of the Bengali nation, which derives its identity from its language and culture, attained sovereign and independent Bangladesh through a united and determined struggle in the war of independence, shall be the basis of Bengali nationalism (Article 9)." The Constitution also makes the state responsible to adopt measures to foster and improve the national language for the enrichment of the national culture by stating: "The State shall adopt measures to conserve the cultural traditions and heritage of the people, and so to foster and improve the national language, ... to contribute towards and to participate in the enrichment of the national culture (Article 23)."

The Constitution of Bangladesh has provided due respect to Bangla by declaring: "There shall be an authentic text of this Constitution in Bengali, and an authentic text of an authorized translation in English, both of which shall be certified as such by the speaker of the Constituent Assembly [Article 153(2)]." Again the supremacy of the Bangla language has been firmly enforced in Article 153 (3) of the Constitution which states: "A text certified in accordance with clause(2) shall be conclusive evidence of the provisions of this Constitution ; provided that in the event of conflict between the Bengali and the English text", the Bengali text shall prevail [Article 153(3)]."

The Constitution in Bangla along with an authentic text of its authorized translation in English is an implicit recognition of the historical significance of English and an indirect acknowledgement of the status of English in Bangladesh. Again there was a self-contradiction in the Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 in the Constitution. The Second Proclamation Order No. IV of 1978 which was repealed later in the Fifteenth Amendment on 30 June 2011 stated: “In the event of any conflict, contradiction, discrepancy or inconsistency between the Bengali or English text of the Constitution ... the English text will prevail [Article 150(3A)].”

**Table 2:** Reference of Language in the Constitution of Bangladesh

| Chapter | Title | Article | Content |
|---|---|---|---|
| PART I | The Republic | Article 3 | The state language |
| PART II | Fundamental Principles of State Policy | Article 23 | ‘National Language’ under the sub-title of ‘National Culture’ |
| PART XI | Miscellaneous | Article 153 | The Bengali and the English text under the sub-title of ‘Commencement, Citation and Authenticity’ |
| Fourth Schedule | Transitional and Temporary Provisions | Article 150 (3A) Clause 9 | The Bengali and the English text in Clause 9 under the sub-title of 'Validation of Certain Decrees, etc.’. |

Source: (Ferdousi 26)

Apart from the constitutional recognition in 1972, a strict official order from the President Sheikh Mujibur Rahman for the introduction of Bangla language on 12 March 1975 stated:

Bangla is the state language of the People's Republic of Bangladesh ... Even after three years of independence, documents are being written in foreign English instead of mother tongue in most of the offices and courts ... and this disorder cannot be allowed to continue. As soon as this order is issued, documents and correspondence will be written in Bengali only in all government, autonomous bodies and semi-government offices. If there is anything else in this regard, legal action will be taken against the violators ... This order will be effective immediately (Sarker 17).

Then another government order for the introduction of Bangla language was issued on 2 October 1975. It stated:

Bengali is the state language. It has already been ordered that official documents and correspondence should be written in Bengali ... Again it is being directed that all government, autonomous bodies and semi-government offices should be written in Bengali. Copies in English or the corresponding language approved with Bengali shall be used in execution of agreements with any government or organization abroad. However, correspondence with any foreign government or organization can be done in English. This order will come into force immediately (Sarker 18).

A further order was issued by the Cabinet Division on 12 January 1979 to introduce Bangla language, citing the decision of the Cabinet meeting on 26 December 1979. The order, written in English, stated:

(a) The Bengali language is an integral part of our nationalism and was a key element in our struggle for independence. The failure to use and apply the language at all levels of national life is a sad commentary on our declared intentions and sincerity. All work and files concerning the cabinet and ministries may be conducted in Bengali from now onwards ...

(d) We must take lead and sincerely play our role to the best of our ability. Others will follow us. There is no need to fix a target date for the eventual switch-over to Bengali. The work may start now and instead of going for publicity, necessary executive orders may be issued (Sarker 19-20).

Bangla Bhasha Prachalan Ain, 1987 [Bangla Language Implementation Act, 1987] was enacted on March 6, 1987 to make the provisions of the Constitution fully effective and to make the use of Bangla language compulsory at all levels in Bangladesh. The Act was promulgated as part of the first major activity of the "Bangla Bhasha Bastobayon Kosh" (Bangla Language Implementation Cell) set up under the Ministry of Establishment. A Gazette Notification of 7 March 1987 issued by the government in regard to the Acts passed in the National Assembly as well as approved by the President clearly stated the following instruction under the section "Act No. 2 of 1987" that, from then on in all government, semi government and autonomous institutions all over Bangladesh, it was compulsory to use Bangla in interoffice memos, legal documents, correspondence as well as in arguments, question-answers in law courts--except in case of communication with foreign governments and organizations. Section 3 of the Act has made Bengali language compulsory in all government offices, courts and meetings except in the field of foreign communication. Violation of this law is considered as misconduct for government employees. But there is no precedent for punishing anyone for violating this law in Bangladesh so far. This Language Act 'officially' transformed Bangladesh into a monolingual country; but expected results still remain unfulfilled and ambiguity persists in language situation of Bangladesh.

In fact, the constitutional declaration of Bangla as the state language of Bangladesh and then the Language Act, 1987 came as a setback for the status of English. The language policies adopted in Bangladesh since independence are mainly characterized by an emphasis on Bangla and this 'Bangla at all levels' policy has, in turn, affected the status of English in Bangladesh. Moreover, uncertainty and ambiguity are reflected through government policy documents, repeated orders and directives and memoranda about the use of language in Bangladesh. The transitional language planning that had been required in case of such policy shift and switch-over from one medium to another was absent (Musa 239). Policy shift needed a generation of competent bilinguals who could act as agents of change; and language planning for language maintenance and language shift was necessary. As a result, English remains embedded in the state system; and the prestige and use of English in public domains are not overshadowed. As a result, English has an optional and non-

statutory status in Bangladesh and this language situation has created a "vacuum" in English Language proficiency and deprived the nation of numerous global opportunities.

**4. Education Policies of Bangladesh and English**

Language policy is closely related to education policy of a country and so the status of a language is determined by an appropriate education policy in a particular country. Although the English language received policy recognition for "historical reasons" in educational system of Bangladesh, inconsistency in education policies and Bangla-centric sentimentalities overshadowed the role of English within the new nation. The primary and secondary levels of education were affected by the policy of Bengalization. English was to be abolished till class five; English-medium schools were closed down and English was removed from all public service examinations in the full flush of liberation. But English was allowed to continue parallel to Bangla as the language both of instruction and examinations in the tertiary level of education.

The first Bangladesh Education Commission, Quadrat-e-Khuda Commission, 1974 laid out the language-in-education policy of Bangladesh. The Commission was imbued with strong feelings of Bengali nationalism to 'decolonise' the education system and incorporated the four pillars of the Constitution in its vision of an appropriate education policy (Zaman 203). Acknowledging the instrumental role of English, the Quadrat-e-Khuda Report did not recommend the elimination of English, rather recommended the relegation of English. Then the English Teaching Task Force commissioned by the Ministry of Education in 1976 first made explicit recommendations in favour of English and proposed English to be introduced either in Class 3 or Class 6. Then the National Curriculum Committee in 1976 made English a compulsory subject from Class 3. The Bangladesh National Education Commission Report, 1988 was also in favour of introducing English in Grade 3. The National Curriculum Committee, 1991 recommended introducing English in Class 3. Finally English was made a compulsory subject from Class 1 to the level of graduation in 1992 according to the recommendation of the National Curriculum and Syllabus Committee. The National Education Policy 2000 suggested introducing English as an extra subject in Classes 1 and 2, with strong recommendation for the introduction of English as a compulsory subject from Class 3. The National Education Commission 2003 emphasized on English learning from the primary level in favour of English. The National Education Commission 2003 also declared that one of the fundamental objectives of primary education was to acquaint students with the English language, and to achieve primary skills and use English as a useful foreign language.

The country's latest education policy, the National Education Policy 2010, prioritizes English education with a view to building a strong and progressive knowledge-based and information technology-oriented society. The policy recommended that appropriate steps needed to be adopted from the very beginning of primary education to be continued at higher levels to allow students acquire usable skills. The policy also recommended that any school could choose to introduce English as a medium of instruction at the secondary level in addition to English being a compulsory subject

across all formal education. The National Education Policy 2010 suggested English (along with Bengali) to be the mediums of instruction at the tertiary level as a compulsory subject in all colleges and universities. However, the government is yet to formulate an education law on the basis of the National Education Policy 2010 and at present English is studied as a compulsory second language subject from Class 1 to Class 12 in Bangladesh.

**Table 3:** English-in-Education Policy: A Chronological Summary

| **Education Policies and Education Commission Reports** | **The Status of English and English Education** |
| --- | --- |
| 1974 Bangladesh Education Commission | English given priority as foreign language, to be taught from Class 6 |
| 1976 English Teaching Taskforce Commission | English to be taught either in Class 3 or Class 6 |
| 1988 Bangladesh National Education Commission | Grade 3 suggested as recommended starting point for English education |
| 1991 National Curriculum Committee | English education introduced in Class 3 |
| | English introduced as compulsory subject in Class 1 (1992) |
| 2000 National Education Policy | Introduction of English as extra subject from Class 1 and 2 and as compulsory subject from Class 3 |
| 2003 National Education Commission | Reemphasis on English from the primary level |
| | One objective of primary education to acquaint learners to English language skills as a foreign language |
| 2010 National Education Policy | English recognized as essential tool to building knowledge-based society |
| | Emphasis on English writing and speaking from the very beginning of primary education |
| | English (along with Bengali) to be the mediums of instruction at the tertiary level |

Source: (Chowdhury and Kabir 10; Rahman and Pandian 895–896; Faquire 45)

## 5. Findings and Policy Implications

English in Bangladesh is located in an extremely complex web of history, geography, politics, political economy and individual and social psychology (Hamid and Erling 47). The 200 year history of British colonial rule and its politically inspired regressive language policy left the country without an appropriate policy direction. It is no longer the official language as it was in the British colonial era in Bangladesh. The end of the British Raj in 1947, the creation of Pakistan in 1947, the Language Movement of 1952, the emergence of Bangladesh in 1971 and the legislative actions adopted since 1971 provide the key background to the policy decisions and the current status of English in Bangladesh. In fact, the Language Movement of 1952, the Liberation War of 1971 and the politics surrounding the national language in Bangladesh laid the foundation for language policy decisions,

the implementation of English-in-Education and the status of the English language in Bangladesh.

English has passed through phases of significant ambivalence during its long journey to its current state of prominence in Bangladesh. English, the official language of the British colonial era, had already been relegated to the status of a foreign language or a second language in Bangladesh. It is expected that English will no longer exist after the departure of the English, but English survives as an associate language (Siddiqui 25). The four institutional areas of post-independent Bangladeshi life and culture: administration, education, law and the media have gone through the dynamics of English language policy and practice. But the power of English has not diminished in Bangladeshi life and culture. The colonial past and the future of global English have perpetuated the continuity of English in the administration of Bangladesh in spite of the constitutional and legal obligation to use Bangla in the administration of Bangladesh. Education in Bangladesh has suffered the most from the dynamics in English language policy and practice. As a result, the overall quality of English education has deteriorated due to Bangla-based nationalistic language policy, but the global competitive price of English at the national level is high. Again Bangla is used in lower courts, but English is widely used in the High Court and Appellate Division due to the British legacy of Bangladeshi law. Finally the media in Bangladesh patronizes the Bangla language, but the number of English newspapers has increased in post-independent Bangladesh. So inconsistencies arise in the language situation of Bangladesh.

The language situation of Bangladesh has reached a tragic end for failure to bring about the desired development despite the great achievements of the language movement. The use of Bangla has not reached the optimum level and the standard of English has deteriorated. The primary and secondary education system in Bangladesh has suffered the most from the variability in English language policy and practice, and as a result, the overall quality of English has declined in Bangladesh. Bangladesh Public Administration Training Centre (BPTC) conducted a survey among the 200 government officials about the use of Bangla in government offices from 3 February 1992 to 8 February 1992; and the survey showed that 19% officials lacked proficiency in translation from Bangla to English or English to Bangla (Mowla 181). Language corruption, code-mixing, misspelling and mispronunciation are prevalent in the sociolinguistic landscape of English in Bangladesh. The headlines and stories in the leading newspapers in Bangladesh show the bleak picture of the present language situation in Bangladesh and prove how erosion in the field of education has reached its peak:

**Table 4:** Bleak Picture of the Present Language Situation in Bangladesh

| Headline | Story | Source |
|---|---|---|
| **20 percent BCS (Bangladesh Civil Service) examinees get "zero" in English** | A total of 3,295 or 20.11 percent of candidates appearing at the 18th BCS examination got 'zero' marks in English, the Public Service Commission said in its report for 1998. Five of them [Out of these candidates] have been qualified for BCS jobs, three in the education cadre and one each in health and agriculture cadres. The three in the education cadre are likely to teach English in government colleges. *NB.* Marks less than 25 out of 100 are considered 'zero' by the BCS standard. | *The Daily Star*, 07 June, 1999 |
| **Poor show in DU admission tests** | While pass rates in the SSC and HSC examinations are on the rise, admission tests at Dhaka University this year saw around 83 percent aspirants fail to obtain even pass marks. DU sources said most of the admission seekers failed in Bangla and English. Only two out of 1,364 students qualified to be enrolled at the DU English department. | *The Daily Star*, 30 September, 2014 |
| **90% students fail DU admission tests** | Around 90% of the applicants who took the admission tests for the science, arts and commerce faculties at Dhaka University, have failed. The university said that many of the students could not succeed because of their weakness in the English Language. | *The Independent* 26 October, 2016 |
| **83.11pc fail in DU Kha unit entrance exam** | Results of Dhaka University's 'Kha unit' entrance examination came out on Tuesday with a pass rate of 16.89 per cent as most of the admission seekers failed in English and Bangla. | *The New Age* 02 November, 2021 |

Bengal was originally the epic entre of the British Empire in the subcontinent, and therefore Bangla had to become a complementary vehicle for the expansion of the British Empire. So "the historical process of imperial expansion" has disturbed the uniqueness of language development method in Bengal; and "the social process of communication with the imperial power" has eventually controlled language formation method in Bengal (Roy 6-7). The historical process of imperialism created a sense of inferiority and colonial hangover in the collective mentality of the Bengalis, and therefore Bangla has not yet become fully 'highly regarded' to Bengalis. As a result, a profound process of purifying the 'underdeveloped' Bengali language by imitating Sanskrit and English continues and after becoming 'elegant', Bengali cannot displace English in 'higher' places like higher education, offices and

courts (Azam 12). Robert Philipson and Edward Said consider the English language a tool of imperialism and cultural hegemony. Philipson discusses the historical reasons for the spread of English and explores how English has become so influential in the Third World countries in his book *Linguistic Imperialism*. He said, "English has been successfully promoted, and has been eagerly adopted in the global linguistic marketplace" (Philipson 7). Similarly Edward Said believes that imperialism has perpetuated indirect colonialism and imperialism through culture and language after the end of the imperial era. Said thinks that the ideas of imperialism and cultural hegemony spread from Europe to non-European countries through English language and literature, especially English novels (Said XII).

The English went away, but English remains and we are to bear the colonial legacy of English. Today English is the language of power in "our apparently decolonized world" which continues to use it as a valuable commodity (Alam XV). It cannot be denied that English in Bangladesh, as elsewhere in Asia, has been influenced by discourses of English and mobility and development in the context of globalization and the perceived value of English in nations' global competitiveness (Pennycook 103). English is no threat for Bangla in the 21st century perspective contrary to the linguistic imperialism viewpoint; rather Bangla can be enriched assimilating English. So recognizing the complexity of the situation, the Government of Bangladesh is expected to take steps to address the problem by realizing the global competitive price of English at the national level in Bangladesh.

Language policy is considered a constitutional obligation of a modern state. The language right of an individual as an integral part of human rights is recognized in 1996 Universal Declaration of Linguistic Rights; although there is so far no general agreement on such linguistic rights comparable to the principles of human rights codified by the United Nations (Richards and Schmidt 343). So a country needs to formulate a pragmatic language policy considering the sociolinguistic background of the country. An overview of English language policy and planning in Sri Lanka shows the country brought a noteworthy policy change in post-independent era in relation to English with the recognition of English as a link language by the 13th amendment to the 1978 constitution in 1987 (Walisundara and Hettiarachchi 301). Again Indonesia formulated a language policy to unite ethnics from a variety of vernacular background consisting of regulations on national, local, and international language; and Malay was chosen as the national language and was given the name Bahasa Indonesia (Alisjahbana31-51).But Indonesia is not considered successful enough in preserving languages of ethnic minorities and promoting English as a crucial international language. The United States has never declared a national official language, but the primacy of English in public affairs has been well-established since the time of the earliest colonies (Crawford 1-5). But to legislate matters of languages, the US states have official languages other than English, according to their constitution. So Bangladesh needs to consider English a language of political, economic, and social power; and utilize its preeminence as a language of technology.

## 6. Conclusion

Bangladesh celebrated its golden jubilee in 2021, but no government of Bangladesh has yet been able to formulate a specific language policy. Bangla is the state language as well as the national and the medium of communication in Bangladesh. But Bangla is not the only language in Bangladesh; rather the sociolinguistic landscape of Bangladesh also encompasses ethnic minority languages, Urdu, Arabic, Pali, Sanskrit, Persian and English. English is widely used in diplomatic relations, foreign trade and higher education for its colonial legacy and global lingua franca status. The basis of the language policy of Bangladesh is the third article of the constitution of Bangladesh that declares "the state language of the republic is Bangla" (Constitution of Bangladesh, Article 3). The main work has been done by mentioning Bangla as the state language in the constitution. But Bangla has failed to become universal even though fifty years have passed since independence and the ambiguity about the status of English has created language problem in Bangladesh. Bangladesh has evolved through a complex linguistic background with a somewhat chaotic linguistic situation which necessitates realistic measures. Therefore a language policy should be formulated and a language commission should be formed on the basis of the Constitution of Bangladesh emphasizing multilingualism and linguistic diversity. So Bangladesh should formulate policies in view of priorities and necessities of its speech communities; as the linguistic scenario in Bangladesh has become more and more multifaceted with the recent popularity and currency of English as a global language and its instrumental value in the local and international job market. The development of communicative competence in English is considered critical for the country's access to the globalized market and for a competitive edge in the neoliberal economy in the 21st century.

## Works Cited

01. Alisjahbana, S. Takdir. *Language Planning for Modernization: the Case of Indonesian and Malaysian.* Paris: Mouton, 1976.

02. Alam, Fakrul. *Reading Literature in English and English Studies in Bangladesh: Postcolonial Perspectives.* Dhaka: Writers. Ink, 2021.

03. Ansari, Md. Sakhawat. "Bhashaniti O Bhasha-Parikalpana: Prasanga Daptarik Bhasha" [Language Policy and Language Planning: About Official Language]. *Bangladesher Bhashaniti O Bhasha-Parikalpana* [Language Policy and Language Planning of Bangladesh]. Edited by Swarochish Sarker. Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies, 2015, pp. 55-85.

04. Azam, Mohammad. *Bangla Bhashar Uponibeshayon O Rabindranath* [Colonization of Bengali Language and Rabindranath]. Dhaka: Adarsha, 2014.

05. Banu, Rahela, and Roland D Sussex. "English in Bangladesh after Independence: Dynamics of Policy and Practice." *Who's Centric Now? The Present State of Post-Colonial Englishes*. Edited by B. Moore. Victoria: Oxford University Press, 2001, pp. 122-147.

06. Chowdhury, Raqiband A. H. Kabir. "Language Wars: English Education Policy and Practice in Bangladesh." *Multilingual Education*, vol. 4, no. 21, 2014, pp. 1-16.

07. Crawford, J. *Hold Your Tongue: The Politics of Language*. New York: Addison Wesley, 1992.

08. Faquire, Razaul Karim. "Consolidating English as a Medium of Instruction in the Education Syatem of Bangladesh." *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities.)*, vol. 66, no. 1, 2021, pp. 43-59.

09. Ferdousi, Nahid. *Adalate Bangla Bhasha* [Bangla Language in Courts]. Dhaka: Academic Press and Publishers Library, 2021.

10. Government of Bangladesh. *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh*. Dhaka: Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, 2016.

11. *National Education Policy-2010*. Dhaka: Ministry of Education, 2010.

12. *Bangladesh Education Commission Report 1974*. Dhaka: Ministry of Education, 1974.

13. Hai, Muhammad Abdul. "The Development of Bengali since the Establishment of Pakistan." *Can Language be Planned? Sociolinguistic Theory and Practice for Developing Nations*. Edited by Joan Rubin and Bjorn H. Jernudd. Hawaii: University Press of Hawaii, 1971, pp. 179-182.

14. Hamid, M. Obaidul and Elizabeth J Erling. "English-in-Education Policy and Planning in Bangladesh: A Critical Examination." *English Language Education Policy in Asia*. Edited by Robert Kirkpatrick. Switzerland: Springer, 2016, pp. 25-48.

15. Hornberger, Nancy H. "Frameworks and Models in Language Policy and Planning Research." *An Introduction to Language Policy: Theory and Method*. Edited by Thomas Ricento. London: Blackwell, 2006, pp. 24-41.

16. Islam, Z., and R. Jahan. "Factors in English Language Teaching in Bangladesh: A Sociolinguistic Appraisal." Paper presented at EL TIP Conference in British Council, Dhaka, 1999.

17. Kachru, Braj B. *The Indianization of English*. New Delhi: Oxford University Press, 1983.

18. McGroarty, M. "Language Policy in the USA." *Language Policy*. Edited by W. Eggington and H. Wren. Amsterdam: Benjamins, 1997, pp. 1-29.

19. Moniruzzaman, Mohammad. "Language Planning in Bangladesh." *Language Planning Newsletter*, vol. 5, no. 3, August 1979, pp. 1-4.

20. Monzur-I-Mowla. "Prosashane Byaboharik Bangla" [Functional Bangla in Administration]. *Bangla Academy Ekusher Prabandha 1992* [Bangla Academy Commemorative Volume of Essays 1992]. Dhaka: Bangla Academy, 1992, pp. 177-196.

21. Musa, Monsur. *Bangladesher Rattrabhasha* [State Language of Bangladesh]. Dhaka: Bangla Academy, 1995.

22. Noss, Richard B. "Politics and Language Policy in Southeast Asia." *Language Sciences*, vol. 16, Aug 1971, pp. 25-32.

23. Pennycook, Alastair. "The Social Politics and Cultural Politics of Language Classrooms." *The Sociopolitics of English Language Teaching.* Edited by J. K. Hall and W. G. Eggington. Buffalo: Multilingual Matters Ltd, 2000, pp. 89–103.

24. Phillipson, Robert. *Linguistic Imperialism.* Oxford: Oxford University Press, 1992.

25. Rahman, Mosiur Mohammad and Ambigapathy Pandian. "A Critical Investigation of English Language Teaching in Bangladesh: Unfulfilled Expectations after Two Decades of Communicative Language Teaching." *English Today*, vol. 34, no. 3, 2018, pp. 43–49.

26. Richards, Jack C., and Richard Schmidt. *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics.* Fourth edition. London: Longman, 2010.

27. Roy, Debesh. *Uponibesher Samaj O Bangla Sangbadik Gadya* [Colonial Society and Bengali Journalistic Prose]. Kolkata: Papyrus, 1990.

28. Said, Edward W. *Culture and Imperialism.* London: Vintage, 1994.

29. Sapir, Edward. ''The Function of an International Auxiliary Language.'' *International Communication: A Symposium on the Language Problem.* Edited byHerbert N. Shent on, Edward Sapir and Otto Jespersen. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1931, pp. 65-94.

30. Sarker, Swarochish. *Sarbastare Bangla Bhasha: Akanksha O Bastabata* [Bangla Language in Everywhere: Aspiration and Reality]. Dhaka: Kathaprash, 2015.

31. Spolsky, Bernard. *Language Policy.* Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

32. Umar, Badruddin. *Purbo Banglar Bhasha Andalan O Tatkalin Rajniti* [Language Movement of East Bengal and the Contemporary Politics]. Volume I. Dhaka: JatiyoGranthaPrakasan, 1985.

33. Zaman, Niaz. "National Language Policy." *Bangladesh in the New Millennium*. Edited by AbulKalam. Dhaka: University Press Limited, 2004, pp. 203-213.

34. Walisundara, Dilini Chamali and Shyamani Hettiarachchi "English Language Policy and Planning in Sri Lanka: A Critical Overview." *English Language Education Policy in Asia*. Edited by Robert Kirkpatrick. Switzerland: Springer, 2016, pp. 301-332.



Date of Submission : 16.02.2022
Date of Acceptance : 22.05.2022

**Jagannath University Journal of Arts**
**Volume 12, No 01, January-June 2022**

# Examining the Racial-Colonial Entanglements of Bakha: Some Investigations into Mulk Raj Anand's *Untouchable*

Sukanta Biswas*

**Abstract**

Bakha, the protagonist of Mulk Raj Anand's debut novel *Untouchable* (1935), can be studied as a complex colonialised character. The colonised persona in Bakha marks some representative features of the global colonised. This aspect of locating Bakha as a racial and colonial subaltern involves some postcolonial lenses into his unsettled identity in a racist-colonialist society. This paper hinges on how postcolonial criticism of the novel can invest some psychological investigations into the clandestine caste-based and colonial regimens of subjugation and their all-pervading impacts on the physical and psychic world of the colonised Bakha. Through a postcolonial reading of the novel, this paper ascertains the ambivalence coupled with a colonial mentality that haunts Bakha and precipitates his helpless imitation of and hegemonic reliance on the British sahibs. These representative officials of the British Raj were deemed to be an idealised insulation from the racial environment of Brahmins who were the allies of the British Raj in India. Bakha's predicaments are traceably colonial in nature and strongly affected by his Dalit identity. This paper infers that Bakha's colonial mentality is provoked by the humane gestures of the British sahibs he serves, who represent the hideous 'civilising mission' of the British Raj, utilise the sufferings of the lower-caste Dalit like Bakha and the system perpetrating race-based oppression and, in the process, normalise colonial rule as a benign and emancipatory rule. The pitfall of the subaltern like Bakha lies in the inability in discerning the hegemonic politics of colonialism that thrives upon the helpless and oppressed state of the native.

**Keywords:** Mulk Raj Anand, colonised psyche, ambivalence, colonial politics, racism and untouchability

## Introduction

Mulk Raj Anand (1905-2004) wrote a number of acclaimed novels that portray the complexities of poverty and coloniality in Indian society. In *Untouchable* (1935), he endeavoured to depict the "insidiousness of untouchability" (Yadav 13) through the binary, inhuman and exploitative relationship between the upper castes and the outcastes in India. Set in the colonial India in the fictional town of Bulasha, the novel unveils Bakha's experiences in the racially segregated and colonised society which are run simultaneously by the British Raj and local upper-class Brahmins.The locale of Bakha is the preserve of an age old caste-based racism and the colonial-imperial ruling system. The caste system in India was precolonial in practice given that the upper class Brahmins had the access to the English language and the reigning control on the native land and its lower caste people. This control led to the cultural and economic disparity,

* Assistant Professor, Department of English, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University, Gopalgonj, Bangladesh

widely known as racism, segregated or split into four major rigid hierarchical categories on the basis of their 'karma' (work) and 'dharma' (the duty). For hundreds of years this caste has dominated in every sphere of the Hindu religious, social and cultural phenomena through the complex stratifications. Bakha does not belong to any of the four socially accepted castes i.e., Brahmins, Kshatriyas, Vaishayas and Shudras. He represents the outcastes, untouchable community who are also known as the 'Harijan' in Gandhi an phrasing and as 'Dalit' in the present day.

The strict social compartmentalization in the twentieth-century colonial Hindu society became an institutionalized caste rule that severed the half quarter of people from basic human rights and privileges through a forced religious construct of hierarchy and thus deprived them in every way of socio-economico-cultural existence. The forced and naturalized practice of racial discriminations was validated in the name of religion and tradition and caused a devastating impact , as *Untouchable* projects, on the people who had been conferred the identity of lower castes. As mentioned earlier, the untouchables were "considered lowest in the social hierarchy and they needed to watch an alternative set of accepted rules" (Yadav 13). The upper caste could enjoy the economic and social power and thus easily manipulated the people of lower caste. Anand portrayed how this racial inheritance ultimately resulted in the multitude of physical and psychological sufferings for the lower-caste Dalits. Bakha embodies these Dalit strata, the by default lower caste and easy target of colonial rule, of the twentieth-century India. In addition, Bakha's miseries in the fictionalised Bulasha attest that "caste alone did not marginalize and defect the identity formation … but colonialism too played a huge part" (Sunmugam et al. 206). The British rulers had to invest a lot of attention to westernize the caste system prevailing in India to have a command and control over the people. They "established the system legally and bureaucratically" (206) ruling over India for more than a century on the strong base of empire and they asserted their leadership and superiority in every sphere. In a changed sociopolitical structure, the colonizers revealed their domineering role through an act of continued representation of the cultural and civilizational supremacy of the British Raj and and a trickery of manipulation of the social and racial tension and oppression that were extant in India. In their claims to remove racial discrimination, they injected the colonial values, some promising values of humanity and emancipation as opposed to native racial oppression, and thus generated a wide populace of believers of colonialism who started uncritically and unquestionably accepting colonial promises as the new language of their freedom and rights.

This very binary perception and practice of representing the British Raj as the cultural-civilizational superior and the Dalits as the objects worthy of being civilised by the constructed colonial refinements is a further form of racism that created an intricate and multi-layered form of subjugation for Bakha and the broader world of the subalterns represented by Bakha. The novel portrays the harrowing experiences of a single day in Bakaha's life where the upper caste people of his surrounding treat him as a sub-human being. Even at his home he is tortured and humiliated by his father. The paper investigates how Bakha undergoes the pangs of exploitation and oppression at the hands of the upper class of his locale. To escape from his miserable

suffering and traumatic experiences in the backdrop of a brutal race system, he resorts to assume a different identity, the identity of the white men.

Though there have been a set of critical studies on Anand's *Untouchable* in varied angles, there is still a vacuum in locating Bakha within a broader postcolonial perspective, especially through investigating the colonized psyche in Bakha. In the article "Identity Dilemma in Mulk Raj Anand's *Untouchable* and Kiran Desai's *The Inheritance of Loss*: A strategic Essentialist Reading" (2015) Sunmugam et al. explore the dilemma of identity as well as conflicting mental state of Bakha as a consequence of "dominance of the caste and colonial systems". The article focuses on the idea that behind the convoluted identity of an individual, colonialism together with caste plays a really significant role.

Nisar Ahmed Dar, in his study (83-87), investigates into the appalling condition of the subalterns, as it is ingrained in the politics of segregation based on caste, class and gender portrayed by Anand's quintessential picture of the racialised Indian society. Dar focuses on the "hierarchical structure" of that society where the "lower class people" are turned easy victims by the "upper class people's supremacy" as they do not have any "economic and political power to fight back". Furthermore, the essay probes into the ways how constructs of untouchability practiced by the upper castes dehumanise the subalterns by stereotyping them as the "thirsty, dirty and filthy" creatures. In another critical study on *Untouchable*, Himanshu Parmar (94-107) claims that "Bakha, through hegemony, is suppressed and through him the masses." This idea, expounded by theoretical interpretations, further delineates the role of power as the "most dominating factor that has governed and determined the fates of nations and civilizations." Besides, it is explored that the "dialectic of power" plays a big role in all aspects of the novel. Bakha holds a desire to change the class, not the caste as if he is "pacified through willed submission." This article, however, aims to pivot around the ways how the oppressive force of Indian caste system and hegemonic force of British colonial rule in India cause a myriad of social sufferings and psychological anguish, leading Bakha to an unsettling anxiety over his identity.

## Bakha: a victim of physical and psychic ills of casteism and racism

The life of Bakha along with his family in the "the outcastes' colony" basically made of "mud-walled houses", implies the downtrodden status of the community surviving "under the shadow of both of the town and the cantonment"(*Untouchable* 1). Bakha being a member of the scavenger community lives there along with other lower caste groups, e.g., the leatherworkers, the washermen, the barbers, the water-carriers, the grass-cutters, etc. Above all, the vicinity where they have to live is indescribably unhygienic and "uncongenial" due to its "dirt and filth", heaps of dungs of the cattle and "the ugliness, the squalor and the misery"(*Untouchable* 1) amid which they have to subsist.

The episodes of collecting the drinking and bathing water from the common sources and Bakha's buying the groceries delineate the inhuman and discriminatory attitude of the upper caste people to the lower caste members. To draw the attention of the upper lords to mercy upon them pouring some water in their pitchers, the women in

waiting row helplessly plead – "Oh, Maharaj! Maharaj! Won't you draw us some water, please? We beg you"(*Untouchable* 18). Likewise, while purchasing cigarettes from the shop an awkward situation arises as the shopkeeper flings the "packet of 'Red-Lamp' cigarettes at Bakha, as a butcher might throw a bone to an insistent dog"(*Untouchable* 34). At every step and everywhere they have to confront with enormous amount of negligence and humiliation. The richer caste of the Hindus donate their leftover foods to the poor people like Bakha. They are also made to beg for this spoilt food. Even amid all the friendly attitude of Habildar Charat Sing to Bakha, his "grin symbolizes six thousand years of racial and class superiority."(*Untouchable* 42). Bakha and his community have no access in the temple to worship as a result of the dogmatic belief of the worshippers that "a low-caste man coming within sixty-nine yards of" a temple can pollute it as maintained by "Holy Books" (*Untouchable* 53). But ironically, Sohini, the sister of Bakha, gets molested by a Brahmin priest in this very temple.

Here we observe the belief in untouchability maintained by the powerful class of society who hold a notion of fabricated sacredness that is pervasively prevalent in the text where not only the temple, their body, house, source of water but also all belongings are in the dire threat of being polluted. With this high sense of sensitivity an artificial and deliberate design has been upheld to continue the exploitation and oppression from the privileged upper class. On the one hand they tend to be superior but in reality their hollowness, hypocrisy and duality astound us.

Isabel Wilkerson in her book *Caste : The Origins of Our Discontents (2020)* brings out three dominant "caste hierarchies in world history—those of India, America, and Nazi Germany—and unearths how the "shared principles" of each of these caste systems has "burrowed deep within the culture and sub consciousness" of their respective societies. Khilnani discusses some of the "pillars" upon which caste is grounded including "inherited rank, taboos related to notions of purity and pollution, the enforcement of hierarchies through terror and violence, and divine sanction of superiority (Khilnani, n.p. para.7). In Bakha's society, we encounter the ubiquitous presence of each of the pillars or indoctrination of caste system. Bakha feels othered from his surrounding places and people who have been some living deterrents for him, his family and fellow lower-caste community. The normative untouchablity of his society does not only physically hurt and hate a big stratum of Hindus, but culturally and psychologically isolate them from the very fabric of societal life. This leads him to an existential alienation and total incredulity to Indian values of humanity. Out of his physical and emotional estrangement from his indigenous land, he grows self-effaced and in turn becomes parasitic on the illusory values of humanity and perfection, as revealed by the British sahibs.

The "caste", in its systematic order, as embodied in *Untouchable*, "through the centuries" has continued to be more and more diabolically "insidious" to the lives which do not belong to the Hindu-supremacist strata. It has dehumanized, brutalized and destroyed the lower castes Hindus, who are called Dalits in the modern India, "under the terror of people who had absolute power over their bodies and their very breath" (Khilnani, n.p. para.16). Sunil Khilnani, the author of *Incarnations: A*

*History of India in 50 Lives* (2016) and *The Idea of India*(1997), extends Wilkerson's observations on the ways how caste system in India or Germany or America has been devastatingly anti-human. He contends that the impacts of caste system in the Indian contexts have some uniquely indelible scars and havocs that could not be found in Germany or America. Khilnani pinpoints that caste has created newer separatist rule in India, resulting in its emergence as a perpetually ethno-national nation and thus rendering it all vulnerable to the British colonizers as the saviours of India. As Khilnani contends:

> Caste as a lived Indian reality, though, is crueler than any study of scriptural texts would indicate; it's also more fluid. Each varna comprises innumerable sub-castes, or jatis, and, over generations, some jatis have climbed up the ranks as others have slipped down. New occupational groups have been incorporated into the system as others have vanished. In the nineteenth century, the hierarchy, vicious enough by its own design, was entrenched by taxonomies imposed by the British Raj—categories used as instruments of colonial control (Khilnani, n.p.para 6).

**Local and global colonial-racial regulations and colonial mentality in Bakha**

It is evident that the appearance of the colonizer as "more wise, more just, more humane, and more anxious to improve [the colonized nation's] condition" (qtd. in Siddique 18) was part of a deliberate British policy. To strengthen their rule and to materialize a holistic domination over India they had the plan to ensure an economic and cultural domination along with the political dominance. Therefore, it was a far reaching scheme from their part to make the Indians detached from their own history, heritage and identity. After all, to cause a cultural bankruptcy, the colonial system injected an inferiority complex into the psychic world of Bakha and other Indians that resulted a mental slavery and willing subjugation to the "idealized image and ideology of British culture" (Siddique 21). Frantz Fanon in his essay "On National Culture" reflects:

> Colonialism is not satisfied merely with holding a people in its grip and emptying the native's brain of all form and content. By a kind of perverted logic, it turns to the past of the oppressed people, and distorts, disfigures, and destroys it (Fanon 169).

Whatever the practices and culture the Indians maintain is a matter of sharp observation and criticism to Bakha while he admires the customs of the "sahibs" as "fashun". He feels ashamed of his fellow countrymen, the Hindus as well as the Muslims' lifestyle, the habits and customs. He shows contempt for natives who are seen "squatting in the open, outside the city, every morning" as the white men call them "kala log zamin par hagewala" (*Untouchable* 11)(Black man, you who relieve yourself on the ground). Even, though some activities of the sahibs are "disgraceful" to him, he takes that as "'fashun'" and he is habituated to see every customs and habits of the Indians in the eye of the Englishmen. He gets "ashamed" and "amused" to observe the activities of the "natives" as the white men do react in that manner. Finally being demotivated and demoralized and "caught by the glamour of the 'white man's' life (*Untouchable* 2), he pursues the ambition to "live like an Englishman" (*Untouchable* 14). Arguably, Bakha and his friends' blind acceptance of the European culture and lifestyle implies their subjugation to a "cultural imperialism

that negates cultural and national identities by representing local culture as deviant and inherently uncivilized" (Siddique 21). Siddique further argues: "a European identity becomes an object of desire, an ideal of magnanimity and fulfillment which highlights their own sense of smallness, deficiency and otherness" (22).

Nevertheless, the strong notion of the superiority of the whiteness that serves to create an Indian otherness in Bakha, can be interpreted in the theoretical perspective of Fanon as he touches upon the complicated relationship between the European colonizer and the colonized in his *Black Skin White Masks* (1952). Fanon reflects "The black man among his own in the twentieth century does not know at what moment his inferiority comes through into being through the other" (Fanon 83).

However, it is noteworthy that the Barrack of the British armies and Bakha's life in the barrack can be a strong symbol of colonial temptation and fascination for colonial society. Bakha's taste, temperament and lifestyle are influenced and regulated by the customs and way of living of the army people of the Barrack. He looks upon them as the idols of his life and as an exit point to get relieved from the trauma that the society compels him to experience. Here we can befittingly put Aime Cesaire's observations as he imparts that due to colonization a sense of "fear" and "inferiority complex" work within the colonized person that lead him "to tremble, kneel, despair, and behave like flunkeys" (Cesaire 43). Likewise, Ngugiwa Thiong'o, puts his critical findings on the question of colonial domination. He talks of the aggression upon the language and culture of the colonized through "the destruction or the deliberate undervaluing of a people's culture, their art, dances, religions, history, geography, education, orature and literature, and the conscious elevation of the language of the colonizer" (waThing'o 16).Due to the oppressive framework of Bakha's society in the novel *Untouchable*, the colonial masters and national elites through the "bourgeoisie hegemonies" (42) ensure their self-interest where there is no work for a "cultural emancipation of the masses" (qtd. in Wade 42). As a result, a shadow of despair and dependence paralyses the psyche of the whole nation.

The attire in the novel, plays a pivotal role to create an identity, a status. Bakha and the youths representing the modern generation are almost obsessed with the European dress, though the older generation is mostly sticking to their traditional clothing. As Anand illustrates: "the consciousness of every child was full of a desire to wear Western dress, and since most of the boys about the place were the sons of babus…" (*Untouchable*92). Interestingly, life is only measured in terms of the European standard. Bakha comparing the clothing of the Indians with that of the English, feels embarrassed seeing the natives. The clothing itself in the novel is suggesting either modernity and progress or tradition and backwardness. The priest "half naked" with a "loin-cloth" (*Untouchable* 51) really throws him into an inferiority complex being an Indian. On the occasion of Ram Charan's sister's wedding, Bakha critically "noticed how white the starched linen, which the washermen wore, seemed against their black skins" (*Untouchable* 81).On the contrary, he considers the habiliments of sahibs to be superior in every respect. The sahibs were "trousered and hatted men" and to Bakha "all sahibs were sahibs" who gave away their cast-off clothes to their servants (*Untouchable* 115). "He had

followed the sahib because the sahib wore trousers. Trousers had been the dream of his life" (*Untouchable*118). In the socio-politico-cultural realities of that time Eurocentric attitude was pervasively dominating the psyche of the majority population all over India. Bakha and his contemporary youths represent that "child of modern India" (*Untouchable* 2) whose colonial temptation demoralizes them from holding interest in their own dress and artifacts of an Indian life.

Clothes here stand for social and cultural status of the people and naturally the differences of the clothing represent the people of two distinct backgrounds. The differences in the external looks and get-ups are instrumentally responsible to make a division as well as a socio-cultural categorization that lead towards a sartorial hegemony "generated by power supremacy – an immediate outcome of economic and cultural hegemony of one nation and culture upon another" (Hossain 1). Moreover, not only clothing, other things related to lifestyle, also influence the psychology of the youths like Bakha. Bakha's fascination for "Red-Lamp" cigarettes (*Untouchable* 34), his boundless joy thinking of playing hockey (*Untouchable* 33) is also noteworthy. While taking tea, he feels "the sharp, warm taste of the liquid sent forth a queer delight spreading into his flesh" (*Untouchable* 24). The style of his taking tea is different from his father and uncle's. His uncle has the notion that the sahibs cannot "enjoy the full flavor of the tea" as they do not blow on it. His father "blows on the tea to cool it" while to imitate the sahibs, Bakha's tongue gets burnt due to the small sips. Needless to say, Bakha learnt this from his stay at the British barracks from the Tommies. In the house, he gets elated to possess "the only article of furniture of European design" that helps to satiate the indomitable desire "in pursuance of his ambition to live like an Englishman" (*Untouchable*14). Bakha, an ardent tennis player, while getting ready with "neatly oiled hair, Khaki shorts and white tennis shoes", looks himself upon as "a model 'gentreman' " that he fantasises to be (*Untouchable* 26). Getting a hockey stick with "a beautiful broad-bladed stick, marked with English stamps" as a gift from Charat Sing overjoyed Bakha.

Seeing the sons of babus going to school Bakha suffers from a sense of agony as he is barred from attaining education. Being an untouchable he feels his dream shattered as "he was a sweeper's son and could never be a babu" (*Untouchable* 30). He heaves a deep sigh thinking of the little child that one day "he will be an extraordinary man when he grows up. A big babu perhaps. Or a sahib" (*Untouchable* 103). From the very tender age, since his stay at the British barracks with his uncle, Bakha had "wish to be a sahib" and he came to know that to be a sahib he had to go to school. But his desire to go to school nipped in the bud as he belonged to an outcaste community. The right to enjoy the facility of school education was preserved for the sons of the babus, not for a son of a sweeper. As a son of an untouchable he was a threat to contaminate by his touch the sons of the upper castes. Though he had a strong impulse to get education, the surrounding realities never supported him. Due to a severe sense of deprivation he held a deep grievance against the cruelty of the "old Hindus" and the elite of the society.

As a result of the ill practices of society and the imbalanced power structure, the outcastes were subdued in all respects. Moreover, they did not have any scope to

resist. Through this age old subjugation they turned to be mute and passive, their existence was thrown into the labyrinth of "confusion between freedom and maintenance with the status quo" of domination (Freire 47). They "internalized the image of the oppressor" that they are "fearful of their freedom" (47) and their lives indeed were heavy burden with insoluble crisis. The miserable deprivation from all the basic needs is marked by the graphic portrayal in the novel. Living amid "the taint of the dark, narrow, dingy little prison cells of their one-roomed homes", the reality was that "they were silent as if the act of liberation was too much for them to bear"(*Untouchable* 27).

Though they had no access in the temple to have their prayer, in this very 'holy' temple which was under extreme threat of being polluted by the untouchables, Sohini, the sister of Bakha was sexually assaulted by the hypocrite "Brahmin dog" (*Untouchable*54).Observing the incident almost before him, though "a smouldering rage in his soul" stirred, and Bakharealised "he could kill them all", he had no way but to control (*Untouchable*54) as his father reminds him "they are our masters (*Untouchable* 71). Indeed, they are masters, they can grab whatever they want. Temple here represents something over which the upper castes have declared their monopolistic access and therefore it is used as a tool to extend their privilege exhibiting the power and aristocracy. They are "Maharaj, Great One" to the untouchables who keep their masters' shoes 'on [their] head' (*Untouchable*73) whereas the upper lords "think [them] … mere dirt because [they] clean their dirt (*Untouchable*70). The caste Hindus with supreme power, exercise the unquestioned authority to call them "dirty dog', 'the swine', son of a 'beaches' (*Untouchable* 38).

Bakha lives in a society where the outcastes are "trampled underfoot" by the high caste Hindus who are "given the authority to degrade the lower caste" (Elgibreen 1113). We are astonished to observe "the hypocrisy and hollowness of the [society] for its belief in pollution by touch, and its justification of manipulation" (Elgibreen 1114). The novel showcases "religious hypocrisy and bigotry in Indian society" and the evil practices of "untouchability, feudalism and economic exploitation" (Sethi 479).The portrayal of "hegemonic structure" within which the "scheme of exploitations" prevails in terms of "class, caste and colonial subjugation" is also prevalent (Sethi 479).

Interestingly, Bakha has to face manifold oppressive agencies at his home and all around in society. His father scolds him and uses as much violent language as the upper caste Hindus do. In the very morning his day starts with his father's furious shout 'Get up, ohe you Bakhya, you son of a pig,' that is thrown "as a bullet" (*Untouchable* 5) targeted at him. His father "nagged him, persistently, stubbornly, without waiting for breath" (*Untouchable* 109). Very often he exposes his brutal nature with the fierce words like "son of a pig! Illegally begotten!, son of a dog" that illustrate an abominable relationship between father and son. Bakha as an individual is always at odds with the society who has to perpetually endure the "cyclic pains and anguish" as "he is a nonexistence in the eyes of the society"(Alam 31). Moreover, he is alienated from his family as well as from the society since he does not get any psychological and moral support from them. Due to his lack of

belongingness and acute sense of dispossession and dislocation Bakha suffers from the "colonial aliénation". He is destined to live in the society "distancing… [himself] from the reality around", amid a crisis "like separating the mind from the body" or "on a larger social scale it is like producing a society of bodiless heads and headless bodies" (waThing'o 28).

In the imperial and colonial realities the people as colonized subjects have to come across a totalitarian impact upon them. However, colonialism utilises the evils ingrained in the racially-splitted social fabric of India. Bakha embodies these faceless and blindly dependent and subservient colonized objects that colonialism contrives to create and recreate. Therefore, he encounters the "economic, political, cultural and psychological consequences" (waThing'o 2). In a colonial state, human relation has to undergo an ordeal as Cesaire maintains there exists no "virtue", no "civilization", "philanthropy" or "human value" in colonialism (Cesaire 32-34). Moreover, colonialism tends to inculcate a notion in the psyche of the native people that before the arrival of the colonizers their history was merely a history "dominated by barbarism" (Fanon 171). Amie Cesaire arguably reflects that colonialism is responsible "to decivilise", "to brutalise" and "to degrade" the colonizer (Cesaire 35). waThiong'o terms this reality as an effect of "a cultural bomb" that destroys the history, identity and confidence of the colonizer.

**Locating Bakha's ambivalence and mimicry**

Bakha feels totally alienated from Indian society resulted from the complex psychological realities and disturbing human condition. In the colonial realities amid the impact of modernization and European influence it gets difficult to be free from conflicting psychological state. In "Remembering Fanon: Self, Psyche and the Colonial Condition" Bhabha delves deep into the psychic condition of a person colonized. He contends that the man being colonized, remains in a limbo state; he can neither identify himself unequivocally with the white man, nor can he go back to his past. As Bhabha reflects: "It is always in relation to the place of the other that colonial desire is articulated"(Bhabha 117). Therefore, "psychic uncertainty" and "ambivalent identification"(116) are considered to be the dominant feature of their identity. The colonized when dwelling in-between the past and present tends to be like the colonizer, his past haunts him creating a perennial contradiction within him.

In their study (203-222), Sunmugam et al. dissect the protagonist Bakha's connection to society and declares that the connection, to a great extent, is "represented by his caste, not by [his] individual self." Moreover, after analyzing the issues of marginality and discrimination, it is also considered that colonialism does play "a huge part in complicating [the] identity."

We observe in Bakha a 'mimic man'. However, at the outset of the novel "the British colonial regime is perceived by Bakha as unequivocally positive" and since "Bakha's sense of self-worth" (Thiara 665) is to some extent aroused by the contact of the "British soldiers", his mimicry is excused as a primary stage of his journey to a different world. In course of time, he tends to adopt "the colonizer's cultural habits, assumptions, institutions and values" (Ashcroft et al. 125) that ultimately result in the

"resemblance" of the Other, the colonizer and a "menace" as well. The consequence is a "'blurred copy' of the colonizer that can be quite threatening" (Ashcroft et al. 125). Bakha's blind imitating of the customs and habits of the sahibs triggers a kind of "mockery" that can be closely implying a "parody" of whatever that is mimicked (Ashcroft et al. 125). His mimicry as Homi Bhabha maintains, alienates him from his "own language of liberty" and baffles him with "double articulation" and "double vision" (Bhabha 381). After all, he is that colonial subject suggested and envisioned by Lord Macaulay in his Minute to Parliament, "a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, opinions, in morals, and in intellect"(Macaulay 430). However, Bakhaepitomises the classic colonized subject within whom hybridity does not evolve as we cannot discover any "active moment of challenge and resistance against [the] dominant colonial power" (Ashcroft et al. 110).

We can identify ourselves in Bakha as an alter ego in the postcolonial Indian subcontinent. Bakha's fascination for the Europeanness, his mimicry and ambivalence are still prevalent in us even after so many years of independence from the colonial rule. So, in our endeavour to dissect the colonized psyche of Bakha, we can discover the very identical crisis within ourselves.

## Conclusion

*Untouchable* creates an ample scope to explore the leitmotifs of colonization, the British colonial imperial period as well as the oppressive race-gender-caste-based regimens in India. The article intends to delve deep into the colonized psyche of the protagonist Bakha, a young man who loves to lead a life in the fantasy of daydreaming but eventually gets shell-shocked with the harsh realities surviving in the oppressive world of subalterns. Marginalized in all respects of socio-cultural stratifications, Bakha, without holding any cultural freedom helplessly gives in to externally imposed charactisations and limitations. Deprived of the basic rights as a human being, Bakha turns to be a vulnerable victim of the socio-politico-cultural evil domination pervading everywhere. He falls into the evil trap of the vicious binaries prevailing in the racist-colonialist scenario.

Moreover, in the colonized psyche of Bakha we observe a deep rooted fear and inhibitions derived from the lingering colonization and obviously the effect of a hegemonic cultural manipulation as Bakha is holding no confidence upon his culture and identity. Furthermore, being a victim of a cultural and racial othering against the upper castes, he seeks a relief embracing the cultural superiority of the colonized sahibs. Bakha is the testimony of the discursive othering of the outcastes and his identity is negated. Being subjugated and dominated he loses his identities and sense of selfhood as a socio-politico-cultural entity. It is vividly clear that colonialism injects a hyperreal sense of identity in Bakha that retards his meaningful resistance against Hindu caste-based racism. Again, his blind fervor for colonial model of gentleman makes him uncritical about the clandestine evils of colonialism and thus renders him ignorant of any counter-colonial and counter-racial resistance.

## Works Cited


1. Anand, Mulk Raj. *Untouchable*. India: Penguin Books, 2001.

2. Alam, Md. Mahbubul. “Society vs. Individual: Analyzing the Character of Bakha in Mulk Raj Anand’s Untouchable.” *International Journal on Art and Literature,* vol. 2, no.3, 2015, pp. 30-33, 17 July, 2020, https://www.researchgate.net/publication/350799829_Society_vs_Individual_Analyzing_the_Character_of_Bakha_in_Mulk_Raj_Ananda%27s_Untouchable.

3. Ashcroft, Bill, Griffiths Gareth and Tiffin, Helen. *Post-Colonial Studies:The Key Concepts,* 2nd ed., London: Routledge, 2007.

4. Bhabha, Homi. “Remembering Fanon: Self, Psyche and the Colonial Condition.” *Colonial Discourse and Post-colonial Theory A Reader.* Edited by Williams, Patrick and Chrisman, Laura. London: Pearson, 1994, pp. 112-23.

5. ---. “Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse.” *Modern Literary Theory.* Edited by Rice, Philip and Waugh, Patricia.London: Arnold, 2002, pp. 380-87.

6. Cesaire, Aime. *Discourse on Colonialism*.Translated by Joan Pinkham. New York: Monthly Review Press, 2000.

7. Dar, Nisar. 2018, “Mulk Raj Anand’s *Untouchable*: A Voice of Subaltern”, *Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science,* vol. 2, no.17, 2018, pp. 83-87, 16 July, 2020, https://www.researchgate.net/publication/324819593_MULK_RAJ_ANAND%27S_UNTOUCHABLE_A_VOICE_OF_SUBALTERN.

8. Elgibreen, A. Norah. “Dignity and suffering: Reading of human rights in *Untouchable* by Anand.” *International Journal of Law and Political Sciences,* vol. 4, no. 6, 2010, pp. 1112-14, 11 September, 2020, https://www.researchgate.net/publication/292895898_Dignity_and_suffering_Reading_of_human_rights_in_Untouchable_by_Anand.

9. Fanon, Frantz. *The Wretched of the Earth*. Translated by Constance Farrington. England: Penguin, 2001.

10. --- .*Black Skin White Mask.*Translated by Charles Lam Markmann. England: Pluto Press, 2008.

11. Hossain, Mohammad Shahadat. “Haq’s Ode on the Lungi: An Allegorical Quest for Sartorial Equality.” *Harvest,* vol. 28, 2013, pp. 1-19, 10 October, 2020,https://www.academia.edu/17036776/Haq_s_Ode_on_the_Lungi_An_Allegorical_Quest_for_Sartorial_Equality.

12. Freire, Paolo. *Pedagogy of the Oppressed*, New York: Continuum, 2000.

13. Khilnani, Sunil. “Isabel Wilkerson’s World-Historical Theory of Race and Caste.” *The New Yorker* 7 August 2020,https://www.newyorker.com/magazine/2020/08/17/isabel-wilkersons-world-historical-theory-of-race-and caste?fbclid=IwAR187cfoELc_wdTA7fYwGsPfjYu0bGkLji3-uZmjIb7cgt-IHImy6DTziHA.

14. Macaulay, Thomas. “Minute on Indian Education”. *The Postcolonial Studies Reader*. Edited by Bill Ashcroft, et al. London: Routeledge, 1995, pp. 428-430, 14 February, 2022, http://www.jakedavidson.com/PCI9.pdf.

15. Parmar, Himanshu. "Social Order and the Dynamics of Hegemony: A Study of Untouchable." *Language in India,* vol. 14, no.5, 2014, pp. 94-107, 11 September, 2020, https://www.google.com/search?client=firefoxbd&q=Parmar%2C+himanshu+2014%2C+%E2%80%9CSocial+Order+and+the+Dynamics+of+Hegemony%3A+A+Study+of+Untouchable%E2%80%9D%2C.

16. Siddique, Rumana. "Representation of Children and Childhood in Colonial India: A Study of the works of three Indian writers, Mulk Raj Anand, Nirad C. Choudhuri and R. K. Narayan." *Spectrum*, vol. 13, 2017, pp. 13-27, 11 October 2020, https://drive.google.com/file/d/1s-3l7aPvqKZzc1j0_0V_GOa7FlOdal5p/view.

17. Sengupta, Parna. *Pedagogy for Religion: Missionary Education and the Fashioning of Hindus and Muslims in Bengal*, USA: University of California Press, 2011.

18. Sethi, Khagendra Dr. "Sketching Mulk Raj Anand as a Postcolonial Writer." *International Journal of English Language, Literature and Translation Studies (IJELR),* vol.2, no. 4, 2015, pp. 478-482, 17 July 2020, http://www.ijelr.in/2.4.15/478482%20Dr.%20KHAGENDRA%20SETHI.pdf.

19.Sunmugam, Sashikala, Muhammad, Suzana Hj., and Liau Wei Lin, Agnes. "Identity Dilemma in Mulk Raj Anand's *Untouchable* and Kiran Desai's *The Inheritance of Loss*: A Strange Essentialist Reading." *Procedia-Social and Behavioral Sciences,* vol.208, 2015, pp. 203-222, 17 July 2020, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815055378.

20.Thiara, Nicole. "The colonial carnivalesque in Mulk Raj Anand's *Untouchable* and Amitav Ghosh's *Sea of Poppies.*"*Journal of Postcolonial Writing,* vol. 52, no. 6, 2016, pp. 659-671, 17 July 2020, https://core.ac.uk/reader/46664592.

21. Wade, Jean-Philippe. "'The Humanity of the Senses': Terry Eagleton's Political Journey to 'The Ideology of the Aesthetic.'" *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*, no. 77, 1991, pp. 39–57, 24 January, 2021, http://www.jstor.org/stable/41801923.

22. waThiong'o, Ngugi. *Decolonising the Mind:The Politics of Language in African Literature.* India: Worldview Publications, 2007.

23. Yadav, Mukesh Dr. "A Critical Study of Mulk Raj Anand's *Untouchable." International Research , Journal of Humanities, Language and Literature,* vol. 5, no. 9, 2018, pp.12-23.17 July 2020, https://1library.net/document/z310prdy-a-critical-study-of-mulk-raj-anand-untouchable.html.

Date of Submission : 16.02.2022
Date of Acceptance : 22.05.2022

**Jagannath University Journal of Arts**
**Volume 12, No 01, January-June 2022**

# Using YouTube Videos as an Influence on the Primary School Teachers Learning Process

Tanvir Ahsan*

**Abstract**

YouTube videos as teaching aid is becoming popular very fast throughout the globe and Bangladesh is no exception. Though not significantly while it is free but the use of such tools needed precaution and teachers needed to be trained to do the needful. The study was conducted with a small sample in one Upazila only. Yet the study explored some of the pertinent issues of primary education in Bangladesh and the influence of visual aid like YouTube videos is tremendous. More studies are required to discover the full potential of using YouTube videos for improving the skillset of the primary level teachers in Bangladesh.

**Keywords:** YouTube, Learning Method, Primary School Teacher

## Introduction

The use of multimedia in the classroom has become an important learning tool especially for early school learners of late. However, the challenge remains how to best use of this learning tool and encountering the expectations for its usage by students. The poplar learning theories including Blended Learning Theory and Information Processing Theory have been frequently advocating for successful technology integration in the classroom (Fleck et al, 2014). YouTube is one of the popular platforms that is being utilized for both earning and learning. Besides entertainment, many people prefer to obtain the necessary knowledge and information from YouTube videos.

For early learners, the four abilities of learning include listening, speaking, reading, and writing. Though viewing is not emphasized as highly in theories, the best approach to learn anything quickly and readily is through observation. Students of time are more digitally savvy and self-motivated than their predecessors in the pre-information age (McCormick, Holland & Szydlo, 2010). This is especially true for persons in their late teens and early twenties, who make up the majority of matriculating students (Greenwood, 2012). Students may access a broad range of contents on YouTube from amateur to professional (Fernandez et al. 2011; Mitra et at. 2010; Davis, 2013) demonstrate the young generation's strong adoption rate and consumption of digital media.

Though the usage of YouTube in academic settings is not new, its use as an educational tool has gained traction in terms of best practices and student outcomes. Conole (2015) discusses the significance of Massive Open Online Courses (MOOCs)

* Associate Professor (Sociology), School of Social Sciences, Humanities and Languages, Bangladesh Open University, Dhaka, Bangladesh

as disruptive tools and emphasizes the importance of innovation and new trends in order to improve users' learning experiences. However, according to Sharma et al. 2015 and Guo et al. 2014, there is a dearth of data about the use of YouTube videos and participatory culture to support students' teaching and ideas. In fact, it is understood that when we can visualize a subject practically, it is likely that the brain accepts and comprehends it rather easily. Thus, anyone may satisfy their hunger for knowledge by watching a YouTube videos, to quickly understand an issue of concern.

Given the above context, a study on the use of YouTube videos is of interest for the teaching communities and thus this present study was conducted to generate some specific knowledge in the wake of the growing interest on the use of YouTube videos and how it influences the learning process. It would be particularly interesting to know the influence of YouTube videos on the teacher learning spree as they are the very part of the young student's world of learning.

### 1.1 The objective of the study

The objective of the research is to explore how YouTube videos have been influencing learning environment of the early grade students as a learning tool being used by their teachers. However, the specific objectives are:

1. To explore how YouTube videos are influencing the learning outcome of the students.
2. To examine how YouTube videos, help in developing teaching and facilitating skills of the teachers.

## 2.0 **Literature Review**

In this section a wide area of available resources has been reviewed in connection with YouTube videos and learning for teachers and students along with related challenges and limitations. This review generates some important messages regarding this learning tool to better understand the global phenomena. The review also ascertained that the developed world with superior availability of technology and other infrastructure to enjoy YouTube videos more than their unfortunate counterparts in the developing countries of the world.

### 2.1 YouTube Videos

YouTube came into being in 2005 as a free platform for anyone to record and share videos. (Terantino, 2011; YouTube, 2013 as cited in Fleck et al., 2014, p. 22). Additionally, it is built on a video-sharing network that enables customized uploads by happy users. (Pinto et al., 2013). Generally, the channel enables users to track and regulate who watches their videos. In most cases, a YouTube video is created by professionals but there are lot of amateurs extending their hands as well. As YouTube is becoming so prevalent in the present day, Cheng et al. (2013) provide a historical overview of YouTube's founding and the extent to which it consumes bandwidth. Each minute, users submit over sixty hours of videos to the network (Wang et al., 2013). YouTube has a high acceptance rate and a user base compared

to available similar video services like Vimeo, Hulu, and a host of other online video streaming platforms. However, there is little information available on the general applications of YouTube videos (Thelwall et al., 2012).Fortunately, there are calls for innovative teaching and learning methods and an urge for accessing the digital world. For instance, the creator of the various education graphs emphasized the need for impact learning tools, concept reconstruction, and knowledge co-construction. While Cheng et al., (2013) classified these video channels as entertainers, other researchers mentioned these platforms depending on the very content and their potential for learning.

### 2.2 YouTube videos as innovative educational tools

According to Fleck et al. (2014), YouTube EDU**1** was launched in 2009 as an educational center for lectures, courses, and examples and is utilized by professionals and non-professionals alike in a variety of subjects. Gabarron et al. (2013) discuss the potential for YouTube videos to promote and educate about health. Similarly, Kay (2012) conducts an international evaluation of studies on video podcasts in order to provide the groundwork for an instructional approach to new media. Duncan et al.,(2013) discussed the relevance of video sharing sites and claimed that YouTube videos were beneficial for teaching and research in practical, medical, and clinical science. Guo et al.,(2014) provided empirical evidence that students prefer video resources to podcasts or pre-recorded classroom lectures in casual situations. Some other were concerned that academics and students' usage of new digital media for educational purposes remains restricted (Lenhart et al., 2010; Al-Aufi & Fulton, 2014). Additionally, Chapman (2015) expressed reservations regarding the use of YouTube videos for academic instruction due to the possibility of misleading information. Thelwall et al. (2012) conducted an interesting examination of large samples of text feedback on YouTube videos.

### 2.3 Concerns for visiting YouTube Channels

YouTube contents have become critical teaching resources in the contemporary time with technological innovations. However, this is not a trouble free in terms of learning for students as Clifton and Mann (2011) explained that uncontrolled information in such platforms could be inaccurate or prejudiced. Fernandes et al. (2011) and Stohlmann (2012) were found to be concerned with superfluous information that might lead to an erroneous conclusion. Therefore, researchers advised that individuals should search through the clutter and find important films in order to promote teaching and learning in the most effective manner feasible (Fernandaz et al., 2011; Marks 2013; Stohlmann, 2012).

### 2.4 Obstacles to educational technologies in developing countries

The opposition to instructional technology adoption is centered on the study conducted by Kremer et al. (2013). Several difficulties have been identified, including technology radiation, computer supply, and efficient use of information communication technology, which requires components, instructional tools, accountability, accessibility, and quality. For instance, Bhuasiri et al. (2012) discussed the issues surrounding new technologies in education in low income

countries including software, licensing, training, maintenance, hardware and software pricing, and instructional materials in progress. According to Liyanagunawardena et al. (2013), MOOCs in a low-income country context are constrained by slow internet connections and a lack of computer literacy. While technology is growing in demand for educational purposes, illiteracy, and internet use, individuals in underdeveloped countries lack access to necessary amenities.

### 2.5 Technology in education

The readiness of online materials, which include videos, presentations, games, and interactive software, among others, is discovered to support teachers in carrying out their teaching and learning activities (Keengwe et al., 2009). Access to computers and the internet is not yet a top priority for low-income areas (Atkinson et al., 2007; Kudryavtsev et al., 2007). The availability of mobile devices however has increased significantly, making it much easier to access YouTube videos. Since the 1950s, the use of film and video to supplement learning has been widely encouraged (Marchionini, 2003) and numerous studies have documented the use of YouTube for teaching and learning across a variety of fields, including nursing (Clifton & Mann, 2011; Agazio & Buckley, 2009; Skiba, 2007).

## 3.0 Study Methods

This was a mixed method study used both qualitative and quantitative data and information to explore the influence of the YouTube videos in the learning process. Three different data collection tools were used including –(i) a mini survey protocol, which covered 25 primary school teachers, (ii) a semi-structured questionnaire 5 teachers and (iii) an FGD guide through which 2 FGDs were conducted with 10 teachers per mixed group. This study was conducted with the assistance of the primary school teachers in Keranigonj, Dhaka. Data and information were collected during the month of February, 2020.

**Table 1:**Mini Survey respondents bySex and Age (quantitative)

| Sex | Age | Number | Percentage |
|---|---|---|---|
| Male | 21-35 | 5 | 20 |
| | 36-50 | 5 | 20 |
| Female | 21-35 | 8 | 32 |
| | 36-50 | 7 | 28 |
| **Total** | | **25** | **100** |

**Table 2:**Resondentprofile by sex and age (qualitative)

| Tools | Sex | Number |
|---|---|---|
| FGDs | Male | 15 |
| | Female | 5 |
| Semi-structured Interviews | Male | 3 |
| | Female | 2 |
| **Total** | | 25 |

### 3.4 Limitations of the study

This exploratory study was first of its kind in Bangladesh on the influence of YouTube videos in the learning process and how it shapes the students learning outcomes. This was done with very limited resources and time and thus could not conduct an in-depth study on the subject matter. Thus, there are some inherent limitations in the study as mentioned below:

- The study has taken the primary school teachers as respondents, who are one side of the coin in a learning environment. If the students could be included int eh study it would have been complete and comprehensive.
- The study was conducted in one Upazila only, and thus a general picture of the phenomena is very challenging to be drawn here.
- A quasi- experimental design could have produced better results for the subject matter.
- With more time and resources, the study would have been more productive to advance suggestions and recommendation for the cause of improving learning process at primary schools.

## 4.0 Study Findings

### 4.1 Quantitative Findings

As mentioned earlier, a mini survey was conducted to collected quantitative data and information for the study. A total of 25 respondents were reached through structures survey questionnaire. In the following section, the collected data and information are presented.

**Table 3:** Availability of watching YouTube facilities at school

| Response | Percentage |
|---|---|
| Yes | 92 |
| No | 8 |
| Don’t know | - |

When asked the respondents mentioned that the facility to show YouTube videos are available at their respective schools (92%), while the rest 8% had no such facility available to them. By such facilities they used to mean availability of desktop computer, laptops or smart phones.

**Table4:**YouTube videos benefitting students in the learning environment

| Response | Percentage |
|---|---|
| Yes | 92 |
| No | - |
| Don’t know | 8 |

The respondents were asked whether YouTube videos are helpful for students in a learning environment. Here also 92% of the respondents replied affirmative as they consider YouTube videos are helpful for students learning. The respondents who never experienced YouTube videos in a learning environment could not say anything about it.

**Table 5:** Respondents on improving their teaching skills through YouTube videos

| Response | Percentage |
|---|---|
| Yes | 80 |
| No | 12 |
| Don't know | 8 |

Respondents on the question on whether YouTube videos are improving their teaching skills in learning environment. YouTube videos with some rich contents and approaches have been helping the teachers to teach their respective students better they opined. Here some of the respondents are confused as they mentioned (12%) that they got to learn some new methods of teaching but not sure their overall skill level improved due to YouTube videos.

**Table 6:** YouTube videos enhanced their confidence as teachers

| Response | Percentage |
|---|---|
| Yes | 80 |
| No | 8 |
| Don't know | 12 |

The responders 80% got the belief that by showing YouTube videos to students in the classroom setting also enhanced their skills and thus made them more confident as teachers. As a common practice the teachers watch the video first before showing it to the students. With age and experience the teachers could grasp the messages from the content which help them in conducting their regular classes better than before. However, 8% of the respondent did not feel that they were more confident as teacher after using YouTube videos in classroom setting.

**Table 7:**YouTube videos are easily available learning tools

| Response | Percentage |
|---|---|
| Yes | 92 |
| No | - |
| Don't know | 8 |

On question of availability of YouTube videos, overwhelming majority of the respondents (88%) mentioned that those were easily available if one knew how to use internet. The rest of the respondents who do not know about the availability of the resources in the net, either did not have computers or smart phones at their control and not conversant with using internet.

### 4.2 Qualitative Findings

Qualitative data and information were collected through administering semi-structured interviews and focus group discussions. The findings are presented here thematically as follows:

#### a) Developing teaching skill watching YouTube videos

There was a general agreement that watching YouTube videos helped them to learn mew teaching skills and techniques which made managing the class easier. They also

observed better learning outcomes among the students, and the resultant effect was increased performance of the students.

- The respondents who used to taught Mathematics did find some interesting techniques that help the students learn times tablesand multiplication rather quickly.
- Taking English class had always been challenging especially when they had to use intonation and stress properly. They could overcome this challenge and got themselves get better prepared watching YouTube videos of late.
- The respondents could make Science classes more attractive by showing the experiments found in YouTube videos.
- The teacher's instructions and guidelines were also found to be very useful for the respondents as available in the YouTube videos. Following these instructions, they could make the textbook interesting to the students with little extra efforts. The result they observed was that the students were enjoying the classes and learning the lessons quickly.

**b) YouTube videos – source of learning tools and methods.**

To make the classroom an attractive and wonderful one the respondents took advantage of the availability of the You Tube videos.

- Physical education, drawing, and singing are the three classes mainly considered as co-curricular activities in schools. With the help of You Tube videos, the respondent could make these three classes more interesting and enjoyable to the students.
- Many of the teacher could not properly follow the instructions and guidelines made available to them from authorities. But with the help of YouTube videos they now understood them well and making classes vibrant and participatory.
- As YouTube is an open-source media. With stable internet connection and a minimum know how on using smartphones, one can quickly get their required resource from the available lots from YouTube, they mentioned.

**c) ICT training for teachers is important**

Training for building capacity is very important in any setting for professional development. For primary level teachers it is even more important as they are the architect of the building a prosperous nation. ICT training not only make the teachers ready for procuring and using international teaching resources available but also make them aware of selecting the appropriate one for the students

- For effective use of YouTube videos in classroom setting to make a better learning environment, teacher must receive ICT training. Unfortunately, all teachers did not get the opportunity to attend ICT training courses offered to them.

- The education authorities have been asking for introducing multimedia classrooms for primary level students. But a teacher with no training hardly can learn this from his/ her trained colleagues.
- Peer learning among the teachers did not work out as expected. Some of them lack the basic ICT skills, some others feel shy to get lessons from fellow colleagues. However, for the interested persons, YouTube videos helped one way or another to get the necessary lessons and made them prepared to use them in classrooms. This urge not only help them becoming a better teacher in the classroom setting but enhanced their skills or techniques as well.

**d) Getting prepared for classes is as important as conducting the class**

Preparation or warming up is very important for getting any work done better. Teachers also need to prepare them for the class they are going to conduct next. However, warming up in the class for setting the tone of the class is equally important for the primary level students.

- For generating interest among the students, a warm up session in the class is essential. Many of the respondents took advantage of YouTube videos to find tools for warming up students before starting the real lessons.

**e) YouTube videos are blessings for teaching community**

While teachers receive training at different institutions but rarely get teaching aid. YouTube videos is one way fulfill the unmet needs of the teachers especially at primary level. The respondents mentioned the following issues regarding YouTube videos as teaching aid:

- Sometimes it is embarrassing to ask for such information or teaching aid from colleagues from the same school or from other schools, but there they were comfortable in searching YouTube by themselves.
- There are ample videos especially for kids in the web but the YouTube videos are more organized, helpful. These videos have been helping willing teachers with new tools to make the regular classes and extracurricular activities more attractive, useful, participatory, lively and creating a learning environment that benefits the students most albeit the teachers.
- The quality of YouTube videos is much better in terms of making, content, instruments used and the atmosphere shown which are all generate interest among the students in general.

### 4.3 Advantages and disadvantages of YouTube videos

FGD respondents were asked to define the advantages and disadvantages of watching YouTube videos in learning environments. In two FGD sessions the following advantages and disadvantages were identified by the respondents of both groups.

**Table 7:** Advantages and Disadvantages of using YouTube videos

| Advantages | Disadvantages |
|---|---|
| Comfortable | Online advertisements are boring and learners get irritated |
| Attractive | It is time consuming to get the right videos for the learners |
| Enjoyable | Watching too much videos might make the students addicted to it |
| Watching videos made anywhere in the world | Some of the learners thinkwatching videos is just waste of time |
| Easy to use | |
| Free of Cost | |
| So many quality resources at one place | |
| Help student give something different and the classrooms attractive | |

### 4.4 Discussion Points

The study was conducted to explore the opportunities created for the teachers to learn new things including enhancing their teaching skills, engaging students more aptly in the classrooms and facilitating better learning outcomes among the students. The study findings suggest the following:

#### i) YouTube videos are instrumental education tool

With the advancement of information and communication technology throughout the globe, it affects the academic atmosphere as well. It's very likely that students as the young generation are the first groups to adapt these technological innovations in practice. However, teachers are not lagging behind nowadays as revealed in the study. It seems that the teaching community, the primary teacher in Bangladesh in particular, with some inherent structural limitations i.e. lack of training, lack of facilities, lack of teaching aid etc. are taking advantage of the modern technologies. The teachers in good numbers are using YouTube videos in class rooms, which indicates that YouTube videos are no longer entertainment tools only rather an instrumental educational tool as well.

#### j) YouTube videos are helping both teachers and students

The study revealed that YouTube videos are helping both the teachers and students. The teachers are getting new tools to make classes more engaging, participatory and enjoyable to students besides new instruments for extracurricular activities. The make teacher more confident and professionally developed. The students on the other hand are becoming more involved in classes, participate actively and ultimately perform better in classes and exams. This looks a win-win situation for both the parties in making the learning environment improved and walking towards making a successful education system in Bangladesh.

### k) YouTube videos are easily accessible

We all know that YouTube is a free source of entertainment and education materials and the study also revealed the same. The respondents mentioned that YouTube videos do not cost anything but only needed the basic computer skills or efficient users of smartphones to search, download and use them the way one wants. However, it is also critical to pick the appropriate video as the target students are early grade kids. This require ICT training for the teachers to use these videos in the right manner and encourage the students to do the same as they will be interested to explore YouTube videos following their teachers as well.

### l) YouTube videos got more potentials to be explored

There is no point to deny that the web is a source of lots of free and unedited materials. Free does not mean it is the best for taking it home. Only the trained teachers are able to select the right videos which benefits students. The study also revealed that many of the teachers are availing the resources from YouTube but not in great extent. To take advantages from these unlimited educational contents available for free, more and more teachers should be trained so that the teachers and students alike get the best out of these.

## 5.0 Conclusions

YouTube videos are significantly influencing the primary school teachers in Bangladesh in terms of improving their teaching methodology and students learning outcomes. Considering some inherent limitations of the education system, YouTube videos might solve some of the problems like teaching aid, learning tools, materials etc. through effectively but selectively choosing them and use at classroom setting. The study, though with a small sample, is an eye opener. More in-depth studies with large sample is needed to be conducted to reap the benefit of free contents and materials with appropriate policy support for the cause of the primary education in Bangladesh.

## Works Cited


1. Agazio, J., & Buckley, K. (2009). An Untapped Resource: Using YouTube in Nursing Education. *Nursing Education, 34* (1), 23-28. http://dx.doi.org/10.1097/01.NNE.0000343403.13234.a2

2. Al-Aufi, A. S., & Fulton, C. (2014). Use of social networking tools for informal scholarly communication in humanities and social sciences disciplines. *Procedia-Social and BehavioralSciences*, *147*, 436-445.

3. Atkinson, N. L., Billing, A. S., Desmond, S. M., Gold, R. S., &Tournas-Hardt, A. (2007). Assessment of the nutrition and physical activity education needs of low-income, rural mothers: Can technology play a role? *Journal of Community Health, 32*, 245-267. http://dx.doi.org/10.1007/s10900-007-9047-7

4. Bhuasiri, W., Xaymoungkhoun, O., Zo, H., Rho, J. J., &Ciganek, A. P. (2012). Critical success factors for e-learning in developing countries: A comparative analysis between ICT experts and faculty. *Computers & Education*, *58*(2), 843-855.

5. Chapman, S. (2015). 7. Media advocacy for public health. *Analytic approaches with street wisdom*, 91.

6. Cheng, X., Liu, J., & Dale, C. (2013). Understanding the characteristics of internet short video sharing: A YouTube-based measurement study. *IEEE Transactions on Multimedia,15*(5), 1184-1194.

7. Clifton, A., & Mann, C. (2011). Can YouTube enhance student nurse learning? *Nurse Education Today, 31(*4),311-313. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2010.10.004

8. Conole, G. G. (2015). MOOCs as disruptive technologies: strategies for enhancing the learner experience and quality of MOOCs. *Revista de Educación a Distancia*, (39).

9. Davis, K. (2013). Young people's digital lives: The impact of interpersonal relationships and digital media use on adolescents' sense of identity. *Computers in Human Behavior*, *29*(6),2281-2293.

10. Duncan, I., Yarwood-Ross, L., & Haigh, C. (2013). YouTube as a source of clinical skills education. *Nurse education today*, *33*(12), 1576-1580.

11. Fernandez, V., Simo, P., Algaba, I., Albareda-Sambola, M., Salan, N., Amante, B., et al. (2011). "Low-cost educational videos" for engineering students: A new concept based on video streaming and YouTube Channels. *International Journal of EngineeringEducation, 27*(3), 518-527.

*12.* Fleck, B. K., Beckman, L. M., Sterns, J. L., & Hussey, H. D. (2014). YouTube in the Classroom: Helpful tips and student perceptions. *Journal of Effective Teaching*, *14*(3), 21-37.

13. Gabarron, E., Fernandez-Luque, L., Armayones, M., & Lau, A. Y. (2013). Identifying measures used for assessing the quality of YouTube videos with patient health information: a review of current literature. *Interactive Journal of Medical Research*, *2*(1), e6.

14. Greenwood, G. (2012). Examining the presence of social media on university websites. *Journal of College Admission, __,* 24-28.

15. Guo, P. J., Kim, J., & Rubin, R. (2014). How video production affects student engagement:An empirical study of MOOC videos. In *Proceedings of the First ACM conference onLearning@ scale conference* (pp. 41-50). ACM.

16. Kay, R. H. (2012). Exploring the use of video podcasts in education: A comprehensive review of the literature. Computers in Human Behavior, 28(3), 820-831.

17. Keengwe, J., Onchwari, G., &Onchwari, J. (2009). Technology and student learning: Towards a learner-centered teaching model. *AACE Journal, 17*(1), 11-22.

18. Kremer, M., Brannen, C., &Glennerster, R. (2013). The challenge of education and learning in the developing world. *Science*, *340*(6130), 297-300.

19. Kudryavtsev, A., Krasny, M., Ferenz, G., & Babcock, L. (2007). Use of computer technologies by educators in urban consumer science education programs. *Journal of Extension [On-line], 45*(5), Article 5FEA2. Retrieved from http://www.joe.org/joe/2007october/a2.php

20. Lenhart, A., Madden, M., Macgill, A. R., & Smith, A. (2010). Teens and social media. Pew Internet and American Life Project. http://www.pewinternet.org/Reports/2010/Teens-and-Social-Media.aspx/

21. Liyanagunawardena, T., Williams, S., & Adams, A. (2013). The impact and reach of MOOCs: a developing countries' perspective. *eLearning Papers*, (33).

22. Marchionini, G. (2003). Video and learning redux: New capabilities for practical use. *Educational Technology,43*(2), 36-41.

23. Marks, R. (2013). I learned it from YouTube! (And other challenges of teaching voice). *Journal of Singing, 69*(5), 589-592.

24. McCormick, J. G., Holland, S., &Szydlo, L. R. (2010). Experiential Learning 2.0: Incorporating YouTube in leisure studies. *Schole: A Journal of Leisure Studies &Recreation Education, 25*, 74-78.

25. Mitra, B., Lewin-Jones, J., Barrett, H., & Williamson, S. (2010). The use of video to enable deep learning. *Research in Post-Compulsory Education, 15*(4), 405-414. doi: 10.1080/13596748.2010.526802

26. Pinto, H., Almeida, J. M., & Gonçalves, M. A. (2013). Using early view patterns to predict the popularity of YouTube videos. In *Proceedings of the sixth ACM international conferenceon Web search and data mining* (pp. 365-374). ACM.

27. Sharma, N., Lau, C. S., Doherty, I., &Harbutt, D. (2015). How we flipped the medical classroom. *Medical teacher*, 37(4), 327-330.

28. Skiba, D. J. (2007). Nursing Education 2.0: YouTube. *Nursing Education Perspectives, 28*(2), 100-102.

29. Stohlmann, M. (2012). YouTube incorporated with Mathematical modelling activities: Benefits, concerns, and future research opportunities. *International Journal forTechnology in Mathematics Education, 19*(3), 117-124.

30. Thelwall, M., Sud, P., & Vis, F. (2012). Commenting on YouTube videos: From Guatemalan rock to el big bang. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, *63*(3), 616-629.

31. Wang, Z., Sun, L., Zhu, W., Yang, S., Li, H., & Wu, D. (2013). Joint social and content recommendation for user-generated videos in the online social network. IEEE Transactions on Multimedia, 15(3), 698-709. Kamberelis, G., &Dimitriadis, G. (2011). Focus groups: Contingent articulations of pedagogy, politics, and inquiry. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The Sage handbook of qualitative research (4th ed., pp. 545-561). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Date of Submission : 22.02.2022
Date of Acceptance : 22.05.2022

**Jagannath University Journal of Arts**
**Volume 12, No 01, January-June 2022**

# Analytical Discourse on Inevitability of Arrival of Refugees in Muslim Countries: Economic Policy Context

Tareq Muhammad Shamsul Arefin*

Mohammad Nurullah**

**Abstract**

Currently, around 25.9 million people are in refugee status throughout the global arena. Specifically, the extent of refugees is overwhelming within the Muslim World. Interestingly, the propensity of refugees is very high within the Muslim majority countries. From the context of refugee-hosting, the top eight Muslim Majority countries are hosting 54% out of the total numbers of the same. Similarly, in terms of country-of-origin top four countries are Muslim majority. This high propensity is continuing over the time and poised refugee incidents as an inevitable incident for Muslim majority countries. This high propensity of refugee incidents is putting huge pressure on Muslim majority countries' socio-politics and economy. Besides, the refugee management problem soars more because most of the refugee host Muslim countries are also developing nations. At present, 90% of the global refugee population is hosted by developing nations. In this context, this paper analyzes data and academic works from secondary sources to identify a suitable refugee management strategy for the developing world Muslim majority countries. The analysis revealed that there remains a substantial trade-off for refugee management policies as most of the costs are heavily front-loaded while the benefits are back-loaded. The trade-off creates cost-benefit dynamics over the time horizon, where the long-run result depends on the magnitude of the interplay of different key factors—refugees integration to the host economy through labor force participation. After reviewing different policy options practiced in different countries, this essay prescribes refugee-hosting developing nations should invest in policies that are designed to integrate the refugees within the economy, rather not to focus on policy design or strategies whose objective is to keep the refugees in legal limbo, so that they have a short stay in the host country and within short they can be pushed back to the origin, from an economic perspective this latter option is the costlier and imposes heavy fiscal burdens.

## Introduction

People who have crossed an international border to find safety in another country from war, violence, conflict, or persecution are designated as Refugees. The 1951 Geneva Convention is the main international instrument of refugee law. When formulated the convention was limited in scope as it was mainly to protect the European refugees in the aftermath of World War II. However, as the problem of displacement spread around the world the 1967 Protocol expanded the scope of the Convention. This convention defines a refugee as – "someone unable or unwilling to return to their country of origin owing to a well-founded fear of being

---

*Associate Professor, Department Economics, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh

**Associate Professor, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh

persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion''.[1]

Currently, we are living in a world where around 25.9 million people are refugees.[2] Specifically, the extent of refugees is overwhelming within Muslim countries. From the geographical context, the top 9 refugee-hosting countries are Muslim. Approximately, these countries host 54% of the world's total refugees.[3] According to the country-of-origin categories, the top 5 refugees originated countries are Muslim countries, and 64% of total world refugees are from these countries.[4] The situation is more severe if we count on the fact that people are being displaced for ever-longer periods after the mid-'90s: The average refugee today won't break out of that status for over a decade.[5]

Considering the contemporary trend of remaining in long refugee status, the management of this problem soars more because most of the refugee host countries are also developing nations and 90% of the global refugee population is hosted by developing nations.[6] These countries are resource-poor and almost struggling to meet the needs of their citizens, thus the flux of refugees to these countries added an extra challenge to their development process. Above this backdrop, this paper critically reviews the contemporary academic literature to identify the potential economic cost and benefits related to the refugee management process. Based on this review later a policy framework is suggested for refugee-hosting Muslim countries to manage it economically. The rest of the paper is organized as follows. The second section presents the recent propensity of refugees in Muslim countries. The next section discusses the pros and cons of the economic cost related to the refugee hosting process. The fourth section analyzes the possible sources of benefit related to the refugee integration process within a host country. The last section concludes on what policy stance should be taken.

**The propensity of refugee status in Muslim countries.**

Historically, the concept of "Refugee" has been closely associated with the religion Islam. Over time, the concept of "Refugee" in a sense has become one of the integral parts of Islamic culture through its tradition and customs.[7] For instance, at the very beginning of Islam, the Prophet Muhammad (PBUH) had to leave his birthplace Mecca towards Yathrib (Medina) to escape from persecution conspired by the elites of Meccan during September 622 A.D.[8] The Prophet along with his followers had to remain refugees in Medina. Even before that during 615 A.D. Prophet advised a few of his followers in Mecca to travel to the Christian Kingdom of Abyssinia (Ethiopia) so that they can escape the unavoidable persecution from their fellow people.[9] Thus, the institutional foundations to manage the refugee status as well asylum is established by divine guidance mentioned in the Holy Quran and the Sunnah (Tradition of Prophet).

From the beginning, through its practice, Islamic institutions are designed to protect the fundamental rights as well the dignity of individuals.[10] Despite this, the 'Shariah' still lays the explicit rules regarding asylum issues. This layout details the provisions that guaranteed asylum seekers' rights— safety, care, protection, and dignity.[11] Thus, from

the context of 'Shariah', the legal procedures are more specifically related to the asylum issue. For example, the enacted contemporary international refugee law is wholly based on the principle of non refoulement, whereas such principle is inherent in 'Shariah' and has been in practice for several centuries beforehand.[12] As there remains a long tradition of refugee seeking and acceptance in the religion of Islam, in this section we explore the contemporary trends in world refugee statistics to depict the overall situation within the Muslim majority countries. Our analysis considers both ways of refugee mobility, originating from as well destined to Muslim countries.

**Figure 1:** Top 10 Refugee Hosting Nation in the World in 2019

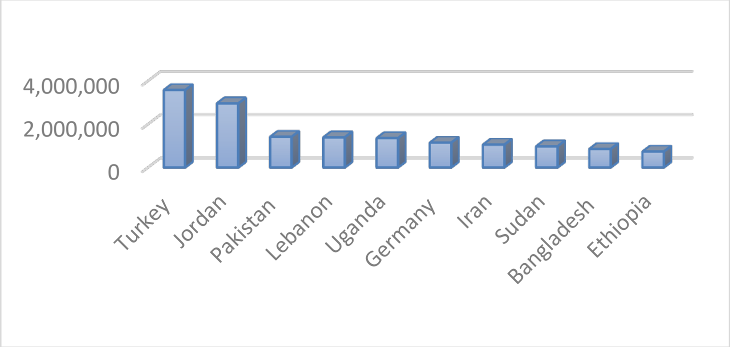


**Source:** UNHCR Statistical Year Book 2019[13]

Figure 1 illustrates the number of refugees hosted individually by the World's top 10 refugee host nations in the year 2019. In Figure 1, from left to right countries are represented in descending order according to the number of refugees hosting. From this ranking, it is evident that the top 4 refugee-hosting countries are Muslim. These countries are Turkey, Jordan, Pakistan, and Lebanon. All these countries are hosting more than 1 million refugee populations within their territory. Whereas Turkey, the top hosting country hosts 3.6 million refugees who are mainly displaced from the civil war in Syria.[14] The second-largest number of refugees, 2.96 million is hosted by Jordan. Similarly, the next two largest number of refugee-hosting nations, Pakistan and Lebanon are hosting almost 1.4 million refugees respectively. Among the top 10 refugee-hosting nations ranked by the hosting of the number of the refugee population, 7 countries are Muslim. They are ranked as 1,2,3,4,7,8, and 9 respectively.[15] In this respect, Bangladesh is ranked as the 9$^{th}$ largest refugee-hosting country, hosting mainly the Rohingya Muslims who faced ethnic cleansing for their Muslim identity and were displaced from their homeland in neighboring Myanmar.

**Figure 2:** Top 10 Countries from Where Refugees are Originated

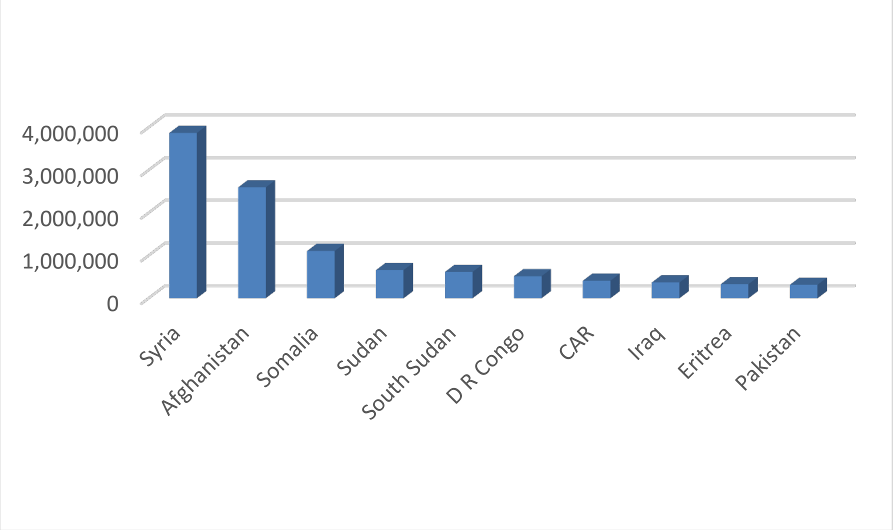


**Source:** UNHCR Statistical Year Book 2015[16]

Figure 2 illustrates the World's top 10 countries from where refugees are mainly originated in the year 2015. In figure 2, the countries from left to right are represented in descending order based on the amount of population that has been displaced from these countries as well as the number of asylum seekers or refugees in other countries. Interestingly, the figure revealed a similar trend that was found in the case of refugee-hosting nations. Alike the refugee-hosting nations, the top 4 ranked countries from where refugees are originated from Muslim countries.[17] These countries are Syria, Afghanistan, Somalia, and Sudan. More than 1 million refugees are originated from the top three ranked countries. The top number of refugees are generated from Syria, these people are mainly displaced from their homeland because of the prolonged civil war in Syria. Approximately 3.87 million became refugees from this country. The second-largest number of refugees, 2.56 million is originated from Afghanistan, like Syria, this huge number of people also become refugees due to the prolonged global war of terror. In this ranking, Somalia is the third country, which is also a predominantly Muslim country, from where 1.1 million people became refugees. The ranking provided in figure 1 also revealed that among the top 10 countries from where refugees are originated, 6 countries are Muslim majority. They are ranked as 1,2,3,4,8 and 10 respectively.[18] Figure 3 represents overtime how the refugees are originated from these ranked countries.

**Figure 3:** Top Ranked Muslim Countries from Where Refugees are Originated

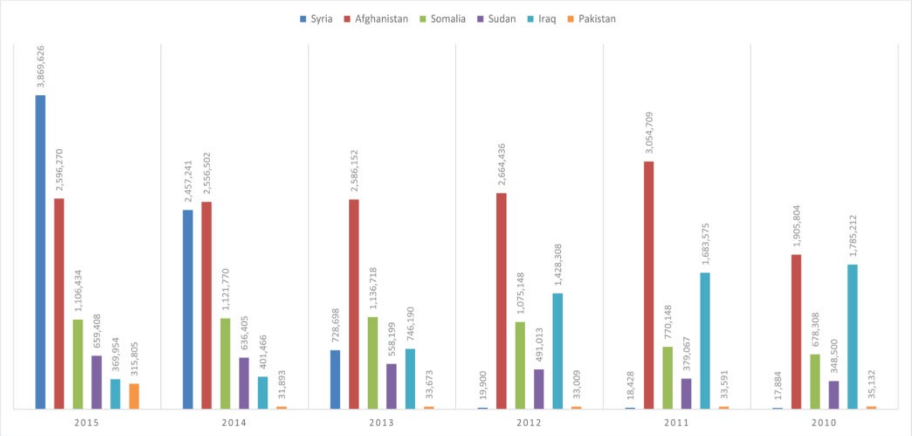


Source: Data are compiled from UNHCR Statistical Year Book of several years (2011-15)[19]

Figure 3 illustrates how refugees originated from Muslim majority countries are evolving. The figure shows the number of refugees from these Muslim-majority countries from 2010 to 2015. It can be seen that out of 6 countries, the situation in Afghanistan is deplorable. The number of evacuees has remained almost constant over the years, indicating that refugees from this country remain largely under legal restriction, and therefore their refugee status is being prolonged. The situation of Somalia is almost similar to Afghanistan but the refugees originated are less in number. At the beginning of 2010, the number of refugees originating from Somalia has increased up to 2012, after then the number remain constant. From the time series,[20] it is evident that only the situation within Iraq has improved as the number of refugees originating from this country has been declining, as a result, among the ranking of the top refugee-originated countries, Iraq stood 8$^{th}$ in 2015 from being ranked 2$^{nd}$ in 2010. On contrary, the series showed the situation within the top-ranked country, Syria has been deteriorating as the number originating from this country are increasing since 2013. As a result, the country rose from being ranked 35$^{th}$place in 2012 to 4$^{th}$ place in the rank of top refugee originating countries in 2013, among the ranking of the top refugee-originated countries. Consequently, within the next two years onward the country is at the top of the rankings.

Though the reasons of generating refugees from these countries are multifaceted the main reason is conflict derived from political disputes. However, though the reasons why top refugee-hosting countries are Muslim are also multifaceted, still it is quite clear from the above discussion that the Islamic religious values and culture play an important role while taking the hosting decisions. Further, observing the geographical distribution of refugees that is presented in figure 4 and 5 in annex, it is evident that refugee originated from and destined to are highly concentrated any regionality where Muslim majority countries are neighbours. Thus, the analyses

presented in this section indicate that both of the refugee incidents—country of origin as well destination—are inevitable events for Muslim majority countries.

**Economic Cost Borne By Refugee Host Nation**

The status of refugees is embedded explicitly and in detail in Shariah. The shariah provisions require guaranteed safety and ensuring dignity for the asylum seekers.[21] It is also required that the government must follow Islamic rudiments in facilitating shelter, sufficient reliefs and assisting according to the need of refugees.[22] Ensuring such facilities for a sudden influx of a large number of people are not so easy, this is more challenging for Muslim majority countries because most of them are developing countries. This section discusses what types of costs as well as in what magnitude fiscal demand is needed to accommodate a large number of refugees within a developing country based on academic literature.

The first incidence of refugees—a large inflow of people crossing over the border—to a host country is always incurred high expenditure due to the high cost related to settlement arrangements for refugees. The incidence of cost-bearing overtime increases in case of relocating refugees as well as hosting them until they integrate into the host country. So, the cost incurred by a refugee is crucially related to the time it requires to integrate them into the society of the host country. In this regard, there remains a substantial trade-off for policies as most of the costs are heavily front-loaded while the benefits are back-loaded.

In literature, most of the studies regarding the front-loaded cost are done in developed countries' setup.[23] As has already been mentioned, the majority of Muslim countries that are hosting refugees are predominantly developing countries. Thus, we need to interpret the estimate based on advanced countries' setup appropriately. In an advanced country setting, the typical estimate for supporting a refugee in the first year is around $10,000.[24] Whether the cost for developing countries is the same or not depends on several factors, mainly related to the level and quality of public services as well as the number of funds received from international donors.[25] However, considering the level of resource availability to developing countries, it is plausible to assume that the public services quality and availability are less than the developed countries indicates the spend amount supposed to be less for developing countries; however, still in relative terms, the cost would be a substantial burden for the developing countries. Furthermore, the aggregate cost would be felt more aggravated taking into account the fact that developing countries host more refugees compared to advanced countries.

Consequently, a crowding out of public services may occur in localities assemblage with refugees[26]. The extent of crowding out depends on the population density of developing countries. It should be severe for countries with a high-density population, like Bangladesh, Pakistan, Jordan, Lebanon, and Turkey.[27] In these countries, the refugee assemblage at the local level should have crowded out the public services, specifically the utilization scope of schools and hospitals. Besides, it also worsens the developing countries' existing problem of traffic congestion and imposed an extra burden on transport infrastructures. Furthermore, the sudden arrival of refugees usually puts upward pressure on housing demand in localities. The

instant pressure is mostly felt on the low-end housing segments which eventually makes housing scarce as well less affordable for low-income people of the refugee host developing countries.[28]

Ruist (2015) in his study used 2007 data for Sweden to find that Swedish people transferred a significant amount of money to refugees. According to his estimation, the net transfer to refugees from the Swedish people is1% of Swedish 2007 GDP.[29] He reported that about 20% of this transfer amount was used to arrange drawing facilities for refugees on social support expenditures.[30] These social support schemes are mainly designed for the integration of refugees into the society of the host country (Sweden). The schemes allocated social assistance and grants to individual and refugee communities as well language training. Besides, social institutions related to crime and justice in the host country also required more spending.[31] Although the share of social spending induced by refugees on pensions, disability, and education spending are less and not that significant relative to host nation citizens. Thus, social expenditure on the former services dominates.

The scope of refugees to participate in host countries' labor market is the crucial factor for reducing the long-term fiscal burden related to refugee absorption within the host country. The underlying argument is that if refugees participate in the labor market they can even earn up to the level where they can pay tax, both the earnings and tax payments can reduce the net fiscal burden to the host country.[32] However, labor market participation in the short run may become a political issue in host countries as large inflows of unskilled migrants may take jobs away from unskilled natives in the host country.[33] In this regard, most of the empirical studies are conducted in developed countries over low-skilled economic migrants. The findings revealed that within the developed economy inflow of migrants does not have a significant impact on the job prospects and wages of low-skilled workers of the host country.[34] The majority of the studies reported that unskilled migrants have a small negative effect on the wages of the unskilled host country worker. In this regard, several studies reported that the wage decline is within the range of 0.1 percent to no decline in the response of a 1 percent increase in the immigrant share in the population.[35 36 37 38]

The generalization of this result would not be appropriate for developing countries' context because labor markets in these countries are less flexible compared to advanced countries, this implies there might be a downward effect over unskilled labor wages as well as an increase in the unemployment rate for the short run. However, the long-run result depends on the magnitude of the interplay of different key factors.[39] For instance, skilled workers of host countries, are always complementary to the inward migration of blue color workers. Thus, in the new steady state which is resulted from the influx of new immigrants, high skilled natives will tend to end up better off.[40] The reason for being better off is that now the high skilled natives have more unskilled workers to work with increased investment as well.[41] However, the effect on unskilled natives is unpredictable beforehand. Though they too tend to benefit from the increased investment they could also face increased competition for their jobs from the unskilled migrants.[42 43] Thus, in the end, what would be their situation is critically dependent on the net effects or how the effects

dominate within the interplay. In this regard, the interplay is mainly dependent on the degree of substitution—how close substitutes are immigrant blue color workers to the native unskilled workers.[44 45]

Furthermore, the negative impacts on the environment induced by the refugees are well documented. These negative impacts are spreading overland to water and significantly pose threat to the sustainability of nature. It is documented that the large-scale arrival and prolonged presence of refugees can engender deforestation; de-vegetation; erosion.[46 47] For instance, to accommodate the refugees the host nation requires to make settlements which in some cases need acquiring arable land of locals. Similarly, in several places' forests area need to be stripped of not only for large space needed to construct refugee camps but also to ensure the supply of necessary materials, such as poles for construction of houses and latrines, fuel wood, and firewood; medicine; thatching and fodder.[48 49] Besides, it can lead to the destruction, degradation, and pollution of water sources and catchment areas. It also put pressure on local livelihood through illegal poaching and fishing as well overgrazing.[50]

UNHCR documented that approximately 167 square kilometers of forest area were severely deforested during the 1994-96 refugee crisis in Tanzania, whereas the total affected forest area was 570 square kilometers.[51] Akinly, an environmental impact assessment reported that during 1994 the Mozambican refugees' settlement in Zimbabwe caused a 58% reduction of woodland around the refugee camps.[52] Thus, in most cases, due to the loss of any forest cover, it is inevitable for refugee host countries to have habitat degradation. Such habitat degradation also led to the loss of ecosystem and even cases it may damage the functioning capacity that may significantly reduce the levels of income as well the lower quality of life.[53] In several cases, such losses are irrecoverable and impose huge environmental costs thus squeezing the scope of any practical solution.[54] Likewise, activities intend to integrate as well accommodate refugees can be detrimental, for example, local roads can be damaged due to an increase in traffic of heavy trucks that are used to transport food and other relief for refugees.[55]

The researcher also provided reasoning that the degradation of the environment may accelerate as well as reinforce the severity of the problem. According to this reasoning, refugee camps usually have a shortage of resources thus the inhabitants require to depend more on surrounding environments for their livelihood.[56] In such a case degradable environment depleted resources fast, which invoked more pressure and consequently more degradation. Ultimately such a situation may lead to resource conflict.[57] The case of deforestation, which is more prominent near any refugee camp is the ideal example of resource conflict. For example, a sudden influx or a new settlement of refugees can increase the demand for firewood within the locality of the host country. The excess demand may instigate a higher rate of firewood extraction from the local woodland to a level so the natural replenish rate decreases. This depletion of natural resources may open up resource competition between refugees and local communities. This resource competition destabilizes the sustainability of the environment because for local natives the management of woodland was sustainable beforehand. If the depletion rate remains unchanged or

increases over time then resource competition can transform into violence. Several refugee host countries reported such cases of violence in local communities.[58] In extreme cases, such resource competition starts regional-level conflicts between local communities and refugees.

It is clear from the above discussion that the two factors are crucial to determine the net cost of hosting refugees. These two factors are the skill level of refugees and the time length require to adapt them within the local society. Both of the factors are deterministic to the integration process of refugees into the local society. However, the degree of integration may vary because refugees themselves are profoundly transformed by their experiences. Thus, it is important to recognize that policies actions of host countries that are intended to keep refugees in legal limbo as well eliminate them from the local workforce are costly to the host economy because such actions increase the time horizon of the integration process.

**Economic Benefit Related To Refugee Integration Process**

In this section, the discussion is mainly focused on the possible positive impact of the refugee integration process. The discussion shed light on three perspectives, from the possible fiscal, labor market, and overall macroeconomic impact of refugee and their return.

In the short run, the arrival of a large number of refugees can stimulate the demand of the local economy. This demand stimulation can also accrue fiscal benefits to a local government authority, for instance, the consumption of local goods and services may boost the collections of sales taxes. Similarly, the flux of refugees may lead to a significant boost to local property markets which include soars in housing price and net wealth gain for native house owners.[59] This may also increase the local government property tax collections. Empirical estimation conducted by OECD[60] and IMF[61] reported that in 2016 refugee inflow in Europe increase the overall demand to 0.1% of 2016 GDP.[62 63]

In the case of appropriate circumstances, such short-run stimulus may carry over to an acceleration of long-term economic growth.[64] In this regard, the path and speed of acceleration depend on the integration policies. How the policies confer support for rapid integration of refugees to local labor markets mainly determines the speed. In this regard, it should be noted that usually refugees relative to immigrants take a longer period to integrate consequently contributing to the local economy.[65] A large number of refugee inflow is necessary for a significant labor market and macroeconomic impact. If such a large inflow of refugees is allowed to work[66] – they immediately increase the economy's productive capacity by expanding the available labor force. For instance, Dadush (2018) through simulation showed that a 1% increase of labor force due to influx of migrants for consecutive 3 years invoke a 2.4% increase of net investment of the initial level by the end of the third year.[67] He also simulated a case where the refugee inflow occurred once and only added 1% to the labor force, in such case over the long run, the capital/labor ratio may remain constant. In that case, the required investment to adopt the increased labor force should react quickly. He showed that approximately there is a cumulative increase to the capital stock over the next 5 years. For his simulation, it is a proportional 1%

addition to the stock that ultimately led to a 1% higher national output at the end of 5 years. This implies a 0.2% a year acceleration of the average annual growth rate over the 5 years adjustment period.[68]

The cumulative increase in the labor force and investment ultimately lead to 0.6% higher growth of output for each year.[69] The above empirical evidence suggests that the long-run economic effect of refugee inflow is conditional on the intensity and transitory nature of its flow as well the stage of the business cycle from the demand side of the economy. However, from the supply side of the economy, the long-run positive economic effect is expected to last long because the refugee inflow has a cumulative effect on the expansion of the economy's production capacity.[70]

As mentioned earlier that usually refugees require a longer time to contribute to the host economy compare to immigrants. This long duration is immediately reduced if a refugee finds a job. The job holding reduces the lag time because their effect on incremental capital formation is alike or their stimulation effect is the same. This stimulation happens as the inclusion of refugees to the workforce also requires the installation of new machines as well require the construction of new housing for them. The new housing demand also expands the construction sectors including the demand for different utilities— electricity, water, etc. Usually, these sectors are the most capital-intensive sector within the economy.[71] The capital requirement to meet the increased demand within the refugee host countries can be sourced mainly from two sources: first, from the investment of domestic savings; second, from the inflow of increased capital from abroad. For instance, the United States in the second half of the 19th century utilized both sources to meet the increased demand from immigrant inflows.[72]

In development thinking, accommodating a large number of unskilled laborers into mainstream activity is always had a potentially positive effect on the economy because of expansion of productivity at lower cost, however, such inflow always raises political debate. [73] [74] [75] Nobel laureate W. Arthur Lewis is a key proponent of the potential positive impact of labor migration on the economy.[76] According to him, the inflow of a large number of cheap laborers effectively increases the economic capacity at zero cost so the incremental labor raises the rate of return to capital because the portion of capital remains fixed within the production process. In case of appropriate conditions, the continuous influx of cheap labor may essentially lead to a virtuous circle of growth.[77] Although Lewis described his model more specifically for the movement of workers from the rural to the urban setting as well factories in poor countries, however, its relevance is more general and also applicable to the mobility of the refugees. This general relevance is evident in the case of the 1950's Europe’s post war economic miracle as well the subsequent slowdowns in the early 1960s. According to the Harvard economic historian Charles Kindleberger, empirical evidence showed that the increased supply of labor can stimulate economic growth but it is not a sufficient condition. According to him, the pent-up consumer demand during the war years and subsequently the reconstruction need in the post-war periods were sufficient conditions for growth.[78] Immigration and refugees not only increase the economic growth of the host economy by increasing labor force and capital, but they also do so in other channels as well.

These channels include the utilization of jobs in an inferior niche by the migrants or refugees. It is documented in several micro-level studies that migrants are eager to take on jobs and also move to localities where native people are reluctant to go.[79 80 81] Similarly, it is reported that refugees are responding more readily to the fill-up jobs gap derived from business cycle fluctuation. Besides, several micro-level studies also showed that immigration-led brain gain also induced accelerated productivity growth by providing a disproportionate share of entrepreneurs and innovators to the host economy.[82] Sometimes, refugees also bring precious metals (gold, silver) and money with them that directly injects capital into the local economy. There is also empirical evidence that the flux of refugees turns the unfavorable demographic trends of a developed country into a favorable ones.[83]

## Conclusion

The available evidence and analyses as set out in the above discussion lead to the main conclusion of this essay are that the hosting costs of refugees are distributed unevenly for the host countries. It is mainly heavy at the beginning and its burden decreases as the integration process of refugees begin, eventually, this cost is eliminated as time increases. The host country's labor market is the main medium of the integration process because through the labor market participation refugees can contribute to the economy of the host nation. Only from this process, the host nation is starting to accrue benefits from hosting a refugee and typically it requires several years to materialize the benefits. This conclusion is drawn from the critical review of the macroeconomic, fiscal, and labor market impacts of integration of immigrants and hosting refugees on the developed country. Thus, the conclusion is an analogy for developing countries. This analogy fills up a significant knowledge gap for the refugee-hosting developing countries because currently data as well empirical studies for refugee-hosting in the context of developing countries are not widely available. From the above analogy, it can be inferred that the aggregate economic effects of refugees, in most instances should be beneficial if they are integrated into the host society. The time to integration is critical to the fiscal impact of refugee flows because longer integration time imposes an incremental cost to the host nation, while rapid integration reduces the cost as it enables economic benefits to accrue instantly from the refugee integration process to the host economy. Studies revealed that the young age structure of refugees usually helps the host nation to accrue positive fiscal benefit both on a cash-flow and present value basis a few years after arrival. Thus, from the above synthesis, this essay prescribed that refugee hosting developing nations should invest in policies that are designed to integrate the refugees within the economy, rather not to focus on policy design or strategies whose objectives are to keep the refugees in legal limbo, so that they have a short stay in the host country and within short they can be pushed back to the origin, from an economic perspective this latter option is the costlier and impose heavy fiscal burdens.

**Works Cited**


(1) United Nations High Commissioner for Refugees, "The 1951 Refugee Convention," UNHCR (UNHCR, The UN Refugee Agency, 1951), https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html.

(2) "UNHCR Global Trends - Forced Displacement in 2017," UNHCR Global Trends - Forced displacement in 2017, July 5, 2018, https://www.unhcr.org/globaltrends2017/.

(3) "UNHCR Global Trends - Forced Displacement in 2017," UNHCR Global Trends - Forced displacement in 2017, July 5, 2018,

(4) "UNHCR Global Trends - Forced Displacement in 2017," UNHCR Global Trends - Forced displacement in 2017, July 5, 2018,

(5) Uri Dadush, "The Economic Effects of Refugee Return," *Economics* 12, no. 1 (2018), https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2018-33.

(6) "UNHCR Global Trends - Forced Displacement in 2017," UNHCR Global Trends - Forced displacement in 2017, July 5, 2018,

(7) Ahmed Abou-El Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'Ah and International Refugee Law: A Comparative Study* (Riyadh, Saudi Arabia: Naif Arab University for Security Sciences, 2009).

(8) Ahmed Abou-El Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'Ah and International Refugee Law: A Comparative Study*

(9) OIC, "OIC Ministerial Conference on the Problems of Refugees in the Muslim World: Working Document No. 3: Durable Solutions," https://www.unhcr.org/protection/conferences, 2005, https://www.unhcr.org/45ab8e462.pdf.

(10) Ahmed Abou-El Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'Ah and International Refugee Law: A Comparative Study*

(11) Ahmed Abou-El Wafa,

(12) Ahmed Abou-El Wafa,

(13) United Nations High Commissioner for Refugees, "Statistical Yearbooks," UNHCR (UNHCR, The UN Refugee Agency), accessed February 22, 2021, https://www.unhcr.org/statistical-yearbooks.html.

(14) For details, see Table 1 in Annex.

(15) See Table 1 in Annex.

(16) United Nations High Commissioner for Refugees, "Statistical Yearbooks," UNHCR (UNHCR, The UN Refugee Agency), accessed February 22, 2021, https://www.unhcr.org/statistical-yearbooks.html.

(17) For details, see Table 2 in Annex

(18) See Table 2 in Annex

(19) United Nations High Commissioner for Refugees, "Statistical Yearbooks," UNHCR (UNHCR, The UN Refugee Agency), accessed February 22, 2021, https://www.unhcr.org/statistical-yearbooks.html.

(20) For Details, See Table 3

(21) Ahmed Abou-El Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'Ah and International Refugee Law: A Comparative Study* (Riyadh, Saudi Arabia: Naif Arab University for Security Sciences, 2009).

(22) Ahmed Abou-El Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'Ah and International Refugee Law: A Comparative Study*

(23) Uri Dadush, "The Economic Effects of Refugee Return," *Economics* 12, no. 1 (2018), https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2018-33.

(24) Philippe Legrain, "Refugees Work: A Humanitarian Investment That Yields Economic Dividends," OPEN, February 1, 2017, http://www.opennetwork.net/refugeeswork/.

(25) Uri Dadush, "The Economic Effects of Refugee Return," *Economics* 12, no. 1 (2018),

(26) Uri Dadush, "The Economic Effects of Refugee Return,"

(27) Lebanon, Jordan, and Turkey have seen cumulative net refugee inflows that exceed 16%, 7%, and 3.6% of their population respectively

(28) Uri Dadush, "KNOMAD Working Paper 1 the Effect of Low-Skilled Labor ...," migration4development.org, 2014, http://www.migration4development.org/sites/default/files/effect_of_low_skilled_labor_working_paper_1_0.pdf

(29) Joakim Rust, "The Fiscal Cost of Refugee Immigration: The Example of Sweden," *Population and Development Review* 41, no. 4 (2015): pp. 567-581, https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2015.00085.x.

(30) Joakim Ruist, "The Fiscal Cost of Refugee Immigration: The Example of Sweden," *Population and Development Review* 41, no. 4 (2015): pp. 567-581

(31) Sarah Deardorff Miller, "Assessing the Impacts of Hosting Refugees" (World Refugee Council Research Paper 4, 2018).

(32) Herbert Brücker and Elke J. Jahn, "Migration and Wage-Setting: Reassessing the Labor Market Effects of Migration*," *Scandinavian Journal of Economics* 113, no. 2 (2011): pp. 286-317, https://doi.org/10.1111/j.1467-9442.2010.01634.x.

(33) Herbert Brücker and Elke J. Jahn, "Migration and Wage-Setting: Reassessing the Labor Market Effects of Migration*," *Scandinavian Journal of Economics* 113, no. 2 (2011): pp. 286-317

(34) Herbert Brücker and Elke J. Jahn, "Migration and Wage-Setting: Reassessing the Labor Market Effects of Migration*," *Scandinavian Journal of Economics*

(35) John M. Abowd, D Card, and G J Altonji, "The Effects of Immigration on the Labor Market Outcomes of Less-Skilled Natives. ," in *Immigration, Trade, and the Labor Market* (Chicago, IL: Univ. of Chicago Press, 1991), pp. 201-234.

(36) Kristin F Butcher, "Immigration and Wages: Evidence from the 1980s," *The American Economic Review* 8, no. 2 (1991): pp. 292-296.

(37) Robert LaLonde and Robert Topel, "Labor Market Adjustments to Increased Immigration. ," in *Immigration, Trade, and the Labor Market*, ed. John M Abowd and Richard B Freeman (University of Chicago Press, 1991), pp. 167-199.

(38) R Schoeni, "The Effects of Immigration on the Employment and Wages of Native Workers: Evidence from the 1970s and 1980s. "(RAND, 1997).

(39) Uri Dadush, "KNOMAD Working Paper 1 the Effect of Low-Skilled Labor ...," migration4development.org, 2014,

(40) Uri Dadush, "The Economic Effects of Refugee Return," *Economics* 12, no. 1 (2018), https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2018-33.

(41) Uri Dadush, "The Economic Effects of Refugee Return," *Economics* 12, no. 1 (2018),

(42) Uri Dadush, "The Economic Effects of Refugee Return,"

(43) Herbert Brücker and Elke J. Jahn, "Migration and Wage-Setting: Reassessing the Labor Market Effects of Migration

(44) Uri Dadush, "KNOMAD Working Paper 1 the Effect of Low-Skilled Labor ...," migration4development.org, 2014,

(45) Uri Dadush, "The Economic Effects of Refugee Return," *Economics* 12, no. 1 (2018), https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2018-33.

(46) United Nations High Commissioner for Refugees, "The Role of Host Countries: The Cost and Impact of Hosting Refugees." (UNHCR, 2011), https://www.unhcr.org /4de4f7959.pdf.

(47) Susan F Martin et al., "Environmental Resource Management in Refugee Camps and Surrounding Areas: Lessons Learned and Best Practices" (Institute for the Study of International Migration, 2017).

(48) United Nations High Commissioner for Refugees, "The Role of Host Countries: The Cost and Impact of Hosting Refugees." (UNHCR, 2011),

(49) Susan F Martin et al., "Environmental Resource Management in Refugee Camps and Surrounding Areas: Lessons Learned and Best Practices"

(50) United Nations High Commissioner for Refugees, "The Role of Host Countries: The Cost and Impact of Hosting Refugees." (UNHCR, 2011),

(51) United Nations High Commissioner for Refugees, "The Role of Host Countries: The Cost and Impact of Hosting Refugees." (UNHCR, 2011),

(52) United Nations High Commissioner for Refugees, "The Role of Host Countries: The Cost and Impact of Hosting Refugees."

(53) Susan F Martin et al., "Environmental Resource Management in Refugee Camps and Surrounding Areas: Lessons Learned and Best Practices"

(54) Susan F Martin et al., "Environmental Resource Management in Refugee Camps and Surrounding Areas: Lessons Learned and Best Practices,"

(55) L B Dzimbiri, "Political and Economic Impacts of Refugees: Some Observations on Mozambican Refugees in Malawi.," *Refuge* 13, no. 6 (1993): pp. 4-6.

(56) Susan F Martin et al., "Environmental Resource Management in Refugee Camps and Surrounding Areas: Lessons Learned and Best Practices" (Institute for the Study of International Migration, 2017).

(57) Susan F Martin et al., "Environmental Resource Management in Refugee Camps and Surrounding Areas: Lessons Learned and Best Practices"

(58) United Nations High Commissioner for Refugees, "The Role of Host Countries: The Cost and Impact of Hosting Refugees." (UNHCR, 2011),

(59) Christian Zimmermann and Uri Dadush & Mona Niebuhr, "The Economic Impact of Forced Migration, by Uri Dadush; Mona Niebuhr," Research papers & Policy papers (Policy Centre for the New South, February 2, 2016), https://ideas.repec.org/p/ocp/rpaper/pp-16-05.html.

(60) Organisation for Economic Co-operation and Development.

(61) International Monetary Fund.

(62) “How Will the Refugee Surge Affect the European Economy? ”(OECD, 2015), https://www.oecd.org/migration/How-will-the-refugee-surge-affect-the-European-economy.pdf.

(63) Bergljot B Barkbu and Shekhar Aiyar, "The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges," IMF (International Monetary Fund, 2016), https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/The-Refugee-Surge-in-Europe-Economic-Challenges-43609.

(64) Christian Zimmermann and Uri Dadush & Mona Niebuhr, “The Economic Impact of Forced Migration, by Uri Dadush; Mona Niebuhr,” Research papers & Policy papers (Policy Centre for the New South, February 2, 2016), https://ideas.repec.org/p/ocp/rpaper/pp-16-05.html.

(65) Christian Zimmermann and Uri Dadush & Mona Niebuhr, “The Economic Impact of Forced Migration, by Uri Dadush; Mona Niebuhr,”

(66) It should be noted that The 1951 Convention relating to the Status of Refugees mentioned .. “States to accord refugees the most favorable treatment accorded to any non-nationals of a foreign country in the same circumstances, concerning the right to engage in wage-earning employment, and refugees must be allowed to start businesses and practice liberal professions equally with other non-nationals.”

(67) Uri Dadush, “The Economic Effects of Refugee Return,” *Economics* 12, no. 1 (2018), https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2018-33.

(68) Uri Dadush, “The Economic Effects of Refugee Return,” *Economics* 12, no. 1 (2018),

(69) Uri Dadush, “The Economic Effects of Refugee Return,”

(70) Uri Dadush,

(71) See, for example, UK Office for National Statistics, 2013 and 2016

(72) Timothy J Hatton and Jeffrey G Williamson, *The Age of Mass Migration Causes and Economic Impact* (Oxford University Press, 1998).

(73) John M. Abowd, D Card, and G J Altonji, “The Effects of Immigration on the Labor Market Outcomes of Less-Skilled Natives. ,” in *Immigration, Trade, and the Labor Market* (Chicago, IL: Univ. of Chicago Press, 1991), pp. 201-234.

(74) Kristin F Butcher, "Immigration and Wages: Evidence from the 1980s," *The American Economic Review* 8, no. 2 (1991): pp. 292-296.

(75) Bergljot B Barkbu and Shekhar Aiyar, "The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges," IMF (International Monetary Fund, 2016), https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/The-Refugee-Surge-in-Europe-Economic-Challenges-43609.

(76) C P Kindleberger, *Europe's Postwar Growth: The Role of Labor Supply.* ( Cambridge, MA: Harvard University Press, 1967).

(77) C P Kindleberger, *Europe's Postwar Growth: The Role of Labor Supply,*

(78) C P Kindleberger,

(79) Kristin F Butcher, "Immigration and Wages: Evidence from the 1980s," *The American Economic Review* 8, no. 2 (1991): pp. 292-296.

(80) Robert LaLonde and Robert Topel, “Labor Market Adjustments to Increased Immigration. ,” in *Immigration, Trade, and the Labor Market*, ed. Richard B Freeman and John M Abowd (University of Chicago Press, 1991), pp. 167-199.

(81) Herbert Brücker and Elke J. Jahn, “Migration and Wage-Setting: Reassessing the Labor Market Effects of Migration,” *Scandinavian Journal of Economics* 113, no. 2 (2011): pp. 286-317, https://doi.org/10.1111/j.1467-9442.2010.01634.x.

(82) Oytun Orhan and Sabiha Senyücel Gündoğar, “Effects of the Syrian Refugees on Turkey” (ORSAM, 2015).

(83) Paul Hagstrom, “The Fiscal Impact of Refugee Resettlement In the Mohawk Valley,” ARTHUR LEVITT PUBLIC AFFAIRS CENTER, June 2000, https://www.hamilton.edu/levitt/pdfs/hagstrom_refugee.pdf.

## Bibliography


1. Abowd, John M., D Card, and G J Altonji. “The Effects of Immigration on the Labor Market Outcomes of Less-Skilled Natives. .” Essay. In *Immigration, Trade, and the Labor Market*, 201–34. Chicago, IL: Univ. of Chicago Press, 1991.
2. Barkbu, Bergljot B, and Shekhar Aiyar. “The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges.” IMF. International Monetary Fund, 2016. https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/The-Refugee-Surge-in-Europe-Economic-Challenges-43609.
3. Brücker, Herbert, and Elke J. Jahn. “Migration and Wage-Setting: Reassessing the Labor Market Effects of Migration.” *Scandinavian Journal of Economics* 113, no. 2 (2011): 286–317. https://doi.org/10.1111/j.1467-9442.2010.01634.x.
4. Butcher, Kristin F. "Immigration and Wages: Evidence from the 1980s." *The American Economic Review* 8, no. 2 (1991): 292–96.
5. Dzimbiri, L B. “Political and Economic Impacts of Refugees: Some Observations on Mozambican Refugees in Malawi.” *Refuge* 13, no. 6 (1993): 4–6.
6. Dadush, Uri. “The Economic Effects of Refugee Return.” *Economics* 12, no. 1 (2018). https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2018-33.
7. Dadush, Uri. “KNOMAD Working Paper 1 the Effect of Low-Skilled Labor ...” migration4development.org, 2014. http://www.migration4development.org/sites/default/files/effect_of_low_skilled_labor_working_paper_1_0.pdf.
8. Hagstrom, Paul. “The Fiscal Impact of Refugee Resettlement In the Mohawk Valley.” ARTHUR LEVITT PUBLIC AFFAIRS CENTER, June 2000. https://www.hamilton.edu/levitt/pdfs/hagstrom_refugee.pdf.
9. Hatton, Timothy J, and Jeffrey G Williamson. *The Age of Mass Migration Causes and Economic Impact*. Oxford University Press, 1998.
10. “How Will the Refugee Surge Affect the European Economy?” OECD, 2015. https://www.oecd.org/migration/How-will-the-refugee-surge-affect-the-European-economy.pdf.
11. Kindleberger, C P. *Europe’s Postwar Growth: the Role of Labor Supply.* . Cambridge, MA: Harvard University Press, 1967.

12. LaLonde, Robert, and Robert Topel. “Labor Market Adjustments to Increased Immigration. .” Essay. In *Immigration, Trade, and the Labor Market*, edited by John M Abowd and Richard B Freeman, 167–99. University of Chicago Press, 1991.

13. Legrain, Philippe. “Refugees Work: A Humanitarian Investment That Yields Economic Dividends.” OPEN, February 1, 2017. http://www.opennetwork.net/refugeeswork/.

14. Martin, Susan F, Nili Sarit Yossinger, Douglas A Howard, Lahra Smith, Lara Kinne, and Mark Giordano. Rep. *Environmental Resource Management in Refugee Camps and Surrounding Areas: Lessons Learned and Best Practices*. Institute for the Study of International Migration, 2017.

15. Miller, Sarah Deardorff. Working paper. *Assessing the Impacts of Hosting Refugees*. World Refugee Council Research Paper 4, 2018.

16. OIC. “OIC Ministerial Conference on the Problems of Refugees in the Muslim World: Working Document No. 3: Durable Solutions.” https://www.unhcr.org/protection/conferences, 2005. https://www.unhcr.org/45ab8e462.pdf.

17. Orhan, Oytun, and Sabiha Senyücel Gündoğar. *Effects of the Syrian Refugees on Turkey*. 195. ORSAM, 2015.

18. Ruist, Joakim. “The Fiscal Cost of Refugee Immigration: The Example of Sweden.” *Population and Development Review* 41, no. 4 (2015): 567–81. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2015.00085.x.

19. Schoeni, R. Rep. *The Effects of Immigration on the Employment and Wages of Native Workers: Evidence from the 1970s and 1980s.* . DRU/1408/IF. RAND, 1997.

20. “UNHCR Global Trends - Forced Displacement in 2017.” UNHCR Global Trends - Forced displacement in 2017, July 5, 2018. https://www.unhcr.org/globaltrends2017/.

21. United Nations High Commissioner for Refugees. “Refugees and the Environment.” UNHCR, 2001. https://www.unhcr.org/protection/environment/3b039f3c4/refugees-environment.html.

22. United Nations High Commissioner for Refugees. “The 1951 Refugee Convention.” UNHCR. UNHCR, The UN Refugee Agency, 1951. https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html.

23. United Nations High Commissioner for Refugees. “The Role of Host Countries: The Cost and Impact of Hosting Refugees.” UNHCR, 2011. https://www.unhcr.org/4de4f7959.pdf.

24. United Nations High Commissioner for Refugees. “Statistical Yearbooks.” UNHCR. UNHCR, The UN Refugee Agency. Accessed February 24, 2022. https://www.unhcr.org/statistical-yearbooks.html.

25. Wafa, Ahmed Abou-El. *The Right to Asylum between Islamic Shari’Ah and International Refugee Law: A Comparative Study*. Riyadh, Saudi Arabia: Naif Arab University for Security Sciences, 2009.

26. Zimmermann, Christian, and Uri Dadush & Mona Niebuhr. “The Economic Impact of Forced Migration, by Uri Dadush; Mona Niebuhr.” Research papers & Policy papers. Policy Center for the New South, February 2, 2016. https://ideas.repec.org/p/ocp/rpaper/pp-16-05.html.

**Annex**

**Table 1:** World Ref46

**ugee Host Country Rankings**

| Ranking | Hosting Country | Refugee Population |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | 3,579,531 |
| 2 | Jordan | 2,967,046 |
| 3 | Pakistan | 1,419,606 |
| 4 | Lebanon | 1,395,952 |
| 5 | Uganda | 1,359,464 |
| 6 | Germany | 1,146,685 |
| 7 | Iran | 1,055,489 |
| 8 | Sudan | 979,435 |
| 9 | Bangladesh | 854,782 |
| 10 | Ethiopia | 733,125 |

**Source:** Data are compiled from UNHCR Statistical Year Book of 2019

**Table 2:** Country Rankings According to Refugee Origin of Country

| Ranking | Country of origin | No. People |
|---|---|---|
| 1 | Syria | 3,869,626 |
| 2 | Afghanistan | 2,596,270 |
| 3 | Somalia | 1,106,434 |
| 4 | Sudan | 659,408 |
| 5 | South Sudan | 616,143 |
| 6 | D R Congo | 516,563 |
| 7 | CAR | 410,787 |
| 8 | Iraq | 369,954 |
| 9 | Eritrea | 330,541 |
| 10 | Pakistan | 315,805 |

**Source:** Data are compiled from UNHCR Statistical Year Bookof 2015

**Table 3:** Top Muslim Majority Country Rankings According to Refugee Origin of Country Over 2015 to 2010

| World Ranking | Country of Origin | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syria | 3,869,626 | 2,457,241 | 728,698 | 19,900 | 18,428 | 17,884 |
| 2 | Afghanistan | 2,596,270 | 2,556,502 | 2,586,152 | 2,664,436 | 3,054,709 | 1,905,804 |
| 3 | Somalia | 1,106,434 | 1,121,770 | 1,136,718 | 1,075,148 | 770,148 | 678,308 |
| 4 | Sudan | 659,408 | 636,405 | 558,199 | 491,013 | 379,067 | 348,500 |
| 8 | Iraq | 369,954 | 401,466 | 746,190 | 1,428,308 | 1,683,575 | 1,785,212 |
| 10 | Pakistan | 315,805 | 31,893 | 33,673 | 33,009 | 33,591 | 35,132 |

**Source:** Data are compiled from UNHCR Statistical Year Book of several years (2011-15)

**Figure 4:** Geographical Distribution of Refugee Holding by Muslim Majority Countries

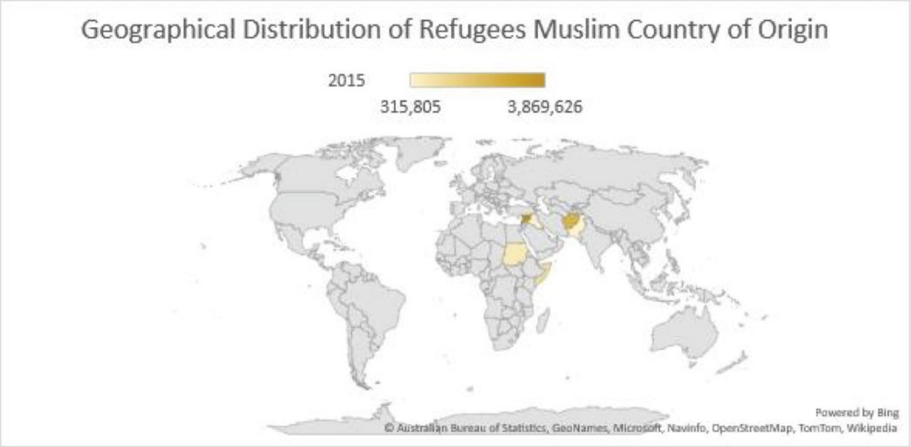


**Figure 5:** Geographical Distribution of Refugees Originated from Muslim Majority Countries

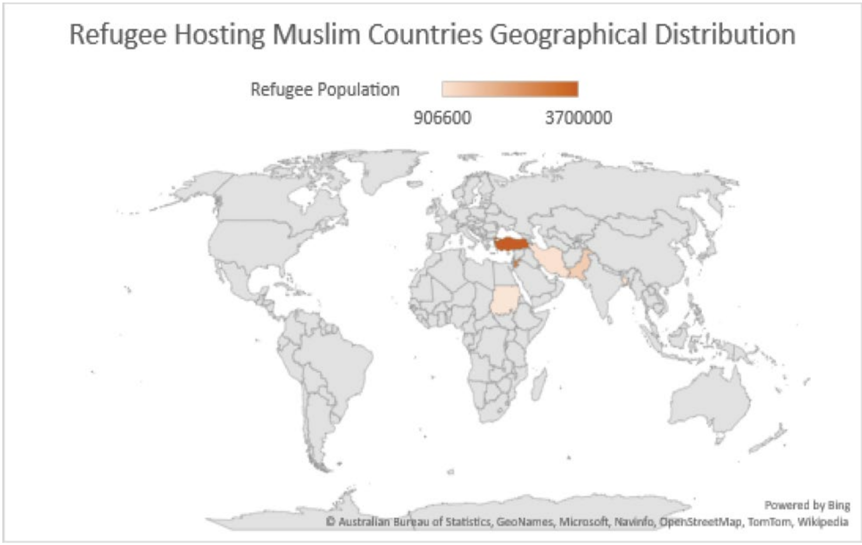


Date of Submission : 15.02.2022
Date of Acceptance : 08.06.2022